আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
খোয়াবনামা

১

পায়ের পাতা কাদায় একটুখানি গেঁথে যেখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গলার রগ টানটান করে যতোটা পারে উঁচুতে তাকিয়ে গাঢ় ছাই রঙের মেঘ তাড়াতে তমিজের বাপ কালো কুচকুচে হাত দুটো নাড়ছিলো, ঐ জায়গাটা ভালো করে খেয়াল করা দরকার। অনেকদিন আগে, তখন তমিজের বাপ তো তমিজের বাপ, তার বাপেরও জন্ম হয় নি, তার দাদা বাঘাড় মাঝিরই তখনো দুনিয়ায় আসতে ঢের দেরি, বাঘাড় মাঝির দাদার বাপ না-কি দাদারই জন্ম হয়েছে কি হয় নি, হলেও বন-কেটে বসত-করা বাড়ির নতুন মাটি ফেলা ভিটায় কেবল হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে, ঐসব দিনের এক বিকালবেলা মজনু শাহের বেশুমার ফকিরের সঙ্গে মহাস্থান কেল্লায় যাবার জন্যে করতোয়ার দিকে ছোটার সময় মুনসি বয়তুল্লা শাহ গোরা সেপাইদের সর্দার টেলরের বন্দুকের গুলিতে মরে পড়ে গিয়েছিলো ঘোড়া থেকে। বন্দুকের গুলিতে ফুটো গলা তার আর পুরট হলো না। মরার পর সেই গলায় জড়ানো শেকল আর ছাইভস্মমাখা গতর নিয়ে মাছের নকশা আঁকা লোহার পান্টি হাতে সে উঠে বসলো কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে পাকুড়গাছের মাথায়। সেই তখন থেকে দিনের বেলা রোদের মধ্যে রোদ হয়ে সে ছড়িয়ে থাকে সারাটা বিল জুড়ে। আর রাতভর বিল শাসন করে ওই পাকুড়গাছের ওপর থেকেই। তাকে যদি এক নজর দেখা যায়—এই আশায় তমিজের বাপ হাত নাড়াতে নাড়াতে আসমানের মেঘ খেদায়।

তা না হয় হলো, কিন্তু এখন থেকে দুই বছর সোয়া দুই বছর পর, না-কি আড়াই তিন বচ্ছরই হবে, বিলের পানি মুছতে মুছতে জেগে-ওঠা ডাঙার এক কোণে চোরাবালিতে ডুবে মরলে তমিজের বাপটা উঠবে কোথায়? তাকে ঠাঁই দেবে কে? বড়ো বানের ছোবলে বড়ো বড়ো কাঁঠালগাছ তো সব সাফ হয়ে গেছে মেলা আগে, শরাফত মণ্ডলের বেটা ইঁটখোলা করলে বাকি গাছগুলোও সব যাবে ভাঁটার পেটে। তখন? তখন তমিজের বাপ উঠবে কোথায়? দিনে দিনে বিল শুকায়, শুকনা জমিতে চাষবাস হয়, জমির ধার ঘেঁষে মানুষ ঘর তোলে। বড়ো বিরিক্ষিকে জায়গা দেওয়ার মতো জায়গা তখন কি আর পাওয়া যাবে?

দিনের বেলা হলে ভালো করে দেখা যায়,—বিলের পশ্চিমে বিলের তীর থেকে এদিকে খালপাড় পর্যন্ত জায়গাটা এখন পর্যন্ত খালিই পড়ে রয়েছে। তারপরই মাঝিপাড়া। মাঝিপাড়ার মানুষ অবশ্য নিজেদের গ্রামকে ওভাবে ডাকে না, গোটা গ্রাম

জুড়ে তো আগে তাদেরই বসবাস ছিলো। এখন পাঁচ আনা ছয় আনা বাসিন্দাই চাষা। আগে কয়েক ঘর কলু ছিলো, আট মাইল পশ্চিমে টাউনে তবিবর মুক্তারের 'রহমান অয়েল মিল' হওয়ার তিন বছরের মধ্যে কলুদের অর্ধেকের বেশি চলে গেলো পুবে যমুনার ধারে। যে কয় ঘর আছে তাদের কারো কারো ঝোঁক জমিতে আবাদ করার দিকেই বেশি।

বিলের ওপারে অনেকটা জমি জুড়ে চাষবাস, তারপর ছোটো খালটা পার হলে চাষাদের গ্রাম। সেখানে এককেটা ঘরের পাশে বাঁধা গোরু, বৃষ্টির পানিতে ভিজে কালচে হয়ে-যাওয়া হলদে খড়ের ভাঙাচোরা গাদা, ভেরেণ্ডা ঝোপের পাশে গোবরের সার, কলাগাছের ঝাড়, বৌঝিদের আব্রু করতে শুকনা কলাপাতার পর্দা, ঘরের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা লাঙল, মই ও জোয়াল। সকাল থেকে দুপুর, এমন কি আষাঢ়ের বিকালে বৃষ্টি না হলে সন্ধ্যাবেলাতেও এপারে দাঁড়িয়ে ওপারটা স্পষ্ট দেখা যায়। শরাফত মণ্ডলের হাতে খাজনা দিয়ে দূরদূরান্তের জেলেরা এসে মাছ ধরে। ওপারের চাষারা, চাষাদের বৌঝিরা পর্যন্ত সার করে দাঁড়িয়ে তাই দেখে। সেসব দিনে বিলে হুলুস্থুল কাণ্ড। জেলে আর কয়জন? সংখ্যায় তাদের তিন গুণ চার গুণ বেশি চ্যাংড়াপ্যাংড়া বিলের তীরে লাফাতে লাফাতে হৈ চৈ করে। তখন কি বিল কি জমি, কি পানি কি ডাঙা কারো কোনো আব্রু নাই। তখন মানুষ বলো, গোরুবাছুর বলো, মেয়েমানুষ বলো আর ছোলপোল বলো, মাছ বলো শামুক বলো,—সব, সব শালা উলঙ্গবাহার হয়ে বেহায়ার মতো খ্যামটা নাচন নাচে।

এখন রাত। এখন কিন্তু অমন নয়। সন্ধ্যা থেকে আবছা কালো পাতলা একটা জাল পড়ে বিলের ওপর, সন্ধ্যা গড়ায় রাত্রিতে আর ঐ অদৃশ্য জালের বিস্তার বাড়ে ঐ সঙ্গে। অন্ধকার গাঢ় হতে হতে সেই বেড় জালের নিচে ধরা পড়ে সমস্ত এলাকা। রাত বাড়ে, রাত আরো বাড়ে, কেউ টের পাবার আগেই শুরু হয় জাল গোটানো। পাকুড়গাছ থেকে টান পড়ে জালের দড়িতে, আস্তে আস্তে দুই পাড়ের গ্রাম নিয়ে গোটা বিল তিরতির করে কাঁপতে কাঁপতে এসে থিতু হয় বিলের মাঝখানে। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশী—কী শুক্লপক্ষ কী কৃষ্ণপক্ষ—গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙা—কাৎলাহার বিলের দুই পাড়ের দুই গ্রাম এই বিলের মধ্যে একাকার হয়ে যায়। তখন যাই দেখো, একটার থেকে আরেকটার ফারাক ধরতে পারবে না। তখন বিলের সিথান থেকে সেই পাকুড়গাছ মস্ত ছায়া ফেলে বিলের ওপর। রাত বাড়ে, বিল জুড়ে তার ছায়া খালি ছড়াতে থাকে, ছড়াতেই থাকে। অমাবস্যার ঘনঘোট অন্ধকার কি পূর্ণিমার হলদে জ্যোৎস্না কিংবা কৃষ্ণপক্ষের ঘোলা লাল আলোয় সেই মস্ত ছায়া গতরে মুড়ে কাৎলাহার বিল, বিলের দুই পাশে গ্রাম, বিলের কাছে খাল, বিলের সিথানে পাকুড়তলা, ওদিকে দক্ষিণে শরাফত মণ্ডলের টিনের বাড়ি এবং বাড়ির পুবে সাদা বকে-ছাওয়া শিমুল গাছ—সব, সবই মায়ের কাছে ভাতের জন্যে কাঁদতে কাঁদতে গায়ে মাথায় জাল জড়িয়ে ঘুমিয়ে-পড়া মাঝিপাড়ার বালকের মতো একটানা নিশ্বাস নেয়। সেই নিশ্বাসের টানে ফোঁপানির রেশ। সব একসঙ্গে দেখার তখন ভারী জুত। এই সময় বেড়জালের দড়ি টানতে টানতে বিলের মাঝখানের আসমানে এসে দাঁড়ায় মুনসি বয়তুল্লা শাহ। তার আগে সাঁতার' কেটে কেটে চলে যায় ভেড়ার পাল। মুনসিকে এক নজর দেখার সুযোগটা নিতেই তমিজের বাপের এখানে আসা। মুনসি কখনোই বেশিক্ষণ থাকে না। ওপরে আসমান আর নিচে পানি ও জমিন একেবারে একাকার। সবখানে মুনসির ইচ্ছামতোন

বিচরণ। সবাইকে একটি লহমার জন্যে এক জায়গায় ঠাঁই করে দিয়ে জাল নিয়ে সে উড়াল দেবে উত্তরের দিকে। বাঙালি নদীর পথভোলা রোগা একটি স্রোত এসে মিশেছে সেখানে কাৎলাহার বিলে। বিলের শিওরে পাকুড়গাছে বসে সকাল থেকে শকুনের চোখে মণি হয়ে ঢুকে মুনসি সূর্যের আকাশ পাড়ি দেওয়া দেখবে, দেখতে দেখতে হঠাৎ রোদে মিশে গিয়ে রোদের সঙ্গে রোদ হয়ে ওম দেবে বিলের গজার আর শোল আর রুই আর কাৎলা আর পাবদা আর ট্যাংরা খলসে আর পুঁটির হিম শরীরে। আর হয়রান হয়ে পড়লে পাকুড়গাছের ঘন পাতার আড়ালে কোনো হরিয়াল পাখির ডানার নিচে ছোটো একটি লোম হয়ে নরম মাংসের ওমে টানা ঘুম দেবে সারাটা বিকাল ধরে।

বিলের শিওরের আরো উত্তরেও কিন্তু সবই মুনসির কবজায়, সেখানেও তারই রাজত্ব। তা তমিজের বাপ সেখানে গিয়েছে বৈ কি! সেখানে অনেক দিনের ঘন কাশবন সাফ করে পাটের জমি তৈরির আয়োজন করেছিলো শরাফত মণ্ডল। তখন পৌষ মাস। খুব ভোরবেলা কুয়াশার নিচে দুটো নৌকা করে নিজগিরিরডাঙার চাষাদের সঙ্গে এপারের মাঝিপাড়ার কয়েকজন গেলো, তমিজের বাপও চললো কামলা খাটতে। কাশবনে ওই সময়ে পানি থাকে না বলে তখনি এই উদ্যোগটা নেয়। কিন্তু না, কাশবনে খটখটে শুকনা জায়গা কোথাও নাই। তখনো পায়ের নিচে প্রতিটি কদমে পানি ছপছপ করছিলো। পৌষ মাসের হিম কাটাতে হাজার হাজার জোঁক গা শুকাচ্ছিলো কাশগাছের রোগা কাণ্ডে, তদের ভারে গাছগুলো একটু একটু নুয়ে পড়েছিলো। এতোগুলো মানুষ কাস্তেকোদাল নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লে দারুণ বুভুক্ষু জোঁকগুলো নিজেদের পছন্দমতো দলে দলে একেকজন কামলার হাতে পায়ে পেটে তলপেটে উরুতে নুনুতে পাছায় হাঁটুতে, এমন কি গোয়ায়—যে যেখানে সুবিধা করতে পারে—খামচে ধরে ঝুলে পড়লো। তাদের বহুকালের খিদে মেটাতে গিয়ে গিরিরডাঙার মাঝি ও নিজগিরিরডাঙার চাষারা ঠিক ভয় না পেলেও যন্ত্রণায় সেগুলো ছাড়াতে তৎপর হয়ে ওঠে এবং শরীরের কোনো না কোনো জায়গায় আস্ত জোঁক বা জোঁকের কামড়ের দাগ নিয়ে ঘরে ফেরে সন্ধ্যার পর। তা ওই জমি ব্যবহারের জন্যে শরাফত মণ্ডলকে অপেক্ষা করতে হয়েছিলো আরো কয়েকটা বছর। তাও সে নিজে নয়, তার বড়োবেটা ওটার পত্তনি নেবে তখন ওখানে কাশগাছ একটাও নাই। চাষা ও মাঝিদের গতরে জোঁকের গাঢ় চুম্বনের রেশ মুছে যাবার আগেই কাশবনের বন্দোবস্ত নিয়েছিলো টাউনের উকিল রমেশ বাগচি। টাউনের বাবু,—জোতজমি করা কি এদের কাজ? তার বেকার ভাগ্নে টুনুবাবুকে জমির তদারকির ভার দিয়ে রমেশবাবু নিশ্চিন্ত হতে পারে না। টুনুবাবুকে সাহায্য করার জন্যে এবং তার ওপর একটু নজর রাখার জন্যেও বটে, রমেশবাবু এদিককার একজন বেশ কর্মঠ, বিশ্বাসী ও বোকাসোকা মানুষ খুঁজছিলো। তমিজের বাপ ইচ্ছা করলেই সুযোগটা নিতে পারতো। খবরটা যখন পায় তার তখন একরকম উপাস চলছে, তমিজের মায়েরও আটমাস, কাজকাম করতে পারে না।

কিন্তু শরাফত মণ্ডল বললো, 'বিলের উত্তর সিথান জায়গা ভালো লয়। হুঁশিয়ার হয়া কাম করা লাগবি।' তা মণ্ডল তো মিছা কয় নি, মুনসির রাগ একটু বেশিই বটে। কারো ওপর মুনসির আসর একবার হয় তো সারা জীবনের মতো তার সব কাজ কাম বন্ধ। তখন তার কিসের বৌ আর কিসের বেটাবেটি! তমিজের বাপ জাহেল মাঝির বেটা, পাক নাপাকের সে জানে কী? সেখানে গিয়ে কখন কী করে বসে সেই ভয়ে সে

একেবারে গুটিয়ে পড়লো। তারপর আট মাস শেষ না করেই একটি মরা মেয়ে বিইয়ে তমিজের মা মণ্ডলবাড়ির বৌঝিদের মতো বিছানায় শুয়ে পড়লে মণ্ডলের দুই নম্বর বিবি গলা নিচু করে সাবধান করে দেয়, 'তমিজের বাপ, বিলের সিথানে যাওয়া আসা করার চিন্তা করিস না। আবার কী মুসিবত হয় কে জানে?'

এসব সেই কোন কালের কথা, কতো বছর আগে, সে হিসাব করা তমিজের বাপের সাধ্যের বাইরে। আর দেখো, আজকাল মুনসিকে একটু দেখার লালচে সেই তমিজের বাপ রাতবিরেতে ঘুমের মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিলের ধারে এসে হাজির হয় একই রাস্তা ধরে। তা মুনসির কোনো আলামত দেখতে হলে রাত্রিবেলাই হলো ঠিক সময়। তমিজের বাপের হাতের ঢেউয়ে ঢেউয়ে মেঘের গাঢ় ছাই রঙ হালকা ছাই হয়ে আসছে। এইবার বিলের পানিতে ভেড়ার পাল হাবুডুবু খেতে খেতে সাঁতার কাটবে। ছাইরঙ ঝেড়ে ফেলে মেঘ সম্পূর্ণ হাওয়া হয়ে যাবে। তখন ভেড়াগুলোর ময়লা সাদা পশমে ঢাকা শরীর দেখে ভেড়া বলে সনাক্ত করা সোজা। তা শালার মেঘ আর কাটে কৈ? মেঘ কাটলেই না ভেড়াগুলোর পিছে পিছে এসে হাজির হবে মুনসি। তার হাতে মাছের নকশা কাটা লোহার পান্টি। এই পান্টি তার হাতের সঙ্গে জোড়া লাগানো, বড়ো একটা আঙুলের মতো বেরিয়ে এসেছে তার হাতের তালু থেকে। মুনসির গলার ফাঁক দিয়ে তার হাঁকডাক দিনদিন একটু একটু করে কমলেও তার দাপটে শরীর এখনো কাঁপে। ওই ফাঁকের জন্যে সে কথা বলতে পারে না, তবে ওখান থেকে প্রচণ্ড বেগে বাতাসের যে ধমক বেরিয়ে আসে ভেড়ার পালের কাছে তার হুকুম বোঝার জন্যে তাই মেলা। চার পা ছুড়ে তারা সাঁতার কাটে, হাবুডুবু খায়। উত্তরে পাকুড়গাছ থেকে দক্ষিণে শিমুলগাছ, এমন কি উত্তর পূর্বে পোড়াদহ মাঠ ছুঁয়ে পানিতে সারারাত তাদের ডোবা ও ভাসা, যাওয়া ও আসা সব চলে এই বাতাসের গর্জন মোতাবেক। তাদের তোলপাড়-করা চলাচলে বিলের সব মাছ সরে সরে যায়। প্রবীণ বোয়াল কি বুড়ো বাঘাড় তার পরিবার পরিজন নিয়ে অনেক নিচে ডুব দিয়ে বিলের তলায় শ্যাওলায় কিংবা সোয়াশো বছর আগে ভূমিকম্পে তৈরি বন্যার তোড়ে মাঝির হাত থেকে খসে-পড়া বৈঠায় বুক পেতে অপেক্ষা করে, কখন ভেড়ার পাল গুটিয়ে নিয়ে ভেড়াগুলোকে গজার মাছের চেহারা ফিরিয়ে দিয়ে মুনসি এদের পাঠিয়ে দেবে বিলের নির্ধারিত জায়গায়। আর নিজে উঠে পড়বে পাকুড়গাছের মগডালে। তারপর?—পরদিন সারাটা দিন ধরে শকুনের চোখের ধারালো মণি হয়ে আকাশ ফালা ফালা করে ফেলবে। আর যদি ফুর্তি ওঠে তো রোদের মধ্যে রোদ হয়ে মিশে বিলের পানিতে তাপ দেবে। আর হাপসে গেলে পাকুড়গাছের ঘন পাতার আড়ালে হরিয়াল পাখির ডানার তলে লোমের মধ্যে লোমশিশু হয়ে হরিয়ালের নরম মাংসের ওমে টানা ঘুম দেবে একেবারে সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত।

তা না হয় হলো, কিন্তু এখন?—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এতোদূর এসে তমিজের বাপ এখন মুনসিকে কৈ কোথাও দেখতে পায় না। জাগরণে তাকে দেখতে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার, স্বপ্নের আড়ালেই কি সে রয়ে যাবে চিরটা কাল? মুনসি মানুষ ভালো লয় গো। মানুষটা মুনসি ভালো লয়! ব্যামাক মানুষের আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে থাকতে সে বড়ই ওস্তাদ।—হায়! হায়! মুনসি কি মানুষ নাকি? তওবা! তওবা! মুনসিকে মানুষের সারিতে নিয়ে এলে কতোরকম বালামুসিবতই না সে দিয়েই চলবে! মরার আগে পর্যন্ত মুনসি হয়তো মানুষই ছিলো। তা সে কি আজকের কথা? সেই কোন আমলে এক বিকালবেলা

বেলা ডোবার আগে আগে মজনু শাহের হাজার হাজার বেশুমার ফকিরদের সঙ্গে করতোয়ার দিকে ছোটার সময় গোরাদের সর্দার টেলরের বন্দুকের গুলিতে মরে সে পড়ে গিয়েছিলো সাদা ঘোড়া থেকে। সব্ব অঙ্গে তীর-বেঁধা সেই ঘোড়া উড়ে গেলো কোথায় কে জানে, আর এখানে এই কাদায় পড়ে থাকতে থাকতে মুনসির লাশ জ্বলে উঠলো লাল আগুন, নীল আগুন, কালো আগুনের শিখায়। তিন দিন তার জ্বলন্ত শরীর ছোঁয়ার সাহস কারো হলো না, কাফন দাফন সবই বাকি রইলো দেখে মুনসি কী আর করে, গুলিতে ফাঁক-করা গলা নিয়ে সোজা চড়ে বসলো পাকুড়গাছের মাথায়। মুনসি সেই থেকে আগুনের জীব। তার গোটা শরীর, তার লম্বা দাড়ি, তার কালো পাগড়ি, তার বুকের শেকল, তার হাতের পান্টি সবই এখন আগুনে জ্বলে। এরকম একটা মানুষকে মানুষ বলে গণ্য করে ফেলার ভয় ও আফসোসে তমিজের বাপ চমকে চমকে ওঠে। হয়তো এই চমকেই ধাক্কা খায় তার ঘুমের ঘনঘোর আন্ধার। হঠাৎ ঘুম-ভাঙা মানুষের মতো চোখ মেলে সে পা ফেলে সামনে। পায়ের গিরে-সমান পানিতে নিজের পায়ের ছপছপ আওয়াজে সে শোনে মুনসির গলা থেকে বেরুনো চাপা গর্জনের বন্ধ কাৎরানি। আশায় আশায় তার বুক ছটফট করে : এই বুঝি মুনসির দেখা পাওয়া গেলো! ভয়ে ভয়ে তার বুক ছমছম করে : এই বুঝি রে মুনসি এসে পড়লো! বিলের শাপলার মূল তার পায়ে ঠেকলে একটু উপুড় হয়ে সে আঁকড়ে ধরে শাপলার ডাঁটা। কিন্তু শাপলার লতা কি তার শরীরের ভার বইতে পারে? বিলের তলার কাদাই তাকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট। তার হাতের মুঠোয় ছিঁড়ে চলে আসে শাপলার পাপড়ির দোমড়ানো টুকরা। ছেঁড়া পাপড়ির নরম ছোঁয়ায় তার ঘুমের পাতলা কয়েকটা খোসা উঠে গেলেও ঘুম কিন্তু সবটা কাটে না। তন্দ্রার মধ্যে হাঁটি হাঁটি পা পা করে সে চলতে থাকে বাড়ির দিকে। তার হাতে শাপলার ছেঁড়াখোঁড়া পাপড়ি। কাঁধে জাল। তন্দ্রা কেটে যাবার আগেই পথ চলার একেকটি কদমে তন্দ্রা ফের ঘন হতে থাকে ঘুমে।

কিন্তু সবসময় কি এমনি হয়?—না কোনো কোনো দিন টানা কোনো আওয়াজে তমিজের বাপের ঘুম একদম ভেঙে গিয়েছে। অনেক দূর থেকে, পাকুড়গাছ ছাড়া আর কোত্থেকে হবে?—ভাঙা ভাঙা গলায় টেনে টেনে কে যেন কয়,

> সিথানে পাকুড়গাছ মুনসির বসতি।
> তলায় গজার মাছ অতি হিংস্রমতি॥
> গভীর নিশিতকালে মুনসির আদেশে।
> বিলের গজার মাছ রূপ লয় মেষে॥

এর পরেও অনেক কথা শোনা যায়, কিন্তু তমিজের বাপ দারুণভাবে চমকে ওঠায় সেগুলো চলে যায় তার কানের এখতিয়ারের বাইরে, ফলে মাথায় চুলকানি তুলেই সেসব হারিয়ে যায়। এমন হতে পারে যে, কথাগুলো তার শরীর জুড়ে শিরশির করছিলো। সেগুলো শব্দের আকার পেতে না পেতে তমিজের বাপের ঘুম ভাঙে এবং ততোক্ষণে আওয়াজটি ফিরে গেছে পাকুড়গাছে। যে বাতাসে ভর করে আওয়াজ আসে তারই প্রবল ঝাপটায় এর পরের কথাগুলো উড়ে যায় দক্ষিণে মণ্ডলবাড়ির খুলি পর্যন্ত, তাইতে জেগে ওঠে শরাফত মণ্ডলের শিমুলগাছের সাদা বকের ঝাঁক। এইসব বক হলো শরফতের পেয়ারের জীব, মণ্ডলের প্রতাপেই এরা বাঁচে এদের সবটা হায়াৎ নিয়ে। তার কড়া

নিষেধ আছে বলেই গ্রামের মানুষ দূরের কথা, মাঘ মাসের শেষ বুধবারে দূর-দূরান্ত থেকে পোড়াদহের মেলায় আসা হাজার হাজার মানুষের কারো সাধ্যি নাই যে ঐ গাছের দিকে একটা ঢিল ছোঁড়ে। শরাফত মণ্ডলের মতো এই বকেদের পূর্বপুরুষের বাড়ি ছিলো নিজগিরিরডাঙা গ্রামে। সেখানে চাষাপাড়ার খালের পর কামারপাড়া, কামারপাড়ার সীমানা শুরু হয় দশরথ কর্মকারের অর্জুনগাছ দিয়ে। দশরথের পূর্বপুরুষের নাম যদি মান্ধাতা না-ও হয়ে থাকে, তবু মান্ধাতার আমলেই যখন দশরথ তো দশরথ, তার ঠাকুরদারও জন্ম হয় নি, এমন কি ঠাকুরদার বাপেরও জন্ম হয়েছে কি হয় নি, হলেও বন কেটে নতুন বসতকরা নতুন ভিটায় সদ্য-বসানো হাঁপরের আঁচে হামাগুড়ি দিচ্ছে, অর্জুনগাছে বকেদের ঘর সংসারের শুরু সেই তখন থেকেই। বক ও কামারের বংশ বেড়েছে পাশাপাশি। গত আকালের সময় কামাররা পটাপট মরতে আরম্ভ করলে বেশ কয়েকটা বকও মরে পড়ে রইলো অর্জুনগাছের নিচে। আকালের সময় কামারদের জমিজমার অর্ধেক চলে যাচ্ছিলো জগদীশ সাহার দখলে, কামারদের ডেকে শরাফত টাকা দিলে সেই টাকা তারা জগদীশকে দিয়ে জমিগুলোকে ক্রোক হওয়া থেকে বাঁচায়। তবে সেগুলোর মালিক হয় শরাফত নিজেই। ওইসব কামার টাউনের দিকে চলে গেলে তাদের ভিটায় হাল দিতে যায় মণ্ডলের কামলারা এবং তখন অর্জুনগাছের বকের ঝাঁক বিল পাড়ি দিয়ে উড়ে এসে বসলো শরাফত মণ্ডলের শিমুলগাছের ডালে ডালে। এই অবলা পক্ষীর জাতকে শরাফত মণ্ডল ঠাঁই দিয়েছে পরম যত্নে। আল্লা মেহেরবান, তাঁর নজরে এড়ায় না কিছুই, এই কাজে শরাফতের সওয়াব মিলেছে মেলা। তার পয়মন্ত সংসারে ছেলেমেয়ে, বৌঝি, গোরুবাছুর, হাঁস-মুরগি, জমিজমা, কামলাপাট দিনদিন বেড়েই চলেছে। তবে একটা কথা—হিন্দু গাঁয়ের পাখি কি কারো কপাল এতো ফেরাতে পারে? আসলে কথাটা মুখে বলতে একটু বাধো বাধো ঠেকলেও গ্রামের মানুষ জানে এই গাছভরা বক হলো মুনসির হুকুমের গোলাম। বকের মস্তুর উড়ালে তমিজের বাপ তাই থরথর করে কাঁপে। এই কাঁপুনি আবার ঘুমের মধ্যে শোনা কিংবা ঘুম ভাঙানিয়া শোলোকেরও রেশ হতে পারে। এই শোলোক কি বের হয় মুনসির ফুটো গলার ভেতর দিয়ে বাতাসের ওপর ভর করে? নাকি তমিজের বাপের পরিচিত কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর তার লোমভরা কানে আটকে গিয়ে ভোঁ ভোঁ করে? ভোঁ ভোঁ আওয়াজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে সমস্ত বিলের ওপর উড়াল দিয়ে দিয়ে তাই জরিপ করার দায়িত্ব পালন করতে করতে ৭/৮টা বক আবার তমিজের বাপের মাথার ওপর ঘুরে ঘুরে সে পাক কি নাপাক তাই হিসাব করে চলেছে। গজার মাঁছের চেহারা নেওয়ার জন্যে মুনসি ভেড়ার পালকে হুকুম করে কীভাবে তাই দেখতে তমিজের বাপের ঘুমে-নেতানো দুটো হাত একটু আগে নড়ছিলো আকাশের মেঘ তাড়াতে, তাই এখন চট করে চেপে বসে তার নিজেরই মাথার ওপর। পাটের আঁশের মতো চুলে ঢাকা এই মাথায় বকের নজর পড়লেই মুনসির হাত থেকে তার আর রেহাই নাই গো, রেহাই নাই! মুখ ঘুরিয়ে তমিজের বাপ কাদা ঠেলে উঠে পড়ে ডাঙার ওপর। এবং সোজা পথ ধরে বাড়ির দিকে। এবার তার কদম পড়ে এদিক ওদিক। কয়েকবার গাইখুরা গাছের কাঁটা লাগে পায়ের নিচে, হাজা-পড়া পায়ের অজস্র ফুটোর কয়েকটিতে কাঁটা বিঁধেও যায়। হাঁটতে হাঁটতে কাঁটা ছাড়াতে ছাড়াতে আরো কাঁটা বেঁধার ঝুঁকি নিয়ে আরো জোর কদম ফেলে সে ছোটে বাড়ির দিকে। এরকম কতোবার আকাশের মেঘ তাড়িয়ে মুনসিকে দেখতে

গিয়ে পাতলা ছাই রঙের উড়ন্ত মেঘ চোখে পড়লে **তারই** ভয়ে **পিছু হটতে** গিয়ে তমিজের বাপ তার ঘাড়ের তৌড় জাল ফেলে গেছে **বিলের** ধারে,—**কখনো** কাদার ওপর, কখনো বৃষ্টিভেজা ডাঙায়।

২

পেটে খিদের খোঁচায় চোখজোড়া ফাঁক হয়ে পড়লে কুলসুমের নজরে পড়ে দরজার কপাট একটা হাট করে খোলা। তমিজের বাপের বাঁ পায়ের কাদামাখা পাতা চৌকাঠের ওপর। দরজা কি খুলে পড়েছে এই পায়ের ধাক্কাতেই? কী করে হয়? ঐ পায়ে কি সেই জোর আছে? মাটিতে শুয়ে রয়েছে; এর মানে মানুষটা রাত্রে উঠে বাইরে গিয়েছিলো; তার মানে কাৎলাহারের কাদাপানি তার পায়ের না হলেও দুই আনা রক্ত টেনে নিয়েছে। আজ দুপুরবেলা পর্যন্ত হাঁটার ক্ষমতা তার হবে কি-না সন্দেহ। তার ডান পা অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে দরজার ভেজানো কপাটের শেষ প্রান্তে। তার রঙ-জ্বলা তবনের অনেকটাই ওপরে ওঠানো, কাপড় তার জায়গামতো নাই। অনেকদিন আগে, এই ঘরে তখন তমিজের মায়ের সংসার, একদিন অমাবস্যার রাতে তমিজের বাপ কাৎলাহার বিলে নামলে মুনসির পোষা গজারের একটি এক কামড়ে তার উরু থেকে খুবলে নিয়েছিলো এক ছটাক মাংস। তমিজের বাপের তবন ওপরে ওঠায় সেই কামড়ের দাগ দেখা যাচ্ছে। তার নিচে হাঁটুতে দগদগ করে বছরখানেকের একটি ঘা। এই ঘা শুরু হলো বড়শির খোঁচা খেয়ে। বড়শি পেতে তমিজের বাপ বসেছিলো ফকিরের ঘাটের শ্যাওড়াগাছের নিচে। মস্ত একটা মাগুর বড়শিতে গেঁথে গেলে তমিজের বাপ হঠাৎ করে টান দেয়। মাগুরশুদ্ধ বড়শি এসে লাগলো তার হাঁটুর ওপর, বড়শি থেকে মাছ ছিটকে পড়ে শ্যাওড়াগাছের নিচু একটা ডালে আর বড়শি গেঁথে যায় তার হাঁটুর ভেতর। মাছটাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি, পানিতে যে ওটা ফিরে গেছে তারও কোনো আলামত তমিজের বাপ দেখে নি। মাছটা তবে ডাঙায় এসেছিলো কার ইশারায় যে তার কারসাজিতে বড়শির ঘা তার আজো সারলো না? তমিজের মায়ের আমলের গজার মাছের কামড়ের দাগ আর হাল আমলের বড়শিবেঁধার ঘা কিন্তু কাছাকাছিই থাকে। ঘা তার দিনে দিনে বাড়ে, ভাব দেখে মনে হয়, গজারের কামড়ের দাগকে বুঝি এই ছুঁয়ে ফেললো। কিন্তু ঐ দাগের সীমায় পৌঁছে শালা আর এগোয় না, আর ওপরে ওঠার লক্ষণ তার নাই। তবে ঘা তার শুকায়ও না, যেটুকুই আছে পুঁজে রসে তাই আরো পুরুষ্টু হয়ে ওঠে।

কাদা লেগে রয়েছে হাঁটুর নিচেই। আর একটুখানি ওপরে লাগলে ঘায়ের আঁশটে গন্ধে কাৎলাহার বিলের সোঁদা গন্ধ মিশে অন্য একটি গন্ধ পাওয়া যেতো। ঐ গন্ধটাও কুলসুমের খুব চেনা। এখন পর্যন্ত আগলে-রাখা নাকছাবিপরা নাকটিকে কুঁচকে নিশ্বাস নিলে বিলের পানির একটু সোঁদা, একটু পানসে ও একটু আঁশটে গন্ধের সঙ্গে তার নাকে ঝাপটা মারে অন্য আরেকটি হালকা বাস্‌না। কিসের বাস্‌না গো? মাচার ওপর

উঠে কুলসুম এদিক দেখে, ওদিক দেখে। গন্ধে গন্ধে দিশা পেলে জিনিসটা তার চোখে পড়ে। কী গো?—না, তমিজের বাপের রোগাপটকা কালোকিষ্টি গতরের পিঠের তলা থেকে বেরিয়ে এসেছে শাপলা ফুলের ছেঁড়াখোঁড়া পাপড়ি। এবার কুলসুমের নাকের সঙ্গে সারা পেট ও বুক নিয়োজিত হয় গন্ধ শোঁকার কাজে। সারাটা শরীর দিয়ে বাতাস টেনে টেনে ছোটো ও মাঝারি নিশ্বাসগুলিকেও সে প্রসারিত করে লম্বা একটি নিশ্বাসে। তা সেটাকে দীর্ঘশ্বাসই বলা যায়। এই দীর্ঘশ্বাসটিকে শব্দে ছেঁকে নিলে তার কথাগুলি হবে এরকম : বুড়া যদি শাপলার ডাঁটা কয়টা তুলে আনতো! তাহলে কী হতো? তাহলে বেশি করে মরিচ দিয়ে, রসুনের কয়টা কোয়া কুচিয়ে ফেলে কুলসুম কী সুন্দর চচ্চড়ি রেঁধে ফেলে। একটু চচ্চড়ি হলে পোড়া মরিচ কয়টা ডলে নিয়ে তমিজের বাপ তিন সানকি ভাত সেঁটে ফেলতে পারে একাই। রাতভর হাঁটাহাঁটি করে আর কাদাপানি ঘেঁটে ঘরে ফিরলে পরদিন অনেক বেলা করে উঠে তমিজের বাপ কী ভাতটাই না গেলে! এই হাড়গিলা গতরটার ভেতর বুড়া এতো এতো ভাত রাখে কোথায়?

বুড়ার জন্যেও বটে, তার নিজেরও বেশ খিদে পেয়েছে, আজ সকাল সকাল ভাত চড়ানো দরকার। কাল দুপুর থেকে ঝমঝম বৃষ্টি, উঠানের চুলা পানিতে টইটম্বুর। পরশুদিনের ভাতে পানি দেওয়া ছিলো, কাল বিকালে তমিজের বাপ একলাই তার সবটা গিললো। পান্তা খেয়ে হুকায় কয়েকটা টান দিয়ে মাচায় উঠে বুড়া সেই যে নিন্দ পাড়তে শুরু করলো, আল্লা রে আল্লা, সন্ধ্যাবেলার ঝড়, ঝড়ের পর বৃষ্টি, তারপর আসমানের একটু জিরিয়ে নেওয়ার পর ফের টিপটিপ বৃষ্টি,—মানুষটা এসবের কোনো খবরই যদি রাখে! পেট ঠাণ্ডা থাকলে বুড়া কী ঘুমটাই যে পাড়ে!

কাল সকালে কয়েকটা শাঁক আলু পেটে জামিন দিয়েছিলো কুলসুম। ব্যস ওই পর্যন্ত। এ ছাড়া এ পর্যন্ত তার মুখে একটা দানা পড়ে নি। তার আর ঘুম হয় কোত্থেকে? ঘরে তোলা-উনান একটা আছে, কিন্তু পরের দিন বাদলা হলে চাল জুটবে কী করে—এই বিবেচনায় হাঁড়ির চালটুকুতে গন্ধ নিয়ে কুলসুম গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়েছিলো স্বামীর পাশে। ঘরে এবার নতুন চাল ছাওয়া হয়েছে, কোনোখান দিয়ে পানি পড়ছে না—এই সুখে বিভোর কুলসুমের চোখেও যে রাজ্যের ঘুম নেমে এসেছিলো সে কিছুই টের পায় নি। তারপর তমিজের বাপ কখন উঠলো, বাইরে গেলো কখন, আবার ফিরে এসে শুয়ে পড়লো মেঝেতে,—কুলসুম এসব কিছুই টের পায় নি। তমিজের বাপ এখন যতোই ঘুমাক, বেলা করে ঘুম থেকে উঠে পিঁচুটি-জড়ানো চোখে ঘরের কোণে হাঁড়িবাসনের দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে থাকবে, তারপর ভাত না পেলে তার সারা শরীরে সাড়া পড়ে যাবে, তখন গলা থেকে কাশি জড়ানো যে স্বর বেরোবে তাতে আর কারো ঘরে টেকা দায়।

তবে সেই স্বর বেরুতে এখনো দেরি আছে, বুড়া অঘোরে ঘুমাচ্ছে। এই সুযোগে ঘরের দুটো এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ির ওপরকার মাটির সরা তুলে কুলসুম প্রাণ ভরে নিশ্বাস নেয়। এই কম্ম করতে তাকে মেঝেতে নামতে হয় নি, মাচায় বসেই মাচার শেষ প্রান্তের জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করা যায়। তো তার তিনটে কি চারটে নিশ্বাসে হাঁড়ির সের দেড়েক চালে বলকানো ভাতের সুবাস পাওয়া যায়। এতে তার পেট, তারপর তলপেট এবং তলপেট থেকে ফের পেট হয়ে ওপরদিকে বুক ও একেবারে জিভ পর্যন্ত চনচন করে ওঠে। চালের ভাতের গন্ধ পেয়ে পেটের এই তোলপাড়ে কুলসুমের গতর

কিন্তু এলিয়ে পড়ে না, বরং আরো চাঙা হয়ে ওঠে। গতরের সাড়ায় সে তখন এটা করে, ওটা করে। যেমন, কয়েক মাস আগে টাউন থেকে তমিজের নিয়ে-আসা বড়ো এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ির ওপরকার মাটির সরা সরিয়ে তমিজের মায়ের আমলের একটা ওষুধের শিশি আলগোছে তুলে তার খরখরে আঙুলে কাচের মসৃণ ছোঁয়া নেয়। ছোটো গোল আয়নাটা ডান হাতে নিয়ে একবার নিজের মুখের ডানদিকে, একবার বাঁদিকে এবং একবার চিবুক দেখে। দুই গাল ও চিবুক দেখার পুনরাবৃত্তি চলে বেশ কয়েকবার। দুই গালের মধ্যে তার তেমন ফারাক নাই, শরীরের শ্যামলা রঙ গালে ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে বলে নিজের মুখটাকে তার প্রায় ফর্সাই ঠেকে। টিকলো না হলেও নাকটা তার উঁচুই, সামনের দিকটা একটু বড়ো। ঠোঁটজোড়া তার দাদার মতো অতোটা পাতলা নয়, কিন্তু পান খেলে দাদার মতোই দুটো ঠোঁটই টুকটুকে লাল দেখায়। দাদার মুখে পানগুপারি থাকতো দিনরাত, কুলসুম পান পায় কোথায়? আয়না ভালো করে দেখে সেটা পাশে রেখে হাঁড়ির ভেতর থেকে একটা একটা করে তমিজের পুরনো পিরান, লুঙি ও তিলে-ধরা কিস্তি টুপি হাতে নিয়ে নাকের সঙ্গে ঠেকিয়ে কুলসুম জোরে জোরে নিশ্বাস টেনে গন্ধ নেয়। তমিজের পিরানের পিঠটা ছেঁড়া, তমিজ ফেলে যাবার পর আর ধোয়া হয় নি। জামার বুকে ঘামের গন্ধ দিনদিন ফিকে হয়ে আসছে, কুলসুমের নিশ্বাসের তোড়ে শিগগরিই মুছে না যায়! না-কি নিশ্বাসে নিশ্বাসেই এর গন্ধ এখন পর্যন্ত টিকে আছে কি-না তাই বা কে জানে?

রোজ সকালবেলার এইসব কাজকাম সেরে কুলসুম মেঝের দিকে আড়চোখে তাকায়। না, তমিজের বাপ আঘোরে ঘুমায়। কুলসুম এবার মাচার সব হাঁড়িপাতিল বস্তার আড়ালে লুকিয়ে-রাখা ঘরের সবচেয়ে পুরোনো জিনিস তার দাদার জরাজীর্ণ বইটা বার করে জান ভরে গন্ধ নেয়। বইটা তার দাদার, দাদা হলো তার বাপের বাপ, অথচ তমিজের বাপ এটাকে আগলে রাখে যক্ষের ধনের মতো। জাহেল মানুষ, মাঝির বেটা, বইয়ের সে বোঝেটা কী? অথচ কুলসুম এটায় হাত দিয়েছে টের পেলেই কটমট করে তাকায়। পাতায় পাতায় চৌকো চৌকো দাগ দেওয়া আর হাবিজাবি কী লেখায় ভরা এই বই তার দাদা যে কী বুঝতো আল্লাই জানে, এ নিয়ে কুলসুমের মাথাব্যথা নাই। তবে হাজার হলেও দাদার জিনিস, অনেকক্ষণ ধরে শুঁকলে দরজায় দাদার চেহারাটা ভেসে ওঠে। কিন্তু তারিয়ে তারিয়ে দাদাকে দেখার সময় কোথায় তার? মাটিতে কুলসুমের ভারি পায়ের চাপে তমিজের বাপের রোগা কালো গতরে অল্প একটু হলেও সাড়া পড়ে, কীসব বিড়বিড় করতে করতে লুঙিটা সে তোলে আরেকটু ওপরে। এতোক্ষণ দেখা যাচ্ছিলো তার হাঁটুর ঘা, এবার তমিজের মায়ের আমলের কাটা দাগটাও বেরিয়ে পড়লো। লুঙি আরেকটু ওপরে উঠলেই বুড়ার কালো কালো কুচকুচে বিচি দুটোর ওপর ন্যাতানো নুনুখানও বেরিয়ে পড়বে। ওটা দেখে লাভ কী কুলসুমের? কিন্তু স্বামীর লুঙি ঠিক করার চেষ্টা না করে কুলসুম চুপচাপ দাঁড়িয়েই থাকে। কান দুটো তার খাড়া করে রাখা, সমস্ত মনোযোগ দিয়ে সে তমিজের বাপের বিড়বিড় ধ্বনির আস্ত আস্ত শব্দগুলো শুনতে চায়। তমিজের বাপের থুথুতে জড়ানো 'তল্যত তাজল তাছ' ঠোঁটের ভেতর দিয়ে ছপছপ করে গড়িয়ে পড়লে কুলসুম আরো ভালো করে কান পাতে। তমিজের বাপ এখন কী স্বপ্ন দেখছে? কাজল বলতে গিয়েই কি তার মুখ দিয়ে তাজল বেরুলো? দাদা বলতো, কাজলের স্বপ্ন দেখলে ছেলেমেয়ে বাপমায়ের কলজে

ঠাণ্ডা করে দেয়। এর মানে হলো, ছেলেমেয়ের হাতে বাপমায়ের জান জুড়ায়। তা তমিজের বাপের ফরজন্দ বেটা আছে, এরকম খোয়াব তো সে দেখতেই পারে। নিজের খালি কোলে হাত রেখে স্বামীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত কুলসুম চোখ বুলায়।—এই আবোর মানুষটা কি তার বিয়ে-করা বিবির শূন্য কোলের কথা কখনো ভাবে? তার কি হুঁশজ্ঞান কিছু আছে?—বেহুঁশ হয়ে ঘুম পাড়তে পাড়তে তমিজের বাপ নতুন করে বিড়বিড় করে উঠলে কুলসুম ফের সেদিকে কান পাতে। কিন্তু অন্য সময়ের মতো এখনো তার কথাগুলো মুখ থেকে বেরিয়ে গলার ভেতর ভাত খাবার সুড়ঙ্গ দিয়ে সেঁধিয়ে পড়ে তমিজের বাপের পেটের ভেতর। কুলসুম কখনো তার নাগাল পায় না। দিনের বেলা কিংবা রাতেও জাগনা থাকলে শোলোক বলার ক্ষমতা তমিজের বাপের লোপ পায়। তখন যতোই পুস করো, 'ক্যা গো, নিন্দের মদ্যে কার সাথে কি শোলেক কচ্ছিলা, কও তো?' শুনে তমিজের বাপ ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, তার ঘুমের ভেতরকার কথা জানবার জন্যে কুলসুম বেশি পীড়াপীড়ি করলে সে ভুরু কোঁচকায়, মেজাজ ভালো থাকলে হয়তো স্বপ্ন কিংবা স্বপ্নে বলা শোলোক মনে করার চেষ্টা করে, চেষ্টা করতে করতে ঝিমায়, চেষ্টা করার ক্লান্তিতে তার স্বর নিচু হয়ে আসে এবং ঘুমের ভেতরে যেভাবে বলে প্রায় সেভাবেই বিড়বিড় করে, 'নিন্দের মদ্যে মানুষ কী কয় না কয়, কিছু মনে থাকে? কী জানি বাপু, কী যে কলাম। কী বা দেখলাম।' তার স্বপ্ন মনে করার জন্যে কুলসুম আরো মিনতি করলে তার দাম বাড়ে, ধমক দিয়ে ওঠে তখন, 'অঙের কথা এখন থো। ভাত দে। ভান্দে। কামোত যাই।' কুলসুমের গোঁ তবু যায় না, স্বামীর ধমক খেয়েও তার হুঁশ হয় না, এমন কি তমিজের বাপের হাতের মারও সে থোরাই পরোয়া করে। ঘুমন্ত মানুষ কথা বলে মুনসির সাথে, না হলে জিন পরির সাথে, মাসুম বাচ্চাদের আলাপ হয় ফেরেশতাদের সাথে। আগুনের জীবদের সাথে তমিজের বাপের কি যোগাযোগ হয় না? দাদা বলতো, 'মানুষটাক আবোর ঠেকলে কী হয়, জাহেল মাঝির বেটা হলে কী হয়, অর মদ্যে বাতেনি এলেম থাকবার পারে রে! মানুষটার মদ্যে আগুন জ্বলে!'

এমন কালোকিষ্টি ছাইয়ের গাদার ভেতর আগুন উস্কে তোলার জন্যেই কি দাদা তাকে এর হাতে সোপর্দ করে কেটে পড়লো? তা সেই দাদার তত্ত্বতালাশ কি তমিজের বাপ কিছুই করতে পারে না? দাদার সঙ্গে কতো বছর ধরে এতো মেলামেশা করলো, এতো গুজুরগাজুর এতো ফুসুরফাসুর করেও তমিজের বাপ কি দাদার কি কিছুই রপ্ত করতে পারলো না? দাদার যে ছেঁড়াখোঁড়া পুরোনো বই, বইয়ের ভেতরে নানা কিসিমের চিহ্ন, চৌকো রেখা, হাবিজাবি কীসব লেখা,—এইসব দেখে দেখে, মাটিতে ওইসব রেখা এঁকে এঁকে দাদা কতো মানুষের খোয়াবের মানে বলে দিয়েছে, হারানো জিনিসের হদিস করে দিয়েছে; কতো মানুষের হাউসের মেয়েমানুষের সঙ্গে আশেকের পথ বাতলে দিয়েছে; বলতে নাই, কুলসুম শুনেছে জোয়ান বয়সে এই বই দেখে দেখেই মানুষের কাছে পয়সা নিয়ে দাদা অনেকের সংসার ভেঙেও নাকি দিয়েছে।—তো সেই বইটাই রয়ে গেলো তমিজের বাপের কাছে। বইয়ের মালিক হয়েও মানুষটা কুলসুমের দাদার কোনো খবরই বার করতে পারে না। ঘুমের মধ্যে এই যে উঠে কোন মুল্লুক ঘুরে আসে, ঘরে যতোক্ষণ ঘুমায় ঘুমের মধ্যে কী কী বলে, দাদার শোলোকগুলোই তোতলায়, তা সে কি কোনো ইশারাই পায় না? নাঃ! তার কথা বোঝবার কোনো উপায়ই কুলসুমের

নাই। এইযে কথা কয়টা মুখ থেকে ছাড়তে ছাড়তেই তমিজের বাপ ফের মিহি সুরে নাক ডাকতে শুরু করলো, কখন খান্ত দেয় কে জানে? মেঝে জুড়ে বুড়া যেভাবে শুয়ে থাকে তাতে মাচা থেকে কুলসুমের নামাটাও মুশকিল। ওই হাড়গিলা শরীরে তিল পরিমাণ জায়গাতেও তার পা ঠেকে তো সর্বনাশ, বুড়া একটা হুলুস্থুল কাণ্ড করে বসবে। এই পা লাগানো নিয়ে একদিন তার কম ভোগান্তি হয় নি।

সেও তো অনেকদিন হয়ে গেলো। তার বিয়ের তখন বোধহয় বছর দুয়েক কেটেছে, তমিজের বাপ সন্ধ্যারাতে বসে ভাত খাচ্ছে, ল্যাম্ফোর কালচে আলোয় ঘর একটু থমকে ছিলো, বাইরে চাঁদের আলোয় উঠানে বসে হুঁকা টানছিলো তমিজ। তামাকের ধোঁয়ার নেশায়-মাতাল জ্যোৎস্নার অনেকটাই খোলা দরজা পেয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে কালচে লাল আলোতে হলুদ রঙ মিশিয়ে দেওয়ায় কুলসুমের মাথাটা হয়তো এতটু ঘুরেই গিয়েছিলো। এমন সময় ট্যাংরা মাছ দিয়ে গোগ্রাসে ভাত খেতে খেতে তমিজের বাপ একটা পেঁয়াজ চাইলো। কুলসুম উঠে দাঁড়িয়ে মাচার ওপর মাটির হাঁড়ি থেকে পেঁয়াজ পেড়ে নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে স্বামীর পাতে দেবে বলে উপুড় হয়েছে, কিংবা উপুড় হয়ে বসতে গেছে স্বামীর সামনে, এমন সময় তার বাম পা লেগে গেলো তমিজের বাপের ডান হাতের কনুইতে। ফলে ভাতের সানকিখান একটু কাৎ হয়ে পড়লো। ঘরের মেঝে লেপামোছায় কুলসুম একটু অকর্মা, সারা মেঝে জুড়ে সম্পূর্ণ সমান জায়গা একটাও যদি পাওয়া যায়! তা তমিজের বাপের সানকির ডালের একটুখানি ছলকে পড়লো মেঝেতে। না, আর কিছু পড়ে নি। ছলকে-পড়া ডালের সঙ্গে ভাতের কয়েকটা দানা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। ট্যাংরা মাছের চচ্চড়ির মাছের কণা কি বেগুনের কুচি কি পোড়া মরিচের কামড়ানো টুকরা সব যেমন ছিলো তেমনি রয়ে গিয়েছিলো সানকির ভেতরেই। তাতেও মানুষটার রাগ কী! তড়াং করে লাফিয়ে উঠলো ভাত ছেড়ে, তারপর শুরু হলো তার সাটাসাটি, 'তুই হামার ভাতেত পাও দিস? এই নাপাক ভাত হামি এখন মুখোত তুলি ক্যাংকা করা্যা?' সঙ্গে সঙ্গে ওই এঁটো হাতের কিল পড়তে লাগলো কুলসুমের পিঠে। বাপরে, ভাতের সঙ্গে বহুদিন পর মুখে দুটো মাছ পড়তে না পড়তে বুড়ার তেজ কী! হাতের কিল আর তার থামে না। ওদিকে চাঁদের আলোয় হুঁকা টানা খান্ত দিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ালো তমিজ। বাপের রাগে জোগান দেয় সেও, 'বাজানের ভাতের থালিত তুমি পাও দেও? ইটা কেমন কথা গো? মুখের রন্ন তুমি পাও দিয়া ঠেলো? লক্ষীর কপালেত তুমি নাথি মারো? কেমন মেয়ামানুষ গো তুমি?'

ছেলের সমর্থনে শক্তি পেয়ে বাপ বৌয়ের চুল ধরে টেনে আনে উঠানে, বলে, 'অতো খলবল খলবল কিসক রে? হুঁশিয়ার হয়া কাম করা যায় না? বেহায়া মাগী, মনে হয় চুলকানি উঠিছে, খালি নাফ পাড়ে, খালি নাফ পাড়ে। আর এই তমিজ জোয়ান মরদটা, কিছুই জানলো না, বুঝলো না, শুরু করলো প্যাচাল পাড়তে, 'ওজগার তো করো না, ফকিরের ঘরের বেটি, ওজগারের কষ্ট তো বোঝো না! মানুষের ভাতের থালিত তুমি নাথি মারবা না তো মারবি কেটা?' তমিজের আক্ষেপে তার বাপের তেজ কিন্তু বাড়ে না। সানকি থেকে ভাতের কয়েকটা দানা গড়িয়ে পড়ার বেদনায় ক্লিষ্ট মুখে সে আরো কয়েক গ্রাস ভাত তোলে এবং তবুও অর্ধভুক্ত থাকার কষ্ট বুকে নিয়ে উঠানের দিকে মুখ করে বসে পড়ে চৌকাঠের ওপর। উঠানের ছোটো ফাঁকা জায়গাটা হালকা ফ্যাকাশে জোৎস্নায় একটুখানি ওপরে উঠেছিলো, উর্ধ্বগামী সেই শূন্যতার দিকে তাকিয়ে সে হুঙ্কার ছাড়ে, 'তামুক দে!' বৌকে বকার হঠাৎ উত্তেজনায় সে হাঁপায়, ফলে

তার হুঙ্কারে রুগ্ন ঘর্ঘরতা, সেই শব্দে জোৎস্নায় এতোটুকু চিড় ধরে না এবং কুলসুম পর্যন্ত ওই হুকুম কিংবা তমিজের হালকা ক্ষোভ এবং জ্যোৎস্নাপীড়িত ছটফটে শূন্যতাকে কিছুমাত্র পরোয়া না করে পায়ের দুমদাম আওয়াজে ঘরে ঢোকে। ঐ যে ঘরে ঢুকে মাচার ওপর শুয়ে পড়লো, সারারাত সে আর উঠবে না। মেঝেতে তার ভাতের খোলা হাঁড়ি যেমন ছিলো তেমনি খোলাই পড়ে থাকবে, এলোমেলোভাবে ছিটানো থাকবে এঁটো ভাতের সানকি, পানি খাবার খোরা, পানির বদনা। এসব এমনি পড়েই থাকবে। এই যে না খেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো, এখন মারো আর বকো, কারো সাধ্যি নাই তাকে মাচা থেকে ওঠায়। ওদিকে মণ্ডলবাড়িতে রাতভর সের দুয়েক চাল নিয়ে ঘরে ফেরা, তাই বা কম কী? এখন এই মাগীকে মাচা থেকে ওঠায় কে? বৌকে মাচা থেকে ওঠাবার ক্ষমতা হয় না বলে এবং গলার জোরও মিইয়ে আসায় তমিজের বাপকে অব্যাহত রাখতে হয় আগের প্যাচাল। তবে প্যাচালে এখন আফসোসই বেশি, 'মেয়ামানুষ, তার এতো কোদ্দ ভালো লয়, ভালো লয়। আজ পাছাবেলা থ্যাকা খলবল, খালি খলবল। নাফপাড়া মেয়ামানুষের কপলেতে দুক্কু থাকে, সংসার ছারেখারে যায়।'

মাচায় শুয়ে এসব শুনতে শুনতে কুলসুমের সত্যি সত্যি লাফ পাড়তে ইচ্ছা করে। বুড়া তার লাফ পাড়ার দেখলোটা কী? খিয়ার এলাকায় ধান কাটা সেরে আগের দিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছিলো তমিজ। গাঁয়ের বাইরে রোজগার করতে যাওয়া জীবনে তার সেই প্রথম। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো কম করে হলেও তিন আনা কম দুইটা টাকা। আকালের দুই বছর আগে সেটা কি কম টাকা গো? খিয়ারের ধান নিয়ে এসেছিলো তাও সের আষ্টেক তো হবেই। কাল সন্ধ্যায় তমিজ যখন বাড়ি পৌঁছয় কুলসুম তখন মণ্ডলবাড়িতে। পরদিন সকালে একটু তাড়াতাড়ি করে ঘরে ফিরে সে দেখে, তমিজ গিয়েছে নিজগিরিরডাঙায়, মণ্ডলের জমির ফলন আর ধান কাটা দেখতে। তারপর কাৎলাহার বিল ঘুরে এসেছে তৌড়া জালটা নিয়ে, কয়েকটা ট্যাংরা নিয়ে ঘরে ফিরতে ফিরতে তার দুপুর পেরিয়ে বিকাল। মাঝির ঘরের ছেলে হলে কী হয়, মাছ ধরায় তার হাউস কম, কেরামতিও একটু কমই। তবে মাছ ছাড়া খিয়ারের চিকন চালের ভাত খেতে মন চায় না। সেই জন্যেই তার জাল নিয়ে বিলে যাওয়া। খিয়ারের চিকন চালের ভাত, চিরল চিরল করে কাটা এলোকেশী বেগুনের সঙ্গে খুব ঝাল দিয়ে রাঁধা মাছ চচ্চড়ি, মাসকলায়ের ডাল আর নতুন আলুর ভর্তা,—এতোসব রান্নাবান্নার উত্তেজনায় কুলসুম সেদিন তমিজের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলো একটু বেশি। হাসাহাসিটাও বোধহয় বেশিই হয়ে গিয়েছিলো। তা কুলসুমের দোষ কী? বুড়া খালি তার পেছনে লেগে থাকে, নিজের বেটার ইয়ার্কি মারা তার চোখেই পড়ে না। রঙ করে তো তার বেটা, আজ দেখা হওয়ার পর থেকে তো সে কেবল মজা করে খিয়ারের গল্পই করলো সেখানে একেকজন জোতদারের দেড়শো দুইশো পাঁচশো হাজার বিঘা জমি। তাদের জমিতে দাঁড়ালে যতোদূর চোখ যায় খালি ধানের ভিঁউ। মাঠের পর মাঠ সেখানে ধানের জমি। কোন কোন মুল্লুক থেকে সেখানে ধান কিনতে যায় পাইকাররা। মণকে মণ ধান কিনে ধানের বস্তা নিয়ে রেলগাড়ি করে তারা চলে যায় কোথায় কোথায়! তালোড়া না কাহালু—কীসব জায়গায় রেলের স্টেশন আছে, স্টেশনের পাকা বারান্দায় ধানের বস্তার পাহাড় জমে ওঠে। এতো ধান হলে কী হবে, খিয়ারের মানুষ নাকি কিপটের একশেষ, ফকির মিসকিনকে তারা খয়রাত দেয় না, রাত্রে মুসাফির এলে তারা ঘরের দরজা আটকে রাখে। দেশে পানি না থাকলে মানুষের জানে দয়ামায়া একটু কমই হয়।

সেখানে নদী নাই, খাল নাই, খালি বড়ো বড়ো পুকুর। সেগুলো তো আর আল্লার দান নয়, মানুষের কাটা। নদীই নাই, সেখানে বান হবে কোথেকে? বানের পানির কামড়ে পায়ে ঘা হয় শুনে কোন বর্গাদারের বেটার বৌ 'ও মা! কী কচ্ছে? পানি বলে কামড়ায়? পানির দাঁত জালায় নাকি?' বলে কীরকম আঁতকে উঠেছিলো তমিজ অদ্ভুত ভঙ্গি করে তার নকল করলে কুলসুম হেসে বাঁচে না। তবে খিয়ারের মানুষের সুখ বুঝি আর টেকে না।—উত্তর থেকে পশ্চিম থেকে নতুন নতুন ঢেউ আসছে, বর্গাদাররা সব ধান নিজেদের ঘরে তোলার জন্যে একজোট হচ্ছে। 'ইগলান কী কথা?'—কুলসুমের বিস্ময়ে উৎসাহিত হয়ে তমিজ গম্ভীর হয়ে যায়। তবে কুলসুমকে আবার আশ্বাসও দেয়, কোথায় এখন যুদ্ধ চলছে, সবাই সেই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, বর্গাদারদের নেতারা কী করবে বুঝে উঠতে পাচ্ছে না। তা যুদ্ধের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কী?—কুলসুমের এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া তমিজের পক্ষে একটু মুশকিল। তবে সে জানায়, যুদ্ধের জন্যে সব জিনিসের দাম বাড়ছে। টাউনে তমিজ নিজে নিজে দেখে এসেছে গোরুর গোশতের সের উঠেছে চার আনায়। দর না উঠলে সেরখানেক গোশত সে নিয়ে আসতো। এই যে বাজারে সাদা কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছে না, মণ্ডলরা হ্যারিকেন জ্বালাতে টাউন থেকে চড়া দামে সাদা কেরোসিন আনে,—এসবই যুদ্ধের জন্যে। যুদ্ধের সঙ্গে জিনিসপত্রের দাম চড়বে কেন?—কুলসুমের কৌতূহলে সাড়া না দিয়ে তমিজ তখন টাউনের গপ্পো ধরে। তাকে খিয়ারে যাওয়া আসা করতে হয়েছে তো টাউন হয়ে। টাউনের মানুষ সব দোকানে বসে চা খায়, গরম চা দেয় ছোটো একটা খোরার মধ্যে করে। যুদ্ধের জন্যে নাকি সাদা চিনিও পাওয়া যায় না, তারা লাল চিনির চা খায়, একেক খোরা দুই পয়সা। একবার খেতে গিয়ে জিভ পুড়িয়ে তমিজের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে বাবা, আর নয়! টাউনের মানুষ সব মানুষ সুবিধার লয় গো, কথার প্যাঁচে তারা মানুষকে ঠকায়, চার আনার জিনিস তারা দর হাঁকে আট আনা দশ আনা। সেখানকার হোটেলে কতো কিসিমের খাবারই যে পাওয়া যায়, কুত্তা জবাই করে তারা খাসি বলে চালায়। তমিজ তাই টাউনে আর যাই করুক, গোশত কখনোই খায় না। তাকে ঠকাবার জো নাই, পুবের পাড়াগাঁর মানুষ হলে কী হয়, টাউনের ফন্দি ফিকির ধরতে আর দেরি হয় নি। তারপর ধরো টাউনের মেয়েমানুষেরা! তারা কীভাবে কথা বলে, মাজা দুলিয়ে তাদের হাঁটা, বিয়ের বয়েসি মেয়েরা, বিয়ে দিলে দুই তিন ছেলের মা হতো, বুকের সঙ্গে বই জড়িয়ে ধরে ইস্কুলে যায়, রিকশায় শাড়ি জড়িয়ে পর্দা করে বসেও শাড়ির ওপর দিয়ে মুখ তুলে তারা টাউন দেখতে দেখতে, কথা বলতে বলতে চলে,—শরীর দুলিয়ে তমিজ এসব বিত্তান্ত এমনভাবে বলে যে হেসে কুটিকুটি না হয়ে কুলসুমের আর জো থাকে না। তা এসব কথাবার্তা আর হাসাহাসিতে তমিজের বাপের মন থাকবে কোথেকে? ঘরে থাকলে বেশিরভাগ সময়ই তো সে ঘুমায়, না হয় হুঁকাটা হাতে গুড়ুক গুড়ুক টানে, না হলে চৌকাঠে বসে ঝিমায়। তা এতোদিন পরে তমিজ সেদিন ঘরে ফিরেছিলো, সেবার সেই তো তার প্রথম গাঁয়ের বাইরে যাওয়া। ছেলে রোজগার করে ঘরে এলো তো কুলসুম একটু খুশি হবে না? হোক না তার সৎ বেটা, হোক না সতীনের বেটা, পেটে নাই বা ধরলো তাকে, তবু বেটা তো!

সেই কতোদিন আগের কথা, কতো দিন আগের উচ্ছ্বাস, আকালের আগের খুশি, আকালের কাঁটাবেঁধা বছর উজিয়ে এসে কুলসুমের বুকে ছলছল করে ওঠে গর্ভে তো সে কাউকে ধরলো না, ছেলে বলো আর মেয়ে বলো তমিজই তার সব। এই আবেগ

বুকে উপচে পড়লে সারাটা শরীর তার শিরশির করে এবং শরীরের এই উৎপাত থেকে রেহাই পাবার তাগিদে তমিজের দোষ ধরার জন্যে সে হঠাৎ করে হন্যে হয়ে ওঠে। কিন্তু সে হলো মুখ্যু মেয়েমানুষ, ফকিরের ঘরের বেটি, অতো বড়ো জোয়ান মরদ তমিজের আয়াব তার চোখে পড়ে কী করে? বরং তমিজের বাপের অঘোরে ঘুমের সুযোগে ছেলের ওপর বাপটার এই রাগের খানিকটা চুরি করে সে চাখে : ক্যা বাপু, কামের খোঁজে খিয়ার এলাকাত না গেলে হয় না?—কিন্তু আবার কাজের সুযোগ এদিকে দিনে দিনে কমে আসছে। এ কথাও তো ঠিক। বেশি দিন নয়, ময়মুরুব্বির কাছে শোনা গেছে, ১০/১২ বছর আগে এই গিরিরডাঙা নিজগিরিরডাঙায়, বিলের এপার ওপার জুড়ে ধান রোপা, নিড়ানি দেওয়া, ধান কাটা—সব কামই পাওয়া গেছে এখানেই। তখন নাকি কামলা দেওয়ার মানুষই ছিলো কম। আর যখন তখন কোনো কাজ বাধলে যেতে হতো বিলের ওপারের পচার বেটা কসিমুদ্দির কাছে। লোকটা বাপের মতোই বোকা ছিলো। জমি ছিলো না তার এক ফোঁটা। থাকতো চাষাদের খুলিতে, এর বারান্দায়, ওর গোয়ালে। গাছ কাটা কি ঘর মেরামতের দরকার হলে মানুষ তার হাতে পায়ে ধরতো। আর দেখো, এই কয় বছরে যেদিকে তাকাও হাজার কসিমুদ্দি। সব শালা খালি কাম খুঁজে বেড়ায়। আকালের বছর এতো মানুষ মরলো, এতো মানুষ ভিটাজমি বেচে দেশান্তরি হলো, তবু শালার মানুষ তো কমে না। জমি-বেচা মানুষ যারা গাঁও ছাড়ে নি, সব কামলা খাটার জন্যে পাগল। কামের জুত কৈ? আগে বর্গাদাররা জমিতে মানুষ খাটাতো, এখন বর্গাদার তার কোলের ছেলেকে পর্যন্ত জমিতে লাগায়।—ঠিক আছে, সবই ঠিক। এরকম হলে তমিজ খিয়ারে না গিয়ে করবে কী?—কিন্তু তার বাপের কথাটাও বোঝো, ভালো করে বুঝে দেখো। খিয়ারে কাম করতে গিয়ে মেয়েমানুষের সঙ্গে তোমার অতো ঢলাঢলি কিসের গো? তমিজের বাপ তো সবই জানে, কুলসুমও অনুমান করতে পারে, খিয়ারের মানুষ মানুষ ভালো লয়। জোয়ান মরদ, কামের মরদ দেখলে তারা নিজেদের মেয়েদের লেলিয়ে দেয় তার পেছনে। মেয়ের সঙ্গে বিয়ে পড়িয়ে ঐ ছেলেকে তারা ধরে রাখে নিজেদের ঘরে। ওদের দিয়ে নিজেদের বর্গা-নেওয়া জমিতে কাম করায়, গোরুবাছুরের দেখাশোনা করায়, ঘর তোলে; মাটি ছেনে দেওয়াল গেঁথে তার ঘর তোলে, মেহনত কম নয়। ছেলে চিরকালের জন্যে তাদেরই হয়ে যায়। ঐসব ডাইনি মেয়েরা ধুলা ঝাড়ে আর পুরুষগুলি তাদের গোলাম হয়ে জীবন কাটায়। নিজেদের বাপমায়ের কথা তাদের আর মনেও পড়ে না। বিয়ে করে পুরুষমানুষ শ্বশুরবাড়িতে কায়েম হবে,—ব্যাপারটা কুলসুমের কাছে হঠাৎ করেই অসহ্য ঠেকে। তমিজের বাপ কি ব্যাজার হয় এমনি? তমিজের বাপ তো যি সি মানুষ লয় বাপু!—ঘুমের মধ্যে সে কার ডাকে বাইরে চলে যায়, কতোদূর যায়, কোথায় যায়, কেউ জানে না। তমিজের বাপকে নিয়ে মানুষ কতো কথাই না বলে! এমনিতে টোপ পাড়লে কী হবে, কামে গেলে তার জুড়ি নাই। শরাফত মণ্ডলের দখলে যাবার আগে কাৎলাহার বিলের মাছ তো ভোগ করেছে মাঝিপাড়ার মানুষই। তখন তমিজের বাপের তৌড়া জালেও পাঁচ সের সাত সের রুই কাৎলা উঠেছে কয়েকটা করে। মাছের ভারে এইসব ছোটো জাল বিলের তলায় এমনি করে আটকে গেছে যে তমিজের বাপকে গলা পানিতে নেমে জালের দড়ি গোটাতে হয়েছে। মুরুব্বি মাঝিরা বলেছে, 'তুমি বাপু বিলে নামার সময় হুঁশিয়ার হয়া নামো। তুমি জাল ফালালেই ব্যামাক মাছ মনে হয় দৌড়াদৌড়ি কর‍্যা খালি তোমার জালতই আসে। কথা ভালো লয়

বাপু।' কেউ কেউ আরো ভয় দেখিয়েছে, 'একটা গজার যদি একদিন জালেত পড়ে তো বড়ো মুসবিত হবি।' কেউ কেউ তার রক্তে তার দাদা বাঘাড় মাঝির অসাধারণ কেরামতি প্রবাহিত হয় বলে মন্তব্য করেছে।—তা এসব অনেক আগের কথা। এখানে তখন তমিজের মায়ের সংসার, কিংবা আরো আগে তমিজের বাপ তখনো বিয়েই করে নি। তবে কুলসুমের দাদা চেরাগ আলি জানতো আসল খবর।—ওসব দাদা পরদাদা কোনো ব্যাপার নয়। তমিজের বাপের শক্তি আসে পাকুড়গাছ থেকে। কাৎলাহার বিল এখন মণ্ডলের দখলে, মাঝির বেটা তমিজের বাপ এখন আর মাছ ধরার কেরামতি দেখায় কোত্থেকে?—দাদার কথা কুলসুম বিশ্বাস করে কীভাবে? এখানে আসার পর থেকে, তার বিয়ের অনেক আগে থেকেই তমিজের বাপকে সে তো এরকম ঝিমাতে আর ঘুমাতেই দেখে আসছে। কাৎলাহার বিল তো মণ্ডল ইজারা নিয়ে দখল করলো সেদিন, আকালের পরের বছর। তার আগে থেকেই তমিজের বাপ একইরকম মানুষ। তবে হ্যাঁ, কামে কোনোমতে একবার লাগলে সে নাকি অন্য মানুষ। জমিতে কাম করতে গেলেও এখনো সে নাকি তিন কামলার খাটনি খাটে একলাই। আবার ঐ মানুষই ঘরে এলে শুরু হলো তার ঘুম আর টোপ-পাড়া। তবে একটা কথা আছে।—তমিজের বাপের ঘুম মানে তো খালি চোখ বন্ধ করে নাক ডাকা নয়; ঘুমের মধ্যেই তার নড়াচড়া, তাঁর হাঁটা, ঘুমের মধ্যেই তার সব চলাচল। কতো মানুষ তাকে নিয়ে কতো কথা কয়। এতো মানুষের ভয় আর ভক্তি দেখেও বেটা তার কথা শোনে না কেন? বাপ যখন পছন্দ করে না তো তমিজ বছর বছর খিয়ারের দিকে না দৌড়ালেই পারে। এই যে আজ ২০/২১ দিন তমিজ বাড়ি নাই, এই বাদলায় খিয়ারে সে কী করছে কে জানে? এখন এখানে বিলের ওপারে মণ্ডলের জমিতে আউশ কাটা চলছে, হুরমতুল্লা একলাই তার জমি বর্গা করছে। আউশ কাটার পর বীজতলা থেকে চারা নিয়ে আমন রোপা হচ্ছে। কাজের অভাব আছে? তমিজের ফুটানিটাও একটু বেশি। এখানে শরাফত মণ্ডলের জমি বর্গা করতে চাইলো, মণ্ডল রাজি হলো না দেখে সোজা হাঁটা দিলো খিয়ারের দিকে। তা বাপু ওখানেও তো কামলাই খাটবি, ওখানে তোকে জমি বর্গা দেওয়ার জন্যে মানুষ কি বসে আছে নাকি? এই বাদলায় সারা দিন পানিতে ভিজতে ভিজতে ধান কাটতে হবে তো ওখানেও। সন্ধ্যাবেলা কোনো বর্গাদারের ঘরের বারান্দায় সে হয়তো বর্গাদারের গোলগাল বৌ কি ছিনাল মেয়ের হাত থেকে চালভাজা কি কাঁঠালের বিচি ভাজা খাচ্ছে। তা মাগীরা কি তাকে এমনি এমনি খেতে দেয়? বাঁশের খুঁটির সঙ্গে সুতা বেঁধে জাল বুনে নিচ্ছে না? তাদের আরো কতো ফন্দি আছে তাও কুলসুম ঠিক বোঝে!

এই সময়ে একটি টিকটিকির ঠিকঠিক আওয়াজ কুলসুমের অনুমানের যাথার্থ নিশ্চিন্ত করে। আসলে টিকটিকি নয়, মেঝেতে পাশ ফিরতে ফিরতে তমিজের বাপই বোধহয় তার সন্দেহে সায় দিয়ে বিড়বিড় করে উঠলো। মানুষটা কী কয়? কাল রাতে বেরিয়ে কার সাথে কী নিয়ে কথাবার্তা বলে এসেছে? কুলসুমের দাদাই কি তমিজের বাপের স্বপ্নে এসে কিছু ইশারা দিয়ে যাচ্ছে?—ইশ! কথাগুলো যদি একটু বোঝা যায়! তমিজের বাপের ঘুমের ভেতর বলা কথা শুনতে কুলসুম মাটিতে উপুড় হয়ে কান পাতলো তমিজের বাপের মুখের কাছে। ঘুমের মধ্যেই তমিজের বাপ লুঙি আরেকটু ওপরে ওঠায়, তার হাত দুটো রাখে নিজের উরুসন্ধিতে এবং কথা বলার বদলে সে জোরে নাক ডাকতে থাকে। কুলসুম তার লুঙিটা একটু নামাতে গেলে তমিজের বাপের নাক ডাকা থামে এবং সুস্বাদু কিছু খাবার ভঙ্গিতে জিভে ও টাকরায় চপচপ আওয়াজ করে?—তা হলে চেরাগ আলি কি তার স্বপ্ন

থেকে সরে পড়লো নাকি? না-কি তমিজের বাপ নিজেই তার সব কথা গুটিয়ে নিচ্ছে নিজের গলার ভেতরে? চপচপ করে কথাগুলো গিলে ফেললে সেগুলো ঝাপসা হতে হতে ঠাঁই নেয় তমিজের বাপের কোন খোয়াবের শাঁসের মাঝখানে কুলসুম তার নাগাল পায় না।

কানে কথা ঢোকার বদলে তার নাকে ঢোকে তমিজের বাপের মুখের পচা আঁশটে গন্ধ। কুলসুমের টিকালো-না-হলেও উঁচু নাক বেয়ে তমিজের বাপের মুখের এই পরিচিত গন্ধ ঢুকে পড়ে তার পেটে। গলায় তো লাগেই, এমন কি একটুখানি ধাক্কা দেয় তার মগজেও। কুলসুমের জিভ জুড়ে এখন পচা মাছের বাস্‌না। মাচার নিচে বারবার থুথু ফেলে গন্ধটা ঝেড়ে ফেলতে ফেলতেই কুলসুম স্বামীর নাকের কাছে নিজের নাক এগিয়ে দেয়। এতে তো পেটটা তার ভরে যাবার কথা, কিন্তু ফল হয় উল্টো। নিস্তেজ খিদেটা তার পেট থেকে তলপেটে এবং ফের পেট হয়ে বুক, এমন কি গলা পর্যন্ত হাঁচড়েপাঁচড়ে ঘোরে। শরীরের এইসব অঙ্গে তোলপাড় ওঠে যে একই সঙ্গে তা নয়। তার চোখের একেকটি পলকে একেকটি অঙ্গে খিদে খুব জোরেসোরে জানান দিয়ে যায়। তবে বারোভাতারি খানকি খিদেকে কাবু করার কায়দাও কুলসুমের জানা আছে। জানে তো জন্ম থেকেই, তবে নতুন ফন্দিটা শিখেছে বছর দুই আগে আকালের সময়। সেটা কী রকম?—জোরালো কোনো গন্ধ পেট ভরে নিতে পারলেই পেটটা তার বেশ ফুলে ওঠে। তবে থুথু ফেললে চলবে না। থুথু যতোবার আসে একটু জমতে দিয়ে গিলে ফেলতে হবে, তাতে পাতলা ডাল খাওয়ার কাজ হয়। বমি বমি লাগবে; কিন্তু বমি করা চলবে না, বমি হলেই পেট খালি।

গন্ধের ভাবনাই কুলসুমের নাকে খেলিয়ে দেয় পানজর্দার হালকা সুবাস। গোলাবাড়ি হাটের বৈকুণ্ঠের মুখের এই গন্ধ বৈকুণ্ঠকে ছাড়াই এসে হাজির হলো,এরকম মাঝে মাঝে তো হয়ই, তবে এতে পেট ভরে না। গন্ধটা নাক দিয়ে ঢুকে গলা পর্যন্ত নেমে ফের উঠে যায় মাথায় এবং মগজে অনেকক্ষণ ধরে ম ম করে কখন মিলিয়ে যায় সে ঠিক ধরতে পারে না।

উঠানে ভাঙা মাটির মালসা চাপা-দেওয়া চুলার ভেতর ছাই গত রাতের বৃষ্টিতে ভিজে কাদা। এর ভেতর থেকে কয়লার দুটো টুকরা নিয়ে ফের ঘরের ভেতর দিয়ে বাইরের উঠান পেরিয়ে ডোবায় পৌঁছে খিদে মেটাবার তাড়া কিন্তু তার আর রইলো না। ডোবার ওপারে একটু উঁচু সরু পথ, খানিকটা গিয়ে গাঁয়ের শেষে এই পথ মিশেছে গোলাবাড়ি যাবার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বড়ো রাস্তার সঙ্গে। বর্ষার ভিজে হাওয়ায় গোলাবাড়ি থেকে পানজর্দার সুবাস কি একেবারেই আসে না? পুবদুয়ারি ঘর তাদের, দাদা বলতো, 'দক্ষিণ দুয়ারি ঘরের রাজা, পুবদুয়ারি তাহার প্রজা।' যমুনার তীরে তাদের মাদারিপাড়া, দরগাতলার মতো এদিককার সব বাড়িও পুবদুয়ারি। এখানে এসে কালাম মাঝির বাঁশঝাড়ে পুবদুয়ারি ছাপরা ঘর পেয়ে চেরাগ আলি মহা খুশি, 'দেখ, একইরকম ঠেকিচ্ছে না রে?' আবার বিয়ের পর ডোবার এদিকে তমিজের বাপের ঘরে ঢুকলো কুলসুম, এটাও পুবদুয়ারি। একটু বাতাস বইলেই তাদের ঘরে হাওয়া ঢোকে। ডোবার ঘাসপাতাশ্যাওলা, অল্প পানির খলসে পুঁটি কি ডোবার ধার ঘেঁষে কাদার ঘরসংসার-করা শোল বেলের তাজা আঁশটে গন্ধ, মানুষের গুয়ের গন্ধ, গোরুবাছুরের গোবরের গন্ধ—সব মিলেমিশে ঝাঁ ঝাঁ রোদে শুকিয়ে কিংবা বৃষ্টিতে নেতিয়ে পড়ে ঘরে ঢুকে মাচার ওপরটা, মাটির মেঝেটা বা ঘরের ছোটো শূন্যতাটিকে কখনো ভারি করে তোলে, কখনো হালকা করে ফেলে।

এসব গন্ধ কি কুলসুমের আজকের চেনা? তমিজের বাপের সঙ্গে বিয়ের কতো আগে থেকে কালাম মাঝির বাঁশঝাড়ের ভেতর ছাপরা ঘরে থাকতেই তো তার থাল-বাসন ধোয়াপাকলা, কাপড় কাচা, মুখ ধোয়া, হেগে ছোচা, গোসল করা সবই তো হয়েছে এই ডোবাতেই। কালাম মাঝির বাড়িতে পাতকুয়া কাটার আগে খাবার পানিও নেওয়া হতো এখান থেকেই। তখন এটা অবশ্য পুকুরই ছিলো। বড়ো বানের পলি জমে উত্তর দিকটা ভরে গেলে ওখানে আরো মাটি ভরে মরিচবেগুনের খেত করে কালাম মাঝি জায়গাটা নিজের দখলে নিয়ে আসে। এসব তো কুলসুমের চোখের সামনের ঘটনা। আল্লারে আল্লা, বিয়ের পরও কুলসুমের সেই আগের নিয়মের কোনো বদল হলো না।

ডোবার ধারে বসে চোখ বন্ধ করেও সে ঠাহর করতে পারে ডোবার ওপারে সরু রাস্তায় সাইকেল চেপে চলেছে সাকিদারদের ইস্কুলে-পড়া ছেলে। ধানের ভার নিয়ে মণ্ডলবাড়িতে যাচ্ছে অহিদ পরামাণিক।

খেজুরগাছের পিঁড়িতে বসে ডোবার পানিতে ঝুঁকে কুলকুচো করছে কুলসুম, তার মুখের ছাইকয়লামাখা পানিতে ডোবার ঘোলা পানির রঙ পাল্টায় না। সেই অপরিবর্তনীয় পানির দিকে তাকিয়ে ডান হাতের তর্জনীর সাদা দাঁতগুলি চকচক শব্দ করে মাজতে মাজতে এবং বারবার কুলকুচো করতে করতে কুলসুম ঠিক বোঝে, দক্ষিণের কলুপাড়ার গফুর কলু গোলাবাড়ি যাচ্ছে দলবল নিয়ে। লোকটা গফুর কলু না হলে তার কিছুই এসে যায় না, শ্যামলা মুখটা যতোটা পারে ফর্সা করে তুলতে অবিরাম পানির ঝাপটা মারতো। কিন্তু গফুর কলু মানুষটা বেহায়া ধরনের আলাপি মানুষ, আবার তার মুখে কথা শুনতেও কুলসুমের কান দুটো উসখুস করে। তা কথা বেশি বললে কী হয়, গফুর ভাইটা কামের মানুষ। অসুখে পড়ে বাপটা তার তেলের ঘানি ঘোরাতে পারে না, তার একরকম ভিক্ষা করে খওয়ার দশা হয়েছিলো। গফুর কিন্তু তেলের ঘানি টানি বাদ দিয়ে ঘুরতে লাগলো মণ্ডলের ছোটোবেটা কাদেরের পিছে পিছে। বছরখানেক তার লীগের পাট্টির হুজুগে মেতে থাকায় তার মেলা ফায়দা হয়েছে। সে এখন কাজ পেয়েছে কাদেরের তেলের দোকানে। এই এলাকায় শুধু কোরোসিন তেল বেচার দোকান প্রথম করলো শরাফত মণ্ডল, সেই দোকান চালায় কাদের। এক বছরেই দোকানের সাইজ বড়ো করে ফেলেছে, আগে টাউন থেকে সপ্তাহে দুইবার ৬/৭টা করে তেলের টিন আসত টমটমে করে, এখন জোড়া জোড়া গোরুর গাড়ি ভর্তি টিন এনেও আশেপাশের চাহিদা মেটাতে পারে না। এর সব দেখাশোনার ভার গফুরের ওপর। কিন্তু এ নিয়ে গফুরের দেমাক নাই, মাঝিপাড়ার আর আর মানুষের সঙ্গে তমিজের বাপও যে তাকে কলুর বেটা কলুর বেটা বলে হেলা করেছে এসব কথা সে মনেও রাখে না। কুলসুমের সঙ্গে দেখা হলেই সে একটু দাঁড়াবে, গোলাবাড়ি হাটের খবর দেবে, তমিজের বাপের কথা জানতে চাইবে, তমিজ কবে ফিরবে জিগ্যেস করবে এবং কুলসুমের দাদার খোয়াবের মানে বলার একটা দুটো নজির দেবে। আজকাল কলুপাড়ার কয়েকটা চ্যাংড়াপ্যাংড়া তার সঙ্গে থাকবেই। লীগের পাট্টির হুজুগ বেশ ভালোই শুরু হয়েছে, হুজুগে সে এদের শরিক করায়, দোকানের কাম কম থাকলে সে নিজেও কাদেরের পিছে পিছে ঘোরে। তা করো, মনিবের মর্জি মতো তোমাকে তো চলতেই হবে। কিন্তু আজ আবার ওই ছিনাল মাগীটাকে নিয়েছো কেন? বুলু মাঝির ভাতারের ভাত-না-খাওয়া বৌ আবিতন এই সাত সকালে কলুর বেটার পাছার সঙ্গে সেঁটে যায় কোথায়? বেশরম বেলাহাজ মাগী, দুদিন পর ভাতার তালাক দেবে, আজ

তুই রাস্তা দিয়ে হাঁটিস অন্য জা্যা তর মানুষের বগল ধরে। শরম করে না?

'ক্যারে কুলসুম, আত্রে ঘরের দুয়ার দিস নাই?' রাত্রে কুলসুমের দরজা খুলে রাখার কারণ জানার আগেই গফুর কলু বলে, 'কাল তালতলাত হাঁটু পানি জমিছিলো রে, তাই ঘুর‍্যা তোর ঘরের খুলির উপর দিয়া গেনু। তোর দুয়ার দেখি খোলা। ভুলকি দিয়া দেখি তুই নিন্দ পাড়িচ্ছু। তমিজের বাপোক ক্যামা দেখনু না।'

বলতে বলতে তার ডান হাতের পুঁটলিটা পাচার হয়ে যায় বাঁ হাতে। বলে, 'মনে হলো বাঁশের আড়াত গেছে। আড়ার ধার দিয়াই তো হ্যাঁটা গেনু, দেখনু না তো। একলা একলা তোক ঘরত থুয়া তাঁই কোটে গেছিলো রে?'

তমিজের বাপের অনুপস্থিতিতে গভীর রাত্রে তার ঘরে উঁকি দিয়ে লোকটা তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে গেছে—এই খবরে কুলসুমের অস্বস্তি হতে না হতে ভাতারের ভাত-না-খাওয়া আবিতন মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে, 'ঘর দুয়ার খুল্যা নিন্দ পাড়িস কিসক? তোর বাপের বাড়ির কথা ভিন্ন। ওটি আছিলো কী, আর চোরে লিবিই বা কী? এটি না হলেও বাসনকোসনগুলা তো আছে। মামুর জাল যে কয়খান আছে তাই চুরি হলে তোক বেচলেও দাম উঠবি না, বুঝলু?'

আবিতন মাঝিদের মেয়ে। তমিজের বাপ কোনো না কোনোভাবে এর চাচা মামু দাদা খালু নানা ভাই ভাতার লাঙ একটা কিছু হয়ই। সেই সুবাদে কুলসুমের বাপের বাড়ি নিয়ে খোঁটা মেরে গেলো।—মাঝির ঘরের বেটি, তুই দুই দিন বাদে লিকা বসবু কলুর বেটার সাথে। তমিজের বাপের সাথে তোর আত্মীয়তা কুটুম্বিতা তখন কোটে যায় দেখা যাবি।—তা দেখে নেওয়ার কাজটা কুলসুম এখনি করতে পারে। কিন্তু গফুর কলু তাগাদা দেয়, 'চলো চলো। কাদের ভাই কছে দশটার মদ্যে গোলাবাড়ি পৌঁছা লাগবি। জোড়াগাছত সভা দশটার সময়। গোলাবাড়িত থ্যাকা মেলা করলে এক ঘন্টার কম লাগবি? চলো বাপু, এ্যানা পাও চালাও।'

আরে বাপ! কুলসুম আর কতো দেখবে? মণ্ডলের দোকানে কাম নিয়ে গফুর কলু আজকাল সময় ঠিক করে ঘড়ির সময় দিয়ে। আবার সভা করে বেড়ায়। কলুর বেটা কলু, তার আবার ফুটানি কতো দেখবো? আবিতনের কথার ঝাঝে কুলসুমের রাগ হয় গফুর কলুর ওপর। দাদা এই কলুটাকে বেশি খাতির করতো, এক আধ পোয়া সর্ষের তেলের লোভে কী মনোযোগ দিয়েই না তার খোয়াবের বিত্তান্ত শুনতো। সেই কলুর বেটা এখন ঘোরে মাঝির ঘরের বৌয়ের সাথে। মরার গাঁয়ে এ্যদের গাঁয়ে ঝাঁটার বাড়িও কেউ মারে না!

৩

কিন্তু গফুর কলুর ওপর রাগ করে কি আবিতনের কথার ঝাঁঝ মোছা যায়? ডোবার ধার থেকে উঠে ঘরের দিকে যেতে যেতে মাটিতে কুলসুমের পা পড়ে দরকারের তুলনায় অনেক বেশি জোরে। এতোগুলো ভারি কদমে আবিতনের পাছায় লাথি ছুঁড়ে মারা হয় না। বরং পায়ের ভেতর দিয়ে মাগীর চোপা কুলসুমের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঢুকে তার সারা শরীরে কোলাহল তুলতে থাকে। ভাতারের ভাত-না-খাওয়া মাগীর ওপর যতোই রাগ

হোক, গ্রামের আর দশটা বৌঝিদের মতো সেই রাগ ঝাড়ার ক্ষমতা কুলসুমের নাই। তার বাপ নাই এবং কোনোদিনই ছিলো না বলে বাপের বাড়ির অভাব অনটনের খোঁটা দিলে সে মুখ ঝামটা দিয়ে জবাব দেয় কোন মুখে? সে যখন এতোটুকু, হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছে কি করে নি, তখনি এক চৈত্র কি বৈশাখের পূর্ণিমা রাতে ভেদবমি করতে করতে মারা যায় ওই অপরিচিত বাপটা। তারপর, কতোদিন পর মনে নাই, যমুনার পুবপাড়ের এক চাষার হাত ধরে ও তাকে কোলে করে মা তার চলে যায় যমুনার পুবেরই কোনো চরে, সেই চরের নাম কুলসুম এখন পর্যন্ত জানে না। তারপর মায়ের কোল থেকে নামবার অল্প দিনের মধ্যেই কুলসুম ঘুরতে থাকে দাদার আঙুল ধরে ধরে। চেরাগ আলি ফকির তো গান করতে করতে নানান দেশে ঘোরে, হয়তো যমুনার ওই চরে মরা ছেলের বৌয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গিয়েছিলো, কুলসুমের মা-ই হয়তো সবুজ শাড়ির ময়লা আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে কুলসুমকে তুলে দিয়েছিলো তার প্রথম পক্ষের শ্বশুরের হাতে। দাদার সঙ্গে এ-গাঁও ও-গাঁও নিয়ে কিন্তু মানুষ এভাবে কথা বলে নি। কয়েকটা ঘরে তো খয়রাত তার একরকম বাঁধাই ছিলো, শুক্কুরবার জুম্মার আগে যে-কোনো সময় একবার গেলেই বেতের ছোটো টালার আধখানা ভরে চাল ঢেলে দিতো তার ঝোলায়। ঈদে বকরিদে কোনো না কোনো বাড়ি থেকে নতুন হোক পুরনো হোক লুঙি একটা ঠিকই পাওয়া গেছে। মিলাদে ফকিরকে যেতে হতো একলাই, কিন্তু কারো জেয়াফতে নাতনিকে সঙ্গে নেওয়ার এজিন না পেলে চেরাগ আলি দাওয়াত কবুলই করতো না। একবার মনে আছে, মাদারিপাড়ার পশ্চিমে খাল পেরিয়ে চন্দনদহের আকন্দবাড়ির হাফিজ দারোগার মা মহরমের চাঁদের এক ভোররাতে স্বপ্নে হাফিজের বাপকে গোরুর গোশত দিয়ে ভাত খেতে দেখে তিনজন ফকিরকে গোরুর গোশত দিয়ে ভাত খাওয়াবার নিয়ত করে। তিন ফকিরের এক ফকির চেরাগ আলি। চেরাগের সাথে কুলসুমকে দেখে আকন্দের পুরনো বাঁদি হোচ্চার মা গজরগজর করে, 'দেখো, সাথ সাথ লাতনিক লিয়া আসিছে। ও ফকিরের বেটা, তোমার লাতনিক জেয়াফত দেওয়া হছে?' চাকরানি মাগীর ভাঙা মোটা গলার আওয়াজে উঠানের পাশে মস্ত রান্নাঘর থেকে ছোলার ডাল দিয়ে গোরুর গোশত রান্নার গন্ধ শুকনা কাঁটা হয়ে কুলসুমের পেটে গলায় বুকে চিরে চিরে যায় : না খেয়েই যদি ফিরে যেতে হয়! তা হলে? কিন্তু তার দাদা চেরাগ আলি ফকির কি কাউকে পরোয়া করার মানুষ? তাঁর কথা সরাসরি বাড়ির গিন্নির সাথে, হাফিজ দারোগার মাকে লক্ষ করে সে বলে, 'মা, হামার সাথে হামার লাতনি আছে গো। হামরা মাদারি ফকির, মানষের বাড়িত একলা জেয়াফত কবুল করা হামাগোরে মানা আছে মা। একলা খাই তো হামাগোরে দোয়া কবুল হয় না।' আর একটা কথা কি, মাদারিপাড়ায় যতোদিন ছিলো, শুক্কুরবার দিন দুপুরবেলা খেতে বসে কথা বলা ছিলো ফকিরের জন্যে মকরু, তাকে থাকতে হতো চুপচাপ। পাতে তার কখন ভাত লাগবে, গোশতের টুকরা চেয়ে নেওয়া কি এক হাতা ডাল ঢেলে দিতে বলা, দৈ দিলে আরেকটু গুড় চেয়ে নেওয়া,—দাদার হয়ে এসব দায়িত্ব পালন করেছে কুলসুম। মানুষের নিয়ত বলো, মানত বলো, ফকির খাওয়ানো বলো, এমন কি খতনা, কুলখানি, জেয়াফত সাধারণত জুম্মার দিনেই আসে বেশি। নাতনিকে সঙ্গে না রাখলে চেরাগ আলির খাওয়া ভালো হবে কী করে? মাদারিপাড়ার খালটা পেরিয়ে চন্দনদহ, শিমুলতলা, শাকদা, গোঁসাইবাড়ি, ভবানীহাট, দরগাতলা—এসব গ্রামে বড়ো বড়ো গেরস্থের বাস। এক চন্দনদহেই তো খালি টিনের ঘর আর টিনের

ঘর। শিমুলতলায় তালুকদারদের মস্ত দরদালান, ভবানীহাটে সরকারবাড়িও পাকা দালান। এসব জায়গায় আকিকা, খতনা, কুলখানি, চেহলাম, বিয়েশাদি, মানত একটা না একটা লেগেই থাকতো। দরগাতলায় শাহসাহেবের দরগাশরিফ,—সেটা তো চেরাগ আলির একরকম বাড়িঘরই বলা চলে। সেখানে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পা দিলে আর কিছু না হোক, আটার খোরমা কিংবা চালগুড়ের পাতলা শিরনি জুটতোই।

আগরবাতির ধোঁয়ার সঙ্গে গুড়ের গন্ধে দরগাশরিফ সবসময় ম ম করে। ফকিরের বেটি বলে ওখানে কেউ তাকে কখনো হেলা করে নি।—না-কি করেছে? কী জানি?—হেলা যদিও করে থাকে তবু শিরনি পেতে তো অসুবিধা হয় নি।

কষ্টে কাটতো বর্ষাকালটা। বাইরে যাওয়া মুশকিল, আবার ভাদ্র মাসে আউশ কাটার আগে পর্যন্ত মানুষ সহজে ভিক্ষা দিতে চায় না। ঐ সময়টা মানুষ খোয়াবও দেখে না। ধান উঠলে ঐ এলাকার মানুষের খোয়াব দেখার ধুম পড়ে গেছে। খোয়াবে খারাপ কিছু দেখলেই চেরাগ আলির কাছে ছুটে এসেছে মানুষ, 'ও ফকির, কও তো, পাছারাতে দেখলাম, হামাগোরে কুয়ার পানি ক্যামা গরম ঠেকিছে। বালটি দিয়া তুল্যা গাও ধোমো, পিঠোত পানি ঢালিচ্ছি, তামান পিঠ বলে পুড়্যা গেলো গো। এই খাবের মাজেজা কী, কও তো বাপু।' ঝোলা থেকে একমাত্র বইটা বার করে চেরাগ আলি আস্তে আস্তে পাতা ওলটাতো। প্রতিটি পৃষ্ঠা ওলটাবার সঙ্গে জিভে আঙুল ছুঁয়ে বলতো, 'স্বপন তুমি কখন দেখিছো কও তো।' ঠিক লগ্নটি বলতে স্বপন-দেখা মানুষটা আমতা আমতা করলে তাকে করা হতো পরবর্তী প্রশ্ন, 'পাছারাতোত তুমি শুছিলা কোন কাত হয়া?' পাশে বই রেখে বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই ঘরের সাসনে ছোটো উঠানে কাঠি দিয়ে চৌকো চৌকো দাগ দিতে দিতে সে এরকম প্রশ্ন করেই যেতো এবং অন্তত পঁচিশটা প্রশ্ন করে তার অর্ধেকেরও জবাব না পেয়েও স্বপ্নের মাজেজা বলে দিতো। কুয়ার পানি স্বপ্নে গরম হলে তার ভাগ্যে অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত,—এই খবর দিয়ে না হলেও দুটো পয়সা সে কামাতোই। কিন্তু বর্ষা আর কার্তিক অগ্রহায়ণে মানুষের স্বপ্ন দেখা বন্ধ। কার্তিকের অভাব আর কাটে না। কিন্তু অভাবের সাধ্য কি যে চেরাগ আলিকে কাবু করে? পেটে কিছু পড়ুক আর নাই পড়ুক, তার কথার তেজ যদি এতোটুকু কমে! কার্তিক হয়ে যায় তার কাছে পোয়াতি মাস। কেমন?—

ছাওয়ালে গর্ভেতে ধরি শুকায় পোয়াতি।
মা তার লোহুতে পুত্র বাড়ে দিবারাতি॥

খালি পেটে এসব শুনতে কুলসুমের ভালো লাগতো না, 'খালি হাবিজাবি কথা কও!'

'হাবিজাবি লয় রে ছুঁড়ি, বুঝ্যা দ্যাখ।' চেরাগ আলি তার শোলোক ব্যাখ্যা করে, 'মাটি এখন গভভো'ধারণ করিছে। তার গভভে দুটা মাস, এক কাত্তিক আর এক আঘুন। পোয়াতি হলে মেয়ামানুষের শরীল শুকায়, এক প্যাট ছাড়া পোয়াতির ব্যামাক অক্ত তার খায়া ফালায় প্যাটের ছাওয়াল। পৌষ মাসে পোয়াতি বিয়ালে তার কোনো দুক্ষু থাকে না।' বলতে বলতে দাদার মুখ থেকে ব্যাজার ভাব কেটে যায়, কার্তিক মাসের অভাব যে সচ্ছলতার প্রস্তুতি ছাড়া কিছুই নয় এই আশ্বাসে সে মহা খুশি। কিন্তু ঘরে বসে আনন্দ অপচয় করার বান্দা চেরাগ আলি নয়, হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে ঝোলাটা টেনে নিয়ে বলে, 'চল বুবু, বেড়াকুড়া আসি। একটা বেলার খোরাক তো পামু।' বেড়াকুড়া আসা মানে ভিক্ষা করা, মাদারিপাড়ার লোকজন এভাবেই বলতো। ওখানকার কেউ তার এই পেশায় দোষের কিছু দেখেনি। ছোটে খাটো বিপদ আপদ,

বালা মুসিবত হলে পরামর্শ নিতে কি স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন দেখলে তার তাবির জানতে তারা বরং ফকিরের কাছেই আসতো। কলিকাল,—আখেরাতের আর বাকি নাই, পরামর্শ শুনে বেশি পয়সা দেওয়ার মানুষ কমে গেছে, ফকির তাই বেড়াকুড়া খায়। এতে হেলা করার কী আছে?—না-কি ভেতরে ভেতরে সবাই তাদের একটু ছোটো নজরেই দেখেছে? কী জানি?—চেরাগ আলি ওদিকে সবার কাছে 'ফকিরের বেটা'। ফকিরের বেটা চলেছে আগে আগে, তার মাথায় কালো রঙের কাপড়ের টুপি, আলখেল্লাটির রঙ এককালে হয়তো কালোই ছিলো, পরে নানা রঙের কাপড়ের তালি লাগার ফলে আসল রঙ খুঁজে পাওয়া দায়। কাঁধে রঙ-জ্বলা চটের ঝোলা, এর ভেতরে তার বই। আবার গেরস্তের ঘরের চাল, বাজারে হাটে দোকানদাররা আলু পেঁয়াজ, পটল, বেগুন, মরিচ, সময়ের আমটা কলাটা যে যা দেয় নেওয়ার জন্যে সে এটা সামনে এগিয়ে দেয়। পয়সা নেওয়ার জন্যে কুলসুমের হাতে একটা টিনের থালা। ফকির হাঁটে তড়বড় করে। সরু দুটো পা যেন দুটো রণপা। হাতের ছড়িটাকে কখনো কখনো ভুল হতো চেরাগ আলির আরেকটি পা বলে। দাদার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কুলসুমের জোরে হাঁটার অভ্যাস হয়েছে, এখন চেষ্টা করেও পায়ের গতি সামলাতে পারে না। তা মাদারিপাড়ায় থাকতে কুলসুমের হাঁটার দোষ কেউ ধরে নি।—ধরতো কি? কী জানি?—এখানে আসার পর, বিশেষ করে তমিজের বাপের সংসার করতে শুরু করার পর থেকে মাঝিপাড়ার বৌঝিরা তার যেসব খুঁত ধরে বেড়ায় তারই কোনো কোনোটি সে গুলিয়ে ফেলে মাদারিপাড়ার মানুষের কথাবার্তার সঙ্গে। আবার এমনও হতে পারে, মাদারিপাড়ায় থাকতে দাদার বেড়াকুড়ার সাথী হয়ে এ-গাঁও ও-গাঁও ঘুরতে ঘুরতে মানুষের যেসব খোঁটা শুনেছে তাই সে আরোপ করে বসে গিরিরডাঙা আর নিজিগিরিরডাঙার বৌঝিদের মুখে। মাদারিপাড়ার কি আর সব ভালো? ওই গাঁয়ে কারো অবস্থাই ভালো লয় গো! ওখানে বারো মাসই আকাল, বারো মাস টানাটানি। একটা দিন খাল পেরিয়ে না ঘুরলে ওখানে ভাত জোটে নি। ছোটো গ্রাম, ঘর মোটে কয়েকটা, সবাই ফকিরের জ্ঞাতিগুষ্টি। পুবদিকে এক ক্রোশ চাষের জমির পর যমুনা, এর মধ্যে কয়েক বিঘা বাদ দিলে সবটাই চন্দনদহের আকন্দদের, শিমুলতলার তালুকদারদের, রৌহাদহের খাঁদের আর গোঁসাইবাড়ির মণ্ডলদের জমি। মাদারিপাড়ার ফকিরদের বেশিরভাগ মানুষ ওখানে বর্গা করে নয়তো কামলা খাটে। কয়েক বিঘা পতিত জমির মালিক ছিলো ফকিররা, তাই নিয়ে তাদের দেমাক কতো! অতো দেমাকের কী আছে? যেখানে পুরনো আমলের গোরস্থান। একটা মস্ত শিরীষ গাছ, কয়েকটা পিতরাজের গাছ আর দুটো শ্যাওড়া গাছ। জিন আর ভূতের আস্তানা। ফকিরগুষ্টির কেউ মরলে গোর দেওয়া হতো ওখানেই; কিন্তু দাফন সেরেই জ্যান্ত মানুষগুলো তড়িঘড়ি করে ঘরে ফিরতো। পরে গোর জিয়ারত করতে যাবার সাহসও কারো হয় নি। এখন তো ওসবের চিহ্নমাত্র নাই।

নদীর ভাঙন শুরু হওয়ার আগে মাদারিপাড়া থেকে যমুনার মূলবাড়ি ঘাটে যেতে হাঁটতে হয়েছে এক ক্রোশের ওপর। চেরাগ আলি বলতো তার পরদাদার পরদাদার আমলে ওখানে নাকি নদীই ছিলো না, যমুনা ছিলো ছিপছিপে লাজুক একটি খাল মাত্র। গোরা নাসারাদের সঙ্গে লড়াই করার সময় মাদারিরা নাকি যখন তখন ঘোড়ায় চড়েই এপার ওপার করেছে। শেষকালে গোরারা জিতে গেলে প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর পর এই গোরস্থান থেকেই মাদারিদের কোন সর্দার ফকির না-কি পীর না পয়গম্বর অভিশাপ

দিলে ভূমিকম্প হয়, সাংঘাতিক ভূমিকম্প, তাইতে খালটা পায় নদীর সুরত। কে অভিশাপ দিলো, কী দোষে এই অভিশাপ কিংবা কাকে অভিশাপ দেওয়া হলো–এসব নিয়ে পরিষ্কার করে চেরাগ আলি কখনো বলে নি। কুলসুম জানতে চাইলে গুনগুন করে শোলোক ধরতো,

তানার লানতে মাটি ফাটিয়া চৌচির।
নবস্রোত তালাশিয়া দরিয়া অস্থির॥
সেইমতো ব্রহ্মপুত্র বহে যমুনায়।
করতোয়া হইল ক্ষীণতোয়া শীর্ণকায়॥
আহা রে কুলীন নদী আবিল পঙ্কিলে।
ফকিরে ঠিকানা পায় মহামীন বিলে॥

তা ওই নদীতে-পরিণত খাল পশ্চিম তীর ভাঙতে শুরু করলে চেরাগ আলি হুঙ্কার ছাড়লো, 'শালী নদী আসুক, মাদারিপাড়ার দিকে আসুক। তখন শালীক দেখা যাবি।' নদীর গতি তবু স্তিমিত না হলে সে হুঁশিয়ার করে দেয়, যার অভিশাপে খাল পরিণত হয়েছে নদীতে, তার মুরিদ সাগরেদ, আত্মীয় স্বজন, জ্ঞাতিগুষ্টির কবর আছে না তাদের গোরস্থানে? এই গোরস্থান ডিঙিয়ে নদী এক পা এগোয় তো চেরাগ আলি নিজের নাম পাল্টে এই নাম দেবে কোনো নেড়ি কুত্তাকে। কিন্তু শিরীষ আর পিতরাজ আর শ্যাওড়া গাছের জিন আর ভূত আর কবরে কবরে চেরাগ আলির সব পূর্বপুরুষ আর চেনাজানা আত্মীয়স্বজনের হাড়গোড়শুদ্ধ গোরস্থান গিলে ফেলার পরও যমুনার আয়তন কমে না। চেরাগ আলির নামের মহিমা বরণ করার নেড়িকুত্তাও সব সাফ হলো। তবে হ্যাঁ, নদী এসে থমকে দাঁড়ালো মাদারিপাড়ার ঠিক ধারে এসে। সবাই বোঝে, এতো খাবার পর যমুনা একটু জিরিয়ে নিচ্ছে, গতরটা একটু ঝরঝরে হলেই শালী ফের গিলতে শুরু করবে। তাই মাদারিপাড়ার লোকজন আগেভাগে এদিক-ওদিক সরে পড়তে লাগলো। কিন্তু চেরাগ আলিকে নড়াবে কে? তার ওপর যেন ওহি নাজেল হয়েছে, যমুনার খিদে সম্পূর্ণ মিটে গেছে, আর এক ছটাক মাটি গিললে যমুনা পেটের অসুখেই মারা পড়বে। মাদারিপাড়া হজম করার সাধ্যি শালীর কোনোদিন হবে না। কিন্তু চেরাগ আলির জ্যাঠতুতো ভাইয়ের বেটা সামাদ ফকির ভোররাতের স্বপ্নে যমুনার ঘোলা পানিতে নিজের ডুবে যাবার স্বপ্ন দেখে তার মাজেজা জানতে এলে চেরাগ আলি ধন্দে পড়ে। ঘোলা পানি দেখা তো ভালো কথা নয়। এ তো রোগের ইশারা বাবা। রোগ বিমারি, বালামুসিবত, এমনকি কারাবাস পর্যন্ত হতে পারে। তবে সামাদ তো ভালো সাঁতার জানে, স্বপ্নেই বা পানিতে কেন ডুববে সে? পানিতে ডোবার স্বপ্নের তাবির খুব খারাপ। সামাদের স্বপ্নের তাবির ঠেকাতে চেরাগ আলি যাকে পায় তাকেই ধরে ধরে শোনায়, 'মাদারিপাড়া গাঁও ছোটো হলে কী হয়, এই গাঁয়ের মাটি বহুত পুরানা। হামাগোরে পরদাদার পরদাদারা দরগাশরিফের ইজ্জত রাখার জন্যে গোরা নাসারা কোম্পানির সাথে নড়াই করিছে। ওই ময়মুরুব্বির দোয়া কায়েম হয়া আছে এই গাঁওত। দোয়ার বরকত আছে না? নদী আর সাহস পাবি না, দেখো!' পূর্বপুরুষের দোয়া, ভোররাতে ডান কাত হয়ে ঘুমিয়ে তার নিজের দেখা শুভ স্বপ্ন এবং তার সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী নস্যাৎ করে দিয়ে এক বছরেরও কম জিরিয়ে নিয়ে নদী এক বর্ষার মাঝামাঝি ছোবল দিলো মাদারিপাড়ার

পুবপাড়া। কয়েকদিনের মধ্যে দক্ষিণ ও উত্তরের মাটি হজম করে পশ্চিম দিক গিলে যমুনা এসে ঠেকলো খালপাড় পর্যন্ত। চেরাগ আলির চাচাতো ভাইয়ের তিন মাসের একটি ছেলে, সামাদ ফকিরের বকনা বাছুরটা, ভুলু ফকিরের সদ্য-ফোটা এক পাল হাঁসের বাচ্চা এবং ল্যাংড়া লইমুদ্দির এক ধামা ধান শেষ পর্যন্ত আর বাঁচানো গেলো না। এ ছাড়া আর সবাই থালাবাসন, ঘরের বাঁশের খুঁটি ও বেড়া, বালিশ ও কাঁথা, বদনা প্রভৃতি সম্পত্তি নিয়ে খাল পেরিয়ে খালের পশ্চিম তীরে আকন্দদের জমিতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে করতে যমুনার ভোজনের বহরটা দেখলো। একটু দেরিতে তৎপর হওয়ায় বাঁশের ঘরটা চেরাগ আলি রক্ষা করতে পারে নি। কিন্তু তার মাথার কালো টুপি, রঙবেরঙের ছোপলাগা আলখাল্লা, ছড়ি, গলা থেকে বুক পর্যন্ত ঝোলানো লোহার শেকল, দোতারা, কেতাবশুদ্ধ ঝোলা এবং ঝোলার বাইরে কুলসুম—এগুলোর কিছুই খোয়া যায় নি। এসব নিয়ে কয়েকটা দিন তার কাটলো আকন্দদের জমিতে, হাফেজ দারোগার মায়ের তুলে দেওয়া চালের নিচে। এরপর এক নাগাড়ে মেলা দিন তার কাটে দরগাতলায় দরগা শরিফে। সেখানে নতুন খাদেম জুটেছিলো তখন কয়েকজন, তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে এবং দরগাকে পরিণত করেছে মসজিদে। তারা মিলাদ পর্যন্ত করতে দেবে না। মাদারি তরিকার ফকির চেরাগ আলি, এসব শরিয়তি বিধিনিষেধের মধ্যে গেলে তার আর থাকে কী? কুলসুম অবশ্য বোঝে, দাদার ওসব তরিকার জেদ টেদ কিছু নয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া, রোজা করা, মওলানাদের ওয়াজ শোনা—এসব করতে গেলে দাদাজানের টোঁ টোঁ ঘোরাটা বন্ধ হয়, তার রোজগারই বা হয় কোত্থেকে? নইলে বর্ষার দিনে ঐ দরগাশরিফের টিনের ছাদের নিচে পাঁকা বারান্দায় শোবার সুযোগ ছেড়ে দাদা মরতে আসে এই গিরিরডাঙা গ্রামের কালাম মাঝির বাঁশঝাড়ে পাটখড়িঘেরা ছনের ছাপরায়?

বুড়া এখানে কী মধু যে পেলো তা বুড়াই জানে। এটা কি একটা গ্রাম হলো? প্রথম দিকে দাদার সঙ্গে কোথাও খেতে বসে একটু বেশি ভাত চাইলেই 'এতোকোনো ছুঁড়ির প্যাটখান কতো বড় গো!' কিংবা 'অদ্যাখলা ছুঁড়ি!' এবং কারো সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হলেই 'ফকিরের বেটি', 'ফকিরের লাতনি',—এইসব কথা শুনতে হয়েছে। ঠিক আছে, দরগায় সুবিধা হলো না, মাদারিপাড়ার সবাই তো চন্দনদহে আকন্দদের জমিতেই মুখ গুঁজে রইলো কয়েকটা মাস, চেরাগ আলি কি সেখানে থাকতে পারতো না? কয়েক মাসের মধ্যে তার জ্ঞাতিগুষ্টি চলে গেলো যমুনার অনেক ভেতরে গোবিন্দপুর চরে, কেউ কেউ ধারাবর্ষায়, কেউ যমুনার পুবপাড়ে মাদারগঞ্জে, সরিষাবাড়িতে। তাদের সাথে সাথে থাকতে পারলেও চাষ করার জমি তো অন্তত কয়েক বছরের জন্যে পাওয়া যায়। যমুনাতীরের মানুষ, যমুনার কোলেকাঁখে থাকাই ভালো। কে শোনে কার কথা? চরে যাবার কথা তুললেই চেরাগ আলির ফুটানির কথা, 'হামরা কি চরুয়া আছিলাম কোনোদিন? বির এলাকার মানুষ চরে যামু কোন দুক্ষে?' এসব ছিলো বুড়ার ছলের কথা। আলসের হাড্ডি, চাষের কামে কোনোদিন হাত লাগালো না, খালি শোলোক গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা করার অছিলা! কালাম মাঝির বাঁশঝাড়ে ঠাঁই পেয়ে খুশিতে দাদা কয়েকটা দিন বুঁদ হয়ে রইলো। বর্ষাকাল, বৃষ্টি লেগেই থাকে, এরই মধ্যে গুটিসুটি মেরে বসে কয়েকদিন বুড়া খালি পুরোনো শোলোকগুলি ঝালাই করে নিলো।

এখানকার কাৎলাহার বিল, তার সিথানে কোন জিন না দেও থাকে, সে কি তার বাপ না সম্বুন্দি কী হয়, চেরাগ আলি তার সারা জীবনের শোলোক মনে হয় বকশা করে দিলো তাকেই।

কুলসুমের তখন কিছুই ভালো ঠেকে না। এখানে মাঝিপাড়ার মানুষ তেমন খয়রাত দিতে চায় না, মিলাদ পড়ায় কম, ছেলেদের খতনা করে কি-না কে জানে। আর এদের মরা ময়মুরুব্বির পাষাণ হিয়া, ছেলেমেয়েদের খোয়াবে এসে দেখাও দেয় না! গোলাবাড়ির হাট বসে সপ্তাহে দুই দিন, জোড়গাছায় এক দিন। এই তিন দিনে ঐসব হাটে গিয়ে দাদায় নাতনিতে প্রাণপণে চ্যাচালেও পয়সা যা মেলে তাতে রেজেক হয় কয় দিনের? পেট প্রায় খালিই থাকে। এর ওপর রাতে বাতাস উঠলেই মাথার ওপর বাঁশে বাঁশে ঠোকাঠুকি। মাদারিপাড়ায় যখন ছিলো, রাত্রিবেলা দাদা বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে হাঁটে নি পর্যন্ত। রাত হলেই প্রত্যেকটা বাঁশ হলো তেনাদের একেকজনের আসন। আর এখানে বাঁশঝাড় হলো তেনাদের স্থায়ী ঘরবাড়ি। কিন্তু এসব নিয়ে কিছু বললেই শুরু হতো ফকিরের ভাষণ, 'এই জায়গার বরকত দেখিছিস? হামাগোরে পরদাদারা এটি অ্যাসা আস্তানা লিছিলো। জ্ঞাতিগুষ্টির কতোজন এটি চোখ মুঞ্জিছে, তানাগোরে রুহ এখনো এটিই ঘোরাঘুরি করে রে বুবু, এই জায়গা যি সি জায়গা লয়।'

'মাদারিপাড়াত না তোমার দাদা পরদাদা ব্যামাক মানুষের গোর আছে। একোজন মানুষের কব্বর হয় কয় জায়গাত?'

'হয় না? তাও হয়।' চেরাগ আলি নজির দেয়, 'সেরপুরে এক পীরের দুই মোকাম, দুই মাজার। একটা শিরমোকাম, সেটি গোর দিছে পীর সাহেবের কাল্লাখানা। আরেকটা ধড়মোকাম, সেটি আছে তেনার শরীলটা। দুষমনে পীর সাহেবকে কাটিছে দুই ছ্যাও কর‍্যা। গোরও হচ্ছে দুই জায়গাত। এক কোশ তফাত।'

'তোমার পরদাদারা কি সোগলি মরার পর দুই তিনখানা কর‍্যা ভাগ হছে?'

এ রকম নিষ্ঠুর উক্তিতে চেরাগ আলির মন খারাপ করতো, গলা নিচু করে বলতো, 'আস্তে বুবু, আস্তে। ময়মুরুব্বি সবই শুনিচ্ছে।' তবে মন ভালো করার কায়দাও চেরাগ আলির ভালো করেই জানা, সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রয়োগ করে,

> সিথানে পাকুড়গাছ মুনসির বসতি।
> তলায় গজার মাছ অতি হিংস্রমতি।

'এটিকার বিল দেখ্যা, তুমি এই শোলোক নতুন বান্দিছো।'

অবোধ বালিকার সন্দেহে চেরাগ আলি হাসে, কোনো শোলোক বাঁধবার ক্ষমতা কি তার আছে? কতো কিসিমের আওয়াজ মানুষের বুকে থাকে। কোনোটা বেরিয়ে আসে [illegible], কোনোটা বেরোয় মানুষ হঠাৎ ভয় পেলে। শোক হলে মানুষের আওয়াজ একরকম, আবার খুশির আওয়াজ আলাদা। এইভাবে কতো শোলোক যে জন্ম থেকে তার বুকে থরে থরে জমা হয়ে আছে, তার দাদা পরদাদার রক্তের সঙ্গে এইসব গান তার শরীরে ভাটি বয়ে এসেছে, কখন সে কোনটা গাইবে তা কি তার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে? কুলসুম বোঝে, দাদার কথাই ঠিক, এতো এতো শোলোক দাদা বাঁধবে কী করে? এসব হলো তার পাওনা-শোলোক। শুনতে শুনতে কুলসুমের অনেকগুলো মুখস্থ

হয়ে গেছে। রাস্তার মোড়ে, হাটে, বাজারে, মেলায় দোতারা বাজাতে বাজাতে চেরাগ আলি এইগুলো গায়, গাইতে গাইতে চরণের মাঝখানে হঠাৎ তার মুখ বন্ধ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে বাকি কথাগুলো সুর করে গাইতে হয় কুলসুমকে। দাদার শোলোক থেকে মাঝে মাঝে পুরনো কথা ঝরে পড়ে, অন্য কোনো শোলোকের চরণ এসে ঢুকে পড়ে সুড়ুত করে, কুলসুম ঠিক ধরে ফেলে। ওদের মাদারিপাড়া দরগাতলায় এসব গান জানে মেলা মানুষ। এদিকে কখনো কখনো কাউকে কাউকে পাওয়া যায় যারা শোলোকের শুরুতে কয়েকটা চরণ গুণগুণ করে গলা মেলাতে পারে। গোলাবাড়ি হাটের বৈকুণ্ঠ, সেই কেবল কয়েকটা গানের পুরোটাই জানে, আর আর শোলোকের কোনোটা আদ্দেক, কোনোটা সিকিভাগ। গোলাবাড়ি হাটে কালাম মাঝির দোকানে এদের নিয়ে তুললো তো সে-ই। তারই উস্কানিতে কালাম মাঝি তাদের দাদা নাতনিকে নিজের বাঁশঝাড়ে ছাপরা করে থাকার সুযোগ করে দিয়েছিলো। তখন ছোটো থাকলে কী হবে, কুলসুমের সব স্পষ্ট মনে আছে। এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে হিন্দুটা তার কী সর্বনাশই না করে দিয়েছে। শরাফত মণ্ডলের বেটার সঙ্গে সভা করে করে গফুর কলু যে আজকাল বলে, 'হিন্দুরা এক জাত, মোসলমান আরেক জাত'—কথাটা ঠিকই। না হলে চেরাগ আলি ফকিরের গান শোনার মতলবে বৈকুণ্ঠ কি চিরটা কাল তাদের এখানে রাখার ব্যবস্থা করে কুলসুমের এতো বড়ো সর্বনাশ করতে পারে?

বুলু মাঝির ভাতারের ভাত-না-খাওয়া বৌ আবিতন এতোক্ষণে চলে গিয়েছে কতো দূর, কিন্তু গিরিরডাঙার মানুষের ওপর, জলবায়ুর ওপর কুলসুমের রাগ আর যায় না। শাড়ির ময়লা আঁচলে সে মুখটা মুছছে তো মুছছেই। এই মোছামুছিতে নাকের ডগা তার একটু একটু ব্যথা করে এবং ঘষায় ঘষায় ডোবার ঘাসপাতাশ্যাওলা ও গুগোবরমাটির গন্ধ এবং বেলে পুঁটি খলসে শোলের আঁশটে গন্ধ ফিকে হয়ে আসে, ফিকে হতে হতে মিলিয়ে যায়। এই সুযোগে বৈকুণ্ঠের মুখের পানজর্দার সুবাস তার মাথায় ঢুকলে মাথা ঝিমঝিম করে। নেশা-ধরা ঐ গন্ধের সঙ্গতে চেরাগ আলি ফকিরের দোতারার টুংটাং বোল কুলসুমের ডানদিকে বাঁদিকে এবং সামনে ও পেছনে, এমন কি মাথার ওপরেও টক টক মেঘ জমিয়ে তোলে। ওই বাসি গন্ধ ও বাসি আওয়াজেই বৃষ্টি নামে তার গোটা মাথা জুড়ে। বহুদিন আগে এই বৃষ্টির মধ্যেই ছুটতে ছুটতে তারা উঠেছিলো কালাম মাঝির দোকানে। গোলাবাড়ির হাটে সেদিন হাটবার, এর মধ্যে সন্ধেবেলা কী ঝমঝম বৃষ্টি! বৈকুণ্ঠের ডাকে তার দাদা আর দাদার হাত ধরে সে একবার মুকুন্দ সাহার দোকানে, একবার কালাম মাঝির দোকানে ছোটাছুটি করলো। মাথার ওপরে ঝমঝম বৃষ্টি। লক্ষণ তো কোনো দিক থেকেই ভালো ছিলো না। দাদা তার এতো জানে, আর এটুকু কি বুঝতে পারলো না যে, ঐ ঝড় বাদলে আর ঐ অন্ধকার রাতে ঘরের বাইরে থাকার কিংবা নতুন ঘরে ওঠার কোনো ইশারাই নাই? কেন, মাদারিপাড়া থাকতে কোনো কোনো মেঘলা সকালে এমন হয়েছে, ঘরে চাল নাই, মাটিতে উপুড় হয়ে বসে দোতারায় টুংটাং করতে করতে চেরাগ আলি কুলসুমকে পাঠাতে চেয়েছে পড়শির ঘরে, 'যা তো বুবু, সামাদের মায়ের ঘরত যা, এক টালা চাল চায়া আন। আজ আর বারালাম না।' মানুষের মুখ-ঝামটা আর কতো খাওয়া যায়? বৃষ্টির মধ্যেই সে বরং খালের ওপারে চন্দনদহে আকন্দবাড়ির যাবার আবদার ধরলে

চেরাগ আলি বলেছে, 'পানি হলে ঘরত থাকা লাগে রে।' পানসে বৃষ্টি তার গলা থেকে ঝরাতো আঠালো' গাঢ় স্বর,

আসমানে সাজিল মেঘ হাতির হাওদা।
ঘরেতে বসিল মজনু জপে আল্লা খোদা।
সাগরেদ না বাহিরিও মাস দুই কাল।
পানির বেগানা পথে নসিব কাঙাল॥

তা বাপু আল্লাখোদাই যদি করতো তো চেরাগ আলিকে কি আর দরগার পাকা বারান্দা থেকে ওভাবে উৎখাত হতে হয়? নতুন খাদেম প্রথম থেকেই তার বেদাত কামকাজে অসন্তুষ্ট। এর ওপর সঙ্গে মসজিদ হলো। ওখানে কোনোরকম বেদাত কাম সহ্য করা হবে না। তা নামাজ বন্দেগি করে পাকা বারান্দায় ঠাঁই পাওয়া গেলে চেরাগ আলি কি তাই করলে ভালো করতো না? কিন্তু মসজিদের ইমাম মেয়েছেলেকে দরগায় থাকতে দেবে না। তবে চেরাগ আলি কি তার নাতনিকে ভাসিয়ে দেবে? চেরাগ আলি অবশ্য বড়ো গলা করে বলতো, 'শালা ভিন্ন তরিকার মানুষ রে, শালারা হামাগোরে দরগা দখল করিছে। হামার পাও ধরলেও হামি এটি থাকিচ্ছি না। হামরা আজকার ফকির লয়, মাদারি ফকির হামরা, বেড়াকুড়া না খালে দাদা পরদাদারা শাপমন্যি দিবি।' এসব গলাবাজি তার ছিলো নতুন খাদেম কিংবা ইমামের আড়ালে, এমন কি দরগার চৌহদ্দির বাইরে, রাস্তায়, যখন কুলসুম ছাড়া তার পাশে আর কেউ নাই। তা খাদেমকে বুড়া যতোই ভয় করুক, ইমামের ভয়ে সে যতোই দরগা ছাড়ুক, এই কথাগুলো বলতে বলতেই তার গলায় গান ফুটতো। তার দোতারার টুংটাং বোল এতোকাল পরেও কুলসুমের মাথায় এতোটাই জোরে বাজে যে মগজের জর্দার নেশা এবং চোখের সামনে তমিজের বাপের চিৎপটাং গতর কোথায় হারিয়ে যায়। মাচা থেকে রান্নার চাল নিতে নিতে তার গলা থেকে বেরিয়ে আসে শোলোক, বেরিয়ে আসে দাদার দোতারার বোলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে।

৪

'ক্যা গো, নিন্দা পাড়ো? ওঠো, ওঠো।'
গতকাল শুতে শুতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিলো, মরার ঘুম আর চোখ ছাড়ে না। বুলু মাঝির ধাক্কায় কুলসুম গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে; এতেই মনে পড়ে, বুলু মাঝি মারা গেছে কাল দুপুরবেলা, তাকে দাফন করে তমিজের বাপ ঘরে ফিরেছে অনেক রাতে। তমিজের বাপ শুয়ে পড়েছে না খেয়েই, মণ্ডলদের বাড়ি থেকে সে খেয়ে এসেছিলো পেট ভরে। শরাফত মণ্ডল বুলুকে মরণোত্তর পুরস্কার দিয়েছে ৮/১০ জন গোরযাত্রীকে পেট ভরে ভাত খাইয়ে। বুলুর নিজের হাতে চাষ করা জমির ধানের ভাত, ভাত কী মিষ্টি! মণ্ডলের চার বিঘা জমি বুলু এবারেই প্রথম বর্গা নিয়েছিলো, জমিতে আউশের ফলন

দেখে মণ্ডল খুব খুশি। অথচ প্রথমে এই জমিটা তাকে দিতে মণ্ডল দোনোমনো করছিলো। হাজার হলেও জমির মালিক ছিলো বুলু নিজেই, আড়াই বছর আগে আকালের সময় মণ্ডলকে বেচে দেয়। তা এবার বুলু খুব কারুবারু করলো এবং বিশেষ করে মণ্ডলের ছোটোবেটা তার পক্ষে সুপারিশ করলে মণ্ডল নরম হয়। তা বুলুর হাতে ধান হলোও বটে! হাজার হলেও নিজের জমিই তো ছিলো, ভিটার সাথে লাগোয়া বাপদাদার আমলের জমি তো, বুলুর রোগা শরীরের অমানুষ খাটনিতে জমি কি সাড়া না দিয়ে পারে? হয়তো ঐ জমিতে আউশ ফলাবার জন্যেই আল্লা এই বছরটা হায়াৎ দিয়েছিলো তাকে, নইলে পেটের ওই ব্যারাম নিয়ে তার চলে যাবার কথা অনেক আগেই। বৌ তো ভেগেছে আরো আগে। শরাফত মণ্ডল গোরযাত্রীদের খাবার সময় কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড়িয়েছিলো নিজেই। তার ইশারায় বুলুর বেটা আফাজের পাতে ভাত তুলে দেওয়া হলো কয়েকবার। মাছ সবার জন্যে জুটলো এক টুকরা করে, আফাজের পাতে পড়লো দুটো পেটি। তার লাশ দাফন করে একেকজনের খিদেও পেয়েছিলো খুব, খেয়েও নিয়েছে ঠেসে। বোয়াল মাছের সালুন দিয়ে পেট ভরে খাবার তৃপ্তিতে তমিজের বাপ কুলসুমের কাছে বুলুর জন্যে শোক ও আফসোসের কথা বয়ান করে তারিয়ে তারিয়ে। তার বিলাপ ঝাপসা হতে হতে নাক ডাকার একটানা ধ্বনিতে ডুব দিলে কুলসুম কী আর করে, মেঝেতে বসে হাঁড়ির ভাত সব খেয়ে নিলো একাই। মাচায় তমিজের বাপের পাশে শুয়ে তার ঘুম আর আসে না। বাইরে বৃষ্টি-ধোয়া জ্যোৎস্না, চাঁদের আলো চাল চুঁয়ে ঢুকে ঘরের অন্ধকারকে অনেকটা পাতলা করে তোলে। এবার বর্ষায় বৃষ্টিতে চালের ছন অনেকটা ক্ষয়ে গেছে। চাল ফুটো হলে বর্ষার পানি তবু হাঁড়িকুড়ি দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা যায়, কিন্তু শীত ঠেকাবে কী দিয়ে? তমিজ যদি নতুন শাড়ি আনে তার জন্যে তো তার ছেঁড়া শাড়িটা আর তমিজের পুরনো তবন আর ন্যাকড়া-ট্যাকড়া জোগাড় করে কুলসুম একটা কাঁথা সেলাই করতে পারে। কাঁথার লাল নীল সবুজ সুতা পাতলা অন্ধকারে তার চোখে শিরশির শিরশির করে। সামনের শীতে নতুন কাঁথার ওমে ঘুমাবার সুখে তখন কুলসুমের চোখ ভরে ঘুম নামে।

তমিজের হাঁকে সেই ঘুম ভাঙলে কুলসুমের বুক কাঁপে : ছোঁড়া এতোদিন বাদে বাড়ি এসেই বাপটাকে বকাঝকা শুরু না করে। দুয়ার ভেতর থেকে বন্ধ, তার মানে তমিজের বাপ সারাটা রাত ঘুম পাড়লো এই মাচার ওপরেই, ঘুমের মধ্যে উঠে সে একবারও বাইরে যায় নি। সারাটা রাত এরকম বেঘোরে ঘুমালো কি বুলুর শোকের তাপে? তা যতোই ঘুমাক, রাতভর বাইরে বাইরে হাঁটার মেহনত যখন হয় নি, তখন কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ঘুম ভাঙবে। বাপ উঠলেই বেটা তাকে বকবে। বাপকে বকায় ব্যস্ত থাকলে তমিজ তাকে বাঁকা বাঁকা কথা শোনাবার ফুরসৎ পাবে না বলে কুলসুম একটু স্বস্তি পায়। আবার বেটার বকাঝকায় তমিজের বাপের কাচুমাচু মুখ ঐ স্বস্তিতে চিড় ধরায়।

এদিকে বাইরে তমিজের গলা শোনা যাচ্ছে ফের, 'আফাজের বাপের দাফন হলো কোটে?' তমিজ নিশ্চয়ই বাইরে কারো সঙ্গে কথা বলছে। এই সুযোগে কুলসুম এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ির ওপরকার সরা তুলে ফেলে, হাঁড়ির ভেতর থেকে ধোঁয়ার মতো উঠে আসে তমিজের পুরনো পিরানের গন্ধ। বাইরে মেয়েলি গলায় তমিজের কথার জবাব দিচ্ছে কেউ। হাঁড়ি সরাচপা দিয়ে মুখ তুলে কান খাড়া করলে কুলসুম বোঝে

তমিজের সঙ্গে কথা বলছে আবিতন। ছি! মাগীর লজ্জাশরম কিছু নাই। মাস ছয়েক আগে গফুর কলুর সঙ্গে নিকা বসলো, তারপর থেকে মাঝিপাড়ায় তার পা দেওয়াই নিষেধ। আজ এতো সাহস সে পায় কোত্থেকে? নিজের বাপের বাড়ি কি মাঝিপাড়া দূরে থাক, গিরিরডাঙা গ্রাম থেকেই তাকে খারিজ করা হয়েছে চিরকালের জন্যে। গফুর কলুর সঙ্গে মাঝিদের ওঠা-বসা তো দূরের কথা, তার কাছে কেউ কিছু বেচেও না। এমন কি কাদেরের দোকানে কাজ নেওয়ার পর সে অবস্থা অনেকটা ভালো করেছে, কিন্তু মাঝিদের কেউ তার কাছে টাকা হাওলাত নিতেও যায় না। এই অবস্থায় কাদের তাকে দিয়ে লীগের কাজ করায় কী করে? মাঝিপাড়ার মাথাগুলোকে নিয়ে সে কয়েকবার বৈঠক করলো। সে বোঝায়, 'কলু হোক তেলি হোক, গফুর তো মুসলমান। না কী? আবদুল গফুরের ধর্ম কী?—ইসলাম। ইসলামে এসব ভেদাভেদ নাই। মুসলমানের এখন একজোট হওয়া দরকার, একজোট না হলে হিন্দুদের সঙ্গে আর কি পেরে উঠবো?'—তা মাঝিরা আরো বেশি একজোট। গফুর মানুষ হিসাবে যাই হোক, মাঝির বেটিকে বিয়ে করে মাঝিদের সে যেভাবে বেইজ্জত করেছে, তার ও তার বৌয়ের কোনো মাফ নাই। মাঝিদের সিদ্ধান্তে বিরক্ত হয় কাদের, 'হিন্দুদের মতো জাতপাত মানলে মুসলমান কওম থেকে তোমরা খারিজ হয়া যাও, সেটা বোঝো?' ওইসব বৈঠকের একটিতে বুলু নিজেও হাজির ছিলো, এর তিন চার মাস আগে সে বৌকে তালাকও দিয়েছে। আবার কাদেরের সুপারিশেই শরাফতের জমিতে বর্গা করার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু সেও মহা গম্ভীর হয়ে চুপচাপ বসে জ্ঞাতিগুষ্টির ক্রোধে ইন্ধন জোগায়। শেষ বৈঠকে শেষ মুহূর্তে কালাম মাঝি এসে একটি কথা বলেই কাদেরকে চুপসে দেয়, 'আপনার বাপজানের সঙ্গে কথাবার্তা কয়েন। আপনে কি কোনো মাঝির বেটিক বিয়া করবেন? মাঝিগোরে আপনেরা কী চোখে দ্যাখেন, কন তো?'

বাড়িতে শরাফত মণ্ডলও ছেলেকে প্রায় একই যুক্তি দেয়, 'আজ তুমি কলুর সাথে মাঝির বেটির নিকা সাপোর্ট করো, ভালো কথা, কিন্তু কোনো মাঝি তোমার বোনের সাথে সম্বন্ধ করবার আসে তো তুমি রাজি হবা?' কাদের জবাব দিয়েছিলো, 'ছেলে যদি লেখাপড়া জানে তো আপত্তি করবো কেন?' সে বলে, লেখাপড়া শিখে চাকরিতে ঢুকেছে বলেই না তার বড়োভাইয়ের এতো খাতির, টমটমে করে গ্রামে ঢোকার সাথে সাথে তাকে দেখতে ভিড় জমে যায় রাস্তার দুই পাশে। আবার মানুষ তাকে হিংসাও করে। এসব তো তার চাকরির জন্যেই। এসব অকাট্য যুক্তি। কিন্তু শরাফত মণ্ডল 'আবদুল কাদের মিয়া, শোনো', বললে কাদের তার পুরো নাম এবং নামের পর ইজ্জত-বাড়ানো শব্দটি শুনে চোখ নিচে নামিয়ে লতিশুদ্ধ দুই কান পেতে দেয় বাপের কথা শুনতে, 'লীগের কামে নামিছো। সামনে ভোট। ভোট চাও তো সমাজ তোমার মানাই লাগবি। মানষের মন বুঝ্যা কাম করো। বইপুস্তকের কথা থোও। ইগলান কথা কলে ভোট পাওয়া যাবি না।' ভোটের কথায় কাজ হয়। গিরিরডাঙা গ্রামে লীগের কাজ থেকে গফুরকে বিরত রাখতেও সে বাধ্য হয়েছে।

যে মাগীকে নিকা করে গফুরের মতো মানুষের হেনস্থার শেষ নাই, সেই আবার তার আগের ভাতার মরতে না মরতে মাঝিপাড়ায় আসার সাহস পায়? ছি! ছি! আবিতনের গলা শুনেই কুলসুম লাফ দিয়ে উঠে দরজা খুলে বাইরে আসে। তাকে দেখেও তমিজ আবিতনকে জিগ্যেস করে, 'আফাজের বাপের প্যাটের বিষ তো অনেক

দিনের, না?' জবাব না দিয়েই আবিতন দ্রুত পায়ে চলে যায় গোলাবাড়ির দিকে। কড়া চোখে তার যাওয়া দেখে কুলসুম তমিজকে 'ঘরত যাও' বলতে বলতে ডোবার দিকে রওয়ানা হয়। ঘরে ঢুকে তমিজ বলে, 'বাজান নিন্দা পাড়ো?'

প্রশ্নটি তমিজের বাপের কানে ঢোকে শাসনের মতো এবং সে উঠে বসে ধরফর করে। এ তার চিরকালের ব্যারাম। ঘুম থেকে জাগার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের মাঝখানে ধক করে আওয়াজ হয় : হায়রে, বেলা বুঝি মণ্ডলবাড়ির শিমুলগাছের বকদের সাদা শরীর বেয়ে নেমে এসেছে গাছের হাঁটু অব্দি, আর এখনো তার চেতন হলো না।—এই উদ্বেগ থেকে রেহাই পেতে কিংবা উদ্বেগের ক্লান্তি মোচন করতে সে মেঝেতে থাকলে মাচায় ওঠে এবং মাচায় থাকলে মাচাতেই ফের পাশ ফিরে শোয়। ঘুম অবশ্য তার আর আসে না, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাপসে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সে হাঁপায়। হাজার হলেও ঘুম হলো তমিজের বাপের এক ধরনের কাজ, তার খুব প্রিয় পেশাও বলা যায়। ঘুমালে তার মেহনত মেলা। ঘুমে ঘুমে তার চলাচল, তার খোঁজাখুঁজি, তার ভাবনাচিন্তা, তার উদ্বেগ ও উত্তেজনা এবং নানারকম বুদ্ধি করা ও ফন্দি আঁটা। সে কী খোঁজে, ভাবনা তার কী নিয়ে, তার উদ্বেগের কারণ কী, কেনই বা তার এতো উত্তেজনা—এসব ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় তার মুশকিল আরো বেশি। তাই ঘুম তার যখনি ভাঙুক অন্তত খানিকটা জিরিয়ে না নিলে তার পক্ষে উঠে দাঁড়ানোটাই কঠিন। কিন্তু এখন সে জিরাবে কি? ঘরের মধ্যে তমিজ। তবে পিঠের নিচে সাপ না বিছার অবিরাম খোঁচায় তমিজের শাসন চাপা পড়ে, ওই শাসন থেকে অব্যাহতির সময়টা আরেকটু বাড়াতেই অদৃশ্য সরীসৃপের ওপর বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং বিড়বিড় করে 'শালার বেটা শালা' বলতে বলতে পিঠের দুর্গম জায়গায় হাত দিয়ে সে বার করে আনে অপরিচিত একটি জীবকে। জীবের দুই পাশে চোখা আগাওয়ালা কয়েকটা ডানা। ডান হাতে চোখের সামনে ধরলে জিনিসটা স্পষ্ট হয় এবং ঝাপসা হয়ে ফুটে ওঠে গত সন্ধ্যার দাফনের ছবি। কাল গোরস্তানের একটি দুই দিনের বাসি কবর থেকে সে এটি তুলে এনেছে। গোরস্তানের খেজুর ডালের গুণ অনেক, এটা সঙ্গে থাকলে রাত্রে কেউ ঘাঁটাতে সাহস পায় না, এর শক্তি আগুন ও লোহার পরেই। রাতে কাৎলাহার বিলের সিথানে পাকুড়তলায় যাবার সময় এটা সঙ্গে রাখা ভালো। কিন্তু গত রাতটা তার কাটলো শুধু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। অপচয়! অপচয়!—একটি দীর্ঘ রাত্রি বৃথা কাটাবার বেদনায় দমে গিয়েও ঐ রাতটির নষ্ট তেজ ফিরে পাবার লোভে তমিজের বাপ চোখজোড়া বন্ধ করে। এতে কাজও হয় বৈ কি! কাৎলাহার বিলে হাবুডুবু খেতে খেতে সাঁতার কাটে ভেড়ার পাল, নিজেদের গজার মাছের সুরত ফিরে পাবার আশায় তারা সাঁতার কাটে খুব মন দিয়ে। এইসব দেখতে দেখতে চোখ মেলে তমিজের বাপ তাকায় ছেলের দিকে। জীবিত একমাত্র সন্তানের কড়া চোখ তার নজরে পড়ে না, ছেলের ঝাঁকড়া চুলে সে দেখে কালো পাগড়ি, তার হাতে লোহার পান্টি, গলায় শেকল।

'টাসকা ম্যারা গেলা ক্যা গো ওঠো না কিসক?' তমিজের এই ধমকে ১৪ অক্ষরের পয়ারের আভাস থাকলেও তমিজের বাপের কানে তা এমনি কষে ধাক্কা দেয় যে চোখের পলকে তার চোখের সমুখের পান্টি মিশে যায় তমিজের হাতের কবজি থেকে কনুই পর্যন্ত, গলার শেকল ঢুকে পড়ে তমিজের কণ্ঠার হাড়ে এবং মাথার কালো পাগড়ি লুকায় তার ঝাঁকড়া চুলের ভেতর। তমিজের বাপ মাচায় উঠে বসে বলে, 'ক্যা বাবা, সোমাচার

ভালো?' ছেলের ধমক খাবার ঝুঁকি এড়াতে ছেলের কুশল না জেনেই নিজের চোখমুখদাড়ি দুই হাতে ঘষতে ঘষতে তমিজের বাপ জরুরি তথ্য দেওয়ার উদ্যোগ নেয়, 'বুলুর খবর শুনিছিস? কও তো বাপু, তাজা মানুষটা, বেনবেলা প্যাট ভর্‌য়া পান্তা খায়া বার হছে, পান্তা খাছে, পান্তার সাথে—।'

'শুনিছি।' এক কথায় তমিজ তাকে থামিয়ে দিলে আরো কথা বলার খাটনি থেকে রেহাই পেয়ে এবং বুলুর শেষ খোরাক গেলার মুখরোচক বর্ণনা বয়ান করা থেকে বঞ্চিত হয়ে এখন কী করবে ঠিক বুঝতে না পেরে তমিজের বাপ হঠাৎ করেই মেঝেতে নামে এবং 'বেলা কুটি গেছে গো' বলে ডোবার দিকে যেতে যেতে আপন মনে বলে, 'আজ শমশেরের জমিত মাঙুন কামলা দেওয়ার কথা। আজ বুধবার লয়?'

'লিজেগোরে নাই এক চিমটি জমি, হামাগোরে আবার মাঙুন কামলা খাটা কিসক গো?' তমিজের এই কথার জবাব না দিয়ে তার বাপ বাইরে গেলে তমিজ জোরে জোরে বলে, 'যার জমিত মাঙুন খাটবা, তাঁই তোমার খ্যাটা দিবার পারবি? তোমার জমি কোটে?' তমিজের এই খেদোক্তির প্রতিবাদ করা মুশকিল। জমিতে মাঙুন খাটা মানে পরস্পরকে মাগনা সাহায্য করা, তমিজের বাপকে জমির কাজে সাহায্য করার সুযোগ কোথায়?

তমিজের বাপ বাইরে মুখ ধুতে গেলে তমিজ যায় ভেতরের দিকের নতুন ঘরটিতে। ফাল্গুনে খিয়ার থেকে টাকা এনে এই ঘরটা সে তুলেছিলো নিজের থাকার জন্যে। সে বাইরে গেলে বৃষ্টি বাদলায় কুলসুম এখানে রাঁধে, ধানের বস্তা রাখে। মুরগিটাকে ওমে বসিয়েছিলো এখানেই, বাচ্চাগুলো মরতে মরতে এখন দুটিতে এসে ঠেকেছে, রাতে মুরগিটা দুটি সন্তানকে নিয়ে এখানেই থাকে। আজ মেঘ নাই, তার ওপর তমিজও বাড়ি এসেছে। কুলসুম তাই উঠানের চুলায় ভাত চড়াবার জন্যে চাল ধুচ্ছিলো। একটা চটের ঝোলা তার হাতে এগিয়ে দেয় তমিজ, 'গোলাবাড়ি থ্যাকা কয়টা মাছ লিয়া আসিছি।' কুলসুম তার দিকে না তাকিয়ে ঝোলাটা নিয়ে চাল ধোয়া অব্যাহত রাখলে তমিজ হঠাৎ নতুন করে গলা চড়ায়, 'কালাম ভায়েক কয়া গেলাম, তাঁই বাঁশ দিবি, খ্যাড় দিবি, চুলার উপরে চালা তুল্যা লিবার কলাম। কিছুই তো করো নাই দেখিছি।'

গতবার তমিজ এসে কালাম মাঝির পাতকুয়ার পাট বদলে দেওয়ার কাম করলো, মজুরি নেয় নি। কথা হয়েছিলো ধান দেবে আধ মণ। তমিজের ঘরেই তখন মেলা ধান, কালামের কাছ থেকে ধান এনে দেওয়া মানে আরো কয়েক দিন বাপটাকে বসে খাওয়ার সুযোগ দেওয়া। তমিজ তাই কালামকে দুটো বাঁশ আর কিছু খড় দিতে বলে যায়, ওই দিয়ে তমিজের বাপ উঠানে একটা চালা করে দিলে কুলসুমেরই সুবিধা হয়। চড়া রোদে কুলসুম ভাত রাঁধে, বৃষ্টি নামলে ছোটাছুটি করে ঘরে উঠে তোলা-উনান ধরায়। এসব কষ্ট থেকে তাকে রেহাই দিতেই চালাটা তোলার কথা। তা তাড়াতাড়ি করে তাকে খিয়ারের দিকে যেতে হলো। বাপকে কতোবার বলে গেলো। কোথায় চালা, কোথায় কী? বাঁশের একটা খুঁটি পর্যন্ত নাই। তমিজের মেজাজটা খিচড়ে যায়, 'ক্যা গো ফকিরের বেটি, হামি না থাকলে একটা কামও কি হবি না গো?'

ভোরবেলা বাড়ি এসেই তমিজ গফুর কলুর নিকা-করা বৌয়ের সাথে কথা বলে কুলসুমের দিনটা তো মাটি করে দিয়েছে। সতীনের বেটার এখন শুরু হলো ত্যাড়া

ত্যাড়া কথা। কুলসুম কয়েকবার গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিলে চুলায় আগুন জ্বলে দপ করে, তার আঁচে মুখটা তার হয়ে ওঠে বেগুনি রঙের। আগুনের তাপে তার গলা বাজে গনগন করে, 'হামাক তো তোমরা রাখিছো চাকরানি কর্যা, আবার হামাক দিয়া কামলাও খাটাবার চাও?' একবার কথা শুরু করলে কুলসুমের পক্ষে থামাটা কঠিন। তাই তাকে অবিরাম বকে যেতেই হয়, 'কালাম মাঝির বাঁশঝাড়ের বাঁশ কি ক্যাটা আনা লাগবি হামাকই? খুঁটি কি হামিই পুঁতমু?' রাগে ও চুলার আঁচে তপ্ত বেগুনি মুখটা তমিজের দিকে পলকের জন্যে একবার ঘুরিয়ে ফের চুলায় মনোযোগী হয়ে কুলসুম বলে, 'হামরা ফকিরের ঘরের বেটি, হামরা কি জেবনে পাকঘর দেখিছি; না-কি পাকঘরত পাকশাক করিছি? হামাক ওদেত পোড়া লাগবি, বিষ্টিত ভিজা লাগবি।' এখন থেকে অন্তত বিকালবেলা পর্যন্ত এই কথাই, একই বাক্য নানা বিন্যাসে সে পুনরাবৃত্তি করে চলবে। কিছুক্ষণের মধ্যে আরো কথা যোগ হবে।—কী? 'হামার কপালের দোষ।' কেন?আগুন ও লোহার পরেই—না, সে ফকিরের বেটি, সে পড়েছে খানদানি মাঝিদের ঘরে। মাঝিদের নিজেদের পাছায় ত্যানা নাই, নিজগিরিরডাঙার হাভাতে চাষারাও এদের সঙ্গে এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করা দূরের কথা, ওঠা বসা পর্যন্ত করে না।—সেই গুষ্টির মানুষ হয়ে তমিজ কথায় কথায় তাকে খোঁটা দেয় ফকিরের বেটি বলে। কৈ, তমিজের বাপ তো কুলসুমকে অন্তত বংশ তুলে কখনো কথা শোনায় না। মানুষটা বোকাসোকা আবোর হোক আর পাইঙ্গা হোক, হাজার হলেও কয়েকটা বছর তো চেরাগ আলির পিছে পিছে ঘুরলো। দাদা কি তাকে কিছুই দিয়ে যায় নি! এই যে ঘুমের মধ্যে উঠে সে বাইরে যায়, আবার ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই ঠিকঠাক ঘরে ফেরে, এইসব সম্ভব হয় কী করে? তেনাদের কেউ তার ওপর ছাতা ধরে আছে বলেই তো! চেরাগ আলি থাকলে তাকে সতীনের বেটার এত্তোই খোঁটা সহ্য করতে হয়? কুলসুমের দুই চোখের পাতাই ভারি হয়ে আসে। তবে সাতসকালে ছিনাল মাগী আবিত্তনের সঙ্গে তমিজের কথাবার্তার অস্পষ্ট ধ্বনি চুলার আগুনকে উসকে দিলে তার আঁচে চোখ খরখর খরখর করে এবং তার ক্ষোভ বেরিয়ে আসতে থাকে প্রবল তোড়ে। কিন্তু কুলসুমের কথার কি চুলার আগুনের ঝাঁঝ তমিজকে ছুঁতে পারে না, সে কথা বলে চলে তার বাপকে লক্ষ করে। কী,—না, আকালের বছর তার সবেধন নীলমণি তিন বিঘা জমি শরাফত মণ্ডলকে বেচে সে শোধ করলো জগদীশ সাহার দেনা, তার গোরুটা পর্যন্ত নিয়ে গেল জগদীশের মানুষ এসে। তাতেও নাকি সাহার সুদের টাকা সব শোধ হয় নি। সেই মানুষ আবার যায় মাগুন কামলা খাটতে! এরকম হাউস সে করে কোন আক্কেলে? তমিজের বাপ জবাব দেয় না। জবাবের জন্যে পরোয়া না করে তমিজ হাঁটা দিলো রাস্তার দিকে।

কুলসুম দেখে হাঁড়ির ভেতরটা, ভাত হতে আর কতোক্ষণ? তমিজ ততোক্ষণে চলে গেছে নজরের বাইরে। এ কী রকম জোয়ান মানুষ গো? সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় খালি পেটে? হাঁটা দিলো বুঝি শরাফত মণ্ডলের বাড়ির দিকে। বুলুর বর্গা-করা জমিটা এবার নিজেই বর্গা নিতে পারে তো আমনের খন্দটা ধরতে পারে। আমন রোপার সময় এখনো যায় নি। কড়া কড়া কথা বলতে বলতেই সে বাপকে এই পরিকল্পনার কথা একবার বলেছে। বাপের সাড়া না পেয়ে হনহন করে ছুটলো।

না খেয়ে তমিজ ঝাল ঝেড়ে গেলো কুলসুমের ওপর। ওদের বাপবেটার ঝগড়া হলে দুজনেই কথা শোনায় কুলসুমকেই। এই ঘরে বিয়ে দিয়ে গিয়ে দাদাটা তার কী

সর্বনাশটাই যে করে গেছে! বুড়া নিজে তো দিব্যি কেটে পড়েছে, এতিম নাতনিটার কথা কি তার একবার মনেও পড়ে না? তমিজের বাপের খোয়াবে তো সে নিত্যি আসা-যাওয়া করে, কুলসুমের চোখের ভেতর কি একবার উঁকিটাও দিতে পারে না? কী জানি, বিটকেলে বুড়া মরেই গেলো কিনা কে জানে? মরে গিয়েছে?—মরলে কিন্তু একদিক থেকে ভালোই। যদি বেঁচে থেকে থাকে তো চোখের আলো তো তার এ্যাদ্দিনে একেবারে নিভু নিভু; একা একা ক্রোশের পর ক্রোশ সে পাড়ি দেয় কী করে? জেয়াফতের বাড়িতে খেতে বসলে তার পাতে এক টুকরা গোশত কি এক হাতা ডাল তুলে দিতে বলবে কে? কুলসুমের সামনে হাঁড়ির ওপর ধোঁয়ায় কাঁপে কালো টুপিপরা চেরাগ আলির মাথা। হাতের ছড়ি ঠুকে ঠুকে বুড়া কোন মেলায়, কোন হাটে, কোন নদীর ঘাটে বটতলায় ঘোরে আর দোতারা বাজিয়ে গান করে। চুলায় ভাত ফোটে টগবগ করে, সেই আওয়াজে তৈরি হয় চেরাগ আলির শোলোক। কিন্তু গানের কথা কুলসুম কিছু বুঝতে পারে না। গান করতে করতে বুড়া মানুষটা হাপসে যাচ্ছে, শুধু দোতারাই বাজিয়ে চলেছে, মুখে তার কথা ফোটে না। তাকে একটু আরাম দিতে কুলসুম বাকি কথাগুলো গুনগুন করবে তার জো নাই। চেরাগ আলির গানের কথা তো কিছুই ধরা যাচ্ছে না।

অনেক দূরের অচেনা জায়গায় চেরাগ আলির অস্পষ্ট কথার ধ্বনি ছাপিয়ে ওঠে তমিজের বাপের হুঁশিয়ারি, 'ক্যা রে ভাত উথলায়, দেখিস না?' চুলার আঁচ কমিয়ে মাড় বসিয়ে হাঁড়ি নামাতে নামাতে কুলসুমের সমস্ত শরীর ভেঙে ভেঙে পড়ে, হায়রে, গান করতে করতে গলা শুকিয়ে কাঠ হলেও দাদার কাছে কেউ নাই যে তাকে একটু জিরাতে দিয়ে পরের কথাগুলো গায়।

৫

অনেকদিন পর রাত্রে গলা পর্যন্ত আউশের নতুন চালের ভাত, গোরুর গোশত ও হাতিবান্দার দৈ এবং এর আগে দুপুরবেলা ভাঁটি ও আলু দিয়ে পাক-করা বোয়াল মাছের ঘাঁটি সালুন এবং সকাল থেকে দুপুর ও দুপুরে ভাত খাবার পর থেকে রাতে খাবার আগে পর্যন্ত দুই দফায় মুড়ি, বাতাসা ও খাগড়াই খেয়ে বাড়ি ফিরে তমিজের বাপ টইটম্বুর পেটে হাত বুলাতে বুলাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। মাঝরাতে তলপেটের ব্যথায় সে জেগে ওঠে এবং দরজা খুলে বাইরের উঠান পেরিয়ে বাঁশঝাড়ে পৌছুবার আগেই তাকে বসে পড়তে হয় ডোবার অনেকটা এদিকেই। কোনোমতে-ধোয়া নষ্ট লুঙি এবং নিজের পাছা উরু ও পা ধুয়ে শরীর টেনে ঘরে ঢোকার আগেই তাকে ফের বসে পড়তে হয় দরজার বাইরে এবং সেখানে বসেই বিপুল আওয়াজে শুরু করে বমি করতে। পায়খানা করার সময় শরীরের বেআক্কেলে নিয়মে মলদ্বারে খাদ্যবস্তুর স্বাদ একটুও পায় নি, এখন বমি করতে গিয়ে গলা দিয়ে ওগরানো ভালো ভালো জিনিসের স্বাদ পেয়ে সে একটু চাঙা হয়ে ওঠে। বমি করার সময় গলার মাত্রাছাড়া আওয়াজে ব্যামাক খাবারের

পেট খালি করে বেরিয়ে যাবার জন্যে হাহাকারটিও ছিলো। ওই আওয়াজে শমশের পরামাণিকের প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ থাকাটাও অসম্ভব নয়। শমশের হলো আদি চাষাঘরের মানুষ, পাছায় ত্যানা না জুটলেও কথাবার্তায় এরা সব লবারের বেটা। কথা সবটা সে রাখে নি। পরশু গোলাবাড়ি হাটে দেখা হলে বললো, নরেশের দোকানের রসগোল্লা দুটো করে হলেও দেবে। না, পাকা মিষ্টি শালা দিলো না। তাতে তমিজের বাপের ততো দুঃখ নাই। হাতিবান্ধার গোপাল ঘোষের দৈ আর দৈয়ের সঙ্গে আখের গুড় যে পরিমাণ দিয়েছে তাতে পাকা মিষ্টি না দিলেও চলে। কিন্তু কপাল মন্দ, এতোগুলো ভালো ভালো জিনিস, পেটে বুঝি কিছুই রইলো না।

তা পেটের কী দোষ? রাত্রে তার খাওয়া নিয়ে নিজের বেটা যেমন চটাং চটাং কথা বললো তাতে গোরুর গোশত আর বোয়াল মাছ কি পেটের মধ্যে জুত করে দুই দণ্ড বসতে পারে? এসব খানদানি খানার ইজ্জত নাই? তমিজের খালি এক কথা, যে মানুষ এক ছটাক জমি রাখতে পারে নি, সে মাঙুন কামলা খাটতে যায় কোন আক্কেলে? ওই শমশেরই তো ওই একই আকালের সময় জগদীশ সাহার দেনা শোধ করতে মণ্ডলের কাছে সব বেচে দিয়েও বিঘা দুয়েক জমি কিছুতেই হাতছাড়া করলো না। হোক না তার দোপা জমি, আউশ ছাড়া আর কিছুই হয় না, কিন্তু এ জমি নিতে মণ্ডল তো কম চেষ্টা করে নি। তবু শমসের জমিটা ছাড়লো না। এর রহস্য কী?—ভরপেটে তমিজের বাপ এই রহস্যের কোনো কিনারা করতে না পারলে দায়িত্বটি পালন করতে হয় তমিজকেই।—আরে, শমশের পরামাণিক হলো খাঁটি চাষার বংশ, এক ছটাক হলেও চাষের জমি তার রাখা চাই। আর তমিজের বাপ হলো মাঝি, মাছ মেরে খাওয়া তার বংশের পেশা। মুসলমান মাঝি আর হিন্দু চাঁড়ালে ফারাক কী? জমির ইজ্জত এই মাঝির জাত বুঝবে কী?—নিজের বংশ নিয়ে বেটার তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে বলা কথা শুনতে শুনতেই তমিজের বাপের পেটে অস্বস্তি শুরু হয় এবং তখন থেকেই পেট গুড়গুড় করতে থাকে।

বাপের এইসব মন-খারাপ কি পেট-চিনচিনকে পরোয়া না করে তমিজ বলেই চলে, মানুষের বাড়ি বাড়ি এরকম খাবার লালচ বাদ দিয়ে বাপ বরং মণ্ডলের হাতে পায়ে ধরে বুলুর চাষ-করা জমিটা বর্গা নেওয়ার ব্যবস্থা করুক। মণ্ডল রাজি হচ্ছে না। তমিজকে আজ ফিরিয়ে দিয়েছে, তবে কাল ফের যেতে বললো। তমিজের বাপ একটু চেষ্টা করুক না! সে গিয়ে কারুবারু করলেই মণ্ডল তাকে মাফ করে দেবে।

তমিজের বাপের দোষটা কী যে তাকে মাফ চাইতে হবে? পেটের সঙ্গে তার গোটা শরীর এবার গরগর করে রাগে : সে কী অপরাধ করলো?

'নিন্দের মধ্যে হলেও তুমি কাৎলাহার বিলে যাও না?' তমিজের প্রশ্ন শুনে বুড়া ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, *গেলোই বা, তাতে দোষের কী?*

'আত্রে ঘাড়ত জাল লিয়া তুমি বিলত যাও কিসক? জানো না, সায়েববাবুর সাথে ন্যাকাপড়া কর‍্যা মণ্ডলে ওই বিল জমা লিছে। তাক খাজনা না দিয়া বিলেত কেউ কিছু করবার পারবি না। আর তুমি লিত্যি ওটি যাও মাছ ধরবার, মণ্ডল যদি চৌকিদার দিয়া তোমাক ধরায়, তুমি কিছু কবার পারবা?'

তমিজের মুখে মণ্ডলের অভিযোগ শুনে তমিজের বাপের চোখ জুড়ে মেঘ নামে। 'বাপদাদাপরদাদা সোগলি ওই বিলের মাছ ম্যারা সংসার চালায়া গেছে, এখন আবার—'

তার এই অসম্পূর্ণ বাক্য মুখ দিয়ে বেরুতে না বেরুতে সমস্ত মুখ-ঢেকে-ফেলা অন্ধকারে ধাক্কা খেয়ে ঢুকে পড়ে মুখের ভেতর এবং নালী অনুনালী হয়ে পেটে ঢুকে যায় হজম বা বদহজম-হতে-থাকা ভাত, গোরুর গোশত, বোয়াল মাছ ও গুড়-দিয়া-মাখা হাতিবান্ধার দৈয়ের কোমল আশ্রয়ে। তার ঘরের ওপরে মণ্ডলবাড়ির কয়েকটা সাদা বকের সুনসান উড়ালে তার কালোকিষ্টি রোগাপটকা শরীর শিরশির করে উঠলে সে তার ঘরের চালের দিকে তাকায় না। ঐসব বকের ছাইরঙের ছায়া থেকে নিজের মাথা বাঁচানোর চেয়েও পেটের খাদ্যিখাওয়াগুলোর হেফাজত করা বেশি জরুরি। বকের নজর থেকে পেটের খাবার বাঁচাতে দুই হাতে সে তার পেট চেপে ধরে এবং তমিজের কথা শুনতে শুনতেই তাড়াতাড়ি করে লুকিয়ে পড়ে ঘুমের আড়ালে। কিন্তু ঘুম কি ছাই ওইসব ছাইরঙের ছায়া-ফেলা বকদের ক্রমপ্রসারমাণ অন্ধকারকে মুছে ফেলতে পারে? তাদের নিনজরে পেটের খাবার তার পেটে থাকতে পারে না। দরজায় বসে বমি করার বিকট আওয়াজে তার পেট থেকে গোরুর গোশত, বোয়াল মাছ, বাতাসা, খাগড়াই ও দৈ বেরিয়ে যাবার জন্যে হাহাকার তো ছিলোই, ওই আওয়াজ ব্যবচ্ছেদ করলে বৈকুণ্ঠের গলায়-গাওয়া চেরাগ আলি ফকিরের গানের টুকরাটাকরাও পাওয়া যেতে পারে,

মজনু হুঙ্কারে যতো মাদারি ফকির।
আন্ধার পাগড়িত বান্ধো নিজ নিজ শির॥
সিনাতে জিঞ্জির পরো আঁখির ভিতর।
সুরমা করিয়া মাখো সুরুজের কর॥

'তুমি ফকিরের সব গানই জানো, না? ইগলান মারফতি গান তুমি বোঝো?'—শমশের পরামাণিকের এই সংশয়ে বৈকুণ্ঠের কিছুমাত্র বিকার নাই। পাঁচটা গান না গেয়ে সে এখান থেকে উঠবে না। ফর্সা গেঞ্জি ও ময়লা ধুতি পরে মুখভরা পান নিয়ে সে যাচ্ছিলো সাবগ্রাম হাটের দিকে; বাবুর আড়তের জন্যে জিরা কিনবে আর জিরার ভেজাল দিতে শটিবীজের বায়না দিয়ে আসবে ছাইহাটার ভক্তদাস কুণ্ডুর গদিতে। একেবারে সন্ধ্যা পার করে দিয়ে জিরা আর জিরার ভেজাল নিয়ে গোরুর গাড়িতে ফিরবে গোলাবাড়ি। তা সাবগ্রামের পথে এখানে পড়ে গেলো শমশেরের দোপাজমি, জমিতে মাগুন খাটা হচ্ছে শুনেই বৈকুণ্ঠ বসে পড়লো জমির আলে আমগাছের তলে।

'ক্যা গো, মাগুন কামলা খাটো, তা মুখোত্ গান নাই?' বলে বৈকুণ্ঠ নিজেই গাইতে শুরু করলে শমশের ভয় পায়, এই মানুষটার বোধশোধ কম,এই যে গান শুরু করলো এর আর থামাথামি নাই। কামলাদের কাজে ঢিল না পড়ে! সে তাই তাকে তাগাদা দেয়, 'সাবগ্রাম যাবা বলে? হাট তো বস্যা গেছে বেনবেলা।'

'আরে জিরা তো পাওয়াই যাবি। শটির বিচি পাওয়ার জন্যে ঐ শালা কুণ্ডুর পাও ধরা লাগবি। শালা ভ্যাজাল বেচে, তারও দাপট কতো। কয় বছর হলো ভ্যাজাল না দিলে জিরা বেচ্যা বাবুর নাকি লোকসান।'

হাটে যাওয়া তার মাথায় ওঠে। গান শুনতে কামলাদের উৎসাহও কম নয়, 'বাপু, হাট তো পাছাবেলা পর্যন্ত চলবিই। আরো কয়টা গান করো।' আর একজন বলে, 'গান না হলে কামের জুত হয়? চেরাগ আলি ফকির থাকতে মাগুন খাটার সুখ আছিলো গো। মাগুন খাটার খবর পালেই ফকির নিজে অ্যাসা গান ধরিচ্ছিলো, কাম খুব আগাছে।' তা

চেরাগ আলির কথাই আলাদা। কোথাও মাগুন কামলা খাটা হবে শুনলেই সে ঠিক হাজির হতো তার নাতনিকে নিয়ে। দোতারা বাজিয়ে একটার পর একটা গান করে অন্তত এক বেলা নাতনিকে নিয়ে পেট ভরে খেয়ে তারপর উঠেছে জমি থেকে। বৈকুণ্ঠের খাওয়া দাওয়ার দিকে নজরটা কম, পান ছাড়া তার মুখে খুব একটা কিছু দেখা যায় না। এমন কি আমগাছের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা হুঁকা হাতে নিয়ে মুখে লাগাতে গিয়েও সে রেখে দেয়, 'না বাপু থাক।'

'তামুক খালেও জাত যাবি? মোসলমান ফকিরের গান ধরিছো, তাত তোমার জাত যায় না?' শমশেরের এই মিষ্টি ধিক্কারে কান না দিয়ে বৈকুণ্ঠ তার ময়লা ধুতির কোঁচা থেকে পেতলের কৌটা বার করে সাজা পান মুখে দেয়। কৌটার ভেতরেই আরেকটি ছোটো কৌটা, সেটা হাতের তালুতে উপুড় করে জর্দা নিয়ে মুখে ফেললে মিষ্টি তামাকের গন্ধে আমতলা ম ম করে। কিছুক্ষণ আয়েশ করে পান চিবিয়ে কৃপণের মতো অল্প একটু পিক ফেলে সে বলে, 'কাম করো গো কাম করো। গান শুনলে কামের জোর বাড়ে। সাধুজনের বাক্য আছে, সংগীতে লঙ্ঘিবি গিরি, পঙ্গুরে কহিল গিরি। গিরি কয়, ওরে পঙ্গু, সংগীত দিয়া পাহাড় ডিঙাবার পারবু। এই গিরি কেটা?—শোনো সেই গিরির গান ধরি। আগেও শুনিছো, এখন আবার শোনো।' প্রস্তাবনা সেরে গুনগুন করে গানের সুর ভেজে নিয়ে অদৃশ্য কারো উদ্দেশ্যে দুই হাত জোড় করে নমস্কার করে। তারপর গায়,

দশনামী প্রভুগণে বন্দিয়া পবিত্র মনে
গিরিসেনা দাঁড়ায় কাতারে।
ভবানী নামিল রণে পাঠান সেনাপতি সনে
গোরা কাটো আদেশে হুঙ্কারে।
ভবানীর কণ্ঠধ্বনি মৃগরাজধ্বনি জিনি
গর্জনে শার্দুলে লজ্জিত।
সেই ডাকে চঞ্চল মানাস নদীর জল
হইল গোরা শোণিতে রঞ্জিত।
কোম্পানির গোরাসবে পাঠাইয়া যমভবে
জলে প্রভু করে আচমন।
বন হইতে সঙ্গোপনে গোরাগণ আক্রমণে
প্রভু সেথা ত্যাজিল জীবন।
গিরিগণে নামে জলে যতনে লইল কোলে
কৃষ্ণ কোলে যেন শত রাই।
পাষাণে হৃদয় বান্ধো কান্দো গিরিগণে কান্দো
ভবানী পাঠক ভবে নাই।

কীর্তনের সুরে হাওয়ার ভ্যাপসা ভাব কাটে, এতে কামলাদের কাস্তের ধার বাড়ে এবং বৈকুণ্ঠের শেষ কথা 'না-আ-আ-ই'-এর লম্বা টানে তমিজের বাপ কেটে ফেলে ধানের মোটা মোটা আঁটি। এমন কি ভবানী পাঠকের মৃত্যুর শোকে বৈকুণ্ঠের পানের পিক-গেলা গলা চিরে গেলেও তাতে ঘাতকের বিরুদ্ধে ক্রোধ মেশানো থাকায় তার ঝাঁঝে

প্রত্যেকের কাস্তের গতি বাড়ে। গান থামার পর গোটা মাঠের হাওয়া এসে ঝাপটা মারে আমগাছের পাতায় পাতায় ও ধানের শীষে শীষে। কোঁচড় ভরা মুড়ি আর বাতাসা আর খাগড়াই নিয়ে বৈকুণ্ঠ সাবগ্রামের দিকে রওয়ানা হলো তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে।

এখন এই এতোক্ষণ পর, এই মধ্যরাতে তুমুল আওয়াজে বমি করতে করতে তমিজের বাপের সামনে বৈকুণ্ঠ গিরির লেশমাত্র ছায়া নাই। গানের কথাগুলি সে বার করে নেয় তার বমির আওয়াজ থেকে। এই গানে তমিজের বাপের রোগাপটকা শরীরে এমনি কাঁপুনি ওঠে যে উঠে দাঁড়াবার বলটুকু তার থাকে না, উঠতে গেলে সে পড়ে যায় চৌকাঠেই। তার মাথা পড়ে থাকে মাচার অন্য প্রান্তের খুঁটির সঙ্গে ঠেকানো এবং পা ঠেকে চৌকাঠে। ঘুম থেকে উঠে আসা তমিজ তন্দ্রা জড়ানো গলায় অক্ষেপ করে, 'বুড়া হয়া মরবার ধরিছে, জিভার লালচ এখনো গেলো না। এখন আত হচ্ছে কতো, আরো কতোবার যে ওঠা লাগবি আল্লাই মালুম।' তার উদ্বিগ্ন ও ক্ষুব্ধ কথা তমিজের বাপের কানে নিশ্চয়ই ঢোকে; কিন্তু মশার ভনভনানি, ঝিঁঝিঁর ডাক, বাঁশঝাড়ের অবিরাম শনশন আওয়াজ, ডোবার পানিতে ঘুমিয়ে-থাকা খলসে পুঁটি বেলে মাছের চমকে ওঠায় পানির উত্তেজনা এবং তমিজের ঘুমে-জড়ানো জিভের কথার সঙ্গতে তার কানে বাজতে থাকে এলোমেলো ছন্দের একটানা সুর,

পাষাণে হৃদয় বান্ধো　　কান্দো গিরিগণে কান্ধো
ভাঙা ডিমে হলুদবরণ হইল সকল ঠাঁই।
বিবিবেটা নিন্দে মগন ফকির ঘরত নাই।
হায়রে ভবানী পাঠক ভবে নাই।

৬

খিয়ারের খেতমজুর থেকে নিজের গ্রামে বর্গাচাষী হওয়ার হাউস মেটাতে তমিজকে শুনতে হয় মেলা কথা। তার নাই গোরু, নাই লাঙল জোয়াল মই; বীজচারা কেনার পয়সাও নাই, লোকে তাকে জমি দেয় কোন ভরসায়? তমিজ জোড়হাতে কারুবারু করে, এখন মণ্ডল তাকে এসব দিক, ধান উঠলে ফসলের ভাগাভাগি করে সব কিছুর দাম ধরে না হয় কেটে নেবে।

তা নেওয়া চলে, এতোকাল যে একেবারে চলে নি তাও নয়। কিন্তু শরাফত মণ্ডলের বড়ো বেটা আবদুল আজিজ বড়ো হুঁশিয়ার মানুষ। সে থাকে জয়পুরে, জয়পুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কেরানি, জমিজমার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল, জমির মাপজোক থেকে শুরু করে খাজনা ট্যাকসের আঁটঘাট আর ফাঁকফোকর তার মতো জানে এমন মানুষ লাঠিডাঙার কাছারিতেও কেউ আছে কি-না সন্দেহ। গোরু, লাঙল, জোয়াল, মই, বীজ ধানের দামের আধাআধি সে আগাম দাবি করে। গোরু নাই, লাঙল নাই, তবু বর্গা করার সখ? ঠিক আছে, করো। কিন্তু শর্ত মেনে জমিতে নামো।

আবদুল কাদের বলে, 'এরা তো অনেক দিনের মানুষ। এর বাপও আমাদের বাড়িতে এক সময়—।'

কিন্তু চাষাদের বাড়াবাড়ি সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছে, টাউন হয়ে করতোয়া পেরিয়ে ঐ দাপাদাপি এই পুব এলাকায় আসতে আর কতোক্ষণ? খিয়ার এলাকায় চাষারা ফসলের ভাগ চায় দুইভাগ, নিজেরা দুইভাগ নিয়ে জমির মালিকের গোলায় তুলে দিয়ে আসবে এক ভাগ। তা চাও; চাইতে তো আর ট্যাকসো লাগে না। কিন্তু একটা কথা,—জমি তো আর হেঁটে হেঁটে জোতদারের বাড়িতে এসে হাজির হয় না। একি কামারপাড়ার অর্জুনগাছের বক যে উড়াল দিয়ে বিল পেরিয়ে এসে বসলো মণ্ডলবাড়ির শিমুলগাছে? এক এক ছটাক জমি করতে মানুষের শরীরের এক এক পোয়া রক্ত নুন হয়ে বেরিয়ে যায়, সে খবর রাখো? জাহেল চাষার গোঁ আবদুল আজিজ দেখে খিয়ার এলাকায়। সেই গোঁ এখানকার চাষার শরীরে চাগিয়ে উঠতে কতোক্ষণ? কাউকে খাতির করার দরকার নাই, নিয়ম অনুসারে জমি বর্গা নাও। না পোষালে কেটে পড়ো।

আবদুল আজিজের এসব উদ্বেগ আর ভবিষ্যদ্বাণীর জবাব তমিজ দেবে কী করে? আবদুল কাদের যে আবদুল কাদের, যে কি-না ইংরেজিতে নিজের নাম এক টানে লেখে এম. এ. কাদের, সভাসমিতি করা মানুষ, সুযোগ পেলেই মানুষকে ধরে ধরে হিন্দুর জুলুমের কথা ফাঁস করে দেয়, সেই জুলুম থেকে বাঁচতে মুসলিম লীগের নিশানের নিচে সবাইকে জড়ো হতে বলে, সে পর্যন্ত খালি নাক খোঁটে আর মাথা চুলকায়। হাজার হলেও ভাইজান তার চাকরি করে জয়পুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে, ডান হাত বাম হাত দুটোই তার ভারী সচল। কয়েক দিনের জন্যে বাড়ি আসায় সকালে হাগার পর ছোচা ছাড়া বাম হাতের কাজকাম বন্ধ, সেই নিষ্ক্রিয়তার শোধ সে তোলে জিভ আর টাকরার অবিরাম ব্যবহার করে।

পশ্চিমে ধান কাটতে গিয়ে আধিয়ারদের কাণ্ডকারখানা তো তমিজ দেখে এসেছে নিজের চোখেই, এসব দাপাদাপি সে নিজেই কি আর পছন্দ করে? জমি হলো জোতদারের, ফসল কে কী পাবে সেটা তো থাকবে মালিকের এখতিয়ারে। অথচ ফসলের বেশিরভাগ দখল করতে আধিয়াররা নেমে পড়ে হাতিয়ার হাতে। তাদের ফন্দি ঠেকাতে এবার পাঁচবিবিতে কয়েকজন জোতদার ধান কাটতে জমিতে কামলা লাগিয়েছিলো নিজেরাই। পুব থেকে গিয়ে তমিজও এক জমিতে কাজ পেয়ে গেলো। জোতদার নাকি পুলিসের সঙ্গেও কথা বলে রেখেছিলো। তা পুলিস যাবে আর কতো জায়গায়?—সেদিন ভালো মজুরির চুক্তিতে আপখোরাকি কাজে নেমেছিলো তমিজ। ধুমসে কাজ করছে, যতো তাড়াতাড়ি পারে ধান কেটে ফেলতে হবে। কিন্তু দুপুর হতে না হতে এতোগুলো মানুষের হৈ হৈ শুনে ভাগ্যিস সময়মতো দৌড় দিয়েছিলো। চাষাদের বৌঝিরা পর্যন্ত ঝাঁটা খুন্তি বঁটি নাকড়ি নিয়ে তাড়া করে। ধানখেতের ভেতর দিয়ে, কাটা ধানের আঁটি ডিঙিয়ে এবং কখনো সেগুলোর ওপর পা রেখে ছুটতে না পারলে ঝাঁটা কি খুন্তির দুই একটা ঘা কি তমিজের গায়ে পড়তো না? কয়েকটা বাড়ি যে পড়ে নি তাই বা কে জানে বাপু? মেয়েমানুষের হাতে মার খেয়ে কেউ কি তা চাউর করে বেড়ায়? ওদের ঝাঁটার ঘা খেয়ে কিংবা কোনোভাবে এড়িয়ে জোতদারের উঠানে ওঠার আগে থেকেই আধিয়ারদের এরকম বাড়াবাড়ি তমিজের একেবারেই ভালো লাগে নি। জমি হলো লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর বেটাবেটি হলো তার ফসল। সেই ফসল নিয়ে টানাটানি করলে জমির

গায়ে লাগে না? ফসল হলো জমির মালিকের জানের জান। তাই নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করলে বেচারা বাঁচে কী করে? মাঝির বেটা বলে জমির বেদনা বুঝবে না বললে তমিজ খুব কষ্ট পায়। তার বাপ দাদা পরদাদা সব মাছ ধরে খেয়ে এসেছে, এটা ঠিক। তার জন্মের অনেক আগে নাকি পোড়াদহ মেলার সবচেয়ে বড়ো বাঘাড় মাছটা আসতো তার বাপের দাদা বাঘাড় মাঝির হাত দিয়ে। এই কারণে সম্মানসূচক মানুষটার নামটি তমিজের বাপ অর্জন করে এবং এমন কি আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও তার আসল নামটি চাপা পড়ে যায়। পূর্বপুরুষের এই খ্যাতি ভোগ করেছে তমিজের বাপ অব্দি। তমিজের জন্মের আগে পর্যন্ত তমিজের বাপকে সবাই চিনতো বাঘাড় মাঝির লাতি বলে, তার পরিচয় পাল্টে যায় তমিজের জন্মের পর। তবে তমিজকে সবাই চেনে তমিজ বলেই।

তা বাপু এই বংশের মানুষ তো এক কালে চাষবাসের কাজই করতো। বাঘাড় মাঝির বাপ বুধা মাঝির দাদা না পরদাদা না-কি তারও দাদা সোভান ধুমা। বিলের এপারে গিরিরডাঙার অর্ধেক, অর্ধেক না হলেও সিকি জমির জঙ্গল কেটে বসত করলো কে?—সোভান ধুমা ছাড়া আবার কে? করতোয়ার পশ্চিমে কোথায় খুব গোলমাল করে কাদের তাড়া খেয়ে সোভানের বাপ এখানে যখন আসে এই তল্লাট জুড়ে তখন খালি জঙ্গল আর জঙ্গল। সোভানের মা ছিলো চার জন, ভাইবোন পঁচিশ তিরিশ জনের কম নয়। এর মধ্যে প্রায় সবই বেটাছেলে। মাঝি হওয়ার আগে তাদের বংশে বেটি পয়দা হয়েছে কম। আরে, বিলের পশ্চিমে এতো বড়ো জঙ্গল কেটে চাষের জমি বার করা কি মেয়েছেলের কাম নাকি? জঙ্গলও জঙ্গল! জঙ্গল জুড়ে তখন বাঘ, ভাল্লুক বুনো শুওর আর সাপ। প্রথম দিকে গাঁইগুঁই করলেও জানোয়ারগুলো তটস্থ থাকতো সোভান আর তার ভাইদের ভয়ে। শেষে এমন হলো যে, সোভানের গায়ের গন্ধ পেলে বাঘ পর্যন্ত আর পালাবার দিশা পায় না। ধরতে পারলে সোভান ধুমা বাঘের ঘাড়ে জোয়াল চড়িয়ে তাকে দিয়ে লাঙল টানায়।

তারপর কবে, সোভান ধুমার নাতি না তার নাতির বেটার আমলে একবার আসামে না রংপুরে না-কি দিল্লিতেই হবে, না বার্মায়—কোথায় ভূমিকম্প হলে কোথাকার বড়ো গাঙের পানি সব এসে পড়লো পুবের যমুনায়। যমুনা তখন কী?—মানুষ শুনে হাসে, যমুনা তখন একটা রোগা খাল। তার ওই ছিপছিপে গতরে যমুনা কুলাতে পারে না, অতো পানি সে রাখে কোথায়? ক্রোশকে ক্রোশ জমি আর বাঘ ভাল্লুক শুওর আর সাপ আর মানুষ আর ঘরবাড়ি আর হাঁসমুরগি আর গোরুবাছুর সাবাড় করে সে কেবলি হাঁসফাঁস করে। যমুনার বদহজম হলে পানির ঘোলা স্রোতের অনেকটাই সে উগরে দিলো বাঙালি নদীতে। প্রবল স্রোতের দলছুট একটা ধারা বাঙালি থেকে বেরিয়ে ঢুকে পড়লো এই কাৎলাহার বিলে। কাৎলাহার বিল তো তখন একটু জলা মাত্র, তার উত্তর সিথানে পাকুড়গাছে মুনসি আরস পেতে বসেছে সোভান ধুমার আমলেই, কিংবা তার বেটার সময়েও হতে পারে। মুনসি না থাকলে কাৎলাহারকে তখন আর পুছতো কে? মুনসি থাকায় পানি খুব টলটলে, গিরিরডাঙার জঙ্গল-কেটে বসত-করা মানুষ ঐ পানি খায়। কিন্তু ওই জলা কি আর বাঙালির দলছুট স্রোতের অতো পানি ওইটুকু গতরে রাখতে পারে? গিরিরডাঙা ডুবলো, কামারপাড়া বাদে নিজগিরিরডাঙা তখনো জঙ্গল, সেটাও ডুবলো। গিরিরডাঙার চাষের জমি আর গোরুবাছুর আর হাঁসমুরগি আর বৌবেটাবেটি নিয়ে মানুষকে ভেসে যেতে দেখে মুনসির আর সহ্য হলো না, পাকুড়গাছ

থেকে সে তার জোড়া পা পঁচিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ গজ বাড়িয়ে বিলের দক্ষিণ পশ্চিম পাড়ে মারলো এক লাথি। সেখানে কতোদিন আগে জঙ্গল কেটে তৈরি চাষের জমি আর বাড়িঘর সব ভেঙে পড়লো, বানের পানি গলগল করে ঢুকে পড়লো পাড়-ভাঙা বিলের ভেতর। বাঙালি নদীর স্রোত দুটো ধারায় এসে পাকুড়গাছে কদমবুসি করে গাছের দুই ধার দিয়ে এসে মিশলো বিলের পানিতে। একটি ধারা মুছে গেছে অনেক দিন আগেই। পাকুড়গাছের পেছনে অনেকটা জায়গা সেই স্রোতের স্মৃতিতে এখনো নাকি ভিজে ভিজেই থাকে। মায়ের কাছে তমিজ গল্প শুনেছে, টাউনের রমেশ উকিল এখানে চাষবাসের জন্যে কাশবন ইজারা নিয়েছিলো। তমিজের বাপকে নাকি সে ওখানে লাগিয়ে দিতে চেয়েছিলো তার ভাগ্নে টুনুবাবুর সঙ্গে। তখন রমেশ উকিলের কথায় তার বাপ কান দেয় তো পাকুড়তলার উত্তরে না হলেও তিন বিঘা জমির মালিক হয়। তাদের জায়গাজমি খেয়েই তো বিলের গতর এতো মোটা। ঐ বান না হলে আর মুনসি তাদের বাঁচাতে বিলের গায়ে লাথি না মারলে এইসব জমি তো তাদেরই থাকে। যাদের জমি খেয়ে মুনসির বিলের গতর বাড়ে, তাদের রেজেকের ব্যবস্থাও করে দেয় মুনসি নিজেই। তার লাথিতে মাটি ভেঙে পানিতে ডুবে গেলে লাঙল হারিয়ে যায় বিলের ভেতরে। মুনসির হুকুমে সেখান থেকে ভেসে ওঠে তৌড়া জাল, প্যালা জাল, এমন কি মস্ত বড়ো বেড় জাল পর্যন্ত।

মুনসির ইশারায় সোভান ধুমার বংশ হয়ে গেলো মাঝি। তা এখন বিল তো আবার বুঁজতে শুরু করেছে। আট বছর আগে বড়ো বানের পর পলি পড়ে বিল ছোটো হয়ে এসেছে। কতো কতো মাঝি কাঁধে জাল আর বৌদের কোলে-কাঁখে ছেলেমেয়েদের তুলে দিয়ে চলে গেলো পুবে যমুনার দিকে। আবার কেউ কেউ বিলে পানির ওপর পুরু সর-পড়া মাটিতে লাঙল ঢোকাবার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু নতুন জমি যা উঠবে সবই নাকি শরাফত মণ্ডলের, জমিদারকে টাকা দিয়ে গোটা বিল সে পত্তন নিয়েছে। কিন্তু তমিজের কেমন খটকা লাগে, বিলের নতুন জমিতে চাষবাস করার হক এখন কার?—বোঝো, ভালো করে বুঝে দেখো। কিন্তু সে নিজেও হিসাবটা ভালো করে বুঝতে পারে না। জমির মালিক না হোক, জমিতে বর্গা তো করতে পারবে, না কী কও?–কিন্তু তার উত্তেজনা ও উদ্বেগ ও খানিকটা হাহাকারও বটে, সবটাই মিনতি হয়ে প্রকাশের জন্যে ছটফট করে, কিন্তু তাও আর হয়ে ওঠে না। তবে তার হয়ে কথা বলে কাদের, 'ভাইজান, এই চ্যাংড়াক জমি দিলে ফসল মার যাবি না। চ্যাংড়াটা খাটতে পারে খুব। গরিব মাঝির বেটা, বেয়াদবি করার সাহস পাবি না।'

সেটা আবদুল আজিজও আঁচ করতে পারে। মাঝিদের বেটা, তার ওপর গরিবের মধ্যেও গরিব। চাষ করতে শুরু করলেও ভালোভাবে চাষা হতে আরো দুই পুরুষ লাগবে। লাঙল হাতে নিতে না নিতে আরো কয়েকটা চাষার সঙ্গে জোট বাঁধার সময় কোথায় তার?—ঠিক আছে।—কিন্তু আবদুল আজিজ একজন সরকারি কর্মচারী, তার বেতন আসে ডিস্ট্রিক্ট ট্রেজারি থেকে। তাকে চলতে হয় বৃটিশ রাজের তৈরী রুলস অনুসারে। বৃটিশ রাজ আর যাই করুক, তোমরা এটা বলো সেটা বলো, কিন্তু আইনের ফাঁকি তারা সহ্য করে না। বৃটিশ খেদাতে তোমরা উঠে পড়ে লেগেছো, দেশটা তোমাদের হাতে পড়লে এর হালটা কী হয় তখন দেখে নিও। তা এখনো আইনকানুন বলে কিছু আছে, চাষেরও নিয়ম আছে। এখন পর্যন্ত ফসল ভাগ হয় আধাআধি। পুঁজিও খাটাও তবে আধাআধি, এতোকাল তাই তো চলে আসছে। লাঙল গোরু নাই, ঠিক

আছে ভাড়া বাবদ আধাআধি পয়সা দিয়ে বর্গা নাও।

আবদুল আজিজের কথা শেষ হলে আবদুল কাদের মুখ খোলে, 'ভাইজান, আধিয়ারের সাথে নগদ পয়সার কারবার কী চলে নাকি? ফসল উঠলে ওর ভাগ থেকে ক্যাটা নিলেই হবি। তমিজ পয়সা পায় কোথায়?'

'জগদীশ সাহার মোকাম এখান থেকে কয় দিনের রাস্তা?' আজিজ পরামর্শ দেয়, 'হাঁটার কষ্ট হলে না হয় সাইকেলটা দে।'

জগদীশ সাহার নাম মুনসির ইশারায় কি মাথার ওপর আমগাছের ডালপাতার আলোছায়ার কারসাজিতে তমিজের সামনে একটা ভাঙাচোরা গোরুর আদল পায়, গলায় বাঁধা দড়ির টানে সেটা কেবলি সামনের দিকে চলে। দড়ি-ধরা হাতের মালিককে দেখা যায় না, কিংবা দেখার সাহস তমিজের হয় না বলে ওটা রয়ে যায় তার চোখের আড়ালেই। তমিজের বাপের আসল গোরু তবু সেদিন বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছিলো, এখন এ বেটা ভূতুড়ে গোরুর সেই টানটাও নাই। এর খুরের লাথিতে নিজের টলোমলো করা পা সামলাতে তমিজের প্রাণপণ জোর খাটাতে হয়। তমিজের দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি খানিকটা এসে বর্তায় কাদেরের ঠোঁটে, সেই তেজে তার জিভ বলকায়, 'হিন্দু জমিদার আর হিন্দু মহাজনের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই তো লীগের পাকিস্তানের লড়াই। হিন্দু মহাজন মুসলমান চাষার রক্ত চুষে শেষ করে ফেললো। আর আপনি এখন এই ছোঁড়াটাকে পাঠাবেন সেই মহাজনের বাড়ি? নাঃ। ওকে জমি বর্গা দিয়ে কাজ নাই।' গলার ঝাঁঝ দ্বিগুণ করে তমিজকে সে নির্দেশ দেয়, 'তমিজ, তুই যা। জমি তোক দেওয়া যাবি না। মাঝির বেটা, যা, খালে বিলে মাছ ধর‍্যা খা। যা ভাগ।'

'আঃ। তোমরা কী শুরু করলা?' বিলের প্রসঙ্গ ওঠায় শরাফত তাড়াতাড়ি করে কথা বলে। বিল থেকে সরিয়ে রাখার জন্যেই মাঝিদের সে জমি বর্গা দেওয়ায় আগ্রহী। ছেলেটা আবার সেই বিলের কথাই তুললো। ছেলেদের কথা কাটাকাটিতে লোকটা মাথা গলায় না। খানকা ঘরের একটু উঁচু বারান্দায় আধশোয়া হয়ে সে বসেছিলো ইজি চেয়ারের খয়েরি ও সবুজ ডোরা-কাটা ক্যানভাসে। কয়েক গজের মধ্যে আমগাছের নিচে হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে আজিজ এবং বেঞ্চে বসে কথা বলে কাদের। শরাফত তাদের কথা ঠিকই শুনছিলো, তবে তার চোখ ছিলো বাড়ির সীমানা পেরিয়ে কাৎলাহার বিলের ওপারে নিজগিরিরডাঙার চাষাদের গ্রামের পেছনে বৃষ্টির পানিতে ছপছপ-করা জমির দিকে। বকের ঝাঁকের ফেলে-আসা অর্জুনগাছের কয়েক গজ পরেই কামারদের ছেড়ে-যাওয়া ভিটা চাষ করে দেড় বিঘা জমিতে এবার কলা লাগানো হয়েছে। এই গোটা এলাকার এতো জায়গা নিয়ে কলার আবাদ এই প্রথম করলো শরাফত মণ্ডলই। সারি সারি শবরি কলার গাছে কলাপাতা রঙ ভাদ্রের ঘোলা রোদে একটু ময়লা দেখালেও শরাফত একটুও দমে না। কারণ চশমা ছাড়াই কলাপাতার আসল রঙ সে দিব্যি দেখতে পায়। ওপারের রোদবৃষ্টি, গাছপালা, আলোছায়া, জমিজমা, মানুষজন, গোরুবাছুর সবই তার খুব চেনা। আজ এপারের বাসেন্দা হলে কী হয়, জন্ম তো তার ওপারেই, দলিল দস্তাবেজে তার সাকিন লেখা থাকে : গ্রাম—নিজগিরিরডাঙা। আবদুল আজিজ আজকাল সব দলিলে লিখতে শুরু করেছে : হাল সাকিন—গিরিরডাঙা। কাৎলাহার বিল পুরট হতে শুরু হওয়ার অনেক আগেই শরিকদের সঙ্গে গোলমাল করে এপারে এসে ঘর তোলে শরাফতের বাপ। শরাফত তখন একেবারেই শিশু। সেবার কী যেন হলো, আল্লার ইচ্ছা বুঝতে পারে কে?—কাৎলাহারে মাছ মরলো একেবারে ঝাঁক বেঁধে। গিরিরডাঙার মাঝিদের জালে

কেবল মরা মাছই ওঠে, বিলের পচা মাছ খেয়ে মাঝিপাড়ায় কলেরা লাগলো। অভাবে পড়ে কয়েকজন মাঝি নিজেদের বাড়িঘর জমিজমা বেচে দিলে শরাফতের বাপ কিছু জমি কিনে এপারে চলে আসে। বাপের কি পূর্বপুরুষের স্মৃতিতে মগ্ন হয়ে কিংবা জমি বিস্তারের স্বপ্নে বিভোর হয়ে শরাফত যে এতোক্ষণ চুপচাপ ছিলো তা কিন্তু নয়। বিলের ওপারে জমি তার কম নাই। খোদার রহমতে পূর্বপুরুষের গ্রামে সে কম জমি করে নি। মোষের দিঘির দক্ষিণে জমিটা তার বাপের আমলের, বাপের আমল থেকে জমিটা নিজেরাই চাষ করেছে, বছর পাঁচেক হলো অর্ধেক দিয়েছে হুরমতুল্লাকে বর্গা করতে। মোষের দিঘির ধার ঘেঁষে সবটাই জমিদারের খাস জমি, পতিত হয়েই রয়েছে। উত্তরে হুরমতুল্লার ভিটা, ভিটার সঙ্গে লাগোয়া বিঘা তিনেক জমি হুরমতুল্লা এখনো হাতছাড়া করে নি। তার ভিটার দক্ষিণে ভবানীর মাঠ, প্রায় আধ ক্রোশ জায়গা খাঁ খাঁ পড়ে থাকে। ওপারের গাঁয়ের গোরু চরাবার জায়গা ওটা, জমিদার কাউকে পত্তন দেয় না। এর পরই মণ্ডলের এক দাগে ১২ বিঘা জমি, একটা জলা, তারপর ফের কামারপাড়ায় কেনা তার চার বিঘা জমি। বিলের দক্ষিণে সাত দাগে তার আটচল্লিশ বিঘা জমি, এর বেশিরভাগ বর্গা করে হামিদ সাকিদার। গিরিরডাঙায় তার জমি একেবারে কম নয়, কিন্তু সেগুলো বড়ো এলোমেলো। মাঝির জাত জমি আর গুছিয়ে করবে কী করে? এদিকে সস্তায় পেলে মণ্ডল জমি ছাড়ে না, তবে তার মনোযোগটা নিজগিরিরডাঙার জমির দিকেই বেশি। হামিদ সাকিদারের ওপর বেশ ভরসা করা যায়। ওপারের উত্তরের জমিও অর্ধেকটা নিজে লোক দিয়ে চাষ করার ব্যবস্থা আগের মতোই রেখে বাকিটা হুরমতুল্লাকে বর্গা দিলে ছেলেরা মোটেই সায় দেয় নি। তাদের কথা, হামিদ সাকিদারই করুক। কিন্তু শরাফতের হিসাব অন্যরকম, নিজের পূর্বপুরুষের গ্রামে প্রজা একটা বাড়লো। তা ছাড়া ভিটার কাছাকাছি বলে নিজের অল্প জমির সঙ্গে এই জমিটার যত্ন হুরমতুল্লা একটু বেশিই নেবে। আবার নিজের দূর সম্পর্কের আত্মীয় এই মানুষটাকে বশে রাখা যাবে। কিন্তু জমির বাকিটা হুরমতুল্লা এতো চাইলেও তাকে দিলো না কেন তা শরাফতই জানে। তবে মোষের দিঘির উত্তরের জমি, পুবের জমি ও পশ্চিমের জমি পত্তন পেলে এটা হয়তো সে হুরমতকেই দেবে। মোষের দিঘির ঘেঁষা জমিগুলো নিয়ে গতবার পোড়াদহের মেলায় নায়েববাবুর সঙ্গে শরাফতের একটু আলাপও হয়েছিলো। আশাও পাওয়া গেছে। খাস জমি রাখার ব্যাপারে জমিদারবাবুর আগ্রহ নাকি দিন দিন কমে আসছে। ছেলেরা তার কলকাতা থেকে নড়তেই চায় না। কলকাতাতেই ব্যবসা করার নাম করে জমিদারি থেকে টাকা সরানো ছাড়া জমিদারিতে তাদের কোনো আগ্রহই নাই। নায়েববাবু বলে, বিষয় সম্পত্তিতে বাবুও উদাসীন হয়ে উঠেছে, এটাকে নায়েববাবু বৈরাগ্যই বলতে চায়। শুনে উত্তেজনা ও উৎসাহে শরাফত পায়ের গতি আর নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। তবে মেলার ভেতর হাঁটতে হাঁটতে পায়ের তাল সে রাখে হুঁশিয়ার হয়েই। দুদিন পর পনেরো সেরি দুটো রুই মাছ আর হাতিবান্ধার তিন হাঁড়ি দৈ নিয়ে লাঠিডাঙার কাচারিতে নায়েববাবুর সঙ্গে দেখা করে খুব হুঁশিয়ার হয়ে মোষের দিঘি পত্তন নেওয়ার কথা তোলে। নায়েববাবুর হাবেভাবে বোঝা যায় কিছু খরচপাতি করলে ওটা পাওয়া যেতে পারে। পেলে দিঘির চারপাশ মিলে এক দাগে বিঘা বিশেক জমি শরাফতের দখলে আসে। জোত এরকম এক দাগে হলে হিসাব রাখতে সুবিধা, জমিতে গিয়ে চোখও জুড়ায়। ওদিকে দক্ষিণে অর্জুনগাছের একটু ওপাশে কামারপাড়ার অনেকটাই শরাফত কিনে ফেলেছে। কেবল দশরথ আর নারদ আর ওদিকে গৌরাঙ্গ আট বিঘা

জমি আঁকড়ে পড়ে রয়েছে। ওরা উঠে গেলেই ওখানে এক দাগে সতেরো বিঘা জমি হয়। আহা! তা হলে নিজের বাপের গ্রামের অর্ধেকের বেশির মালিক হতে পারে সে।—এখন তার ছেলেরা যদি সামান্য এক মাঝির বেটাকে জমি বর্গা দেওয়া নিয়ে এতো তর্ক করে তো সম্পত্তি রাখতে পারবে এরা? ভাইয়ে ভাইয়ে তর্কাতর্কি মনোমালিন্যে পৌঁছুতে কতোক্ষণ? একেক দাগে বিঘার পর বিঘা জমির সম্ভাবনা আর ছেলেদের বিবাদের আশঙ্কা তাকে বঞ্চিত করছিলো ইজি চেয়ারের নিরঙ্কুশ আরাম থেকে এবং একই সঙ্গে তাকে বাধ্য করছিলো চুপ করে থাকতে। নইলে তার সামনেই তার নিজের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো আলোচনা কি ঝগড়াঝাটি তার সহ্য করার কথা নয়। কিছু না হোক, গোরু দুটোর মুখের সামনে খড়ের কুচির পরিমাণ কমে এসেছে এবং কাঁঠালতলায় বাঁশের বাতায় ঘেরা মাটির চারিতে মাড়নুন মেশানো পানি থেকে বকনাটা বারবার মুখ তুলে নিচ্ছে,—এসব ব্যাপারে রাখাল ছোঁড়াটাকে অন্তত বার কয়েক ধমক দিতোই। ধমকের কুচি লাগতো তার ছেলেদের গায়েও। কিন্তু শরাফত হঠাৎ করে এতোটাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে যে, ইজিচেয়ারে পিঠ সোজা করে বসে সে চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে, 'জবান যখন দেওয়া হছে, জমি তমিজকেই দেওয়া লাগে।'

এই সিদ্ধান্ত শরাফত নিয়েছে ছেলেদের মুখের দিকে চেয়ে নয়। বড়ো ছেলেটা সুযোগ পেলেই আইন নিয়ে তড়পায়। বর্গাচাষাদের সঙ্গে এতো আইন তড়পালে চলে না। জোতজমি ঠিক রাখতে হলে, সম্পত্তি বাড়াতে হলে কখন কী করতে হয় তা আগে থেকেই কোথাও ঠিক করা থাকে না। আবদুল আজিজ রাগ করতেপারে; কিন্তু কয়েক বছরের সরকারি চাকরি তার রাগ পোষার ক্ষমতাকে অনেকটা নিংড়ে ফেলেছে। এই ছেলেকে সামাল দেওয়া শরাফতের কাছে ডালভাত। সে বরং কাদেরের একটা ভুলকে ভেঙে দিতে বেশি মনোযোগ দেয়, 'কাদের, শোনো, টাকা লগ্নি করা হলো জগদীশের পেশা, এই ব্যবসায় না গেলে ওর বাপের লগ্নি করা টাকাও তো উদ্ধার করবার পারতো না। এটাই হলো ব্যবসা, ব্যবসার ভালোমন্দ দেখলে চলে? তোমরা যদি কও, হিন্দু মহাজনের টাকা নেওয়া হবি না, তা হলে মানুষ যাবি কুটি? আজই জগদীশ টাকা লগ্নি করা বন্ধ করে তো কালই মেলা মানুষ না খায়া মরবি। কার্তিক মাসে মানুষের পেট তো চালায় জগদীশই।'

'তার সুদটা তোলে কীভাবে তাও তো জানেন।'

'ওটা ওর ব্যবসা। জ্যানা শুন্যাই মানুষ টাকা লেয়। জগদীশের ধর্মেও তো সুদ খাওয়া পাপের কাম লয়।'

আবদুল কাদেরের মৌন যে সম্মতির লক্ষণ নয় এটা জেনেও শরাফত মণ্ডল বিরক্ত হয় না। ছোটো ছেলের পাগলামিগুলোকে প্রশ্রয় দিতে তার ভালোই লাগে। বংশের এই ছেলেটাই বছর তিনেক কলেজে আসা যাওয়া করেছে। দুই চান্সে আই এ পাস করে বি এ পড়ার বায়নাও ধরেছিলো। কিন্তু তা হলে তাকে যেতে হয় রাজশাহী। রাজশাহী যাওয়া মানে মাসে মাসে টাকা গোনা তো আছেই, তা ছাড়া ছেলেকে নাগালের বাইরে ছেড়ে দেওয়া হয়। যেভাবে সভাসমিতি শুরু করেছে দূরে পড়তে গেলে পড়াশোনা সে ছেড়েই দিতো। তবে এখন বাড়ির ভাত খেয়ে যতো খুশি সভা করে বেড়াক শরাফতের আপত্তি নাই। জেলার নেতারা গোলাবাড়ি এলে তার সঙ্গেই কথাবার্তা বলে, তাদের বাড়িতেও আসে। দিনকাল যা পড়ছে এসব ছাড়া আর গতি নাই। গোলাবাড়িতে কেরোসিনের দোকানটা দেওয়ার বুদ্ধি ওর মাথায় এলো; সে তো এইসব যোগাযোগের ফলেই। আবার গ্রামের গরিব ছোটোলোকদের খাতির করতেও ছেলেটা তার বেশ পটু।

এটার দরকার কম নয়। আবদুল আজিজ বলুক আর নাই বলুক, শরাফত ঠিকই জানে, অবস্থা ওদিকে সুবিধার নয়। আইনকানুনের ধার বেশি ধারলে শেষে সবই ফসকে যাবে। শরাফতকে সবই বিবেচনা করতে হয়। কাদের তমিজকে কথা দিয়েছে, তাকে এতোদিন আশায় আশায় রেখে এখন ফিরিয়ে দিলে ছোঁড়াটা হয় কাৎলাহার বিলে মাছ চুরি শুরু করবে, চুরি করতে করতেই একদিন বিলের হক দাবি করে বসবে। নইলে সে চলে যাবে খিয়ারে। খিয়ারের চাষাদের বেয়াদবি দেখতে দেখতে তারও মাথাটা বিগড়ে যাবে না কে বলতে পারে?

শরাফত বলে, বুলুর জমি এখন দেওয়ার দরকার নাই। তমিজ বরং বিলের ওপারে মোষের দিঘির কাছে হুরমতুল্লার পাশের জমিটা বর্গা করুক। হুরমতুল্লার বাড়িতে মণ্ডলের গোরু লাঙল মই জোয়াল সব থাকবে, তমিজ সব ব্যবহার করবে। তবে যাই নিক, সব কিছুর দাম ধরে ফসলেই সে শোধ করবে ধান কাটার পর। তবে সেখানে কয়েক মাসের হিসাবে কিছু লাভ শরাফতকে দিতে হবে। মুসলমান বলে সুদ সে নেবে না, কিন্তু মুনাফা নিলে কাদের নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না।

সুদ নিতে মুসলমানের অসুবিধা আছে কি নাই, তা নিয়ে আবদুল কাদের মাথা ঘামায় না। সে তো আর মাদ্রাসায় পড়া কাঠমোল্লা নয়, রীতিমতো কলেজে পড়ে আই এ পাস করেছে, তার মধ্যে ওসব গোঁড়ামি থাকবে কেন? টাউনে মুসলিম লীগ অফিসে কি সিরইলে ইসমাইল হোসেনের বাড়িতে কি ঝাউতলায় সাদেক উকিলের বৈঠকখানায় পাকিস্তানের আলাপ একবার শুরু হলে কতো নামাজের ওয়াক্ত কোন দিক দিয়ে চলে যায় কেউ খেয়াল করে না। আবদুল কাদেরের সহ্য হয় না হিন্দুদের জুলুম। এর সঙ্গে মুসলমানদের হারাম হালালের সম্পর্ক কী? কিন্তু এসব কথা সাদেক উকিল কি ইসমাইল হোসেনের মতো গুছিয়ে বলা কাদেরের সাধ্যের বাইরে।

তার আমতা আমতা কথা এবং আজিজের উসখুস-করা নীরবতা অগ্রাহ্য করে শরাফত বলে, 'তমিজ, ভালো জমিখান তোক দিলাম। বাপের আমল থ্যাকা ঐ জমি নিজেরা চাষ করিছি। উঁচা ভাঙা জমি, আমনের ফসল হবি ভালো।' তার বাপের আমলে গোবর ছাড়া আর কোনো সার ছিলো না, গোবর ছাড়া অন্য সার দেওয়াকে তারা গণ্য করেছে গুনা বলে। তো তার দাদার আমলে ওই জমিতে একেক বিঘা জমিতে ধান উঠেছে ছয় মণ, সাড়ে ছয় মণ। 'বাপজান লিজে লাঙল ধরলে সাড়ে সাত মণ ধান না তুল্যা ছাড়ে নাই।'

তাদের দাদার নিজের হাত লাঙল ধরার বিবরণ আবদুল আজিজ বা আবদুল কাদের উপভোগ করে না। আজিজ ছোটোখাটো হলেও সরকারি চাকরি করে, শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সঙ্গে তার ওঠাবসা, মাত্র দুই পুরুষ আগে মাঠে নিজের হাতে লাঙল ধরার কথা শুনলে তারা ওর দিকে তাকাবে। আর তাদের মধ্যে যাদের বাপেরা এখনো ভোর হতে না হতে লাঙল ঠেলতে শুরু করে তারা তো এই নিয়ে আজিজকে পাকেপ্রকারে টিটকিরিই দেবে।

তবে বিরক্ত হবার সুযোগ কাদেরের কম। তমিজকে জমি বর্গা দেওয়ায় বাপের প্রতি সে গদগদচিত্ত। তমিজটা এখন তার বশেই থাকবে। গিরিরডাঙায় মাঝিদের দাপট এখনো কম নয়। মাঝিদের মধ্যে এই তমিজটাই গোলাবাড়ি গেলে একবার না একবার তার দোকানে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকে, লীগের ছেলেদের কথাবার্তা মন দিয়ে শোনে। একে দিয়েই মাঝিপাড়াটা কাদের নিজের দিকে টানতে পারবে। আবার দলের

নেতাদের সামনে সে দাখেল করতে পারবে তমিজকে, এরকম কর্মী এই এলাকায় আর পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া, এসব মাঝি আর চাষা আর কলুদের মধ্যে ভেদাভেদ রাখলে পাকিস্তানের ডাকে সাড়া দেবে কে? সেখানে তার দাদা পরদাদার লাঙল ধরার কথায় সংকোচ করার কী আছে? তবু হালুয়া চাষা দাদা সম্বন্ধে বাপের স্মৃতিচারণে সেও অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করে। বাপ যে তাদের আরো কতোদূর নিয়ে যায়, বংশকে নামিয়ে আনে কোন পর্যায়ে এই নিয়ে দুই ভাইই কাতর হয়ে পড়লে বাড়ির ভেতর থেকে শরাফতের দ্বিতীয় বিবির 'ক্যা গো, বেলা গেলো কোটে, এখনো তোমরা ডুব দিলা না, ভাত খাবা কখন গো?'—এই তাগাদা এসে আবদুল আজিজ ও আবদুল কাদেরকে উদ্ধার করে।

৭

মণ্ডল দুই বেটাকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে গেলো, বেলা তখন অনেক। সকালের পান্তা সব ঘাম হয়ে, হাওয়া হয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় তমিজের পেটটা চুপসে গেছে। কিন্তু হলে কী হয়, নিজগিরিরডাঙায় দুই বিঘা সাত শতাংশ জমিটা এক পাক ঘুরে আসার জন্যে চোপসানো পেটশুদ্ধ সারাটা শরীর তার ছটফট ছটফট করে। বিলের ধারে বিলের পাহারায় নিয়োজিত বুলুর বেটাকে বলে তমিজ চেয়ে নেয় মণ্ডলের কোষা নৌকাটা।

পানিতে টান ধরেছে, দক্ষিণে বাড়ির কাছে মাছ আটকে রাখার ব্যবস্থাও করে রেখেছে মণ্ডল। বিলে এখন মাছ ধরার জুত। বিল তো এখন ভরা পোয়াতি, গর্ভে তার রুই কাৎলা থেকে শুরু করে পাবদা ট্যাংরা, কৈ মাগুর শিঙি আর খলসে পুঁটি। বিলের ভেতর, অনেক ভেতরে কোথায় মাছ রান্না হচ্ছে, তার ধোঁয়ায় তমিজের চোখমুখ ঝাপসা হয়ে আসে। অবশ্য মাথার ওপর রোদের ভ্যাপসা তেজও তার চোখ ঝাপসা ঠেকার কারণ হতে পারে। আকাশে এদিক-ওদিক ছড়ানো মেঘ, সূর্যের তাপে সেগুলো এখন শুকাচ্ছে বলে পানিতে ময়লা মেঘের নিংড়ানো ধোঁয়া। পানি এখন তাই ঘোলা। আশ্বিনে পানি আরো সরে গেলে বিল সাফসুতরো হবে। তা ঘোলা হোক আর সাফ হোক, বিল তো মণ্ডলের দখলে। রুই কি কাৎলার কয়েকটা বাচ্চা বৈঠায় দুষ্টুমি করে ঠোকর দিয়ে যায় : মণ্ডলের বর্গাচাষী হওয়ায় কাৎলাহারের মাছেরা কি তমিজকে বিদায় জানিয়ে গেলো?

কোষাটা বিলের পুব তীরে ভেড়ার আগেই দ্যাখা যায়, অল্প দূরে জমির আলে নামাজ পড়ছে হুরমতুল্লা পরামানিক। কোষা থেকে লাফিয়ে নেমে, সেটা একটু টেনে ডাঙায় রেখে তমিজ গিয়ে দাঁড়ালো তার জমির পাশে। বিলের ঢালের একটু ওপরে এক দাগে শরাফতের সাড়ে চার বিঘা জমি। এর মাঝামাঝি আল, আলটা একটু চওড়াই। আলের পশ্চিম ভাগটা বর্গা করে হুরমতুল্লা, পুবেরটা এখন থেকে করবে তমিজ। খানিকটা তফাতে উত্তরে মোষের দিঘি, মস্ত গোল দিঘির উত্তর পূর্ব কোণে দিঘি থেকে অন্তত পাঁচ ছয় বিঘা জমি পেরিয়ে হুরমতুল্লার বাড়ি, দিঘির খুব উঁচু পাড়ের জন্যে এখান থেকে সম্পূর্ণ দ্যাখা যায় না। চার পাশটা ভালো করে দেখে বহুবার দ্যাখা জায়গাটা তমিজ জরিপ করে। না, মণ্ডল তাকে জমি দিয়েছে চমৎকার। সমান ডাঙা জমি,

একেবারে খিয়ার এলাকার মতো। মাঝখানের আলটাও সমান। কুলগাছের নিচে সবুজ জমিতে গামছার ওপর বসে নামাজের শেষে হাত দুটো জোড়া লাগিয়ে হুরমতুল্লা এখন মোনাজাত করছে। মাঝিপাড়া জুম্মাঘরে নামাজের পর কুদ্দুস মৌলবি একদিন বয়ান করেছিলো, রফাদানিদের এটাও একটা দোষ, মোনাজাতের সময় হাত এক সাথে করে তারা শয়তানকে বসার সুযোগ করে দেয়। জোড়াহাতের পেছনে এবং এলোমেলো ছড়ানো দাড়ির ভেতরে হুরমতুল্লার কালো ঠোঁটজোড়া বিড়বিড় করে। মোনাজাত শেষ হলে হাত নামাবার পরেও দোয়া পড়া তার থামে না, তবে তার গলা চড়লে তমিজ শোনে, হুরমতুল্লার লক্ষ এখন আল্লাতালা নয়, তমিজ নিজে। কী রকম?—'ক্যা রে মাঝির ব্যাটা, মণ্ডল তা'লে জমি তোকই দিলো? মণ্ডলেক কয়া হামাকও এটি থ্যাক্যা বিদায় দে। মাঝির সাথে জমিত কাম করবার পারমু না বাপু!'

এরপর শুরু হয় তার একটানা আক্ষেপ, কতোদিন সে গোটা সাড়ে চার বিঘা জমিতে মণ্ডলের কামলা খাটলো। তার আগে এই জমিতে কামলা খেটেছে হুরমতুল্লার ভাই। তারপর গত বছর পাঁচেক হলো জমির আর্ধেকটা বর্গা করছে হুরমতুল্লা। পুরো জমিটাই তো সে চেয়েছিলো, তখন মণ্ডল গলা নিচু করে বলেছিলো, 'বুঝিস তো, বেটারা যতোই কোক, ব্যামাক জমি বর্গা দাও; হাজার হলেও হামি চাষার বেটা। লিজের হাতোত নাঙল ধরি না, আবার কামলাকিষাণ দিয়াও যদি এক আধটা জমি আবাদ না করি তো জমি ব্যাজার হবি। এই জমিটা হামারই থাক, তুই এটি আগের লাকান কামলা খাট।' তা ছেলেদের সঙ্গে যখন পারলোই না তখন এটা হুরমতুল্লাকে বর্গা দিলে মণ্ডলের লোকসানটা কী হতো? আবদুল আজিজ তো তার হয়ে বাপকে বলতেও চেয়েছিলো, বললো কি-না কে জানে? তাকে বর্গা দিলে তার আগের বর্গার জমিটার পাট না হয় সে একটু আগেই কাটতো। পরে গোটা জমি জুড়ে আমন করে দেখিয়ে দিতো আবাদ করা কাকে বলে! তার মুশকিল হলো, সে নিজেও চাষার ঘরের ছেলে, দুই পুরুষ আগেও শরাফতের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তা পর্যন্ত ছিলো। সে তো আর চামার কি কামার কি কুমার কি কলু কি মাঝির ঘরে জন্ম নেয়নি যে জমি বর্গা নেওয়ার জন্যে মণ্ডলের ছেলেদের পায়ে ধরবে। 'মণ্ডলেক খালি একবার কছিলাম। তার ছোটো বেটা কয়, এই জমি দেওয়া লাগবি তমিজেক। কিসক?—না, মাঝির বেটা জমিত সোনা ফলাবার পারবি।' হঠাৎ কাশতে শুরু করলে হুরমতুল্লার শেষ কয়েকটি কথায় আবদুল কাদেরের মুখ ভ্যাংচাবার চেষ্টা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সফল হয়।

জবাব না দিয়ে তমিজ হাঁটু মুড়ে বসে নিজের বর্গা জমির মাটি তুলে দ্যাখে। আউশ কাটা হয়েছে জমি চেঁছে, নাড়ার গোড়া যেন কালচে হলুদ চুলের কদমছাঁট হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে মাঠ জুড়ে। নাড়ার গোড়ায় হাত দিয়ে একটু ডলতে তার খড়খড়ে আঙুলে নরম ছোঁয়া লাগে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে জমিতে আস্তে আস্তে হাঁটলে পায়ের নিচে বৃষ্টির পানিতে ভেজা মাটি ও নাড়ার ছপছপ বোল ওঠে। কাল খুব ভোরে রাত থাকতে উঠে হুরমতুল্লার গোয়ালে রাখা মণ্ডলের জোড়া বলদ জোয়ালে জুতে লাঙল চালিয়ে দেবে এই নরম মাটিতে। মাঝির বেটা হলে কী হবে, তমিজ ঠিক বুঝে ফেলেছে, শরীরে লাঙলের ফলা লুফে নেওয়ার জন্যে জমি অস্থির হয়ে উঠেছে। জমিতে এটা কি বৃষ্টির পানি? চুতরের সামনে পানি ভাঙছে? প্রথম দিনেই যতোটা সম্ভব জায়গা জুড়ে চাষ দিয়ে জমির আশটা মেটানো চাই। পর দিন ফের চাষ দাও, তারপর পর দিন

ফের চষো। সবটা জমিতে যতোবার পারে চাষ দিয়ে ফেলবে তমিজ। নাড়ার মোতাগুলো সব মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, মিশতে মিশতে মাটির রঙ নেবে। জমি কাদাকাদা করে তাতে রুয়ে দেবে কচি কচি ধানের চারা। মণ্ডলের বাড়ির পালানে বুলু বীজতলা করে গেছে। আজকেও দেখে এসেছে তমিজ। কী শোভা! কলাপাতা রঙের একটা নতুন কাঁথা যেন পেতে দিচ্ছে, পেতেই দিচ্ছে। কে পেতে দেয় গো? কাঁথা পাততে উপুড় হয়েছে ঐ মানুষটা কে? একটু নিচের দিকে তাকানো মুখটি কুলসুমের বলে বুঝতে পারলে তার মাথাটা ঘুরে যায় এবং এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করে। তার খিদে পেটে মোচড় দিতে থাকে নতুন করে। কিন্তু এসব কেবল কয়েক পলকের জন্যে। জমিতে লাঙল দিতে হবে;—একটা হাল, দুটো হাল, তিনটে হাল। জমির মাটি তুলতুলে নরম না হলে ধানের চারা কষ্ট পাবে। চারা বুনতে হবে একটু ফাঁক করে করে। তবেই না চারা বাড়বে, কলকল করে বাড়বে। চারা বাড়তে বাড়তে বাড়তে গাছ হবে, কাদায় পানিতে আরো বাড়বে। অগ্রহায়ণে পানি শুকায়, শুকনা জমিতে রসের খোঁজ করতে গাছ শিকড় নামায়, ওপরেও বাড়ে। কার্তিকে পানি না হলে এই জমিই খটখট করবে। তখন পানি সেঁচো রে, নিড়ানি দাও রে, গাছের গোড়ালি একটু আলগা করে দাও রে—এইসব খেদমত কোনো কালানুক্রমিক বা অন্য কোনোরকম বিন্যাসে না আসায় তমিজের মাথার উত্তেজনা কেবলি বাড়তে থাকে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার শিরশির করে, আবার সেখানে ফুরফুরে হাওয়াও একটু বয় বৈ কি! শিরশির-করা ফুরফুরে উত্তেজনায় শরাফত মণ্ডলের জমিকে নিজের জমি ভাববার সুখ ছিলো, এই প্রথম সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে আবাদ করার উদ্বেগ ছিলো, আর ছিলো আবদুল কাদেরের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ, সেটা চড়ে গিয়েছিলো আনুগত্যে। এই অবস্থায় ছটফট করতে করতে তাকে একবার বসে পড়তে হয়েছে হুরমতুল্লার পাশে, তার হুঁকা নিয়ে লম্বা লম্বা টান দিলে খালি পেটে ধোঁয়া ঢোকে, খিদেটাকে বেশ ভোঁতা করা যায়। তার হাতে হুঁকা রেখে হুরমতুল্লা ফের পাট কাটে। বুড়া পাট কাটে একা একা। প্রথমে আড়চোখে, পরে ভরা চোখে এবং আরো পরে শুধু তার দিকে দেখতে দেখতে তমিজ হুঁকায় টান দিতে ভুলে যায়।—বুড়া হোক আর হিংসুটে হোক, মানুষটা খাটতে পারে বটে। এই চড়া বেলায়, এইতো দিঘির ওপারে বাড়ি, তবু বাড়িতে গিয়ে কাঁথায় পিঠটা ঠেকায়নি একবারও। একটা কামলা নেয়নি। বেশির ভাগ পাট সে একলাই কেটে ফেলেছে। বুড়া কি একাই সব করে? জিন পোষে নাকি?

জিনের কথা তার সম্বন্ধে শোনা যায় না। তবে বদনাম আছে অন্যরকম। কামলা রাখলেও মোটা কাজগুলো সারা হলেই কামলাপাট বিদায় দিয়ে জমিতে সে খাটায় তার মেয়েদের। হুরমতুল্লার মেয়ে তিন জন। বড়োটার বিয়ে হয়েছিলো, স্বামীর ভাত খায় না দুই বছরের ওপর। বাপের বাড়িতেই পড়ে আছে। তার পরেরটাও বিয়ের বয়েসি, ছোটোটা বোধহয় একেবারেই ছোটো। দুটো বিয়ে করেও হুরমতের ছেলের ভাগ্য হয়নি। আকালের সময় দুই নম্বর বৌকে সে পাঠিয়ে দিয়েছিলো বাপের বাড়ি, আকালেই সেটা মরে গেছে। তা ছেলে না হোক, লোকে বলে, মেয়েরাই তার একেকটা মদ্দা মানুষের মতো। নিজেদের ভিটার জমিতে সব কাম তো করেই, দিঘির দক্ষিণে এই বর্গা জমিতেও বাপের কামলাগিরি করে তারাই। বাপের সাথে সাথে তারা থাকে। এই যে পাট কাটছে বুড়া, কাটা পাটগাছ দাঁড় করিয়ে সাজিয়ে রাখার পটুত্ব তাদের কোনো

কামলার চেয়ে কম নয়। তমিজ অনুমান করে, দুটো মেয়ে তার সঙ্গেই কাজ করছিলো, তমিজকে দেখে বাড়ির দিকে চলে গেছে। হুরমতুল্লা হঠাৎ করে ডাকে, 'মাঝির বেটা, একটু আসো তো। বস্যাই তো আছো, ধরো।'

কাটা পাটগাছগুলো তমিজ ধরলে সদ্য-ফাঁকা-হওয়া জায়গায় সেগুলো দাঁড় করিয়ে রাখতে হুরমতুল্লার সুবিধা হয়। বুড়ার পাট হয়েছে ভারি সুন্দর। অতি চমৎকার। একটু দেরিতেই কাটলো, কিন্তু পাট নষ্ট হয়নি। গাছ একেকটা পুরুষ্টু কী! পাকা ছাল ফুঁড়ে আঁশের সোনালি আভা উঁকি দিচ্ছে এখন থেকেই। তমিজের মুগ্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে হুরমতুল্লা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, 'পাট তো আল্লা দিলে ভালোই হছে। লাভ কী? সোগলি বুঝি মণ্ডলের বাড়িতই তোলা লাগে গো। পাঁচ বছর তার জমি বর্গা করি, খন্দ উঠলে হামার ঘরত যা তুলি কামলা দিলেও মনে হয় ততোকোনাই তুলতাম। কখন ধান করজ করি, কিবা কিবা হিসাব কয়, ফসল হামি কিছুই পাই না।'

তমিজ বলে, 'তুমি আঁটিটা ধরো, হামি বাড়িত যাই।'

'আর এক ঘড়ি বাপু! এই কয়টা কোষ্টা কাটা হলেই আজ উঠমু।'

'না গো। যাই। হামার খিদা নাগিছে।' তমিজ আল পেরিয়ে নিজের জমিতে উঠে দাঁড়ায়। এই বুড়া তো ভারি বজ্জাত। মণ্ডলের জমি বর্গা করে, ওর বাপের ভাগ্যি! কার্তিক মাসে মঙার সময় মণ্ডল ধান করজ না দিলে বুড়াকে তো যেতে হয় জগদীশ সাহার মোকামে। হিন্দু মহাজন যে ওর কী সর্বনাশ করতো সেটা সে এখনো টের পায়নি। জমির মালিককে তার ভাগের ফসল দিতে বুড়ার বুক টনটন করে। নিমকহারাম! নিমকহারাম!—কথাটা কাদেরের কানে তোলা দরকার। না, কাদের মানুষটা নরম, তাকে দিয়ে কাজ হবে না। মণ্ডলকে সব খুলে বললে এখানে হুরমতুল্লাকে মণ্ডল জমিই দেবে না। হুরমতুল্লাকে উচ্ছেদ করতে হলে মণ্ডলকে চেতিয়ে দেওয়া দরকার। কাদেরকে লাগাবে এর পর। ওকে ধরে তমিজ এই জমিটা বর্গা পায় তো আল উঠিয়ে এক সঙ্গে সাড়ে চার বিঘা জমিতে সে মনের সুখে আবাদ করতে পারে। নিমকহারাম বুড়া হুরমতুল্লার বেইমানি তমিজের আর সহ্য হয় না।

কিন্তু শরাফত মণ্ডল কি তার কোনো ছেলের কানে তমিজ কথাটা আর তুলতে পারে না। সময় কোথায় তার? সূর্য ওঠার অনেকটা আগে অন্ধকার থাকতেই লাঙল গোরু জোয়াল নিতে তমিজকে যেতে হয় হুরমতুল্লার বাড়ি। প্রায় রোজই ঐ সময়টাতে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ে। মাথাল মাথায় মোষের দিঘির উত্তরে যখন সে পৌঁছয় বৃষ্টি তখনো পড়তেই থাকে। এর মধ্যে একবার ঝমঝম বৃষ্টি হয়ে যায় তো ভালো, এর মানে বৃষ্টির পর বিকাল পর্যন্ত আসমান সাফ থাকবে। যতো তাড়াতাড়িই করুক, হুরমতের বাড়ি গিয়ে তমিজ তাকে একদিনও দেখতে পায় না। তমিজ পৌঁছুবার অনেক আগেই বুড়া জমিতে গিয়ে হাজির। তমিজ লাঙল গোরু নিয়ে জমিতে পৌঁছতেই বুড়ার বড়ো মেয়েটা মুখের ওপর লম্বা ঘোমটা টেনে দৌড় দেয় বাড়ির দিকে। তখন হয়তো বেলা কেবল উঠছে। বৃষ্টির মধ্যে কাশতে কাশতে পাট কাটতে দেখে তমিজের মেজাজটা খিচড়ে যায়, বাপবেটির চোখে এদের নিন্দ নাই নাকি? বুড়ার বেটির তাকে দেখে ওভাবে পালাবার দরকার কী?

পাট কাটা কি পাটের গাছ গোছাবার কাজের ফাঁকে ফাঁকে হুরমতুল্লা কখনো কখনো

হুঁকাটা হাতে নিয়ে চলে আসে তমিজের জমিতে। তমিজ হঠাৎ করে তার কথা শুনতে পায়, 'এ মাঝির বেটা, ইংকা কর‍্যা নাঙল ধরলে মাটির মদ্যে ঠেলতে কষ্ট হয় গো। গোরু ক্যাংকা হাপস্যা যাচ্ছে দ্যাখো না?' বলতে বলতে হুরমতুল্লা তার হাত থেকে লাঙল নিয়ে ভিজে মাটিতে লাঙল চষার যথাযথ কায়দাটি দেখিয়ে দেয়।

তা এই কয়েক দিনে তমিজ জমিটাকে একেবারে মাখনের মতো করে ফেলেছে। সকালবেলার দিকে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানি প্রায় পড়েই না। বিকালের দিকে আলের ওপর বসে দুই হাতে কাদা ছানতে ছানতে বৃষ্টির গন্ধে, কাদার গন্ধে, একটুখানি আভাস-দিয়ে-যাওয়া রোদের গন্ধে এবং হাতের সঞ্চালনে তমিজের ঘুম ঘুম পায়, এই সময় জমিতে একেবারে উপুড় হয়ে শোবার তাগিদে তার সারা শরীর এলিয়ে এলিয়ে পড়ে। হয়তো সত্যি সত্যি সে শুয়েই পড়তো, কিন্তু বেছে বেছে ঐ মুহূর্তেই শালার বুড়ার বেটা চিৎকার করে বলে, 'ক্যা রে মাঝির বেটা, মাটি কি মাগীমানষের দুধ? ওংকা কর‍্যা টিপিচ্ছো কিসক?'—এই ধমকে তমিজের চোখের সামনে জমি যেন উদাম মেয়েমানুষ হয়ে শুয়ে থাকে। শুধু স্তন নয়, তার গোটা গতরে সাঁতার কাটার জন্যে তার নিজের শরীরেই ভয়ানক কোলাহল শুরু হয়। হুরমতুল্লার ওপর রাগ করার সুযোগও তার হয় না। আবার তার শরীরের কোলাহল চাপা পড়ে হুরমতুল্লার উপদেশে, 'হাত দিয়া মাটি ছানা হয় না। জমি চায় নাঙলের ফলা, বুঝলু? জমি হলো শালার মাগীমানুষের অধম, শালী বড়ো লটিমাগী রে, ছিনালের একশ্যাষ। নাঙলের চোদন না খালে মাগীর সুখ হয় না। হাত দিয়া তুই উগলান কী করিস?'

বলতে বলতে হুরমতুল্লা গম্ভীর হয়ে যায় এবং কাশির দমক অগ্রাহ্য করে সে জানায়, হাত দিয়ে ছানলে রোদ একটু চড়া হলেই মাটি শক্ত হয়ে যায়। ভেতরে শক্ত হলে সেই মাটিতে ধানের চারা আরাম পায় না।

জমির বুক থেকে হাত প্রত্যাহার করে নিয়ে তমিজ উঠে দাঁড়ায়। হুরমত কাশতে কাশতে দলা দলা থুথু ফেলে এবং এর ফাঁকে ফাঁকে বকেই চলে, মাঝির বেটা জমির খেদমত করবে কী করে? এ কী জাল ফেললো আর ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ উঠলো? মাছের প্রতি তারা যেমন নিষ্ঠুর, জমিও তাদের কাছে শুধু ভোগের বস্তু ছাড়া আর কী? চাষার ঘরে না জন্মালে কি আর জমির দরদ বোঝা যায়? আরে হুরমতুল্লা তো পুরুষমানুষ, তার বেটিরা পর্যন্ত জমির যে তদারকি করতে পারে, নতুন চাষা হওয়ার হাউস-করা মাঝি কি তার ধারে কাছেও যেতে পারবে?—মেয়েছেলের সাথে এরকম তুলনায় তমিজের গা জ্বলে যায়। একটু আগে তার দুই বিঘা সাত শতাংশ জমি জুড়ে উদাস হয়ে শুয়েছিলো যে লম্বা চওড়া মেয়েমানুষ সে হারিয়ে যায় জমির ভেতরে, তাকে আর দ্যাখা যায় না।

এই হুরমতুল্লাকে সহ্য করা দিনদিন তমিজের অসহ্য হয়ে উঠছে। কিন্তু কিছু বলাও মুশকিল। চাষবাসের সবই সে জানে খুব ভালো। তাকে দেখে সরে-যাওয়া বুড়ার বেটির কাজের যে নমুনা সে দ্যাখে তাও একেবারে নিখুঁত। বাপবেটির কাজে মুগ্ধ চোখজোড়া তমিজ কখনোই সরাসরি ফেলতে পারে না বুড়ার চোখে। কিন্তু পাট কাটুক আর কাটা পাটের গোছা সরাতে থাকুক আর কাশতে কাশতে মাঝির গুষ্টি উদ্ধার করুক, বুড়ার ঘোলাটে চোখজোড়ার একটা সবসময় নিয়োগ করা থাকে তমিজের দিকে।

বাড়িতে তমিজের বাপ বেটার দিকে মোটে তাকায় না। প্রতিদিন ঘরে ফিরে তমিজ দ্যাখে অন্ধকারে মাচার ওপর শুয়ে ভোঁসভোঁস করে ঘুমাচ্ছে তার বাপ। আর ঐ ঘরের ভেতরের ছোটো বারান্দায় চুলার সামনে বসে আগুনের আভায় ও ধোঁয়ায় এবং আগুন ও ধোঁয়ার ছায়ায় মুখে অন্যরকম চেহারা করে আগুনের ওপরকার অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কুলসুম। খিয়ারের চাল শেষ না হাওয়া পর্যন্ত তার যখন তখন ভাত রাঁধার আর খান্ত হবে না। তমিজের বাপের ভাত খাবার কোনো সময় অসময় নাই। দুই বছর আগে আকালের সময় খুদও জুটতো না, না খেয়ে থাকাটা তখন বেশ অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো। আর এখন খিয়ার থেকে চাল নিয়ে ফিরলে লোকটার খাবার কোনো আগামাথা থাকে না। বিকলাবেলা হয়তো ঘুমিয়েছে ভর পেট খেয়ে, অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেলে মাচা থেকে নেমে হাঁড়ি হাতড়ায়। আর সেদিন পেট খারাপ হলো, সেরে ওঠার পর তার খাওয়া বেড়ে গেছে কয়েক গুণ। পারিমাণে তমিজ যতোই খাক, তার খাবার একটা সিজিলমিছিল আছে। সকালে পান্তা খেয়ে মাঠে যাবার সময় ভাত বেঁধে নিয়ে যায়। রাতে ফিরে সে একবারই ভাত খায়। খেতে বসার আগে ডোবায় কয়েকটা ডুব দিয়ে এলেও হাতে হোক, পায়ে হোক, কানের লতিতে কি ঘাড়ের খাঁজে হোক, কোথাও না কোথাও একটুখানি কাদা তার লেগেই থাকে। কুলসুম মহা উৎসাহে সেদিকে আঙুল দিয়ে দ্যাখালে তার সমস্ত উদ্দীপনা নস্যাৎ করে দিয়ে বাপের দিকে চোখ নাচিয়ে তমিজ জিগ্যেস করে, 'তামান দিন ঘরের মদ্যেই আছিলো?'

কুলসুম কখনোই এই প্রশ্নের জবাব দেয় না। স্বামীর সারাদিন শুয়ে-থাকা দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে ফের আরেক দফা তার বিবরণ দিতে গেলে তার হাই উঠতে পারে। সন্ধ্যাবেলা হাই তুলতে তার ভালো লাগে না। কিংবা একটু তফাত থেকে তমিজের কানের লতি কি ঘাড়ের খাঁজ কিংবা হাত কি পায়ে লেগে থাকা কাদার গন্ধ চুরি করতে নিয়োজিত থাকায় স্বামীর প্রসঙ্গটি কুলসুম এড়িয়ে যায়। সে জিগ্যেস করে, 'হাল দেওয়া শ্যাষ হলো?' কিংবা 'আর কয়টা হাল দেওয়া লাগবি?'

গোগ্রাসে ভাত গিলে হাত ধুয়ে নিজের ঘরের ভেতরের বারান্দায় দরজার চৌকাঠে হুঁকা হাতে বসে তমিজ ধীরেসুস্থে জবাব দেয় কুলসুমের কথার, 'এখনি? আরে লিজে জমি বর্গা করলে মেলা খাটনি গো! ইটা তো তোমার মানষের জমিত কামলা খাটা লয় যে চুক্তিমতোন দুটা হাল দিলাম আর ধানের বিছন রুয়া দিলাম। বলে আমন ধানের খন্দ, খাটো তো ফসল উঠবি বুনা ধানের দেড়া, না খাটলে ফক্কা', হুঁকায় টান দিতে দিতে সে জানায়, জমি খেদমত চায়, খেদমত না পেলে জমি অসন্তুষ্ট হয়। 'জমি হলো ছিনাল মাগীমানুষের লাকান—।' বলতে বলতে সে মুখ সামলায়, হুরমতুল্লার কথা সে বলতে বসেছে কোথায়?—একটু থেমে হয়তো হুরমতুল্লাকে অনুসরণ করার সাফল্যের খুশিতেই একটি উপমা বেরিয়ে আসে তার নিজের মাথা থেকেই, 'অসন্তুষ্ট জমি হলো কিপটার একশেষ। শালার জগদীশ সাহার চায়াও কিপটা।' কৃপণতায় মানুষের সঙ্গে জমির তুলনা শুনে কুলসুম হেসে গড়িয়ে পড়ে। তমিজের এই উপমা কি তার হাসির কারণ, না-কি তার হাসির অছিলা তা না বোঝে তমিজ, না বোঝে সে নিজে। কুলসুমের হাসিতে তমিজের উৎসাহ বাড়ে। সে ঘোষণা করে, এবার জমির যে সেবাটা সে করছে তাতে ঐ শালা হুরমতুল্লার মুখটা আন্ধার না করে ছাড়বে না। অনেক ধান পাবার

সম্ভাবনায় হতে পারে, হুরমতুল্লার মন্ধকার মুখ দ্যাখার আশায় হতে পারে, আবার কুপির শিখার কালচে হলুদ আঁচেও হতে পারে,—তমিজের কালো মুখে বেগুনি রঙের আভা ফুটতে দেখে কুলসুমের সারাটা শরীর শিরশির করে ওঠে। খুব ঝাপসা এই কাঁপনকে কথায় গড়িয়ে নিতে পারলে কুলসম শুনতো : তমিজের বাপের মুখেও এমনি ছায়া ছায়া আভা কখনো কখনো ফুটে ওঠে। কখন? কখন গো?—সেই দিনক্ষণ খুঁজে বার করতে কুলসুম শোঁ শোঁ করে নিশ্বাস নিতে থাকে, গন্ধ শুঁকে শুঁকে তমিজের এই চেহারায় তার বাপের ঠিক সময়ের আদলটা দেখতে পারবে। কয়েকটি বড়ো বড়ো নিশ্বাসেই পাওয়া গন্ধে কুলসুম সত্যি বুঝতে পারে, তমিজের বাপের মুখে হলুদ-বেগুনি ও কালো রঙের ঝাপটা টের পাওয়া যায় সন্ধ্যার আগে আগে। না, সব দিন নয়, মাঝে মাঝে। কখন? কুলসুম আরো কয়েক বার গন্ধ নেয়। —হ্যাঁ, মানুষটা যে রাতে ঘুমের মধ্যে হেঁটে হেঁটে বাইরে যায়, সেই সব সন্ধ্যায় এই সব গাঢ় রঙের ঝাপটা লেগে মুখটা তার ঝাপসা হয়ে আসে।

তার বেটা তো খালি জমিতেই পড়ে থাকে, রাতেও তার ধানের ভাবনা। রাত্রির খোয়াব কি আর তাকে কখনো কবজা করতে পারে? তবু, তবু সাবধানের মার নাই। ঘুমের মধ্যে তমিজের বাইরে যাবার সম্ভাবনাটিকে বিনাশ করতে তমিজের কালো মুখের এই হলুদ-বেগুনি দাগ এক্ষুনি মুছে ফেলা চাই,—হয়তো এই বিবেচনা থেকেই হুরমতের প্রসঙ্গটাই সে অব্যাহত রাখে, 'হুরমত তোমার কী করবি? বুড়া মানুষ, তাঁই তোমার কী লোকসান করবার পারে?'

'বুড়ার শয়তানির কথা শুনবা? শুনবা?' হুরমতুল্লার আপত্তিকর স্বভাব প্রকাশের উত্তেজনায় হুঁকায় নতুন করে তামাক সাজানো স্থগিত রেখে তমিজ সোজা হয়ে বসে এবং হুরমতুল্লা চাষার রক্তের দাপটে তাকে কীভাবে হেলা করে, কাজ শেখাবার ছলে পদে পদে তার ভুল ধরে, এইসব নালিশ করতে করতে গলা কেবলি ওপরে চড়ায়। 'বুড়া কয়, ও মাঝির বেটা, হামরা হলাম চাষার জাত, হামাগোরে ঘরের বিটিছোলও চাষবাসের কাম যা জানে তোরা জেবনভর নাঙল ঠেললেও তার এক কানিও শিখবার পারবু না।"'—এটা কি কোনো একটা কথা হলো? নিজের ঘরের বেটিদের বেআব্রু করতে তার এতোটুকু বাধে না, চাষার বংশের ফুটানি মারে সে কোন আক্কেলে? আবার এরা নাকি রফাদানি জামাতের মুসলমান? তমিজ ভোররাতে জমিতে পৌঁছলেও হুরমতের বড়ো মেয়েটাকে কাজ করতে দেখে। তাকে দেখে আস্তে করে সরে পড়ে। ঐরকম জোয়ান সোন্দরি মেয়েকে হুরমতুল্লা ঘরের বাইরে আনে, পরপুরুষরা তাদের গতর দেখে, আল্লা সহ্য করবে না এসব!

হুরমতুল্লার সুন্দরী মেয়েদের বেহায়াপনার গল্প তমিজ করে চলেছে, করেই চলেছে, কুলসুম কোনো সায়ই দেয় না। তমিজ হঠাৎ বুঝতে পারে, তার একটু কাছে ঘেঁষে কুলসুম জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। এই নিশ্বাস কথার বিকল্প হয়ে দাঁড়ালে তমিজকে চুপ করতে হয়, কল্কেতে তামাক সাজিয়ে সে হুঁকা টানতে শুরু করে। কিছু হারিয়ে গেলে কুলসুম মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গন্ধ শুঁকে শুঁকে যেমন করে খোঁজে,—তাই নিয়ে তমিজের বাপ তাকে কতোবার তাকে বকাবকি করে এবং তমিজ নিজেও ঠাট্টা করে আসছে কুলসুমের বিয়ের আগে থেকেই,—তেমনি করে এক হাত দূর থেকে তমিজের সর্বাঙ্গ শুঁকেতে শুঁকতে সে খোঁজেটা কী? কুলসুমের সজোর নিশ্বাসের আওয়াজে

তমিজের বুক ধড়ফড় করে : কুলসুমের কী হারিয়ে গেছে? সেই জিনিস কি তার ঝাঁকড়াচুল মাথায় কি কাদা-লেগে-থাকা ঘাড়ের খাঁজে কি হাতের কনুইতে লুকানো রয়েছে যে বাপের বৌটা এমন পাগলের মতো খুঁজতে শুরু করলো? সে কি কুলসুমের কিছু চুরি করেছে?—এই অনিশ্চয়তা ছাপিয়ে সে কী চুরি করলো তাই ঠাহর করার উদ্বেগ মাথা চাড়া দিলে হুঁকার মালাটা সে হাত দিয়ে চেপে ধরে বেশি জোর দিয়ে এবং ঐ মালার ফুটোতে পুরু ঠোঁটজোড়া চেপে ধরে এতোটাই সেঁটে চেপে ধরে যে তার চুমুর টানে ডাবার সব পানি কল্কের তামাকের আগুনের তাপে ধোঁয়া হয়ে তার পেট ও বুকের, এমন কি তলপেটের ফাঁকফোকর সব অন্ধকার করে ফেলে। তার প্রাণপণে হুঁকা টানার গুরগুর ধ্বনি এবং কলসুমের গন্ধ শোঁকার জন্যে নিশ্বাসপ্রশ্বাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ চড়তে থাকে সমান মাত্রায়। এগুলোর মধ্যে সংঘাতের লক্ষণ নাই, আবার সমন্বয়ের সম্ভাবনাও নাই। তমিজ তাই কিছুক্ষণের মধ্যে নিস্তেজ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসেই থাকে। অকেজো হাতিয়ারের মতো হুঁকাটাকে সে রেখে দেয় দরজার পাশে বেড়ার সঙ্গে ঠেস দিয়ে। হুঁকাটা কাৎ হয়ে থাকে এবং সেটার গড়িয়ে পড়ার ভয় একটু থাকলেও তমিজ সেদিকে ফিরেও তাকায় না। সে দরজার ভেতরদিকে আরেকটু সরে বসে এবং মোটামুটি নিরাপদ দূরত্ব তৈরি হলে কয়েকবার কাশে, উঠানের দিকে থুথু ফেলে এবং একটা ঢেকুরও তোলে। ঢেকুরের সংক্ষিপ্ত ধাক্কায় জিভে তামাকের গন্ধ-মাখা একটু-আগে-গেলা ভাত, খেসারির ডাল, বেশি মরিচ দিয়ে রাঁধা খলসে মাছ-বেগুনের চচ্চড়ির স্বাদ একটুখানি পেয়েই তমিজের গায়ে বল আসে। নিজের ঘরে যাবার জন্যে সে উঠে দাঁড়ালে কুলসুম দুই কদম পিছে গিয়ে চড়া গলায় বলে, 'চাষার ঘরের বিটিছোল খন্দের তয়তদবির তোমার চায়া ভালোই করবি। হুরমতুল্লা পরামাণিক কথাটা অলেয্য কয় নাই। তোমার বাপও তো কাল ইংকা কথাই কচ্ছিলো। কয়, মাঝির বংশের বেটা জমির মদ্যে নাঙল ঢুকালে জালের সাথে নাঙলের আগামা জড়ায়া যায়। ওটি ফসল কুনোদিন ভালো হবি না। জালখানাও মাটির তলা থ্যাক্যা আর ওপরে ওঠে না। মাঝির বেটার তখন মাছ ধরারও শ্যাষ।'

কুলসুমের প্রবল বেগে গন্ধ-শোঁকা ফেটে পড়লো এইসব কথার তোড়ে। তার সজোর নিশ্বাসপ্রশ্বাস থেকে অব্যাহতি পেয়ে তমিজ ফের চাঙা হয়ে ওঠে এবং সমান তেজে চ্যাচায়, 'তুমি কী বোঝো? ফকিরের ঘরের বিটি, মানষের ঘরত ঘরত ভিখ মাঙিছো, মানুষের গোয়ার পিছে ঘুর্যা ভাত চায়া খাছো, জমিজমার তুমি বোঝো কী? যাও যাও। তোমাক আর প্যাচাল পাড়া লাগবি না। উঠ্যা বাজানেক ভাত দেও। বুড়া মানুষ, তার খিদা নাগে না? তোমার লজর খালি লিজের প্যাটের দিকে। ফকিরের বেটির ওংকা চোপা ভালো লয়।'

এইসব কথা যেন অন্য কোনো মানুষের হাতের চড় থাপ্পড় হয়ে তমিজকেই ঘা মারতে থাকে একটা একটা করে। যতোই ঘা খায়, তমিজের কথা ততোই বাড়ে। সেই রাত থাকতে বিল পেরিয়ে হুরমতুল্লার গোয়াল থেকে গোরু নেওয়ার সময় থেকেই তমিজের ঘোর লাগার শুরু, সারাটা দিন জমিতে লাঙল চষতে চষতে তা আরো পুরুষ্টু হয়েছে। কুলসুমের গন্ধ শোঁকার ধাক্কায় ধাক্কায় তা চাপা পড়েছিল, এখন নিজের এই চড়া চড়া কথায় সেই ঘোর একেবারে কেটে গেলে তমিজের শরীর ভেঙে পড়ে অবসাদে। তার ঘুম পায়, খুব ঘুম পায়। ঘুমঘুম চোখে মাচার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে

শোনে, পাশের ঘর থেকে বাবার ঘর্ঘরে গলার ভাঙাচোরা কথা, 'শমশেরের ভিটার পুব ধারে ধানের বীজতলা করিছে। কাল বেনবেলা শমশেরের কাছে যাস। হামার সাথে অর কথা হছে। অর ধানের পুলের বরকত বেশি। শমসের লিজে হামাক কলো। পয়সাও কেমই লিবি না।'

তমিজের বাপের ঘুম-ভাঙা গলার এইসব ছোটো ছোটো বাক্য মনোযোগ দিয়ে না শুনলে এগুলোর মধ্যে সম্পর্ক ঠিক করা মুশকিল। তমিজের ঘুমে-ভারি মাথাতেও শমশেরের ভিটার বীজতলা কচি কলাপাতা রঙে ঢেউ খেলাতে লাগলো। এতে তার ঘুম নামে আরো ঝেঁপে।

কুলসুম এদিকে নিজের ঘরের দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত ঠেকিয়ে চিৎকার করে তমিজের কথার জবাব দেয়, 'হামি না হয় ফকিরের বেটি। তোমার বাপের জমিদারি আছে তো, হামি তাই জমি আর খন্দের বিত্তান্ত সবই শিখ্যা লেমো, না? তোমার মাও তো তামান দিন বলে মণ্ডলবাড়িতই পড়্যা থাকিচ্ছিলো। জোতদারের বাড়িত গতর খাটায়া তাঁই জমিজমার ব্যামাক কথা শিখ্যা লিছিলো, না? ঐ বাড়িত কাম কর্যা তাঁই খুব সুখে আছিলো, না? ওংকা সুখ হামি চাই না। ওংকা সুখের পাছাত হামি নাথি মারি।'

তমিজের বাপ কিন্তু এর মধ্যেও শমশেরের বীজতলার কথা বলেই চলছিলো। ঘুমভাঙা ঘর্ঘর-করা পুরুষ কণ্ঠের সঙ্গে চড়া মাত্রার মেয়েলি গলা মিলে এমন আওয়াজ তৈরি হয় এবং কলাপাতা রঙের ঢেউতে তা এমনভাবে ঢেউ খেলায় যে তমিজের ঢুলুঢুলু চোখের ভেতরে ঢুকে পড়ে তাই তাকে গড়িয়ে দেয় আরো গভীর ঘুমের পরতে।

৯

কুলসুমের গলার তেজে বরং ঘুমের রেশটুকু কেটে যায় তমিজের বাপের। ঘুমিয়ে আর দিনমান শুয়ে ক্লান্ত শরীরে বৌকে ধমক দেওয়ার বলও সে পায় না। মেঝেতে বসে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকালে তারার টিমটিমে আলোয় জবুথবু বাইরের উঠানটা একটু করে বাড়ে, কিন্তু তার নিজের জবুথবু ভাব আর কাটে না। সামনের ডোবাটাও মাথা গুঁজে দিয়েছে এই উঠানের ভেতর। ডোবায় কি ডাঙা জেগে উঠলো? তমিজ কি ডোবা-ফুঁড়ে-ওঠা এই ডাঙাতেও একদিন লাঙল দেওয়ার নিয়ত করে নাকি? তখন তো এটা চলে যাবে মণ্ডলের দখলে। তমিজ কি তখনো মণ্ডলের বর্গাচাষী হয়েই জীবন কাটাবে? ওদিকে কাৎলাহার বিলে এই যে রোজ রোজ জমি জেগে উঠছে, বিল হয়তো একদিন এই ডোবার মতোই আরেকটি ছোট্টো ডোবার মধ্যে গুটিসুটি হয়ে ধুঁকতে থাকবে।—তমিজের বাপ জানে, এসব আসলে শালা মণ্ডলের কারসাজি। মণ্ডল মনে হয় উত্তর সিথানের পাকুড়গাছ দখলের তালে আছে।—তমিজের বাপের চোখ হঠাৎ করে খচখচ করে, সেখানে কি পড়লো বোঝা যায় না। খচখচ-করা চোখের বন্ধ দুই মণির মাঝখানে ঠাঁই নেয় কাৎলাহার বিল। ভাদ্রের ভরা বিলে মাঝে মাঝে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে,

তাতে তার মাথার ভেতরটা চুলকায়। হতে পারে চোখ সাফ করে চোখের কাঁটা তার পৌঁছে গেছে মাথার ভেতরে। সেখানে টনটন করে : ভাদ্রের মেঘের উল্টা টানে কাৎলাহারের সব পানি বুঝি মেঘ হয়ে হয়ে ওপরে উড়ে যাচ্ছে। উড়তে উড়তে, রাতভর উড়তে উড়তে বেলা উঠবে, সূর্যের তাপে মেঘ আগুন হয়ে জ্বলে ঝলতে ঝলতে শুষে নেবে বিলের শেষ জলবিন্দুটি। তারপর আসমান থেকে আগুনের গোলাগুলো দেখবে যে, পানিহারা বিলে শরাফত মণ্ডলের বর্গাচাষীরা হাল বাইছে।—মণ্ডল যদি পাকুড়গাছ পর্যন্ত লাঙল চালায় তো কী হবে? সবটাই মণ্ডলের দখলে গেলে মুনসির পোষা গজার মাছগুলো হয়তো নতুন-ওঠা মাটির তলায় কেঁচো হয়ে কিলবিল করবে। না-কি সেগুলোকে ভেড়ার আকার দিতে না পেরে মুনসি তাদের লোহার আংটা করে গড়িয়ে নিয়ে গেঁথে রাখবে নিজের গলার শেকলে? অতো সোজা লয়!—চেরাগ আলি বলে গেছে, চেরাগ আলির রুহে ভর করে মুনসিই জানিয়ে গেছে, গজারগুলোকে কেউ উৎপাত করলে এই দুনিয়ার ভাত তার চিরকালের জন্যে উঠে যাবে। গজার মাছের ওপর জুলুম করা অতো সোজা নয়।—তমিজের বাপের সারা শরীরে রক্ত চলাচলের গতি বাড়ে, এই চলাচলের আওয়াজ সে শোনে এইভাবে:

মুনসির হুকুম দরিয়াতে গরজিলে।
কোম্পানি সিপাহি চোক্ষে দ্যাখে আজরাইলে—

কিন্তু ফকির নাই, মুনসির হুকুম আসবে কার মুখ দিয়ে? কতোদূরে কোন কোন গাঁও, কতো চর, কতো কায়েমি চর, কতো নতুন জেগে-ওঠা বিরান চর পেরিয়ে যমুনার সাত স্রোতের টানে টানে, ঊনপঞ্চাশ ঢেউয়ের তালে তালে চেরাগ আলির গান উছলে পড়ে বাঙালি নদীর পানিতে, সেখানে কয়েকটা ডুব দিয়ে উঠে মানুষের জোতজমি, জোতদারদের সাথে লাঠালাঠি করা বর্গাচাষাদের রক্তে পিছলা জমির আল পেরোতে পেরোতে মুনসির গান কমজোর হয়ে গড়িয়ে পড়ে কাৎলাহার বিলে। বিলের পানিতে হাবুডুবু খেয়ে উঠে এই গিরিরডাঙায় আসতে আসতে গান ঝাপসা হয়ে পড়ে। বৃষ্টিভেজা তারার আলোয় তমিজের বাপের বাড়ির খুলিতে তার ছায়া পড়ে। এই ছায়া ছায়া আলোয় ঐ গান এসেছে কার গলায় সওয়ারি হয়ে? ভালো করে খেয়াল করলে ছায়াটিকে পাকুড়তলার সাদা ঘোড়া বলে ঠাহর করা যায়। সারা অঙ্গে তার দুষমনের তীর বেঁধা, সওয়ারি নেওয়ার জন্যে অস্থির সাদা ঘোড়ার গায়ের তীরের ডগাগুলো তিরতির করে কাঁপে। অতো অতো তীরের মধ্যে মুনসি বসবে কোথায় তা ভালো করে বুঝতে না বুঝতে ঘোড়া ছুটতে শুরু করে। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ বাজিয়ে তোলে চেরাগ আলি ফকিরের গান :

চান্দ কোলে জাগে গগন পাশে বিবি নিন্দে মগন
খোয়াবে কান্দিলো বেটা না রাখে হদিস।
(ফকির) না রাখে হদিস।
(হায়রে) সিথানে পড়িয়া থাকে কার্পাসের বালিস।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ঘোড়া করিলো কুর্নিশ।
(ফকির) ঘোড়ায় চড়ি বাহিরিলো নাহিকো উদ্দিশ॥

এখানে কে গান করে গো? ফকির চেরাগ আলি কি ফিরে এলো নাকি? **বাইরের**

দিকে তাকিয়ে দেখলে তমিজের বাপ হয়তো বুঝতে পারতো, কিন্তু হাঁটু ভেঙে বসে দাড়িওয়ালা মুখটা হাঁটুর ওপর রেখে চোখ বন্ধ করে কান বন্ধ করে সে এক মনে গান শোনে :

চান্দ জাগে বাঁশঝাড়ে একটা একটা ডিম পাড়ে
ভাঙা ডিমে হলুদবরণ হইলো সকল ঠাঁই।
উঁকি দিয়া চায়া দেখি ফকির ঘরত নাই॥

না গো, এ তো চেরাগ আলির গলা নয়। তার গলার স্বর তমিজের বাপের মতো এতো ভালো করে চেনে আর কে? গিরিরডাঙায় আসার পর চেরাগ আলির গান প্রায় সব সময় শুনতো সেই মানুষটা কে?—তমিজের বাপ ছাড়া আবার কে? আর থাকতো চেরাগ আলির নাতনি কুলসুম। তা কুলসুমের বয়স তখন কম। দাদার গান শুনে সে নিজেও গাইতো, কিন্তু এইসব গানের কথা বোঝার বয়স কি তখন তার হয়েছে? এখনি কি গানের ভেতরের কথা কিছু ধরতে পারে নাকি? কালাম মাঝির বাঁশঝাড়ের ছাপরা ঘরের ভেতর বসে গুনগুন করতে করতে মাটিতে দাগ কেটে কেটে লোকটা কতো মানুষের খোয়াবের তাবির বলতো তার আর লেখাজোকা নাই। খোয়াবের মানে খোঁজার ফাঁকে ফাঁকে কিংবা খোঁজার জন্যেই ফকির একটার পর একটা শোলোক গাইতো। আবার গোলাবাড়ি হাটে দোতারা বাজিয়ে গান গেয়ে গেয়ে সে মানুষ জমাতো, মানুষজন জমা হলে শুরু হয়েছে তার স্বপ্নের বয়ান। তার রঙবেরঙের কাপড়ের তালি দেওয়া ঝোলা থেকে বার হতো ছেঁড়াখোঁড়া বই, সেই বইয়ের লেখা কি ফকির পড়তো, না-কি তার পাতায় পাতায় আঁকা চৌকো চৌকো সব রেখাগুলো গুনতো তা অবশ্য তমিজের বাপ জানে না। তবে ঐ দাগগুলো সে আঁকতো ঘরের জমিনে। দাগ কেটে কেটে সে মানুষের স্বপ্ন বুঝে ফেলতো। কতো মানুষের কতো কিসিমের খোয়াব!—খোয়াবে কেউ একটা গোরু দেখলো, গোরুটা মোটাতাজা হলে তার মানে এক রকম, আবার রোগা হলে মানে অন্য রকম। গোরু জবাই হতে দেখলে তাবির পাল্টে যাবে। স্বপ্নে কাউকে কুকুর তাড়া করেছিলো শুনে চেরাগ আলি হাসতো, লোকটার শত্রু জব্দ হবে। আবার শুধু কুকুর দেখা মানে কঠিন বিপদের আলামত। বাঙালি নদীর ওপারে কোনো এক গাঁয়ের এক জয়িফ বুড়া এক দিনের রাস্তা হেঁটে এসে উপুড় হয়ে পড়েছিলো চেরাগ আলির পায়ে। কী ব্যাপার?—না, সে নিজের বেটার বৌয়ের সঙ্গে জেনা করার স্বপ্ন দ্যাখে সপ্তাহে অন্তত একবার। হাজার তওবা করেও কুলকিনারা করতে না পেরে চেরাগ আলির কাছে ধন্না দেয়। তারপর ধরো কালাম মাঝির নামাজের জামাতে ইমামতি করার স্বপ্ন খুব জোরেসোরে রাষ্ট্র করা হয়েছিলো। কিন্তু কালামের অন্য অনেক খোয়াবের বৃত্তান্ত জানে এক কালাম আর চেরাগ আলি। শরাফত মণ্ডলও গোলাবাড়ি হাটে একদিন চেরাগ আলিকে আড়ালে ডেকে খুব গোপনে তার এক স্বপ্নের কথা বলেছিলো। তবে ফকির কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই স্বপ্ন কারো কাছে ফাঁস করে দেয়নি। বৈকুণ্ঠ তো প্রায় নিত্যি নতুন নতুন স্বপ্নের কথা শোনাতো। নিজের স্বপ্নের কথা শুধু বলেনি তমিজের বাপ। তবে তার আর দোষ কী?—আবোর মানুষ, রাতভর ঘুমের ভেতর যা দেখে আকাশ ফর্সা হলে তার কিছুই মনে থাকে না। গোলাবাড়ি হাটে বৈকুণ্ঠ ছোঁড়াটা প্রায়ই বলতো, 'তমিজের বাপ, তুমি কথা কও না কিসক? তুমি কী দেখিছো, কও তো!' এমনিতে কথা বলতে গেলে তমিজের বাপের সব তালগোল পাকায়, স্বপ্নের কথা সে বলে কী করে? এই বৈকুণ্ঠই

ফকিরের ঘরে একদিন চেপে ধরলো, 'তোমার আজ কওয়াই লাগবি তমিজের বাপ। তুমি বলে দরজার হুড়কা খুল্যা কোটে কোটে যাও? তোমাক ডাক দেয় কেটা, কও তো? কী স্বপন দেখ্যা তুমি বারাও? আজ তোমাক কওয়াই লাগবি।'

তখন মাটিতে চৌকো চৌকো দাগ কেটে চেরাগ আলি খুঁজছিলো বৈকুণ্ঠের স্বপ্নের মানে, গুনগুন করে শোলোক বলা স্থগিত রেখে একেকবার বৈকুণ্ঠকে সে কী জিগ্যেস করে আর তাকে জবাব দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে বৈকুণ্ঠ খালি খোঁচায়, 'ক্যা গো, তমিজের বাপ, কল্যা না?'

ভোঁতা চোখে তমিজের বাপ এদিক ওদিক দ্যাখে। অনেকক্ষণ স্থির তাকিয়ে থাকে ঘরের বাইরে। বাঁশঝাড়ের ওপারে বেগুনখেতের বেড়া ডিঙাবার চেষ্টা করে না পেরে মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালাম মাঝির মাদি ছাগলটা। তমিজের বাপ ওর চোখে কী দ্যাখে? দেখতে দেখতে তার চোখ বুঁজে বুঁজে আসে। আগের রাতে দ্যাখা স্বপ্নটা মনে করতে সে কি কয়েক পলক ঘুমিয়ে নেবে নাকি? বৈকুণ্ঠের তাগাদায় শেষ পর্যন্ত তাকে মুখ খুলতেই হয়, 'কাল।' বলে সে চুপ করে। কিছুক্ষণ পর স্বপ্নের ভেতর কথা বলার মতো বিড়বিড় করে, 'না, গো কাল লয়। উদিনকা!' কিন্তু ঠিক কোন দিন সেটা উল্লেখ না করেই সে ফের বলে, 'বেনবেলা পান্তা খানু মরিচপোড়া দিয়া, না আঁইটা কলাও বুঝি আছিলো। না, কলা খাছি তার আগের দিন।' কলা খাবার দিনটাও ঠিক মনে করার জন্যে সে ফের চুপ করে। কুলকিনারা না পেয়ে বৈকুণ্ঠের দিকে বোবা চোখে তাকালে বৈকুণ্ঠ হেসে ফেলে, 'কী হলো কও।' তমিজের বাপ চমকে উঠে গড়গড় করে বলে, 'উদিনকা বেনবেলা খাপি জালখান লিয়া বিলত গেনু। কয়টা ট্যাংরা পাওয়া গেলো, সাথে দুটা ছাতান আর একটা বেল্যা আছিলো।' তমিজের বাপ থামলে তার এই সংক্ষিপ্ত স্বপ্নবয়ানে বৈকুণ্ঠ হতাশ হয়, 'দুর, ইটা তোমার স্বপন হবি কিসক? তুমি তো লিত্যি কাৎলাহার বিলত যাচ্ছো। বিলত মাছ ধরো না তুমি?'

শরাফত মণ্ডল তখনো বিল ইজারা নেয়নি। সুতরাং তমিজের বাপের এটা স্বপ্ন হতে যাবে কেন?

তা হলে ঐদিন রাতে সে দেখলো কী?—মাথা নিচু করে তমিজের বাপ মেঝেতে বসেই থাকে, তার তখন-পর্যন্ত-কালো দাড়ি আরো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। স্বপ্নের কথা ভাবতে ভাবতে তার ঘুম পায়, ঘুম ঘুম চোখে তার স্বপ্নের লেশমাত্র নাই। তার কানে ঝাপসা হয়ে বাজে, চেরাগ আলির শোলোকের সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে বৈকুণ্ঠ গিরি। বৈকুণ্ঠের মুখ ভরা মুড়ি, গানের তোড়ে তার সামনে মুড়ির গুড়ার কুয়াশা। চেরাগ আলির ঘরে আসার সময় কোঁচড় ভরে সে মুড়ি দিয়ে এসেছে। তার মুড়ি খাচ্ছে সবাই,—চেরাগ আলি, কুলসুম, এমন কি তমিজের বাপও। মুড়ি খেতে খেতে আর কথা বলতে বলতে গলা কাঠ হয়ে এলে বৈকুণ্ঠ কুলসুমকে ডাকে, 'এ কুলসুম, তোর হাতের আমটা দে।'

খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে খাল পেরিয়ে গিয়ে বুলু মাঝির বাড়ির পালান থেকে আমটা কুড়িয়ে এনেছে কুলসুম। বৈকুণ্ঠের আবদেরে হুকুমে মুখটা কালো করে সে তার হাতে আম তুলে দেয়। আমের নিচের দিকটা দাঁতে কেটে বৈকুণ্ঠ চুষে চুষে খায় আর বলে, 'টক আম রে। টকের টক।'

কুলসুম মুখ ঝামটা দেয়, 'হামি তোমাক সাধিছিনু? টক আম তোমাক খাবার কছে কেটা?'

'তিয়াস লাগিছে রে ছুঁড়ি। এতোগুলা মুড়ি খালাম, জলতেষ্টা হবি না?'

মুশকিল কি, চেরাগ আলির ঘরে বৈকুণ্ঠ জল খেতে পারে না। তার জাত তো আলাদা, পিপাসা পেলেও জাত বাঁচাতে তাকে জলতেষ্টা মেটাতে হয় আম খেয়ে। এদের ঘরে বৈকুণ্ঠ বসতে পারে, মুড়ি খেতে পারে,—গুড় দিয়ে তো পারেই, এমন কি নুনতেল দিয়ে মাখালেও দোষ নাই। কিন্তু পারে না কেবল জল স্পর্শ করতে। জাতের দোষ হয়ে যাবে। কুলসুম আর একবার মুখ ঝামটা দিলে বৈকুণ্ঠ বলে, 'ভগবান জাত সিষ্টি করিছে, আমরা সিটা লষ্ট করবার পারি?'

'তোমার ভগবান মানষের ঘরত আম খাবার হুকুম দিছে, না? ভগবানের লালচ বেশি, পানি খাবার দিবি না, আমেত আপত্তি নাই।'

'উগলান কথা কওয়া হয় না, কওয়া হয় না। তোর আল্লা যা, হামার ভগবানও তাই। ফারাক খালি নামের। লয় গো ফকিরের বেটা?'

আল্লা ও ভগবানের অভিন্ন সত্তা সম্বন্ধে বৈকুণ্ঠের এই সিদ্ধান্তকে ঘাড় নেড়ে অনুমোদন জানাতে জানাতে চেরাগ আলি মেঝেতে আরো কয়েকটি দাগ কাটে এবং নতুন দাগের দিকে কয়েক মিনিট চুপ করে তাকিয়ে থেকে বৈকুণ্ঠকে জিগ্যেস করে, 'তুই খৈ খাওয়ার স্বপন দেখলু বেনবেলা? বেলা ওঠার আগে?'

'হুঁ। তোমাক আর কী কই, বাবু বাড়ির দিকে ঘাটা ধরিছে আত তখন লওটা বাজে। না-কি দশটাই হবি? না গো, এগারোটার কম লয়।' দোকান থেকে তার মনিবের বাড়ি যাবার সময় নির্ণয় করতেই সে অনেকটা সময় নেয়। তারপর তার খলসে মাছ দিয়ে এবং পরে তালের রস আর দুধ দিয়ে ভাত খাবার বিবরণ চলে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর হরির নাম দিয়ে শোয়া এবং নিঝুম হাটে মুকুন্দ সাহার দোকানে তার দুই চোখের পাতা কিছুতেই এক করতে না পারার কষ্ট সম্বন্ধে বলতেও তার উৎসাহের কোনো সীমা নাই। এসব খান্ত করে তারপর আসে তার স্বপ্নের প্রসঙ্গ। সকালে মুড়ি খেতে খেতে গত রাতে দেখা স্বপ্নের যে বিবরণ সে দিয়েছিলো এখন তার সঙ্গে যোগ করে মেলা খুচরা ঘটনা। এতে চেরাগ আলির কোনো বিকার নাই, বৈকুণ্ঠের নতুন নতুন সংযোজন শোনে আর মাটিতে তার দাগের সংখ্যা বাড়ে। এর মধ্যে বৈকুণ্ঠ জানায়, স্বপ্নে বৈকুণ্ঠ খৈ খেয়েছিলো মশারির ভেতরে বসে। চেরাগ আলি জানতে চায়, 'মনে কর্যা কোস। মশারির মদ্যে খৈ খালে একরকম, ধারেত বস্যা খাস তো তার মাজেজা আলাদা। খোয়াব ঠিক মতোম কবার না পারলে ফল খারাপ কলাম। যা দেখিছু ঠিক ঠিক বুঝ্যা শুন্যা কবু।'

চেরাগ আলির এরকম প্রশ্ন, মন্তব্য, হুঁশিয়ারি ও ধমকে উৎসাহিত হয়ে বৈকুণ্ঠ একটিমাত্র রাত্রের স্বপ্নের যে দীর্ঘ ও জটিল বিবরণ দেয় তাতে তমিজের বাপ একেবারে মুগ্ধ। কিন্তু চোখের কোণে ও ঠোঁটের বিচিত্র বাঁকাচোরায় চেরাগ আলি ওর স্বপ্নের যে মাজেজা শোনায় তাতে সবাই বোঝে, খৈ খাবার স্বপ্নে বৈকুণ্ঠের ধনদৌলত রোজগারের যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিলো, একই স্বপ্নে মশারির ভেতর ঢুকে বৈকুণ্ঠ তার বিনাশ তো ঘটিয়েছেই, এমন কি বেশ সংকটেই পড়েছে। সর্বনাশের ইংগিত পেয়ে বৈকুণ্ঠ জোরে শব্দ করে টক আমের রস একেবারে শেষ বিন্দুটুকু চুষে খায়। তার নির্বিকার চেহারায় চেরাগ আলির লম্বা দাড়িওয়ালা মুখে মেঘ নামে। মশারির স্বপ্ন আসলে কবরের ইশারা,—কথাটা বলতে বাধো বাধো ঠেকছিলো চেরাগ আলির। এটা সে সরাসরি জানায় কেবল তমিজের বাপকে, তাও তিন দিন পর গোলাবাড়ি হাটে। ওখানেই

বৈকুণ্ঠকে ডেকে ফকির শুধু বললো, 'বৈকুণ্ঠ তোর খোয়াবের মাজেজা ভালো লয় রে! পাঁচ আনা পয়সা মুনসির নামে মানত দেওয়া লাগবি।' শুনে বৈকুণ্ঠ হাসলে ফকির ধমক দেয়, 'হাসিস কিসক রে ছোঁড়া? পয়সা কয়টা দে। বড়ো ফাঁড়া আছে রে তোর!'

পাঁচ আনা পয়সা কম নয়। বৈকুণ্ঠ বলে, 'পয়সা পাই কুটি? কলকাতাত বোমা পড়িচ্ছে, সেই খবর রাখো? হামার বাবুর বলে ব্যবসা বাণিজ্য লাটে উঠিচ্ছে, তার চোখোত নাই ঘুম। এখন হামাক পয়সা দিবি?'

কলকাতায় বোমা পড়ার খবর এবং জাপানিদের অবধারিত বিজয়ের সম্ভাবনায় হাট জুড়ে সেদিন মহা উত্তেজনা, চেরাগ আলির রোজগারপাতি একেবারেই কম। বৈকুণ্ঠের কাছ থেকে একটা সিকি পেলেও সের খানেক চাল, বেগুন আর তেল নুন কেনা যায়। দরগায় গিয়ে মানত পরে দিলেও চলবে। চেরাগ আলি বলে, 'ছোঁড়া তুই হাসিস? মশারির স্বপন দেখা এখনো তুই হাসিস?' দোতারায় টুংটাং তুলতে তুলতে সে খোয়াবে মশারি দেখার শোলোক গায়,

> খোয়াবে দেখিল মুসা শয্যাতে মশারি।
> শুনিয়া মজনু কান্দে আছাড়ি পিছাড়ি॥
> হায় হায় নাহি মোর পুত্রের হায়াৎ।
> কেমনে সহিব পুত্রবিয়োগ আঘাত॥
> আজরাইলে তিন রোজ তিন রাত দিবে।
> তওবা কর‍্যা আসো বেটা দরগাশরিফে॥

এতোকাল পর ঘরের মেঝেতে বসে বাইরে তারার আলো-ফেলা আবছা আলোর দিকে দেখতে দেখতে তমিজের মাথামোটা মাথার ভেতরে একটানা ঢেউ ওঠে। ঢেউ ওঠে, ঢেউ পড়ে এবং অবিরাম এমনি হতে থাকলে তার চোখ জড়িয়ে আসে ঘুমে। মেঝেতে সানকিতে বেড়ে-রাখা ভাত ও খেসারির ডালের টান এড়িয়ে সে সটান শুয়ে পড়ে মাচার ওপরে, কুলসুমের গা ঘেঁষে শুতে না শুতে ঘুম নামলো তমিজের বাপের দুই চোখ ঝেঁপে।

তমিজের বাপের ঘুমের মধ্যে চেরাগ আলির গান কিছুমাত্র মিইয়ে যায় না, বরং ফুটতে থাকে আরো কলকল করে। ঐ শোলোক গাওয়া হয়েছিলো বৈকুণ্ঠকে লক্ষ করেই। দ্বিতীয়বার যখন গাওয়া হয় তখন বৈকুণ্ঠও গলা মেলালো তমিজের বাপের সঙ্গে। তার মনিবের ব্যবসার সম্ভাব্য লোকসান কিংবা জাপানিদের বোমা পড়ার ভয় ভুলে সে বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলো আসন পেতে। তিন দিন আগে দেখা নিজের স্বপ্ন সে ভুলে গেছে কিংবা ঐ স্বপ্ন চলে গেছে তার নতুন কোনো স্বপ্নের আড়ালে। তমিজের বাপকে নতুন শোলোকটা বারবার গাইতে বললে তমিজের বাপ হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে যায়, বেশ জোর দিয়ে বলে, 'বৈকুণ্ঠ, পয়সা কয়টা দিয়া দে। স্বপন তোর ভালো লয় রে।'

সে কথায় কান না দিয়ে বৈকুণ্ঠ জিগ্যেস করে ফকিরকে, 'গানটা লতুন শুনলাম। লতুন বান্দিছো? আগে তো শুনি নাই।'

'গান তো হামি বান্দি না বাবা, কতোবার না তোক কছি। ইগলান হামাগোরে মাদারির গান। ইগলান পাওনা গান। হামরা পাই নাই, হামরা কি আর পাওয়ার মানুষ? ইগলান পাছে আগিলা জামানার মুরুব্বিরা।' চেরাগ আলির কথার মাঝখানে বৈকুণ্ঠের দিকে তাকিয়ে প্যানপ্যান করে কুলসুম, 'পয়সাটা দ্যাও না? তোমার জানের মায়া নাই?

চার আনাই তো পয়সা। দ্যাও না কিসক?'

'পয়সা দিলে তোক দিমু। উদিনকা তুই যা টক আম খিলালু, তার দাম শোধ করা লাগবি না? সুদে আসলে ধরলে তোক আধুলি একটা পুরাই দেওয়া লাগে রে।'

বৈকুণ্ঠের এইসব ইয়ার্কি মারা কথায় কুলসুমের রাগ হয় না, তার ভয় করে। —মানুষটার কি জানের ভয়ডর কিছু নাই? কাছেই বসে সেদিন কুলসুমের চোখের সেই ভয় দেখছিলো তমিজের বাপ। সে কি আজকের কথা গো? অথচ দেখো, শালা গিরির বেটার জন্যে কুলসুমের সেই সেদিনকার উদ্বেগ এতোকাল পর তমিজের বাপের মাথায় কুটকুট করে কামড়ায়। এই পোকাটিকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতেই সে কাত হয়ে শোয়, তার মাথা লাগে কুলসুমের বুকে। ঐ বুকে বৈকুণ্ঠের মশারির স্বপ্ন দেখায় তার জন্যে কতোকাল আগেকার উদ্বেগের ছিটেফোটা রেশ আছে কি-না, থাকলেও তমিজের বাপের কানে সেটা লাগে কি-না বোঝা মুশকিল। তবে তমিজের বাপের মাথায় ও ঘাড়ে, পাতলা চুলে ও ঘন দাড়িতে কাদার গন্ধে কুলসুমের স্তনজোড়া কেবলি ফুলতে থাকে। কিন্তু তমিজের বাপের মাথায় চেরাগ আলির শোলোক বাজে শিরশির করে, শোলোকের সঙ্গে বৈকুণ্ঠ গিরি গলা মেলাচ্ছে বলেই হয়তো তার মাথার ভেতরটা ভারি হয়ে গড়িয়ে পড়ে কুলসুমের বুক থেকে। সেখানে খট খট করে বাজে শরাফত মণ্ডলের কাঠের খড়মের আওয়াজ। এই আওয়াজে মুনসির মস্ত কালো জাল কি গুটিয়ে পড়ছে নাকি? মুনসি কি কিছুই খেয়াল করে না? পাকুড়গাছে বসে মুনসি এখন করেটা কী?—একবার দেখা দরকার। মুনসিকে এক নজর দেখতে বিলের দিকে যাবার জন্যে তমিজের বাপ মাচা থেকে নামে টলতে টলতে।

১০

ভাদ্র গেলো, আশ্বিন গেলো, কার্তিক আর যায় না। আমনের বাড় এবার ভালোই; কিন্তু মাটি একটু শুকনা, ধানের গোড়ার নিচে নিচে মাটিতে চিকন চিকন রেখা। আশ্বিনের শুরুতে এই উঁচু জমিতে একটু পানি ছিলো। পানি নেমে যাবার আগে এক রাতে হুরমতুল্লা চুরি করে তমিজের আল কেটে পানি টেনে নিয়েছে নিজের জমিতে। বুড়ার জমির মাটি এখনো কেমন কালো কুচকুচে, আলে দাঁড়ালে সোঁদা গন্ধে তমিজের বুকটা ভরেও যায়, একটু জ্বলেও ওঠে। বুড়া তার জমিতে এখন মরিচের আবাদ করে।

এদিকে তমিজের জমিতে চিড় ধরার আভাস; পানির পিপাসায় জমির ঠোঁট একটু একটু ফাঁক হচ্ছে, ফাঁকটুকু হাঁ হতে আর কতোক্ষণ?—হাঁ হলেই ধানের চারাগুলো আস্তে আস্তে হেলে পড়বে। তখন?—তখন?—নিড়ানি দিতে গেলেই তমিজের বড়ো পিপাসা পায়। হুরমতের কাছে বদনা ভরা পানি, তার কাছে পানি চাইলেই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তমিজ ঠিকই বোঝে, মাঝির বেটাকে নিজের বদনা থেকে পানি খেতে দিতে বুড়ার বাধো বাধো ঠেকে। পানি খেতে তমিজকে তাই যেতে হয় মোষের দিঘির ধারে। কিন্তু এখন জমির পিপাসায় তমিজের গলা কাঠকাঠ, দিঘির অতো উঁচু পাড়ে ওঠানামা

করার ধৈর্য তার নাই। দিঘির পুব ধার দিয়ে হেঁটে চয়ে যায় হুরমতের ঘরের দিকে। 'ক্যা গো, বাড়িত কেউ আছো? পানি খিলাবার পারো?' তমিজ হাঁক দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে কাঁসার বদনা হাতে এসে দাঁড়ায় হুরমতের ছোটো মেয়ে। কিন্তু তমিজ ভাবছিলো বড়ো মেয়েটি আসবে। খুব ভোরে এসে তমিজ রোজ তাকে চুপচাপ জমি থেকে চলে যেতে দেখেছে, তার পেছনটা তমিজের একরকম চেনাই। তা মেয়েটির মুখ দেখার তাগিদ হয়তো তমিজের ছিলো। আবার আশ্বিন মাসে ওর জমি থেকে আল কেটে পানি নেওয়ার সময় বাপের পাশে দাঁড়িয়ে সেও কোদাল ধরেছিলো; এই সুযোগে তাকে বেশ দুটো কথা শুনিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু ছোটো বোনকে দেখে তমিজের এসব আর মনে পড়ে না। তার পানির পিপাসাও তখন হঠাৎ প্রকট হয়, বদনার নল উঁচু করে ধরে সে পানি খায় ঢক ঢক করে।

তমিজের পেছনে শুকনা কলাপাতা ঝোলানো পর্দা, পর্দার ওপার থেকে কচি কলাপাতায় এক টুকরা গুড় এগিয়ে দিলো একটা কালো হাত। কচি কলাপাতা তমিজ হাতে তুলে নিলো এবং অন্যের জমির আল কেটে পানি-চুরি-করা মন্দা কিসিমের মাগীর পর্দার বাহারকে মনে মনে গাল দিয়ে গোগ্রাসে গিলে ফেললো গুড়ের টুকরা। গুড় মুখে বদনার বাকি পানিটুকু গিলতে তার বড়ো ভালো লাগে, এবার পানির স্বাদ বেড়ে গেছে শত গুণ। নিজের জমিতে ফিরতে ফিরতে তার ছোটো একটা ঢেকুর ওঠে, এই ঢেকুরে আখের গুড়ের গন্ধের সঙ্গে উগরে ওঠে চিনচিনে হিংসা : কার্তিক মাসে মানুষের ভাত জোটে না, আবার চাষার ঘরে দ্যাখো গুড়ের ফুটানি! বাপটা তো কিপটের একশেষ, জমির আলে কুলগাছতলায় সানকি ভরা পান্তা মরিচ দিয়ে ডলে খেতে খেতে একবার মুখের কথাটাও বলে না, ক্যা গো, খাওয়া দাওয়া হছে? আর এ কঞ্জুসের বেটি গুড়ের ফুটানি মারে। গুড় যখন দিলোই তো পর্দার বাহার দেখাবার দরকারটা কী? রাত্রিবেলা বাপের সঙ্গে আল কেটে তমিজের জমির পানি চুরি করার সময় পর্দার বাহাদুরি ছিলো কোথায়?—তা দুই বছরের ওপর বাপের বাড়িতে বসে বাপের অন্ন ধ্বংস করছে, বাপের জমিতে কাম না করে তার উপায় কী? তমিজ সব খবরই রাখে।—আকালের বছর হুরমতুল্লার জামাই নিজের বৌ, বছর দেড়েকের একটা বেটা আর ছয় মাসের একটা বেটি শ্বশুরবাড়িতে গছিয়ে রেখে সেই যে ভাগলো,—বেটিটা মরলো বছর না পুরতে, পেটফোলা বেটাটার পেট দিনদিন আরো ফুলছে তো ফুলছেই, তার তামাটে মুখ রোজ রোজ হলদে হয়, চোখের হলুদ ছোপ গাঢ় হয়ে আসছে। আর খেতে না পেয়েও বৌটার পাছা হয়ে উঠছে ধামার সমান।—তা সেই মানুষটার কোনো পাত্তাই নাই। ওদিকে ঐ জামাই বেটার গাঁয়ের আদ্দেকের বেশি মানুষ নাকি আকালে সাফ হয়ে গেছে, যারা ছিলো তাদের বাড়িঘর খেয়ে ফেলেছে যমুনা। কিন্তু হুরমতুল্লার জামাই নাকি বেঁচে থেকেই কোথাও উধাও হয়ে গেছে কেউ বলতে পারে না। হুরমত শুনেছে জামাই তার রংপুর না আসাম না কুচবিহার না জলপাইগুড়ি না দিনাজপুর কোথায় চলে গেছে, কাউকে ঠিকানা দিয়ে যায়নি। সে নাকি আবার গান লেখে; হুরমতুল্লা বলে, তার গানের এতোই চাহিদা যে গান লিখতে তাকে হয়তো কলকাতা না হয় ঢাকা না হয় দিল্লি চলে যেতে হয়েছে। তমিজ এসব বোঝে! ঐ লোকটা নির্ঘাৎ পাড়ি দিয়েছে বিয়ার এলাকায়। কামলার মজুরি ওদিকে বেশি, এই কার্তিক মাসেও সাড়ে পাঁচ আনা ছয় আনার কম নয়। কাজও পাওয়া যায় ওদিকে, মেলা কাম। জমির তদারকি ওদিকে বেশি, জমিতে

ওরা মেহনতও করে খুব। খিয়ারে তো নদী একরকম নাই বললেই হয়, বড়ো বড়ো সব দিঘি আছে, দিঘি থেকে নালা কেটে ওরা জমিতে পানি সেঁচে দোন দিয়ে। কামলাপাটের নাকমুখ গুঁজে পান্তার শেষ আমানিটুকু চুমুক দিয়ে খাবার মতো জমি চুপচাপ শুষে নেয় দোনের পানি। এখানে তমিজের জমিতে পানি সেঁচতে পারলে কাজ হতো। হুরমতুল্লাকে ভালো করে বোঝাতে পারলে সে-ই শরাফত মণ্ডলকে বলে মোষের দিঘি থেকে নালা কাটাবার ব্যবস্থা করতে পারবে।

কিন্তু বুড়ার কাছে তমিজ কথাটা পাড়ে কীভাবে?—শুরু করা যয় তার পালিয়ে-যাওয়া জামাইকে খোঁজ করার পরামর্শ দিয়ে।—না, ওসব কলকাতা দিল্লি কিংবা আসাম কি জলপাইগুড়ি দিনাজপুরের কথা বাদ দাও বাপু, জামাই তোমার খিয়ারের দিকেই গেছে।—আরে, হিসাব তো সোজা।—টাউনে গিয়ে ট্রেনে চাপো, তারপর যে স্টেশনেই নামো, চোখে পড়বে খালি ধানখেত আর ধানখেত। বর্গাচাষাদের উৎপাতে অতিষ্ঠ কোনো জোতদার হুরমতের জামাইকে ঠিক কাজে লাগিয়ে দিয়েছে নিজের খাস জমিতে। আধিয়ারদের হাঙ্গামা বাড়ার পর কামলার মজুরি সেখানে বেড়ে গেছে।—কেন? মজুরি বাড়বে কেন?—কাজে অনেক ঝুঁকি নিতে হয় তো, তাই। বর্গাচাষারা সেখানে একজোট, জোতদারের মানুষদের তারা যে কোনো সময় হামলা করতে পারে। তমিজ তো ঐ এলাকা থেকেই ঘুরে এসেছে এই মাস তিনেক। তিন মাস, কিন্তু মনে হয় কালকের ঘটনা। আধিয়ারদের তাড়া খেয়ে কাটা ধান ফেলে সে দৌড় দিলো। দৌড়, দৌড়, দৌড়। তার গায়ে তীর বিঁধছিলো একটার পর একটা, তমিজ শুনেছে সাঁওতাল চাষারা নাকি জোতদারদের মারে তীর দিয়ে। তা তীরের খোঁচায় টিকতে না পেরে তমিজ একটা জমির আলে দাঁড়িয়েছিলো বাবলা গাছের নিচে। তা ঐ রোগা বাবলা গাছ তাকে আর আড়াল দেবে কোত্থেকে? উপায় না দেখে তমিজ তখন কাঁটাওয়ালা বাবলাডাল ভেঙে ভেঙে ছুঁড়ে মারতে লাগলো ঐ চাষাদের দিকে। কিন্তু কোন শালা কি মন্ত্র পড়ে দিয়েছে, বাবলাডাল একটার পর একটা গিয়ে লাগে জোতদারের গায়ে। শরাফত মণ্ডলের গলার ঠিক নিচে বাবলাকাঁটা লেগে রক্ত বেরুচ্ছে। বাপের পেছনে দাঁড়িয়ে আবদুল আজিজ আবদুল কাদের দুই ভাই। অন্তত আবদুল আজিজের মুখ বরবার কাঁটাওয়ালা মোটা একটা বাবলাডাল লাগাবার জন্যে তমিজ নানাভাবে চেষ্টা করে, কিন্তু জুত করতে পারে না। তমিজ আরো ডাল ভাঙতে লাগলো। জোতদার শালা ঝাড়েবংশে হারামজাদা, শালার একোটা মাকুচোষা। তমিজের এতো কষ্ট, এতো মেহনত, এতো কষ্টের মেহনতের ফসল সব নিয়ে তুলতে হবে শালাদের মোটা মোটা গোলায়।—জমির আলে কুলগাছের ডাল মুঠি করে ধরায় হাতের তালুতে ও আঙুলে কাঁটা ফুটলে মাথা ঝাঁকিয়ে তমিজ চারদিকে তাকায় : তার পাশের জমিতে মরিচের চারা বুনে চলেছে হুরমতুল্লা। এখানে বাবলা গাছ কোথায়? খিয়ারে কাজ করতে গিয়েও তো তমিজ কখনো বাবলা গাছের ডাল ভাঙেনি। খিয়ারে চাষাদের তাড়া খেয়ে সে আবার রুখে দাঁড়ালো কবে? একদিন কেবল আধিয়ারদের হামলায় পালিয়ে এসে জোতদারের বাড়ির উঁচু ভিটা থেকে সাঁওতালদের তীর ছুঁড়তে দেখেছে। কিন্তু তাই বলে সে-ও তাদের দলে ভিড়ে যাবে কেন? তওবা, তওবা! ছি! ছি! শরাফত মণ্ডল কিংবা তার ছেলেদের গায়ে সে কি কখনো ভুলেও হাত তুলতে পারে? সে কি এতোই নেমকহারাম হয়ে গেলো যে এসব ভাবনা এসে দানা বাঁধে তার মাথায়? আবদুল কাদেরের সুপারিশে

আর শরাফত মণ্ডলের মেহেরবানিতে তমিজ দিনমজুর থেকে আজ বর্গাচাষী। অথচ এই ভর দুপুরবেলা মণ্ডলেরই জমিতে দাঁড়িয়ে জেগে থেকে সে এসব কী দেখে? বাপের ব্যারাম কি তার ওপরে ভর করলো নাকি? ব্যাপারটা ভালো করে বোঝবার আগেই সে শুনতে পায় হুরমতুল্লার ডাক, 'ক্যা গো। ওটি খাড়া হয়া কী তামসা দ্যাখো? নিড়ানি হলো? মাটি বলে শুকনা। বানও এবার জুতের হলো না গো!'

হুরমতুল্লার এই কথা ধরেই মোষের দিঘি থেকে নালা কাটার ব্যাপারটা তোলা যায়। কিন্তু একটু আগে দিব্যি জেগে জেগে দেখা বেআক্কেলে খোয়াবটা তার আসল কথাটা ভুলিয়ে দিতে না পারলেও কথার ভনিতাটা গুলিয়ে ফেলেছে। কী কথা দিয়ে যেন শুরু করার কথা ছিলো? কিছুতেই আর মনে পড়ে না। মনে পড়ে কোত্থেকে?—মাথার ভেতরে তার কেবল দিঘি কাটা নালার পানি বইতে থাকে কুলকুল করে। পানি পেয়ে জমি তার গাঢ় সবুজ রঙের হাওয়া বইয়ে দিচ্ছে আকাশ জুড়ে, তমিজের সর্বাঙ্গ কাঁপে সেই হাওয়ায়। হুরমতের বুড়া গতরে তো কাঁপন উঠবে আরো বেশি। বুড়ার মরিচ খেত প্রথমে হয়ে উঠবে ঘন সবুজ। তারপর সবুজ পাতার ভেতরে পাতার সঙ্গে সবুজ মরিচের লুকোচুরি খেলা। তারও পর সবুজ আঁচল ফেটে বেরুবে পাকা মরিচের লাল টকটকে শিখা। আহা, পাকা মরিচের সেই আগুনে-হাসি দেখে বুড়ার সব দোষ তমিজ মাফ করে দেবে। আর তখন তমিজের আমন হবে এখানে আউশ যা হয়েছিলো তার আড়াই গুণ। এতো এতো ধান তারা খাবে কতো? দুর! আমন ধানের চিকন চাল দাঁতের ভেতর কেমন ফস্কে ফস্কে যায়, ভাত খাবার জুত হয় না। খাবার জন্যে আউশ ধানের ভাত কতো ভালো। আর অতো খাবার লালচ কেন? আমন বেচে টাকা যা পাবে সবটা পেটের ভেতরে না সেঁধিয়ে জমিয়ে রাখবে। এক জোড়া গোরু, লাঙল, জোয়াল, মই কিনতে পারলে জমি বর্গা পেতে কষ্ট হয় না। বেশি নয়, বছর তিনেক বর্গা করতে পারলে দুটো দুটো ফসল ঘরে তুলে অন্তত ১৫ শতাংশ জমি কেনার টাকা হয়। নিজেদের ভিটার লাগোয়া জমিটা মণ্ডলের কাছ থেকে ফেরত পাওয়া যায় কি-না একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী? আবদুল কাদেরকে তমিজ একবার বলে দেখবে। মাসখানেক হলো তো সে রোজই সন্ধ্যাবেলা গোলাবাড়িতে কাদেরের দোকানে যাচ্ছে, লীগের ছেলেদের সঙ্গে এদিকে ওদিক যায়, খুব জোর গলায় শ্লোগান হাঁকে। এসব দেখে কাদের নিশ্চয়ই খুশি। কাদের কি আর তার ভিটার জমিটার জন্যে বাপকে একটু বলবে না? মণ্ডল জমি যদি না-ও বেচে তো অন্তত খাইখালাসি দিক। বাপটাকে তমিজ তা হলে ওখানেই লাগিয়ে রাখতে পারে।

বাপ তো তার কামের মানুষ। যেখানেই লাগুক, সে একাই একশো। খালি একটা কথা,—কামটা তার জুত মতো হতে হবে। বিলের মধ্যে যেসব ডাঙা ফুটে উঠছে। সেখানে বর্গা করার সুযোগ পেলে তমিজের বাপ কাম দেখাতে পারে। মণ্ডল এই বিল পত্তন নেওয়ার আগে তমিজের বাপ বিলের যেখানে জাল ফেলেছে, মাছ উঠেছে সেখানেই। মানুষটার হাতে জাল ফেললেই মাছ। বিলের স্বভাবচরিত্তির তার চেয়ে ভালো জানে কে? বিলের পানি থেকে ওঠা জমিও তার বশেই থাকবে। এই যে রাতে নিন্দের মধ্যে আন্ধারে মান্দারে মাঠেপাথারে হেঁটে হেঁটে বিলে যায়, সে কি এমনি এমনি? বিলের উত্তর সিথানে পাকুড়গাছ থেকে মুনসি তাকে যদি একটু কোল দেয় তো বিলের জমিজিরেত কি তার হাতে না এসে পারে?

কিন্তু হুরমতুল্লা হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দৌড়াতে শুরু করলে তমিজের বাপ তো তমিজের বাপ, এই কাৎলাহার বিল আর তার দুই পাশের গ্রামগঞ্জের সবার বাপ মুনসি পর্যন্ত রোদে মিলিয়ে যায়। বুড়ার হলোটা কী? মোষের দিঘির ওপারে নিজের বাড়ির দিকে মুখ করে বুড়া হাত দেখায় বিলের ওপারে পুবের রাস্তার দিকে আর উর্ধশ্বাসে চ্যাঁচায়, 'ক্যা রে ফুলজান, ক্যা রে নবিতন, ক্যা রে ফালানি, দ্যাখ দ্যাখ কেটা আসিছে দ্যাখ।'

গোলাবাড়ি থেকে দক্ষিণে নেমে কাৎলাহার বিলের পুব দিয়ে মণ্ডলবাড়ি ছুঁয়ে কলুপাড়া পর্যন্ত চলে-যাওয়া রাস্তায় একটা টমটম ছুটছে। টমটমের পেছন পেছন ছুটছে এক দঙ্গল ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে। এদের বেশির ভাগের কোমরে তাবিজ আর কানা-পয়সা ঝোলাবার তাগা ছাড়া শরীরের সবটাই খালি। ৪/৫টি মেয়ের পরনে কেবল গামছা, তাদের গলায় অবশ্য তাবিজও ঝুলছে। মাঝে মাঝে টমটমের চাকায় কাঠি ঠেকানোর ফলে টরররটররর আওয়াজ উঠছে, ঘোড়ার খুরের শব্দের সঙ্গে সেই আওয়াজ শুনে একটু দূরের ঘরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে বৌঝিরা, তাদের প্রত্যেক্যের কোলে একটা একটা ন্যাংটা শিশু।

টমটমের সওয়ারিকে চিনতে পারলে হুরমতের লাফালাফি ও উত্তেজনার কারণ বোঝা যায়। বিলের ওপারে স্পষ্ট নজর দেওয়া সোজা নয়। তবু টমটমের ওপর কাঁথা পেতে বসা আবদুল আজিজকে সনাক্ত করা গেলো। তার পাশে সবুজ এন্ডির র‍্যাপারে জড়ানো বালকটি নিশ্চয়ই আজিজের ছেলে। তাদের উল্টোদিকের মেয়েটি আজিজের মেয়ে ছাড়া আর কে হবে? টমটমের নাগাল পেতে হুরমত দৌড় দিলো বিলের পাড়ে, কোষা নৌকা নিয়ে সে যদি ওপারে যায়ও তো গাড়ি ততোক্ষণে চলে যাবে মেলা দূর। ফিরে এসে হুরমত তাই মোষের দিঘির উঁচু পাড়ে উঠে যতোটা পারে টমটমটা ভালো করে দেখতে লাগলো।

ওদিকে হুরমতের মেয়েরাও এসে দাঁড়িয়েছে দিঘির পাড়ের ওপর। বড়ো মেয়ের কোলে তামাটে হলুদ ছেলেটি ঘ্যানঘ্যান করে কেঁদেই চলেছে, টমটমের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে তার মায়ের সবরকম চেষ্টাই একেবারে ব্যর্থ। হুরমতের ছোটো মেয়েটি নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে, কিন্তু তার বড়ো বোন এক হাতে খামাখা তাকে আটকাতে গেলে ছেলেটি তার কোল থেকে একরকম গড়িয়ে নামে নিচে এবং ওখানেই বসে কাঁদতে থাকে চিৎকার করে। কিন্তু গলার জোর একেবারেই কম, তার পেটের পিলে মনে হয় তার গলার ভেতরটাও কুরে কুরে খেয়ে ঢাউস হয়ে উঠেছে।

কোলের ছেলে নিচে নেমে পড়ায় হুরমতুল্লার বড়ো মেয়ের মুখ বুক এখন তমিজ স্পষ্ট দেখতে পায়। তামাটে রঙের গোলগাল মুখের নিচে ফুলজানের ঘ্যাগটা একটু বড়োই দেখায়। শরীরটা তার মোটা, তবে কোমর অতোটা মোটা না। সারা শরীরে শক্ত মাংস ঠাসা। এই শরীরের মেয়ে জমিতে কাজ করবে না তো করবে কে? আহাম্মুক স্বামীটা তার বুঝতে পারলো না! নইলে এই বৌকে নিয়ে সে তো জমি বর্গা চাষ করতে পারে কোনো কামলা ছাড়াই।

হাঁপাতে হাঁপাতে জমির আলে কুলগাছের নিচে ফিরে এসে হুরমতুল্লা হাঁপায় এবং হাতের কাছে পানি ভরা বদনা থাকা সত্ত্বেও মেয়েদের দিকে তাকিয়ে চ্যাঁচায়, 'পানি লিয়া আয়।' পরের মুহূর্তেই সে নির্দেশ পাল্টায়, 'ওটি খাড়া হয়া বেহায়ার লাকান কী দেখিস? যা, ঘরত যা।'

তার হুকুম মেয়েরা পালন করলো কি-না না দেখেই হুরমত বলে, 'মণ্ডলবাড়িত একবার যাওয়া লাগে গো। কিসক আসলো, কী সমাচার শুন্যা আসি।' ঘাড়ের গামছা দিয়ে পিঠ ও বুক মুছতে মুছতে সে টমটমের সওয়ারিদের মধ্যে আবদুল আজিজ ছাড়া আর কে কে থাকতে পারে তাই নিয়ে নানারকম অনুমান করে, অনুমানটি নিয়ে সংশয় হয় তার, তখন অনুমান বাতিল করে ও ফের নতুন অনুমানটি জানায়। টমটমে আবদুল আজিজকে বাড়ি আসতে দেখে হুরমতুল্লার এরকম উত্তেজনা তমিজের পছন্দ নয়। কিন্তু এই অপছন্দ জানানো দূরের কথা, এটিকে বেশিক্ষণ পুষে রাখাও তার পোষায় না। হুরমত হলো আজিজের পেয়ারের মানুষ। শরাফত মণ্ডলের বাপ এই গ্রাম থেকে বাস উঠিয়ে নেওয়ার আগে হুরমত তাদের পড়শি ছিলো, তাদের মধ্যে আত্মীয়তাও থাকতে পারে। তমিজের এই জমিটাও আজিজ হুরমতকেই বর্গা দিতে চেয়েছিলো। তার কথা, 'পুরানা আমলের মানুষ। পুরানা চাল ভাতে বাড়ে।'
কিন্তু শরাফত মণ্ডলের কী হয়েছে, বিল পত্তন নেওয়ার পর থেকে সে জমি বর্গা দিতে শুরু করেছে মাঝিদের কাছে। এই নিয়ে আবদুল আজিজ বেশি কিছু বলতেও পারে না। হাজার হলেও সে থাকে বাইরে, গাঁয়ের খুঁটিনাটি ব্যাপার সে আর কতোটাই বা জানে? তবে হিসাবনিকাশের কাজে বড়ো ছেলের ওপর মণ্ডলের আস্থা বেশি। ফসল কাটার সময় তাকে তাই ছুটি নিয়ে একবার বাড়ি আসতেই হয়। আবদুল আজিজ মাথার ওপর দাঁড়ালে আধিয়াররা ফাঁকি দিতে পারে না, তাদের ফন্দিফিকির কিছুই খাটে না। কিন্তু এখন তো ধান কাটার সময় নয়। আবদুল আজিজ হঠাৎ করে বাড়ি এলো কেন? লোকটা কি তবে তাদের জমিতে জমিতে ফসলের সম্ভাবনা অনুমান করতে এসেছে? তমিজ একটু ভাবনাতেই পড়ে : মাঝির বেটা লাঙল ধরে কোথায় কী অকাম করলো তাই তদন্ত করতেই যদি সে গ্রামে এসে থাকে তো তমিজের কপালে দুঃখ আছে।

১১

ত্রিশূল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মহাদেব নিজের হাতে মোষের দিঘি খুঁড়েছেন এক রাতের মধ্যে। তাও আবার মা দুর্গার আবদারে। দেবমহিমায় নায়েববাবুর ঘন ভুরুতে গেরো পড়ে : এই দিঘিতে জাত-বেজাতের মানুষের হাত পড়লে ভোলানাথ আবার দ্বিতীয় একটা দক্ষযজ্ঞ করতে পারে,—সেই ভাবনায় নায়েববাবু বড়ো কাতর। তার ভক্তিখচিত কাতরধ্বনি শুনতে শুনতে শরাফত সোজা হয়ে বসে চেয়ারের ওপর, মহাদেবের কিংবা তার ভক্তের বেসামাল রাগের ভয়ে তার শিরদাঁড়া একটু একটু কাঁপে।

দেবতা ও জমিদার দুই জনের প্রতিই নায়েববাবুর ভয় ও ভক্তি সমানভাবে বরাদ্দ, 'কর্তাবাবু তো তোমাদের জন্যে সর্বদাই খুব ভাবে, বুঝলে না? তাঁর প্রজাপাটের দশ আনাই মোসলমান, তোমার জাতের মানুষ। চার আনার বেশি নমশূদ্র। তার নিজের জাতের মানুষ আর কয়জন?—এই এস্টেটে বামুন কায়েত কতো তা তো জানোই। আর কর্তাবাবুর ছেলেরা তো জাত একরকম মানেই না, তাদের খাদ্যিখাওয়া ওঠাবসা সব

সায়েবদের সাথে।' জমিদারতনয়দের বৈপ্লবিক জীবনযাপনে নায়েববাবু যেমন গর্বিত দেবদেবীর প্রতি তার ভক্তিও তেমনি সীমাহীন। সে বলে, 'কিন্তু কথাটা বোঝো, ভালো করে বুঝে দেখো। কথাটা অন্যভাবে নিও না।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নায়েববাবু চোখজোড়া আধবোঁজা করে, 'মহাদেবের নিজের হাতে কাটা দিঘি, তাও কাটলেন মা দুর্গার কথায়, এই দিঘিতে ব্রাহ্মণও কোদাল বসাতে সাহস পায় না। আর অন্য জাতের হাতের কোদাল পড়লে কৈলাসনাথ সহ্য করেন কীভাবে? বলো, তুমিই বলো।'

কৈলাস এখান থেকে কতো দূরে সে সম্বন্ধে শরাফতের ধারণা না থাকলেও ওখানকার বাসিন্দাদের ভক্ত নায়েববাবুকে সে ভালো করেই চেনে। আহলে হাদিস জামাতের মানুষ সে, মাঝি কলু কি হানাফি জামাতের অন্যসব মানুষের মতো হিন্দু দেবদেবীর নামে সে কখনো মানত করে না। কিন্তু ভয় একটু পায়। জমিদারের কাছারিতে বসে নায়েববাবু ও অনুপস্থিত মহাদেবের সঙ্গে বেয়াদবি করার ইচ্ছা কিংবা সাহস তার একেবারেই নাই। যতোক্ষণ ওখানে ছিলো ভয় ও ভক্তিকে সে এক মুহূর্তের জন্যে কাছছাড়া করে নি। দিঘিটা যে মহাদেবের কাটা তাও সে জীবনে প্রথম শুনলো। কোম্পানির গোরা সেপাইদের কেটে ভবানী সন্ন্যাসী তার খাঁড়াটা ধোবার জন্যে এই পুকুর কাটে বলে ছোটোবেলা থেকে সে গল্প সে শুনে আসছে সেটা কি তবে ঠিক নয়? তবে নায়েববাবুকে চটিয়ে তার লাভ কী? কথাটা না তুলেই সে কাছারি থেকে ফেরে।

গোলাবাড়ি হাটে ভুটিয়া ঘোড়া থেকে নেমে শরাফত এদিকে ওদিক তাকাতেই গফুর কলু ছুটে আসে কাদেরের দোকান থেকে। গফুর ঘোড়া ধরলে সে বলে, 'দোকানের পিছনে ছায়া দেখ্যা বান্ধ্যা রাখ। বিকালবেলা কাউকে দিয়া বাড়িত পাঠায়া দিস।'

গফুরকে হুকুম দিতে দিতে কাছারির ভয়টা তার তরল হয়। দোকানের ভেতরে ক্যাশবাকসের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাদের। বাপকে দেখে দাঁড়ালো তা কিন্তু নয়। লীগের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলো। তার পেছনে টিনের দেওয়ালে সাঁটা আগামী রবিবার টাউনে মুসলিম লীগের মিটিঙের পোস্টার। পোস্টারের একেবারে ওপরে আড়াআড়িভাবে আঁকা মুসলিম লীগের নিশান, তার ওপরে লেখা, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ও 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ।' অন্য তিন দিকে টিনের বেড়ায় পুরোনো দৈনিক আজাদের ওপর গাঢ় নীল কালিতে লেখা পোস্টার। ঘরের এক দিকে টিনের বেড়া ঘেঁষে কেরোসিন তেলের টিন সাজানো, অন্য দিকে খালি টিন একটু এলোমেলোভাবে রাখা। খালি টিনগুলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে শরাফত গত দুইদিনের বিক্রির পরিমাণটা আন্দাজ করে নিলো।

আবদুল কাদেরের দিকে মুখ করে দুটো বেঞ্চে গাদাগাদি করে বসেছিলো ১২/১৪ জন ছেলে, কাদের এদের সঙ্গেই কথা বলছিলো। শরাফত মণ্ডল আজকাল যখনি দোকানে আসে এক দঙ্গল ছেলে দেখতে পায়। দিনরাত এরকম দরবার করলে ব্যবসা হবে? মণ্ডলের মেজাজটা খিঁচড়ে যায়, হিন্দুদের সঙ্গে লাগতে চাও;—দেখো হিন্দুর বাচ্চা কী করে ব্যবসা করে! এই তো কয়েক গজ পরেই মুকুন্দ সাহার আড়ত, চার চালা টিনের ঘর, বাপের আমলে যেমন ছিলো তেমনি আছে, একটা টুলও বাড়ায় নি। অথচ ব্যবসা চালাচ্ছে চুটিয়ে! আজ হাটের দিন নয়, তবু আড়তের সামনে বাঁধা ৪/৫টা ঘোড়া, আদা রসুন জিরা নিয়ে এসেছে পাইকাররা। দোকানে বসে সাহা কি কখনো আড্ডা মারে? আর কাদেরের ঘরে এতোগুলো ছোকরা, বিড়ির ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। মুরুব্বি গোছের খদ্দেরদের এখানে ঢুকতে কি একটু বাধো বাধো ঠেকবে না?

তবে কিছুক্ষণের মধ্যে এই ক্ষোভ ও বিরক্তি শরাফত সামলে নেয়, তাকে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে-পড়া ছেলেদের দেখে একটু চাঙাই হয়ে ওঠে। পিপাসা না পেলেও সে তখন এক গ্লাস পানি খেতে চায়। শুধু তার জন্যেই দোকানে রাখা বড়ো কাঁসার গ্লাস হাতে গফুরকে বাইরে টিউবওয়েলের দিকে যেতে দেখে সে বলে, 'এখন থাক।' কাদের তখন গফুরের হাত থেকে গ্লাস নিয়ে ওটা এগিয়ে দেয় গিরিরডাঙার চাষীপাড়ার একটি ছেলের দিকে। এবার পানি খাওয়া স্থগিত রাখার দরকার হয় না শরাফতের। পানি খেয়ে আরামের নিশ্বাস ছেড়ে সে বলে, 'মোষের দিঘিত নালা কাটা যাবি না। ওই দিঘি বলে দেও দানবে কাটিছে, নায়েববাবু কয়, মহাদেবের নিজের হাতে কাটা দিঘি, মোসলমানে কোদাল ধরলে ঠাকুর কোদ্দ হবি।'

দেবতার ক্রুদ্ধ হবার কথায় জ্বলে ওঠে কাদের, 'মোসলমানের ভালো দেখলেই হিন্দুর গাও জ্বলে।' এই বাক্য তার একটু আগে বলা কথার জের হিসাবে চালানো যায়, প্রসঙ্গটি অব্যাহত রাখতে তাই তার অসুবিধা হয় না, 'হিন্দু জমিদার ফুটানি মারে মোসলমান প্রজার রক্ত চুষে। পাকিস্তান না হলে মোসলমানের জান মাল ইজ্জত সব বিপন্ন।'

এর মধ্যে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে বৈকুণ্ঠ গিরি। কাদেরের কথা সে শুনছে খুব মন দিয়ে। কাদেরের কথা শেষ হলেও সে সরে না, বরং ফের পান মুখে দেওয়ায় জর্দার গন্ধে তার অবস্থান আরো শক্ত হয়। শরাফত মণ্ডল ও কাদের বাড়ি যাবার জন্যে পা বাড়ালে বৈকুণ্ঠ এগিয়ে মণ্ডলের কাছে এসে বলে, 'কাকা, আপনের সাথে বাবুর কী দরকার, কী নাকি কথা আছিলো।'

'ও হ্যাঁ', শরাফতের হঠাৎ কী মনে পড়লে কাদেরকে বলে, 'তুমি একটু বসো, মুকুন্দবাবুর সাথে কথাটা স্যারা আসি।'

শরাফত মুকুন্দ সাহার আড়তের দিকে গেলেও বৈকুণ্ঠ দাঁড়িয়েই থাকে, কাদেরকে সে জিগ্যেস করে, 'দাদা, আপনাগোরে না সভা হবার কথা? সভাত গান হবি তো? গান না হলে সভা কিসের?'

গোলাবাড়ি হাটে তখন শেষ দুপুর। বটতলায় একটি ভিখিরিনী বসে পাতা জ্বালিয়ে রান্নার আয়োজন করছে। দোকানপাট সব বন্ধ, একটি দোকানের সামনে বাঁশের মাচায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ৭/৮ বছরের একটি মেয়ে, ওই ভিখিরিনীরই মেয়ে হবে। হঠাৎ করে কার্তিক মাসের ফাজিল মেঘের ছপছপ বৃষ্টি হলেও মেয়েটির ঘুম ভাঙে না, মায়েরও রান্নার খুব একটা ব্যাঘাত হচ্ছে বলে মনে হয় না।

বৃষ্টি থামলেও শরাফতের ছাতা খোলাই থাকে, তবে রাস্তায় নেমে সে বলে, 'বৃষ্টি আর হবি না। বৃষ্টিরই দরকার, না হলে ফসল মার যাবি।'

কিন্তু আবদুল কাদেরের মনোযোগ অন্য দিকে। সারাটা পথ ধরে সে হিন্দু জমিদারদের জুলুম নিয়ে গজগজ করে। আবার বাপের অপমানও তার গায়ে লেগেছে। জিগ্যেস করে, 'নায়েববাবু কি আপনার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করিছে বাপজান?'

'আরে না, তুমি কী কও!' শরাফত ছেলের ভয়কে উড়িয়ে দিতে চাইলেও বুকের ভেতরটা একটু খচ খচ করে। নায়েববাবুর তলব এসেছিলো সকালে, শরাফত তখন চিড়াদুধকলা নাশতা করে উঠে হাত ধুচ্ছে। কাদের তখনো নাশতা করে নি, সে তার ভাইপোর জ্বর দেখছিলো থার্মোমিটারে। তখন বাড়িতে এসে হাজির হলো নায়েববাবুর

খাস পেয়াদা হাতকাটা অসিমুদ্দি। অসিমুদ্দি স্পষ্ট করে কিছু বলে নি, শুধু জানালো মোষের দিঘি থেকে নালা কাটা নিয়ে নায়েববাবু কার কাছে কী শুনেছে, শরাফতের সঙ্গে তাই নিয়ে আলাপ করতে চায়। নায়েববাবুর হুকুম তামিল করতে বাপকে তড়িঘড়ি করে পিরান ও টুপি পরতে দেখে কাদের আড়চোখে তাকিয়ে বলে, 'হুমায়ুনের জ্বর তো আজ বেশি।' হুমায়ুনের মায়ের দিকে থার্মোমিটার এগিয়ে দিয়ে সে নিজের বাকস থেকে বার করে একটা জিন্না টুপি। বাপের সামনে বিছানায় টুপি রেখে কাদের বলে, 'বাপজান, এই টুপি মাথাত দেন।'

শরাফত কিন্তু নিজের কিস্তি টুপিটাই ফুঁ দিয়ে মাথায় চড়ালো, তবে ছেলের নতুন কেনা জিন্না টুপিটা তাকে ফিরিয়ে দিলো না, আজিজের বৌয়ের হাতে তুলে দিয়ে বললো, 'বাবরের মা, রাখো, বাবরের মাথাত হবার পারে।'

এখন ছেলের সঙ্গে বাড়ি ফিরতে ফিরতে শরাফত মণ্ডলের মনে হয়, জিন্না টুপিটা মাথায় থাকলে নায়েব আরেকটু হুঁশিয়ার হয়ে কথা বলতো। তা বয়স হতে হতে নায়েব এমনিতেই অনেকটা নরম হয়ে আসছে, তার কথাবার্তা আজকাল আগের চেয়ে অনেক ভালো। আজ এতোদিন পর হঠাৎ এরকম বেঁকে গেলো কেন? মণ্ডল বেঞ্চে বসার আগেই নায়েব বলে, 'কী মণ্ডল, তোমার তো দেখাই পাই না। তা তোমাদের সাথে আজকাল বড়ো বড়ো মানুষের খাতির, আমাদের তো মনে হয় পোঁছোই না। আমাদের দিন শেষ হয়ে গেলো নাকি?'

শরাফত চুপ করে থাকে, নায়েববাবুর কাছে এর চেয়ে অনেক খারাপ ব্যবহার সে আগে মেলা পেয়েছে। তবে আজ মোষের দিঘির পুবের জমিটা পত্তন নেওয়ার কথাটা আর তোলা যাবে না বলে সে দমে যায়।

নায়েব বলে, 'তোমার বেটা তো পাকিস্তানের মিটিং করে বেড়ায়। ভালো, বাপু ভালো। আমাদের এস্টেটের একটা ছেলে উঠতে পারলে আমরা খুশি। দেখো না, কাউনসিলে যেতে পারে কি-না। আবার শুনি, জমিদারি নাকি উচ্ছেদ করবে। দেখো বাপু, জমিদারি আর ধনসম্পদ সব দুইদিনের ভোগ। কর্তাবাবু বলেন, পূর্ণ, এসব কিছুই থাকবে না। দেশটা ছোটোলোকদের অধিকারেই যাবে। কিন্তু আমার অনুরোধ, জাতটা মেরো না। জাত গেলে মানুষের আর থাকে কী?'

'কী যে কন বাবু, কী যে কন।' জমিদারি না জাত,–কোন প্রসঙ্গে শরাফত নায়েববাবুর খেদ ও আকুতিতে সাড়া দিচ্ছে তাও পরিষ্কার করতে পারে না সে।

'তোমাদেরই তো এখন দিন! মন্ত্রী বলো, উজির নাজির সবই তো তোমাদের। চাকরি বাকরি তো ভদ্দরলোকের ছেলেদের জন্যে বন্ধই করে দিয়েছে। কয়টা দিন গেলে দেশে আর চাষাবাদ করার মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। চাষারা হ্যাটকোট পরে অফিস কাছারি করবে। তা করুক। অন্নদাতা ভগবান, জীব যখন দিয়েছেন, অন্নও তিনি জোগাবেন। কিন্তু বাপু, জাত মারার ফন্দি করলে—'

এই অসমাপ্ত ব্যাক্যের জবাব শরাফত মণ্ডল দেয় কী করে? তাকে উদ্ধার করে নায়েব নিজেই। প্রথমে জানায় যে, মোষের দিঘিতে নালা কাটা শুরু করে শরাফত বিবেচনাবোধের পরিচয় দেয় নি। তারপর নায়েব হঠাৎ করে প্রশ্ন করে, 'মণ্ডল, তুমি তো বুড়ো হলে। এখানকার সবই তো জানো। এই দিঘি কে কেটেছে, কাটার উদ্দেশ্য কী ছিলো জানো না?'

এই এলাকায় এসব আবার জানে না কে? আষাঢ়ের অমবস্যায় রাত্রি আড়াই প্রহরে কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে, পাকুড়গাছ থেকে অল্প তফাতে পানিতে একটা কাৎরা ভেসে ওঠে। মণ্ডল এই গপ্পো বলতে শুরু করলে নায়েব ভুরু কোঁচকায়, 'কাৎরা?' মণ্ডল বুঝিয়ে বলে, কাৎরা মানে বলি দেওয়ার জন্যে জোড়া কাঠ। মানে—।' নায়েব হাত তুলে থামায়, 'যূপকাষ্ঠ?' শব্দটির মানে জানে না বলে মণ্ডল চুপ করে থাকলে নায়েব বলে, 'আরে এসব তো বানেয়াট গল্প।' তা বানোয়াট গল্পটাই তো এখানে ঘটে আসছিলো বহুকাল থেকে।—ওই কাৎরা ভেসে উঠলে সেখানে জোড়া পাঁঠা বলি দিয়ে শত্রুবিনাশ হয়, বিলের দুই ধারে রোগবালাই থাকে না। তা এখন আর কেউ বলি টলি দেয় না, তাই কাৎরাও বুঝি রাগ করে আর ভেসে ওঠে না।—বলি দেবে কোত্থেকে?—বলির পাঁঠা তো কিনে আনলে চলবে না। সেই রাতে মুনসির পোষা গজারের সবগুলি ভেড়ার আকার পায় না, এক জোড়া গজার মাছকে মুনসি সেই রাতে ভাসিয়ে দেয় সাদা পাঁঠার শরীরে। কবে কয়শো বছর আগে কোন সন্ন্যাসী এদিকে এসেছিলো, মানাস নদীর তীরে লড়াই করতে করতে কোম্পানির গোরা সেপাইদের সে নাকি নিজের হাতে বলি দিয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসী মারা পড়ে সেপাইদের হাতেই। তা মরে গিয়ে লোকটা বছরের একটা দিন এখানে আসে, বিল থেকে কাৎরা তুলে নিয়ে মুনসির দেওয়া পাঁঠা বলি দিয়ে সে ঠাঁই নেয় পোড়াদহ মাঠের বটতলায় সন্ন্যাসীর থানে। যাবার আগে বলি দেওয়ার খাঁড়াটা সে ধুয়ে নেয় মোষের দিঘিতে। ওই রাতে মানুষজন এদিকে আসে না, আসা নিষেধ। কিন্তু পরদিন মোষের দিঘির মাঝখানে গোলাপি রঙের পানি ভাসতে থাকে।

গল্প শুনে নায়েববাবু হাসে, এই গল্প শুনে লোকটা অনেকবার এমনি করে হেসেছে। তার সঙ্গে হাসে শরাফত মণ্ডল। হিন্দুদের এইসব গালগল্প সে বিশ্বাস করে না। তবে মাঝি আর কলুদের কথা আলাদা, তারা কতোটা মোসলমান তাই নিয়ে মণ্ডল প্রায়ই এটা ওটা বলে। আর তার আত্মীয়স্বজনের মধ্যেও সব কেচ্ছা বলার লোকের অভাব নাই। তবে আজকাল কাৎরা টাতরা আর ওঠে না, উঠলেও কেউ দেখতে পায় কি-না সন্দেহ।

গ্রামবাসীর অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে নায়েববাবু দুঃখিত হয়। নায়েববাবু বলে, 'আরে, মহাদেবের দিঘিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নমশূদ্ররা চালিয়ে দেয় সন্ন্যাসীর নামে। তাঁর দুর্গার সখের দিঘিতে বেজাতের মানুষের হাত পড়া কি দেবতা সহ্য করবেন?' এই পাপ কি গিরিরডাঙা, নিজগিরিরডাঙার প্রজাদের, এমন কি এদের কলকাতাবাসী জমিদারবাবুকেও স্পর্শ করবে না?

কিন্তু কাদেরকে তো শরাফত মণ্ডল সব খুলে বলতে পারে না। মাথাগরম ছেলে তার, এসব শুনে আবার কী করতে কী করে ফেলে! না বাবা, জমিদারের কোপে পড়লে কাৎলাহারের এপার-ওপার জুড়ে বিস্তীর্ণ জোত করার সাধ তার কখনো মিটবে না। নায়েববাবুকে সে চটায় কী করে? নায়েব এখন কতো নরম মানুষ হয়েছে এই মানুষের রাগ কাদের কি কিছু দেখেছে? শরাফতের বাপচাচাকে কাছারির কোনো নায়েব তুইতোকারি ছাড়া ডাকে নি। অনেক আগে শরাফতের জ্যাঠা পিয়ারুল্লা মণ্ডলকে আগের নায়েব ডাকতো শিয়ারুল্লা বলে, এই নায়েবের আমলে সে পরিচিত হলো শিয়ালু বলে এবং মরার পরও ওই নাম থেকে জ্যাঠা তার রেহাই পায় নি, তার ছেলেমেয়ে নাতি নাতনি সবার বাপদাদার নাম এখনো লেখা হয় শিয়ালু মণ্ডল। সেই লোকের ভাইপো

হয়েও শরাফত নায়েববাবুর কাছে আসল নামে স্বীকৃত এবং তুমি বলে সম্বোধিত হয়। হবে না কেন? আল্লায় দিলে শরাফত কিছু জোতজমি করেছে, গিরিরডাঙায় বাপের ছনের ঘর ভেঙে টিন দিয়ে সব ঘর তুলেছে বড়ো বড়ো। তার দুই ছেলের একজন ম্যাট্রিক পাস করে সরকারি চাকরি করে, আরেকজন বছর তিনেক কলেজে পড়েছে। সব তো জমির কল্যাণেই। আর নায়েববাবুর নেক-নজরটা না থাকলে জোতজমি কি আর হেঁটে হেঁটে তার হাতে আসে?

কাৎলাহার বিলের কাছাকাছি এসে শরাফতের হাঁটার গতি হঠাৎ করে বাড়ে এবং রাস্তা থেকে সে নেমে পড়ে ডান দিকে জমির আলে। পাকুড়তলার দিকে হাঁটা দিলে তার গতি আরো বাড়ে এবং এতে কাদেরের অস্বস্তি টের পেয়ে সে বলে, 'হুরমতের জমিটা দেখ্যাই যাই। বুড়া মরিচের কী করিচ্ছে বোঝা দরকার। মুকুন্দ তো দর এবার ভালোই দিবি কলো।'

বেলা হেলে পড়েছে, একটু আগে বৃষ্টি হওয়ায় আকাশ এখন মেঘশূন্য, শেষ রোদের তেজ একটু বেশি। খিদায় কাদেরের শরীর এলিয়ে পড়েছে। তার ওপর পাকুড়তলায় বড়ো বড়ো গাছের জঙ্গল, ওদিক দিয়ে এই অবলোয় হাঁটতে একটু গা ছমছম তো করেই। কিন্তু বাপ তার সিদ্ধান্ত একটা নিয়ে ফেলেছে, তাকে নড়ানো অসম্ভব।

ঝোপজঙ্গল পেরিয়ে জমির আলে আলে হেঁটে মোষের দিঘির ধারে পৌঁছে কাদের ফের চাঙা হয়ে ওঠে, বলে, 'এই দিঘিতে মোসলমানের কোদাল পড়লে দোষ হয়, না?' নিজের কথায় তেতে উঠে সে বার করে বিকল্প উপায়, 'বিল কাটলেই তো হয় বাজান। বিল থেকে নালা নেওয়া যায় না?' শরাফত কিছুই না বললে কাদেরের ধৈর্য থাকে না, 'বিল কাটলে মুনসি আবার লাফালাফি শুরু করবি না তো?'

মুনসির স্বভাব নিয়ে এরকম বাঁকা কথা শরাফতের গায়ে বেঁধে, তার একটু ভয় ভয়ও করে। তবে ছেলের প্রস্তাব সে বিবেচনা করে বৈ কি—! কাৎলাহার বিল তো একরকম তার নিজের সম্পত্তিই। এই বিল ইজারা নিতে তার কম ভোগান্তি হয় নি। নায়েববাবুকে সেলামি দিতে হয়েছে দফায় দফায়, লাঠিডাঙা কাছারিতে নানা স্তরের আমলা থেকে মিষ্টি খাওয়াতে হয়েছে পাইক বরকন্দাজ সবাইকে। মনে হয় কুত্তাবিলাইও একটা বাদ পড়ে নি। কালকাতায় জমিদারবাবুকে খাওয়াবার নাম করে নায়েববাবু হাতিবান্ধার দৈ নিয়েছে হাঁড়ি হাঁড়ি। তার পৌঁছানোর খরচা পর্যন্ত জোগাতে হয়েছে শরাফতকে।—এতো কষ্টের বিল তার, জমিতে পানি সেঁচতে সেখান থেকে নালা কাটতে পারবে না কেন? কাদেরের পরামর্শটা ভালো। নালা কাটার কাজে তমিজকে মাগনা খাটানো যাবে, এই ব্যাপারে প্রথম উৎসাহটা তো তারই।

কিন্তু আমনের খেতে তমিজ নাই, পাশে মরিচের জমিতে হুরমতও নাই। আলের ওপর কুলগাছের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা হুরমতুল্লার হুঁকা, পাশে তার বদনা ভরা পানি। আবার পাশের জমিতে মাঝে মাঝে কেটে রাখা আগাছার ছোটো ছোটো স্তূপ।—কিন্তু এরা গেলো কোথায়? শরাফত জমিতে মরিচের গাছের বাড় পরীক্ষা করে। এখনো কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো নিজের ঘর থেকে ছুটে আসছে হুরমতুল্লা। পথ সংক্ষেপ করতে সে উঠে পড়েছে মোষের দিঘির উঁচু পাড়ের ওপর এবং তাতে সময় লাগছে

আরো বেশি। উঁচু পাড়ে উঠে সে হাঁপায় এবং হাঁপাতে হাঁপাতে চিৎকার করে, 'ক্যা রে নবিতন, পান লিয়া আয়, পান লিয়া আয়।' মেয়ের প্রতি এই নির্দেশে বেশিরকম জোর থাকায় তার গলা চিরে চিরে যায় এবং শুরু হয় কাশি। কাশির দমকে দৌড়ুবার বল পাওয়া যায় না, আবার দৌড়ুবার ফলে কাশির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ বিঘ্নিত হয়।

হুরমত শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ায় শরাফতের সামনে এবং হাঁপাতে থাকে। একই সঙ্গে অনেক কথা বলার উদ্যোগ নিয়ে কী বলবে বুঝতে না পেরে সে ফের চ্যাঁচায়, 'ক্যা রে নবিতন, কথা কানোত যায় না?'

'কী গো, তোমরা সব কোটে গেছো? তমিজ কোটে?'

কিন্তু শরাফতের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেয়ে তাকে আপ্যায়নের গুরুত্ব হুরমতুল্লার কাছে অনেক বেশি। ফের মেয়েকে ডাকতে শুরু করলে ক্লান্তি ও উত্তেজনায় তার গলার স্বর বেরোয় না, পিঠে কাঁটা বেঁধার ঝুঁকি নিয়েও কুলগাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে সে বিড়বিড় করে, 'কী জ্বালা, কানোত কথা সান্দায় না। এতো ডাক পাড়িছি, কেউ আসে না।'

এর মধ্যে মোষের দিঘির ওপার থেকে ফিরে আসে তমিজ, তার হাতে মাটির সানকিতে পান, গুপারি, চুন ও তামাক পাতা। শরাফত নিজেই পান সেজে মুখে দিলে তমিজ জানায়, ফুলজানের ছেলেটা খেতে বসে হঠাৎ বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলো, তার মুখের কষে ফেনা বেরিয়ে যায়। ফুলজান, নবিতন ও ফালানির সমবেত আর্তনাদ শুনে হুরমতুল্লা ও তমিজ দৌড়ে গিয়েছিলো। তমিজের বুদ্ধিতেই চার বছরের ছেলেটির মাথায় পানি ঢালা হলো অনেকক্ষণ ধরে, এখন সে অনেকটা সুস্থ, ফুলজান এখন তাকে ভাত খাওয়াচ্ছে।

কাদের বলে, 'বেহুঁশ হয়া গেছিলো? ভালো কথা নয় তো। তোমার নাতির না কালাজ্বর শুনিছিলাম। চিকিৎসা করাও না?'

হুরমতুল্লা প্রথমে তার নসিব ও নিরুদ্দিষ্ট দায়িত্বহীন জামাইকে গালি দেয় এবং কাদের তার প্রশ্নের যথাযথ জবাব দেওয়ার জন্যে তাগাদা দিলে সে তার নাতির চিকিৎসার একটি বিবরণ ছাড়ে, 'আর বছর লাঠিভাঙার যতীন কোবরাজের ওটি হামি লিজে যায়া বড়ি লিয়া আসিছি, ছয় আনা খচর করয়া ওষুধ লিয়া আলাম, দুটা বড়ি খায়া আর খালো না। আর বড়িগুলান ফেরত দিবার গেলাম, কোবরাজ বড়িও লেয় না, পয়সাও দেয় না। তিন মাস আগেও পীরসাহেবের, মহাস্থানের শাহসাহেবের পানিপড়া লিয়া আসিছি দুইবার, সাড়ে চার আনা দিলাম মাজারত, আসা যাওয়ার খরচ—তাও তিন আনা চোদ্দ পয়সা,—কতো হলো?—'

'আরে থোও তোমার পানি পড়া! ওষুধ না দিলে ব্যারাম সারে? ছাইহাটার সাকিদারবাড়ির ইমান আলি সাকিদারের বেটা করিমকে দেখাও। এল এম এফ ডাক্তার, নতুন পাস করয়া আসিছে। নাতিক নিয়া একদিন যাও। দেরি করো না।'

'বাড়ির কাছে হরেন ডাক্তার থাকতে ছাইহাটা যাওয়ার দরকার কী?' ডাক্তার নির্বাচনে শরাফত ছেলের পরামর্শ অনুমোদন করে না, 'হরেন কি আজকের মানুষ? এদিককার রোগীপত্তর তো সবই তার হাতে।'

'হরেন ডাক্তার অনেকদিনের লোক ঠিকই', কাদের জোর দিয়ে বলে, 'কিন্তু একটা মোসলমান ছেলে নতুন প্র্যাকটিস করতে বসিছে, কোয়ালিফায়েড ছেলে, তাকে একটু হেলপ না করলে কি চলে?'

কিন্তু হুরমতুল্লার নাতির চিকিৎসা সংক্রান্ত আলাপে সময় নষ্ট করা শরাফতের পক্ষে সম্ভব নয়। সে তাই তোলে পানি সেঁচার কথা, 'তমিজ তোর জমিত তো ফাটা ধরিছে। আর কয়টা দিন গেলে—।'

তমিজ তো এই প্রসঙ্গটির জন্যেই ব্যগ্র হয়ে ছিলো। মোষের দিঘিতে কোদালের কোপ পড়তে না পড়তে কাজটা বন্ধ হয়ে গেলো, এর ভেতর হুরমতুল্লার কোনো ফন্দি আছে কি-না কে জানে? তবে হুরমত সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ঘুণাক্ষরেও যাতে তার মুখ দিয়ে না বেরোয় সে ব্যাপারে সে খুব হুঁশিয়ার, একটু ভেবে বলে, 'নালা কাটা হলে আপনার ব্যামাক জমিতই ফসল ভালো হবি। হামি তো খিয়ারেত অনেক—।'

'না রে, মোষের দিঘি কাটা হবি না' শরাফতের এই কথায় কাদেরের উত্তেজনা বাড়ে, প্রস্তুতি নিয়ে সে আরম্ভ করে, 'শালা জমিদাররা প্রজার ভালো দেখলে—।'

তার পাকিস্তান প্রসঙ্গ আসার আগেই শরাফত তাকে থামিয়ে দেয়, তমিজকে বোঝায়, 'ওই দিঘি তো হামি পত্তন নেমো, বুঝছিস? আগেই নালা ক্যাটা এমন সোন্দর দিঘিটা লষ্ট করি! নালা কাটলেই বর্ষার ঘোলা পানি সান্দাবি। নায়েববাবুক সেই কথাই কবার গেছিলাম।'

আবদুল কাদির হাঁ করে বাপের কথা শোনে। এখন নায়েববাবুর শয়তানির কথা চেপে যাচ্ছে দেখে বাপকেও তার দুটো কথা শুনিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু শরাফত এখন তার দুই বর্গাচাষার সঙ্গে কাৎলাহার থেকে নালা কাটার আলাপে নিয়োজিত। কিছু বলতে না পারায় কাদেরের রাগ তাই বেড়েই চলে, সে কেবলি থুথু ফেলতে থাকে।

১২

বালিশের নিচে মানকচুপাতা দিয়ে আবদুল আজিজের ছেলের মাথায় পানি ঢালছিলো শরাফত মণ্ডলের দ্বিতীয় বিবি। হুমায়ুনের ভিজে মাথায় চুলে সে বিলি কাটছে বাঁ হাতে। ঠাণ্ডা পানির অবিরাম ধারায় ছেলেটি চোখ বন্ধ করে রয়েছে, ঘুমিয়েও পড়তে পারে। কিন্তু শরাফত ও কাদের ঘরে ঢুকতেই সে চোখ মেললো। চোখ তার টকটকে লাল, লাল রঙে যন্ত্রণার দাগ। কাদের কথা বলতে পারে না, তার খিদাও মনে হয় মরে গেছে। শরাফতের ছোটোবিবি স্বামী ও সৎ ছেলের দিকে একবার তাকিয়েই পানি ঢালা অব্যাহত রাখে। বিছানায় ছেলের শিয়রে বসেছে আজিজের বৌ হামিদা, কিছুক্ষণ পর পর আঁচলে মুখ চেপে সে কান্না সামলাচ্ছিলো। শ্বশুর ও দেওরকে দেখে ভিজে আঁচলটা মাথায় বেশি করে চাপাতে চাপাতে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে এবং ফোঁপাতে ফোঁপাতেই বলে, 'এই অজপাড়াগাঁয়ে ছোলেক থুয়্যা কোথায় গেলো, এখন কী করি?'

অসুস্থ ছেলে এবং একমাত্র মেয়েকে বাড়িতে রেখে আবদুল আজিজ চলে গেছে কর্মস্থলে। বৌ তো তার আগে থেকেই বাড়িতে ছিলো, ভাদ্র মাসে আউশ উঠলে এসেছে, আমন ধান তোলা পর্যন্ত থাকবে। এ্যানুয়াল পরীক্ষা দিয়ে ছেলেমেয়েরা বাড়ি আসবে,

এই কয়েকটা মাস মাকে ছাড়াই তাদের থাকার কথা। এখন ছোটো ছেলের ঘুসঘুসে জ্বর চলতে থাকায় তার সেবাযত্ন করা আজিজের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ছে। এসব কি পুরুষমানুষের কাজ? ওদিকে জয়পুরে আবার মাছ ভালো পাওয়া যায় না। এক পটলটাই যা মেলে, আবার পটল আর আলু ছাড়া আর সব তরকারি সেখানে নিরেস। বাজারের তরকারিতে কি আর স্বাদ হয়? এখানে বাড়িতে নিজেদের বিল, উঠানে হাঁসমুরগির লেখাজোকা নাই। মায়ের কোলে বসে দিন কয়েক শিংমাগুরের ঝোল আর ঘরের মুরগি আর খেতের তরকারি খেয়ে ছেলে ঝরঝরে হয়ে উঠবে,—এই ভরসাতেই আজিজ তাকে বাড়িতে রেখে গেলো। তা এখানে এসে ভালোর দিকেই তো যাচ্ছিলো। মেয়াদের জ্বর ঘণ্টা তিনেকের বেশি থাকে না, কটা দিন তো দুপুরের জ্বর আসতে আসতে আসরের ওক্ত পেরিয়ে যাচ্ছিলো। ছেলেটা দাদীর ন্যাওটা। অনেক রাত্রে জ্বর ছেড়ে গেলে মায়ের পাশ থেকে উঠে সোজা এসে শুয়ে পড়েছে দাদীর ঘরে, তার কোল ঘেঁষে। রোগ তো তার সেরেই যাচ্ছিলো, দাদী তাকে চুপচুপ করে এক দিন ইলিশ মাছের সর্ষেবাটা দিয়ে ভাতও খাইয়ে দিয়েছে। তাতেও কিন্তু জ্বর তখন তার বাড়ে নি।

কিন্তু আজ দুপুরবেলা থেকে তার গা গরম। রান্নাঘরে খেতে বসে কাঁপতে কাঁপতে পিঁড়ি থেকে পড়ে যাচ্ছিলো, দাদী ধরে না ফেললে মাটিতে গড়িয়েই যেতো। তারপর থেকে তার প্রবল কাঁপুনি, জ্বরও বেড়ে যাচ্ছে ধাঁ ধাঁ করে। সকালে তাকে বারান্দার রোদে বসতে দেখে হামিদার একটু ভয় হয়, আবদুল কাদেরকে দিয়ে থার্মোমিটারে জ্বরটাও দেখিয়ে নিলো। তেমন কিছু হলে কাদের নিশ্চয়ই বলতো। এদিকে কাদের ছাড়া বাড়িতে কেউ থার্মোমিটার দেখতে জানে না। কিন্তু গায়ে হাত দিয়েই বোঝা যায় জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে।

উঠানের ওপারে পুবদুয়ারি ঘরে শুয়েছিলো শরাফত মণ্ডলের প্রথম বিবি, আবদুল আজিজ ও আবদুল কাদেরের মা। চিরকালের নিয়ম অনুসারে বাড়িতে অসুখ দেখেই সে শয্যা নিয়েছে। জ্বরতপ্ত মানুষের মতো অবিরাম কথা বলে চলেছে এবং সেগুলোকে প্রলাপ বলে বাতিল করা যায় না। তার কথার সিংহভাগ জুড়ে তার স্বামীর নামে নানারকম নালিশ। নাতির রোগের প্রকোপ বাড়তে বাড়তে তার নালিশ চড়ে যায় সরাসরি গালাগালির পর্যায়ে। যেমন, 'সারাদিন খালি জোতজমি আর সম্পত্তি তার মাথাত কুটকুট করিচ্ছে। বেটা হামার ব্যারামি ছোলটাকে থুয়্যা গেলো, তার জন্যে একটা ওষধু লয়, পথ্যি লয়, পানিপড়া লয়, পীরমুনসি লয়। জ্বর কি তোমার কামলা কিষাণ না চাকরবাকর? তুমি হুকুম করলা আর জ্বর গেলো?'

উঠান পেরিয়ে বড়োবিবির নালিশ এই ঘরে এসে ধাক্কা খায় হুমায়ুনের মায়ের বিলাপের সঙ্গে, 'বাবা আমার, আব্বা আমার। এখন কেমন ঠেকিচ্ছে বাবা?'

মায়ের ব্যাকুল ডাকে চোখ মেলে হুমায়ুন জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, 'মা, আজ ডিমভাজা দিয়া ভাত দিবা না মা?'

শূন্যের সঙ্গে ডিমের সাদৃশ্য থাকায় হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার কয়েকটা দিন ছেলেকে স্কুলে যাবার সময় ভাতের সঙ্গে ডিম দেয় নি বলে আফসোসে হামিদা হাপুস নয়নে কাঁদে এবং রোগ সেরে গেলে তাকে রোজ, এমন কি এ্যানুয়াল পরীক্ষার সময়েও দুটো করে ডিম দেওয়ার মনস্থ করে। মায়ের কান্না এবং সংকল্পকে অগ্রাহ্য করে জ্বরের ঘোরের হুমায়ুন বিড়বিড় করে, 'আজ খালি ডিম খায়া যাই মা। ভাত খাবো না। আজ তো হাফ ইস্কুল।'

এইসব এলোমেলো কথায় সবাই ঘাবড়ে যায় এবং টিনের বেড়ায় লাগানো কাঠের তাকে থার্মোমিটার খুঁজতে গিয়ে আবদুল কাদের মেঝেতে ফেলে দেয় শরাফতের মদনমঞ্জরি বড়ি আর চ্যবনপ্রাসের দুটো কৌটা এবং ওষুধ খাবার খলনুড়ি। কিছুই ভাঙে না, এমন কি কৌটাগুলোর ঢাকনিও খুলে পড়ে না। তবে কাদেরের বুকটা কাঁপে। অনেকটা সময় নিয়ে ভালো করে ঝেড়ে থার্মোমিটার সে গুঁজে দেয় হুমায়ুনের বগলে। তার মাথায় পানি ঢালার বিরতি ঘটে এবং এতে এই ঘরের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা উঠান পেরিয়ে ঘা দেয় পুবদুয়ারি ঘরে। বড়োবিবি তার নালিশ ফের চড়িয়ে দেয় গালাগালিতে, 'এই কিপটা বুড়া কারো ব্যারাম হলে একটা পয়সাও খরচ করবি না। কঞ্জুস বুড়া পয়সা জমায় কার জন্যে? হামি কিছু বুঝি না, না? বুড়া বয়সে জোয়ান বৌ আনিছো ঘরত, তার নামে ব্যামাক সম্পত্তি লেখ্যা দেওয়ার মতলব করে। হামি বুঝি না? চান্দে চান্দে কাছারিত যায় কিসক, আমি বুঝি না? কার নামে ব্যামাক দলিল করিচ্ছে, হামি ইগলান বুঝি না? তোমার বেটাবেটি লাতিপুতি মরলে তুমি খুশি, ব্যামাক সাফ হয়া যাক, তুমি থাকো তোমার জোয়ান বৌ লিয়া।'

তার অভিশাপ পৌঁছে যায় রোগীর ঘরে এবং 'অ বৌ, ধরো তো' বলে পানির বদনা হামিদার হাতে দিয়ে ছোটোবিবি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা হয়ে উঠানে নামে এবং দুই হাত কোমরে রেখে দাঁড়ায় পুবদুয়ারি ঘরের দিকে মুখ করে। তারপর শুরু করে তার একটানা কথা, 'মুখ সামলায়া কথা কও আজিজের মাও। তোমার বুড়ার সম্পত্তিত হামি প্যাশাব করি, প্যাশাব করি।' বলতে বলতে তার কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত সে এমনভাবে দোলায় যে মনে হয়, তার সংকল্পটি এক্ষুনি কার্যকর করতে যাচ্ছে। তবে বর্ষণ না হলেও গর্জন তার চলতেই থাকে, 'হামার বাপের ট্যাকা লিয়া বুড়া কতো জমি কিনিছে, সেই খবর তুমি রাখো? হামার নামে জোত করার কথা কয়া বাপজানের কাছ থ্যাকা ট্যাকা লিয়া দলিল করে লিজের নামে। আজই বুড়া চোখ মোজে তো সম্পত্তি ভোগ করবা তুমি আর তোমার বেটাবেটি।'

শরীরের রাগ ভালোভাবে ঝেড়ে ফেলে ঘরে এসে রোগীর শিয়রে বসে ছোটোবিবি কাঁসার বদনাটা ফের নিজের হাতে নেয় এবং আগের মতো একই ধারায় পানি ঢালতে থাকে হুমায়ুনের মাথায়।

কিন্তু থার্মোমিটারে জ্বর দেখে মুখ অন্ধকার করে আবদুল কাদের আড়চোখে তাকায় হামিদার দিকে, এতো পানি ঢালার পরেও ছেলেটার এতো জ্বর? বিচলিত হয়ে বড়ো বড়ো পা ফেলে খোলা থার্মোমিটার হাতেই সে চলে যায় খানকা ঘরে। সেখানে জলচৌকিতে আসরের কাজা নামাজ পড়তে বসেছে শরাফত মণ্ডল। কাদের দাঁড়িয়ে ছটফট করে। টের পেলেও শরাফতের নামাজের বিরাম নাই, রাকাতের পর রাকাত নামাজ সে পড়েই চলে। অনেকক্ষণ ধরে মোনাজাত করে উঠে দাঁড়িয়ে জায়নামাজ ভাঁজ করতে করতে শরাফত বলে, 'তুমি সাইলেকটা লিয়া যাও। হরেনেক সব বুঝায় বললে হরেনই সাব্যস্ত করবি; আর কোনো ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগে কি-না ওই কয়া দিবি। তবে ওক একবার লিয়া আসবা।' বলতে বলতে শরাফত বারান্দায় যায়। বাইরে উঠানের আমতলায় বুলুর বেটাকে ডাংগুলি খেলার কাঠি চেঁছতে দেখে তাকে সে ধমক দেয়, 'এই ছোঁড়া, খালি খেল্যাই বেড়াস। গোরুর প্যাট ওঠে না কিসক রে? তখন দেখি বকনাটা চারির তলা চাটিচ্ছে, জাবনা কি তোর প্যাটত সান্দাছু?' প্রায় একই স্বরে একটু

নিচু গলায় ছেলেকে নির্দেশ দেয়, 'কামলাপাট লিয়া যাও। কাছারি থ্যাকা আসার সময় দেখলাম অজিত সাইকেল লিয়া পশ্চিমমুখে যাচ্ছে। কালুর বাপ না হয় ঘোড়াটা লিয়া তোমার সাথে যাক। হরেনের সাইকেল ঘরত না থাকলে ওই ঘোড়াত চড়্যা আসবি। হরেন আর বছরও ঘোড়াত কর‍্যাই রোগী দেখবার গেছে, সাইকেল কিনলো তো উদিনকা।'

বাড়ির সামনের পাগাড়ের ওপারে বেগুনখেতে কাজ করছিলো কালুর বাপ। বুলুর বেটা তাকে ডাকতে গেলে হঠাৎ করে হুরমতুল্লার নাতির জন্যে কাদেরের সুপারিশের কথা মনে পড়ে শরাফতের, 'কাদের, তখন তুমি না কার কথা কচ্ছিলা? আরে কী নাম কল্যা? আরে মোসলমান কোন ডাক্তার, ছাইহাটার কোন ডাক্তারের কথা তখন কল্যা না?'

'করিমের কথা কন? আবদুল করিম?' নাম ঠিকঠাক বলতে পারলেও আবদুল কাদের ওই ডাক্তারকে নাকচ করে দেয়, 'না না। বাজান, কী যে কন। হরেন বাবু পুরানা ডাক্তার, আগে দেখুক। খালি খালি নতুন ডাক্তারের কাছে যাওয়া— ।'

'দরকার নাই। তুমি তখন কল্যা, তাই।'

হরেন ডাক্তার পরপর দুইদিন এলো, জ্বর একটু কমে ফের দ্বিগুণ বেগে জ্বর ও কাঁপুনি হতে থাকলে টাউনের রহমত শেখের জোড়া ঘোড়ার ফিটন ভাড়া করে বাড়িতে নিয়ে আসা হলো ডাক্তার শিশির সেনকে। শিশিরবাবুর সঙ্গে এসেছে প্রশান্ত কম্পাউনডার, তার হাতে ডাক্তারের ব্যাগ। গাড়ির পিছে পিছে এসেছে চাষীপাড়ার মানুষ, মাঝিপাড়ার মানুষ। কলুপাড়ার গফুর আর গোলাবাড়ির কিছু লোক তো আছেই। মেয়েমানুষও হাজির হয়েছে মেলা। কোলে কোলে ন্যাংটা শিশুরা এবং সঙ্গে বিপুলসংখ্যক বালক বালিকা। বিলের ওপারের নিজগিরিরডাঙার মানুষও ভেঙে পড়েছে মণ্ডলবাড়িতে। এমন কি মরিচের খেত থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে হাজির হয়েছে হুরমতুল্লা। হুরমতুল্লা কিছুক্ষণ পর পর আবদুল আজিজকে খুঁজে বার করছে এবং নিয়োজিত থাকছে আজিজের ছেলে সম্বন্ধে প্রশংসা করায় এবং তার রোগ নিয়ে আক্ষেপ করায় এবং প্রশংসা ও আক্ষেপকে বিলাপে রূপ দেওয়ায়। টেলিগ্রাম পেয়ে আবদুল আজিজ এসে পৌঁছেছে শিশির ডাক্তার পৌঁছুবার একটু পর; সুতরাং তার টমটমের গতি উদযাপন ও চাকা অনুসরণে উৎসাহী মানুষ বেশি পাওয়া যায় নি।

হুরমতুল্লার মেয়ে এসেছে দুই জন, ফুলজান আর সবচেয়ে ছোটোটা, ফালানি। ফুলজানের কোলে তার ছেলেটি প্রায় সবসময় ঘ্যানঘ্যান করে, মাঝে মাঝে তার কমজোরি কান্না বন্ধ হয় কেবল সে মায়ের ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লে। তমিজ ঘুরঘুর করছিলো প্রশান্ত কম্পাউনডারের পিছে পিছে। কম্পাউনডার বাবুর ভার লাঘব করতে তার হাতের ব্যাগ বহন করার জন্যে সে দুটো হাতই বাড়ালো কয়েকবার। কিন্তু প্রশান্ত তার সেবা প্রত্যাখ্যান করেছে বারবার। এমনি রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয় আর তমিজ এককেবার ভাবে, দূর, এর চেয়ে বরং জমিতে যাই, বিল থেকে নালা কেটে নেওয়ার কাজটা বরং এগিয়ে রাখি। কিন্তু এতো এতো মানুষ, এরকম জোড়াঘোড়ার ফিটন গাড়ি এবং ডাক্তারবাবু, কম্পাউনডার এবং সর্বোপরি তার হাতের ব্যাগের আকর্ষণ তাকে সেঁটে রাখে মণ্ডলবাড়ির সঙ্গে।

হুমায়ুনের অছিলাতেই কয়েক গ্রামের মানুষ মেয়েমানুষকে আল্লা আজ টাউনের বড়ো

ডাক্তার, তার ব্রাহ্মণ কম্পাউনডার, কম্পাউনডারের হাতের ব্যাগ, জোড়া ঘোড়ার ফিটন গাড়ি প্রভৃতি এতো কাছে থেকে দেখার সুযোগ দিয়েছে। সুতরাং হুমায়ুনের প্রতি দায়িত্ব পালনে উচাটন হয়ে তারা ভিড় জমায় রোগীর ঘরের বারান্দায়, বারান্দার নিচে উঠানে, ঘরের দরজায়, এমন কি ঘরের ভেতরে পর্যন্ত। প্রশান্ত নাকে রুমাল চেপে বলে, 'এ কি, তামাশা নাকি? যাও, যাও।' শরাফত, আবদুল কাদের ও হরেন ডাক্তারের ধাক্কাধাক্কিতে লোকজন উঠানে নেমে গেলে শিশির ডাক্তার স্টেথসকোপ দিয়ে হুমায়ুনকে নানাভাবে দেখে আর যতোই দেখে ততোই গম্ভীর হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা চোখে সে তাকায় হরেনের দিকে। হরেন অবশ্য কাল থেকেই ভয়ে ভয়ে আছে। কাল বিকালে বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলেছিলো হুমায়ুন। লুঙিতে রক্তের দাগ দেখে হামিদা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যায় বিছানাতেই। তখনি শিশির ডাক্তারকে ডেকে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই গ্রামে শিশির সেন আজ প্রথম এলেও শরাফত মণ্ডলের ছেলেরা চিকিৎসার জন্যে টাউনে গেলে তার চেম্বারেই ধন্না দেয়। আবদুল কাদের তার মোটামুটি ভালোভাবেই চেনা। এই দুই ভাইকে বারবার নাম ধরে ডেকে ডাক্তার আজ দূরত্বটি কমিয়ে ফেলেছে। হুমায়ুনকে 'বাবা', 'বাবু', 'লক্ষ্মীছেলে', 'এইতো আমার গুডবয়' বললে বাড়ির সবাই ডাক্তারের প্রতি গদগদচিত্ত হয় এবং তার ওপর নিরঙ্কুশ আস্থা পোষণ করতে থাকে।

পুবদুয়ারি ঘরে শরাফতের বড়োবিবি ডাক্তারের মুখ দেখতে না পেলেও রোগীর ঘরের আকস্মিক নীরবতা থেকে হুমায়ুনের বিপদের মাত্রা ঠিক আঁচ করে ফেলে এবং নিয়ম অনুসারে বিলাপ করতে করতে গালি দিতে থাকে শরাফত মণ্ডলকে। এই উচ্চকণ্ঠ বিলাপে প্রথমে বিব্রত ও পরে ক্ষিপ্ত হতে থাকে আবদুল কাদের। তবে মায়ের অসৌজন্যমূলক আচরণে ডাক্তার ও কম্পাউনডারের প্রতিক্রিয়া দেখতেই সে বেশি মনোযোগী ছিলো। ডাক্তারের মুখের রেখা এতোটুকু বাঁকা হয় না, কিন্তু প্রশান্ত কম্পাউনডার তার ফর্সা মুখটাকে বাঁকাচোরা করে বারবার তাকায় উঠানের ওপারে পুবদুয়ারি ঘরের দিকে এবং ডাক্তার শুনতে না পায় এমন স্বরে বিরক্তি ঝাড়ে, 'এরকম চ্যাচালে রোগী দেখা যায়? এগুলো সব কী?'

ডাক্তারবাবুকে সন্তুষ্ট রাখতে তটস্থ ছিলো আবদুল আজিজ। রোগী দেখার পর ডাক্তারবাবুর হাত ধোবার ব্যবস্থা করতে সে নিজেই বারান্দায় পানির বালতি, বদনা ও জলচৌকি নিয়ে আসে। সাবানের জন্যে ডাক্তার প্রশান্তের দিকে হাত বাড়ালে বেচারা ব্যাগ হাতড়াতে হাতড়াতে হয়রান হয়ে পড়ে, নাঃ ব্যাগে সাবান নাই। আজকাল তার এরকম ভুল প্রায়ই হচ্ছে, বাবু এই নিয়ে কথা তুলবে টাউনে গিয়ে। প্রায় কাঁপতে কাঁপতে সে আজিজকে বলে, 'এদিকে দোকান নাই? সাবান পাওয়া যাবে না?'

'সাবান? দিচ্ছি।' বলে আজিজ ঘরে গেলেও প্রশান্তের সংশয় কাটে না, কাদেরকে জিজ্ঞেস করে 'হাটের গোলাপি সাবান? তোমাদের ব্যবহার করা না তো?'

আবদুল কাদেরের ভুরুতে গেরো পড়ে, গেরো-পড়া ভুরুর নিচে চোখজোড়া কুঁচকে সে তাকায় প্রশান্তের দিকে, আবদুল আজিজ এর মধ্যে নতুন লাইফবয় সাবান এনে দিলে ডাক্তারবাবু দুই হাতে সাবান মাখে, বদনা থেকে পানি ঢালে আবদুল আজিজ। প্রশান্তের কানের কাছে মুখ এনে কাদের বলে, 'লাইফবয় চলে তো? নাকি লাক্স, পালমোলিভ লাগবে? কন তো তাই না হয় দেই।'

প্রশান্ত এবার হাসে বাঁকা ঠোঁটে, 'তোমাদের তো এখন দিন! কতো কি আমদানি

হচ্ছে। তোমরা শিশির ডাক্তারকে নিয়ে আসো! ওরে বাবা! বাড়িতে তো বাবু পিয়ার্স ছাড়া মাখে না। তোমাদের ঘরে বুঝি তাও মজুত রাখো, না কি?'

বাইরের ঘরে বসে ডাক্তার নীচু গলায় বলে, 'একটু দেরি হয়ে গেছে শরাফত মিয়া। আমার সঙ্গে কাদের যাক, ওষুধপত্র নিয়ে আসুক। হরেন ইনজেকশনটা পুশ করবে। দেখা যাক।'

কাঁসার মস্ত গামলা থেকে ফুলপাতা আঁকা চিনামাটির বড়ো প্লেটে চামচ দিয়ে পায়েস ঢেলে দিতে কাদেরের বাধো বাধো ঠেকছিলো। কিন্তু দুই চামচ দেওয়ার পর ডাক্তার 'ব্যস' বললে এই খাদ্য গ্রহণে তার সম্মতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে খুশিতে সে আরেক চামচ ঢালে। টাউন থেকে ডাক্তারকে নিয়ে আসার সময় ক্রিম ক্রেকার বিস্কুট ও লিপটনের চা নিয়ে এসেছিলো। পায়েসের পর বিস্কুট কয়েকটা খেয়ে চায়ে লম্বা চুমুক দিয়ে ডাক্তার বলে, 'আঃ! ভেরি গুড!'

কিন্তু ঘরের বারান্দায় বসে-থাকা প্রশান্ত কম্পাউনডারকে কিছুই খাওয়ানো গেলো না। এমন কি কিসের না কিসের হাঁড়িতে জল গরম করেছে এই ভাবনায় সে চা পর্যন্ত ছুঁয়ে দেখলো না। এতে শরাফত বা আজিজ মাথা ঘামায় না। কিন্তু প্রশান্তকে খাওয়াবার জন্যে কাদেরের যেন জেদ চেপে যায়, 'তো কলা চলবে তো? কলায় তো আর জাতের গন্ধ নেই।'

কাদেরের এই উত্তেজনায় ঘরের ভেতর ডাক্তার হেসে ফেলে, কাদেরকে ডেকে বলে, 'কাদের, রাগ করো না। প্রশান্তের ছোঁয়াছুঁয়িটা একটু বেশি। ব্রাহ্মণ সন্তান, আমার বাড়িতেও কিছু মুখে দেয় না, বুঝলে? তুমি কিছু মনে করো না।'

কাদের বাইরে এলে প্রশান্ত গলা নামিয়ে বলে, 'বাবু সায়েব মানুষ, তিনি সবই পারেন। আমরা গরিব বামুন, আমাদের অর্থবল নেই, প্রতিপত্তি নেই, জাতটা গেলে আমাদের আর থাকে কী?'

কাদের বলে, 'জাতপাত নিয়েই থাকেন। আলাদা জাত বলেই তো আলাদা হতে চাই। আলাদা দেশ দিতে আপনাদের এতো গায়ে লাগে কেন?'

ফর্সা ও রোগা প্রশান্ত ফের বাঁকা করে হাসে, 'আলাদা হয়ে থাকতে পারবে? আলাদা হলে তোমার ভাইয়ের চিকিৎসা করবে কে?'

আবদুল কাদেরের তখন রাগ হয় বাপের ওপর, ভাইয়ের ওপর এবং খানিকটা নিজের ওপরেও বটে। স্কুলে লেখাপড়াটা ভালো করে করলেই আই এসসি পড়তে পারতো, তাহলে সোজা মেডিক্যাল কলেজে ঢুকলে ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে আসতো কবে! ম্যাট্রিক পাস করে তো ক্যাম্বেলেও ঢুকতে পারতো। ডাক্তার হতে না পারার দুঃখে আবদুল কাদের কাতর হয়ে পড়ে। নিজেদের মধ্যে ডাক্তার থাকলে এই মালাউন কম্পাউনডারের কাছে আজ তাকে এরকম হেনস্থা হতে হয়? দুটো ভাইকেই ম্যাট্রিক যখন পাস করালোই তখন তার বাপের মাথায় এটা কি ঢুকলো না যে, ফ্যামিলিতে এখন একটা ডাক্তার অন্তত হোক। চাষের জমি বাড়াবার ফন্দি ছাড়া বুড়ার আর কোনো বুদ্ধি খোলে না।—আবদুল আজিজের বড়ো ছেলে বাবর ছাত্র তো খুব ভালো, জয়পুর হাই ইংলিশ স্কুলে হিন্দু ছেলেদের মধ্যেও তার রোল নম্বর হয় ৪/৫। হিন্দু মাস্টাররা কি তাকে ফেল করাবার জন্যে চেষ্টা করে না? তারপরেও তার এই রেজাল্ট। বাবরকে ডাক্তার করতে পারলে এই শিশির সেনেরই পসার নষ্ট হবে। এই তামাম এলাকার মোসলমান

রুগীরা হুমড়ি খেয়ে পড়বে টাউনে বাবরের চেম্বারে। এই বেটা মালাউন কম্পাউনডার তার ফার্মেসিতে চাকরির জন্যে এই কাদেরের সুপারিশ চাইবে। চাইতে পারে না?—ভাইপোকে বড়ো ডাক্তার বানিয়ে শিশির সেনের পসার মারা এবং প্রশান্তকে তার অধীনে চাকরি দেওয়ার সব পরিকল্পনা পণ্ড হয় তমিজের ডাক শুনে, 'ভাইজান!'

চমকে উঠে বারান্দার নিচে তাকালে ভয়ে আঁতকে ওঠে কাদের : একি? তমিজের ঘাড়ের পাশে বিদুঘুটে একটা ঘ্যাগ গজালো কী করে? তারপর বোঝা যায়, ঘ্যাগ নয়, ওটা একটা মুণ্ডু। তমিজের খালি গতরের ওপর ঘাড় থেকে উঠে এসেছে দুটো মাথা। একটি তার চেনাজানা ও বর্তমানে তাদের বর্গাচাষা তমিজের; আর একটার ঘোলাটে চোখ, ফ্যাকাশে তামাটে মুখ জুড়ে কালচে হলুদ ছোপ। তমিজের ঘন কালো ঝাঁকড়া চুল তার দ্বিতীয় মাথাটিতে গড়িয়ে পড়েছে ফ্যাকাশে লাল আঁশ হয়ে। ওই মাথায় ঘোলা চোখের নিভু নিভু মণিজোড়া বেঁধা রয়েছে কাদেরের দিকে। ময়লাজমা ওই দুটো চোখের টিমটিম করে জ্বলা ভোঁতা মণি দুটো সামলানো কাদেরের সাধ্যের বাইরে।

'ভাইজান, ফুলজানের বেটা। হুরমতুল্লার নাতি গো।' নিজের দ্বিতীয় মুণ্ডুটির পরিচয় দিলে প্রথমে মনে হয়, ওটাই আসলে কথা বলছে পরিচিত তমিজের মুখ দিয়ে। ফুলজানের বেটা আস্তে আস্তে কাঁদতে আরম্ভ করলে কাদেরের কাছে দুজনে আলাদা হয়ে যায়। তমিজ বলে, 'ভাইজান, ছোলটার আজ ব্যায়না থ্যাকা খুব জ্বর। উদিনকার লাকান বেহুঁশ হয় নাই, কিন্তু শরীলেত মনে হয় আগুন ধরিছে। জ্বরের মদ্যে চ্যাংড়া খালি হেল্যা হেল্যা পড়ে। ডাক্তারবাবুক একবার দেখাবার চাছিনু।'

শিশুটির দিকে ভালো করে তাকিয়ে কাদেরের গা শিরশির করে। অনেকদিনের কালাজ্বর ও আজকের প্রবল জ্বরে সে পেয়েছে একটা ভূতের চেহারা। কে জানে তার ওপর কারো আসর টাসর পড়লো কি-না। মোষের দিঘিতে কোদালের কোপ পড়েছে, মহাদেব কি আর কোনো দেও তার মুখে ছাই ছিটিয়ে দিলো নাকি? না-কি কাৎলাহারের খানদানি বাসিন্দা চোখ দিলো তার ওপর? এখন এই ভূতের চিকিৎসা করার অনুরোধ সে ডাক্তারবাবুকে করে কোন আক্কেলে?

এই সময় ডাঃ শিশিরকুমার সেন বারান্দা থেকে নিচে নেমে ঘোড়াগাড়ির দিকে রওয়ানা হয়ে একটু দাঁড়িয়ে সাদা বকে-ছাওয়া শিমুলগাছ দেখছিলো অভিভূত চোখে। পাশে তার আবদুল আজিজ। আজিজের চাপাস্বরের তীব্র ধমকে তমিজ সরে যায়, তবে কয়েক মুহূর্তেই সে দাঁড়ায় গিয়ে ফিটনের সঙ্গে জুতে-দিতে-থাকা জোড়া ঘোড়ার পাশে। ফুলজানের বেটা এখন মায়ের কোলে, মাতৃক্রোড়েও তার রূপের হেরফের হয় নি। তবে তমিজ মুক্ত হয়েছে ভৌতিক মুণ্ডু থেকে। তাই কাদের স্বস্তি পায়, স্বস্তির খুশিতে তার বর্গাচাষা ও দলের কর্মীকে কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত জানায়, 'ফুলজানের বেটাক ভালো ঠেকলো না রে। করিম ডাক্তারের কাছে লিয়া যাস। তখন কলাম না? আমার কথা বললে পয়সা কম লিবি। যাস!'

গাড়িতে ওঠার আগে ডাক্তারবাবু আবদুল আজিজের সঙ্গে রোগী সম্বন্ধে শেষবারের মতো কথাবার্তা বলছিলো। গাড়িতে এক কাঁদি শবরিকলা তুলে দেওয়ার তদারকি করছিলো শরাফত মণ্ডল নিজে। ফুলজান ডাক্তারের দিকে এগোবার চেষ্টা করলে শরাফত চাপা গলায় বকে, 'এই বেহায়া মাগী, তফাৎ যা, তফাৎ যা!' একটু তফাৎ যেতেই ফুলজান পড়ে প্রশান্তের সামনে। প্রশান্ত হঠাৎ শিশুটির গায়ে হাত দিয়ে বলে, 'জ্বর তো অনেক রে! চোখ দেখেই আমি বুঝেছি।'

এতোটা লাই পেয়ে ফুলজান গদগদ হয়ে যায়, তার বাড়ন্ত গলগণ্ড থেকে কথা গড়িয়ে পড়ে পুঁজের মতো আঠালো হয়ে, 'ছোলকোনার হামার বারো মাসই ব্যারাম গো বাবা ডাক্তোরবাবু। এ্যানা ওষুধ দিয়া যান গো বাবা। পয়সা হামি সাথথ লিয়াই আসিছি। ওষুধ দিয়া যান বাবা।'

সিকি দুয়ানি একানি কানা পয়সা মিলে সে সাড়ে চোদ্দ আনা পয়সা নিয়ে এসেছিলো। ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে বলে তমিজ তার কাছ থেকে নিয়েছিলো পুরো আট আনা পয়সা, 'পয়সা না দিলে ডাক্তার তোমার ছোলের গাওত হাত দিবি না।' এখন ফুলজানের আঁচলে বাঁধা সাড়ে ছয় আনা। তমিজ তো কিছু করতে পারলো না। এখন নিজেই সে মরিয়া হয়ে এসেছে ডাক্তারের কাছে। ওষুধপত্র যা দেয় এখনি সে কিনে ফেলবে নগদ নগদ, নইলে পরে মাঝির বেটার কাছ থেকে পয়সা কি আর আদায় করতে পারবে?

'দিলি তো দিনটা নষ্ট করে।' প্রশান্ত রাগ করে, 'এখন বাড়ি গিয়ে রাতবিরেতে চান না করে জলটা স্পর্শ করতে পারবো?' শরতের রাতে একটু একটু ঠাণ্ডায় স্নান করার ঝুঁকি নিয়েও প্রশান্ত কিন্তু শিশুটির পেট টেপে এবং এই সিদ্ধান্তে আসে, 'পেটের পিলেটা তো পিপে হয়ে গেছে রে। হরেন বুঝি এই হাল করে দিয়েছে। না কী?'

হরেন ডাক্তারকে অবশ্য কখনো দেখানো হয় নি। ফুলজান তবু তার সন্তানের চিকিৎসা ব্যয়ের একটি হিসাব দাখিল করে, 'ডাক্তোর কোবরাজ কম করনু না বাবা ডাক্তোরবাবু। উদিনকা কয়েস কোবরাজেক দ্যাখানু, লগদ সাড়ে সাত আনা পয়সা খরচ হলো। মহাস্থানের ফকিরের পানিপড়া লিয়া আসিছি জষ্টি মাসোত, বাজানের আসা যাওয়া আর দরগার শিরনি বাবদ গেছে এক পয়সা কম চার আনা। আবার—'

'এই ব্যারাম কতোদিন হলো রে?' প্রশান্ত তাকে থামিয়ে জিগ্যেস করলে ফুলজান বলে, 'ছোল হামার বারোম্যাসা রোগী গো। ছোলকোনা হামার বাঁচবি না!'

'বাঁচবে না কেন?' ডাক্তার সম্বোধনটির মর্যাদা রাখতে প্রশান্ত কম্পাউনডার প্রেসক্রিপশন ছাড়ে, 'ব্রহ্মচারীর ইনজেকশন দিতে হবে। কালাজ্বর এখন সারে, এই ইনজেকশন দিলেই সারে। টাউনে নিয়ে আয়, দিয়ে দেবো। ছেলে তোর ঠিক বেঁচে যাবে।'

ছেলের আয়ুর নিশ্চয়তা পেয়ে ফুলজানের ঘ্যাগে কাঁপন ওঠে, তার মোটা ও তামাটে গালে লাগে রক্তের ঝাপটা। তার মুখের সঙ্গে লাগানো শিশুটির কালচে হলুদ ছোপ-লাগা মুখে ও ঘোলাটে চোখে সেই ঝাপটার ছায়া একটুখানি হলেও পড়ে বৈ কি!

১৩

প্রশান্ত কম্পাউনডারের ভবিষ্যদ্বাণী শিরোধার্য করে ফুলজানের বেটা বেঁচেই থাকে। সারা শরীরের রক্ত চুষে পিলেটা তার নাদুসনুদুস হয়, তার পেট মনে হয় রোজই একটু একটু করে ফোলে। ইনজেকশন তাকে দেওয়া হয় নি। করিম ডাক্তারের কাছেও যাওয়া হচ্ছে

না। আবদুল আজিজের ছেলে হুমায়ুন মারা যাওয়ার পর কাদের কয়েকটা দিন মনমরা হয়ে পড়ে রইলো ঘরেই, সপ্তাহখানেক পর গা ঝেড়ে উঠে লীগের কাজে এতোটাই জড়িয়ে পড়েছে যে তার নিশ্বাস নেওয়ার সময়টুকু নাই। সাইকেলে করে আজকাল তাকে যেতে হয় অনেক দূরের গ্রামে গ্রামে। টাউনেই যেতে হচ্ছে সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন। তার কেরোসিন তেলের বিক্রিও বেড়ে গেছে অনেক বেশি। এই ইউনিয়নে কেরোসিন আর কোথাও মেলে না, কয়েক গাঁয়ের মানুষ কেরোসিন তেল কিনতে ভিড় জমায় তার দোকানের সামনে। দোকানে গফুর কলুর দাপট, গফুর তেল বেচে আর পাকিস্তানের ভাষণ ছাড়ে। লোকের না শুনে উপায় নাই। আর মানুষ দিনরাত খালি এইসব গপ্পেই মেতে থাকে। কাদেরের সঙ্গে ফুলজান ছেলেকে নিয়ে একটু দেখা করার সুযোগ পায় না।

ইনজেকশন সম্বন্ধে তমিজ একটু আধটু খবর রাখে; ছুঁচ একবার ঢোকালে শরীর থেকে সেটা যে ফের বের করা যাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নাই। এ ছাড়া তমিজ ব্যস্তও তো কম নয়। চারপাশে আমন কাটার ধুম পড়ে গেছে। এদিকে আমনের চাষ তো আগে ছিলোই না। বছর তিনেক হলো একটু উঁচু ডাঙা জমি কেউ আর খালি রাখে না, রোপা আমন লাগায়। শরাফত মণ্ডলের গিরিরডাঙার সব জমিতে আমনের ফলন বেশ ভালো। এখানে তার আধিয়ার হামিদ সাদিকার নিজেও মাঝারি গেরস্থ; তার নিজের জমি বেশিরভাগই দোপা বলে আমন সে তেমন সুবিধার করতে পারে নি। কিন্তু শরাফতের জমিতে ধান সে তুলেছে মেলা। নিজের বাড়ির পালান পেরিয়ে বিঘা চারেক জমি শরাফত মণ্ডল কখনো বর্গা দেয় না, চাষ করায় তার বছর কামলাদের দিয়ে। ধান রোপা থেকে শুরু করে কাটা এবং কাটার পর মাড়া এবং তারও পর গোলায় তোলা পর্যন্ত সব সে দেখে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। সেখানে সবচেয়ে উঁচু জায়গাটায়, তা বিঘা দেড়েক তো হবেই, শালি ধানের চাষ করেছে মণ্ডল। কালিজিরা শালি ধানের চাষ এবারেই সে প্রথম করলো। কী করবে?—বেটার বৌয়ের বাপের বাড়ি টাউনের ধারে, চাঁদে চাঁদে তারা পোলাও খায়; বলতে কি, বড়ো বেটা আর বেটার বৌয়ের হাউসেই এই ধান বোনা হলো। সারাদিন ওই ধান কেটে তমিজের নাকে মুখে সারা গায়ে পোলাওয়ের চালের সুবাস।

তমিজের জমিতেও ধান এবার ভালো। কাৎলাহার বিল থেকে নালা কেটে সেঁউতি দিয়ে পানি সেঁচে সেঁচে তমিজ তার জমির চেহারাই পাল্টে দিয়েছে। কার্তিকে জমিতে যে চিড় ধরেছিলো, তা সম্পূর্ণ বুঁজে গিয়ে মাটি সেখানে এই পৌষেও কালো কুচকুচ করে। অথচ দেখো, পাশেই রাস্তার মাটির রঙ সেখানে হাড়ের মতো ময়লা সাদা। জমিতে ধানের গোছা তার বেশ ভারি, শীষের ভারে ধান গাছ নুয়ে পড়ে। ধানের রঙও দিন দিন হচ্ছে পাকা সোনার মতো। পাশ দিয়ে যে-ই যায়, সে বাপু যতো ঝানু চাষাই হোক, কিছুক্ষণ দাঁড়াবেই। আলের ওপর দাঁড়িয়ে শমশের পরামাণিক সেদিন আর চোখ ফেরাতে পারে না। খুশিতে সে ডগমগ, 'মাঝির বেটা, তুই কী করিছু রে? তোর হাতের বরকত আছে বাপু।' তাও তো শীষের ছড়া ছাড়া শমশের আর কিছুই দেখে নি। পাকা শীষ মাথায় করে কালো মাটির দিকে মাজা একটু হেলে দাঁড়ানো পুরুষ্টু ডাঁটিগুলোকে দেখে শুধু তমিজ নিজে। ধানখেত কিন্তু নিজের রঙকে কখনোই সম্পূর্ণ করে দেখায় না; ভোরে শিশিরে এটা টলটল করে, দুপুরবেলা ধানের শীষ থেকে রঙ নিয়ে রোদের তেজ বাড়ে, রোদকে দিয়ে থুয়ে ধানের রঙ হয় একটু ফ্যাকাশে। আবার পৌষের বেলা

তাড়াহুড়া করে হেলে পড়লে এই জমিতেই পড়ে হালকা ছায়া, শীষগুলো তখন তাকিয়ে থাকে নিজের ছায়ার দিকে। তারপর সন্ধ্যায় কুয়াশার ভেতর মাথা গুঁজলে ধানখেতটাকে চেনা যায় না, এটা তখন কার কবজায় বোঝা দায়!

ভোরবেলা শীত পড়ে। পিরানের ওপর একটা কাঁথা জড়িয়েও তমিজের জাড় করে। ধানগাছও একটু একটু কাঁপে। তখন নিজের শিরশির করা আর ধানগাছের কাঁপুনির কোনটা কার তমিজ ফারাক করতে পারে না।

দিনমান শরাফতের অন্য কোনো জমিতে ধান কেটে কিংবা ধান কাটার তদারকি করে হুরমতুল্লা সন্ধ্যার আগে আগে মরিচ খেতে এসে নিড়ানি দেয়, মরিচ গাছের গায়ের ময়লা সাফ করে। বেলা ডোবার পর এদিকে মানুষজন থাকে না, মোষের দিঘির ওপারে হুরমতের বাড়ি থেকে ধোঁয়া ওঠে। হুরমত কিন্তু জমি থেকে ওঠে না। কোনো কোনো দিন হুঁকায় কল্কে সাজিয়ে আনে ফুলজান। একেক দিন তার হাতে থাকে পোড়া মিষ্টি আলু। বাপকে আড়াল করে এক-আধ টুকরা আলু সে এগিয়ে দেয় তমিজের দিকে। কোল থেকে বেটাকে নামিয়ে কুলগাছের গোড়ায় ঠেস দিয়ে বসিয়ে রেখে সে জমিতে হাত লাগায় বাপের সঙ্গে। ঠাণ্ডায় ছেলেটা তার হি হি করে কাঁপে। তমিজ তখন তাকে কোলে নিয়ে নিজের শরীরের ওম দেওয়ার চেষ্টা করে। ফুলজানের বেটা আরামে মাথা ঠেকিয়ে দেয় তমিজের বুকে। বুকটা তমিজের ভার ভার ঠেকে;—এটা কি এই পেট-ফোলা ছেলেটার শরীরের ভারে কি-না সে ঠিক ঠাহর করতে পারে না। মরিচখেতের হালকা কুয়াশার ভেতর থেকে ফুলজান তার বেটা কোলে বসে-থাকা তমিজকে দেখতে পায় কিনা সন্দেহ। দেখলে ভালোই হয়!

হুরমতুল্লার বড়ো বেটির সবই ভালো। সুযোগ পেলেই তমিজের হাতে পোড়া আলুটা, চালের আটার রুটিটা কিংবা ঠাণ্ডা একটা ভাপা পিঠা গুঁজে দেয়। আবার বাপ অন্যমনস্ক থাকলে তমিজকে জমিতে সাহায্য করতেও তার আপত্তি নাই। মেয়েমানুষের নিড়ানির হাত যে এতো ভালো না দেখলে বিশ্বাস হবে না।—সবই ভালো। দোষ তার একটাই।—তমিজকে সে মাঝির বেটা বলে বড়ো হেলা করে। আর একটা দোষ। —কী?—ওই যে শিশির ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ নিতে তমিজকে আট আনা পয়সা দিয়েছিলো সেটা সে এক ঘড়ির জন্যেও ভুলতে পারে না। তমিজ তো সেখান থেকে কিছু খরচও করে ফেললো। না, নিজের জন্যে নয়।—বৈকুণ্ঠকে দিয়ে টাউনের কালীবাড়ি থেকে পাদোদক এনে দিয়েছে দশ পয়সা খরচ করে। দশ পয়সা আর বৈকুণ্ঠ পান খেতে নিয়েছে দুটো পয়সা। টাউনের কালীবাড়ির জবাফুল ধোয়া মায়ের পাদোদক ভক্তি করে খেতে পারলে মরা মানুষও লাফ দিয়ে ওঠে। ফুলজানের বেটার কিছু হলো না। হবে কী করে?—সব নষ্ট করলো ওই শালা কলুর বেটা গফুর। গোলাবাড়ি হাটে একদিন হুরমতুল্লাকে সে শুনিয়ে দিয়েছে, 'মাঝির বেটা তোমার বেটির পয়সা আর ফেরত দিছে! আবার হিন্দুর ঠাকুরের পানি লিয়া আসিছে? আরে, হিন্দুর ঠাকুর, তাঁই মোসলমানের বালামুসিবত আসান করবি কিসক?' এটা শুনে ফুলজানের মনটা বিষিয়ে উঠেছে, পাদোদকে তার আর ভক্তি রইলো না। বেটার ব্যারাম সারে কী করে? এরপর থেকে পয়সা ফেরত পাবার জন্যে ফুলজান খালি ঘ্যানঘ্যান করে। তমিজ কতোবার বলেছে, ধান কাটলেই কড়ায় ক্রান্তিতে সব শোধ করবে। তো শোনে না।

কিছু পয়সা তমিজ এখনি যে দিতে পারে না তা নয়। মানুষের জমিতে জমিতে ধান

কেটে কামাই তার মন্দ নয় এখন। বাড়িতে রাত্রিবেলা রোজ ভাত জুটছে, সকালে পান্তা কি কড়কড়া না খেয়ে বাপ বেটা ঘর থেকে বেরোয় না। এ ছাড়াও এদিক ওদিক থেকে কিছু কিছু আসছে। এই তো, আবদুল কাদের সেদিন গোলাবাড়ি হাটে লীগের ছেলেদের খাওয়াবার জন্যে জিলিপি আর পান বিড়ি কিনতে তমিজকে পুরো একটা টাকার নোটই দিলো, খরচ হলো সাড়ে বারো আনা, বাকি পয়সাটা পরদিন পর্যন্ত তমিজের কাছেই ছিলো। সে নিজে থেকে দুই আনা ফেরত না দিলে আবদুল কাদের মনেও করতে পারতো না। পুরো চোদ্দটা পয়সা রেখে দিলেই ভালো হতো। সোমবার হাটের দিন মুকুন্দ সাহার আড়তে আদার বস্তা উঠিয়ে দিতে তাকে ডেকে নিলো বৈকুণ্ঠ। গোরুর গাড়ি থেকে বারোটা বস্তা নামিয়ে দোকানে উঠিয়ে দিলো সে আর বৈকুণ্ঠ। বস্তা ওঠাবার পর আড়ালে ডেকে বৈকুণ্ঠ তার হাতে তিন আনা পয়সা গুঁজে দিলো। বাবুর কাছ থেকে নিশ্চয়ই আরো বেশি নিয়েছিলো। তা নিক। তিন আনা পয়সাই বা কম কী? সেখান থেকে খামাখা দুই আনা দিয়ে ট্যাংরা মাছ না কিনে ফুলজানকে দিলেও তার ধারের পরিমাণটা একটু কমে যেতো।

আবার হাটবারের একদিন পর নিজগিরিরডাঙায় কামারপাড়ায় শরাফত মণ্ডলের জমিতে ধান কাটা হলো। আধিয়ার যুধিষ্ঠির কামার। হায়রে, কামারের বেটা নিজের জমি নিজেই বর্গা চাষ করলো। আকালের সময় যুধিষ্ঠিরের বাপ ধান নিয়েছিলো জগদীশের কাছ থেকে, সুদে আসলে যা হয়েছিলো তাই শোধ করতে জমি বেচলো সে শরাফতের কাছে। শরাফতের হাবভাব বোঝা দায়। কামারের বেটাকে তার নিজের জমি বর্গা দাও, ভালো কথা, কিন্তু তমিজের বাপের ভিটার সাথে লাগোয়া জমিটা তমিজকে দিতে দোষ কী? তমিজ কি তার বাপ কি আর গোলমাল করার লোক? যুধিষ্ঠির তো মেলা গাঁইগুঁই করলো। কী সমাচার?—না, আঁটি কোবান দিয়েই ধান সে একবার তুলতে চায় মণ্ডলের গোলায়। আঁটি খুলে গোরু দিয়ে মাড়িয়ে খড় দেবে পরে। মণ্ডল রাজি নয়। ভিজে ধান সে নেবে না। আর ধান-ছাড়ানো আঁটি কামারের বাড়ি রেখে এলেই কামারের বেটা পরে ওখান থেকে মেলা ধান বার করবে। হোক সেটা ঘোলানো ধান, তার দাম যতোই কম হোক, শরাফত নিজের ন্যায্য ভাগ ছাড়বে কেন? যুধিষ্ঠিরকে শেষপর্যন্ত জোতদারের কথাই মানতে হয়। কিন্তু এই নিয়ে মণ্ডলের সঙ্গে ছোঁড়া একটু বেয়াদবিই করে এসেছে। আবার মণ্ডলবাড়ির শিমুলগাছের সাদা বকের কয়েকটা নাকি যুধিষ্ঠিরের ওপর উড়ে উড়ে ওদের বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছিলো। এতে মণ্ডল আরো রেগে গেছে। বকের ঝাঁক তো এসেছিলো কামারপাড়া থেকেই, যুধিষ্ঠির কি আবার তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে তুকতাক করছে নাকি? কিন্তু তমিজের বাপ সেদিন রাতে জড়িয়ে জড়িয়ে তমিজকে বলছিলো, নেমকহারাম বকের ঝাঁক আসলে গিয়েছিলো কামারবাড়ির খুলিতে মণ্ডলের ধানের পরিমাণ দেখে আসতে।

তা বাপু, যুধিষ্ঠির আর মণ্ডল যা ইচ্ছা করুক, তমিজের তাতে কী? যুধিষ্ঠির মানুষটা ভালো। কামলাপাটকে পয়সা যা দেওয়ার দিয়েছে, খাওয়া দিয়েছে ভালো। ওখানে ধান কেটে তমিজের পয়সা যা মিললো, তাতে ফুলজানের পয়সা মিটিয়েও মেলা থাকতো। তবে, পয়সা জমানো দরকার। পয়সা এলো, আর একে ওকে দিয়ে আর মাছ কিনে আর বাতাসা কিনে সব উড়িয়ে দিলো, তো গোরু কিনবে কী করে? তবে ফুলজানের চটাং চটাং কথা শুনে একেকবার ভাবে, দুত্তোরি দিয়েই দিই। কিন্তু ফুলজান তখন তার কাছে আর চাইবে কী?

মাঝির বেটা তমিজের সঙ্গে বেটির এইটুকু মেলামেশায় হুরমতুল্লা তেমন গা করে না। হাজার হলেও বেটির তার স্বামী আছে একটা, মানুষ কতো দূর আর বলতে পারবে? নবিতনের ব্যাপারে বুড়া কিন্তু টনটনা, ওর কাছে তমিজকে ঘেঁষতে দেওয়া যাবে না। তবে নবিতন তো একটু ফুটানিওয়ালি, রাতদিন কাঁথা সেলাই নিয়ে থাকে, কিছুদিন বাদে বাদে কাপড় খারে দেয়, চুল আঁচড়ায় রোজ কাঁকই দিয়ে। এইসব মাঝি আর কলু ঘরের পুরুষমানুষকে সে মোটে আমলই দেয় না। সেদিক থেকে হুরমতুল্লা নিশ্চিত। আর তমিজের সঙ্গে হুরমতুল্লা অতো ঠাস ঠাস করে কথাও কয় না। ছোঁড়াটাকে দিয়ে তার উপকার তো কম হলো না। বিল থেকে নালা কাটার কাজটা তমিজ করলো বলতে গেলে একলাই। হুরমতুল্লার মরিচের খেতে ফলন এবার আল্লায় দিলে আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় ভালো হবে। মরিচের যেমন বাড়, তাতে ফাল্গুনেই মরিচ তোলা যাবে। মুকুন্দ সাহা মণ্ডলকে মরিচের দরও মনে হয় ভালোই দেবে।—তমিজ সব ধরতে না পারলেও কিছু কিছু তো আঁচ করতে পারেই। তমিজ দেখে মরিচের খেতে নিড়াতে নিড়াতে হুরমতের চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে আসে। এখন সেটা মণ্ডলের মরিচের লাভের কথা ভেবে খুশির আবেশে না নিজের খাটনির ক্লান্তিতে তা সে বুঝতে পারে না।

তমিজের চোখ খামাখা বুঁজে আসে না, জেগে থাকলে চোখজোড়া তার খোলাই থাকে। কিন্তু আজ শমশের পরামাণিকের জমির ধান কেটে তার বাড়ির নিকানো উঠানে আঁটিগুলো ফেলতে ফেলতে তার বুকটা হঠাৎ ধক করে ওঠে। বুকে অমন ধাক্কা দিলো কে, কেন দিলো কিছু বোঝা যায় না। এরকম আলগা ব্যারাম তো তার কখনো হয় না। কারণটা সে বুঝতে পারলো বাড়ি থেকে ফিরে সন্ধ্যাবেলা ভাত খেতে বসে।

'ক্যা গো, মানষের জমির ধান কাটো, তোমার লিজের ধান তুলবা কুনদিন?' কুলসুমের এই সাদামাটা প্রশ্নে তার সারাদিনের কাঁপুনির কারণ বুঝলো তমিজ। তবে ধান কাটতে তার দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো? হুরমতুল্লা বলে, দেরিতে রোপা হয়েছে, আরো সপ্তাহ খানেকের আগে তার জমির ধান কেটে লাভ নাই। বুড়াকে বিশ্বাস কী? সময় চলে গেলে ধান কেটে খন্দের সর্বনাশ। তার মানে মাঝির বেটাকে বর্গা থেকে উচ্ছেদ করিয়ে ওই জমি হুরমতুল্লা নিয়ে আসবে নিজের চাষে। বুড়া কি কম শয়তান?–তমিজ সারাদিন পর হঠাৎ অস্থির হয়ে ওঠে : জমি ভরা ধান, আর আজ একবারের জন্যেও সে জমিতে যায় নি। সেখানে কার না কার নজর লাগলো, সেখানে কী না জানি হয়ে যাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে তার ঘুম আসে না। কিংবা ঘুমের পাতলা পর্দার নিচে ছটফটট করে। তার বাপ ঘুমায় পাশের ঘরে। ভেতরের উঠানের দিকের ঝাপ খুলে চৌকাঠে বসে একটানা গুনগুন করছে কুলসুম। আধো আধো ঘুমে অথবা তন্দ্রায় অথবা জেগে থেকেও হতে পারে, তমিজ কুলসুমের একঘেয়ে সুরের গীত শোনে,

> সুরুজে বিদায় মাঙে শীতেতে কাতর।
> ধান কাটো ফাটে ভরা শীষের অন্তর॥

একঘেয়ে সুরেই তমিজের মাথার জট খোলে, বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে নেমে পড়ে উঠানে। কুলসুম ওখানে বসে থেকেই বলে, 'এই জাড়ের মধ্যে তুমি কুটি যাও? তোমার বাপের ব্যারাম ধরলো?'

'ইগলান ব্যারাম হামার হয় না ফকিরের বেটি। উগলান ফকিরালি ব্যারাম, তোমার দাদা দিয়া গেছে হামার বাপোক। হামার বলে ধান দেখা লাগবি না?'

'এই জাড়ের মধ্যে যাবা পাথারের মদ্যে? গাওত খালি একটা পিরান, জাড় করবি না?'

'যাওয়াই লাগবি গো। তামান দিন আজ যাবার পারি নাই।'

সে সামনে পা বাড়াতেই তার পিঠে পড়ে কুলসুমের সুতি চাদর। কুলসুম চাদর দিয়ে বলে, 'গাওত দিয়া যাও।'

এই চাদর এবার পাওয়া গেছে আবদুল কাদেরের দৌলতে। পাউডার দুধ, সুতির র‍্যাপার, উলের সোয়েটার, কুইনাইন ট্যাবলেট আর দেশলাই নিয়ে এসেছিলো রেড ক্রসের দল। দলের সর্দার আবার কাদেরের জানাশোনা মানুষ। মুসলিম লীগের টাউনের নেতা। কাদের বলে, 'শিক্ষিত মানুষ, আগে ছাত্রনেতা ছিলো। এখন টাউনে বাপের বাড়িতে আসিছে।' লোকটার বয়স কম, তিরিশ বত্রিশও হবে না। কিন্তু জুলফিতে পাক ধরেছে এখনই। শ্যাম বর্ণের লম্বা মানুষটির গায়ে বোতাম লাগানো লম্বা মোটা পিরান। কাদের বলে, এর নাম আচকান। সেই কালো আচকান আর সাদা পায়জামাপরা লোকটির মুখে প্রায় সবসময় সিগ্রেট থাকলেও তার গলার স্বর ভারী গম্ভীর ও ভিজে ভিজে বলে তার কথা শুনতে ভালো লাগে। সবার সঙ্গেই হেসে হেসে কথা বলতে পারে, এমন কি এই রিলিফ দেওয়ার সময়েই একদিন সে মুকুন্দ সাহাকে ডেকে বলে, 'এই যে সাহামশায়, কলকাতায় আমার নামে কম্প্লেইন করেছেন। আমাকে বললেই তো হতো!' নালিশ মুকুন্দ সাহা করে নি, তার নাম দিয়ে করেছে টাউনের কংগ্রেস নেতা নলিনাক্ষবাবু। তো নালিশটা কী?—গোলাবাড়িতে রেড ক্রসের রিলিফ দেওয়া হচ্ছে মুসলিম লীগ অফিস থেকে। কাদেরের দোকানে লীগের সাইনবোর্ড। রেড ক্রসের মাল, নাম হবে মুসলিম লীগের। এটা কেমন কথা? এই নালিশ সম্বন্ধে মুকুন্দ সাহা কিছু বলার আগেই রেড ক্রসের ওই লোক বলে, 'বেশ তো আপনার ঘরে জায়গা দিন না! আপনি কংগ্রেস, মহাসভা যার সাইনবোর্ড টাঙান আমার আপত্তি নেই। আমতলি থানার কাছে ধীরেনবাবুর ঘরটা চাইলাম, সেখানে তো কংগ্রেসের আখড়া। আমার কোনো আপত্তি নেই, লোকে রিলিফ পেলেই হলো। তো ধীরেনবাবু রাজি হলেন না। এখানে কাদেরের দোকানে জায়গা পেলাম। বাধা দেবেন, অথচ জায়গাও দেবেন না, এ কেমন কথা?'

মুকুন্দ সাহা সুরসুর করে সরে গেলে কিছুক্ষণ পর আসে বৈকুণ্ঠ গিরি এবং তার জন্যে সুপারিশ করে কাদের, 'ইসমাইল ভাই, সাহার আড়তে কাজ করলে কী হবে, এই চ্যাংড়াটা ভালো।' ইসমাইল হোসেন তাকে সুতির চাদর আর একটা উলের সোয়েটার তো দেয়ই, তার বাবুর জন্যেও পাঠিয়ে দেয় একটা ভালো সোয়েটার। পাউডার দুধ নিয়ে বৈকুণ্ঠ রেখে দিলো কাদেরের দোকানেই, 'বাবু আবার বিলাতি দুধ দেখ্যা কী বা কয়!' সুতির চাদরের ওপর সোয়েটার চড়িয়ে বৈকুণ্ঠ হাটময় টহল দিয়ে বেড়াতে লাগলো। সোয়েটার কিন্তু তমিজকে দেওয়া হলো না। কাদের বলে, 'সোয়েটার পরলে এসব মানুষের গা কুটকুট করবে।' দুধের টিনটাও রেখে দিলো কাদের, 'ইগলান বিলাতি দুধ, খাবার পারবি না। তুই বরং দুইটা চাদর লে। একটা তোর বাপকে দিস।' বাপকে সবুজটা দিয়ে নিজের খয়েরি চাদরটা তমিজ দিয়ে দিলো কুলসুমকে। একদিন গায়ে দিয়ে কুলসুম সেটা রেখে দিয়েছিলো এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ির ভেতর।

আজ সেই চাদর গায়ে জড়িয়ে কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথান ঘুরে তমিজ নিজের জমিতে পৌঁছুলো, গিরিরডাঙায় তখন অনেক রাত্রি। চারদিকে ধানের জমি, বেশিরভাগ জমিতে ধান কাটা হয়ে গেছে। এর ফাঁকে ফাঁকে মরিচের খেত। চারদিকে ফসল, না হয়

ফসল কাটার চিহ্ন। মোষের দিঘি থেকে পানি খেয়ে ছুটে পালিয়ে গেলো বিলের উত্তর সিথানের কয়েকটা শেয়াল। মুনসির তাপে এরা রাতে বিলের পানিতে মুখ লাগাতে পারে না। শেয়ালগুলো চলে গেলে তমিজ একেবারে একা।

দিঘি, এদিকে মাঠের পর মাঠ, ওপরে আকাশ পর্যন্ত কুয়াশা জড়ানো চাঁদের আলো। তমিজের জমিতে পাতলা কুয়াশা টাঙানো রয়েছে মশারির মতো, মশারির ভেতরে চুঁয়ে-পড়া আলোয় তার ধানগাছগুলো ঘুমিয়ে রয়েছে মাথা ঝুঁকে। চাঁদের আলো এই ধানখেতে ঢুকে আর বেরোয় না, ধানের শীষে গাল ঘষতে ঘষতে ধানের রঙ চোষে চুকচুক করে। আবার আলো পোয়াতে পোয়াতে ঘুমায় সারি সারি ধানগাছ।

নয়ন ভরে নিজের জমি দেখতে দেখতে হঠাৎ করে সে চোখ ফিরিয়ে নেয়, ধানখেতে তার নজর লাগলো না তো? কিন্তু মরিচের খেতে নজর পড়তেই তমিজের সারা শরীর থমকে গেলো, আবার শরীরটাকে স্থির রাখাও কঠিন হয়ে পড়ে, বুকের ভেতর থেকে হিম বাতাস বেরোয়, ভয়ে তমিজ তার শিসটা পর্যন্ত শুনতে পায় না। এই চাঁদনি রাতে হুরমতুল্লার মরিচের খেতে হানা দিতে এসেছে সে কোন জীব?

বিলের উত্তর থানের মুনসি কি তার মাছেদের আধার জোগাড় করতে এখানে এসে হাজির হয়েছে নিজেই। তমিজ তো ওইদিক দিয়েই এখানে এলো। কৈ কিছু তো মনে হলো না। পাকুড়গাছের নিচে নিয়ে এলে হয়তো চোখে পড়তো। পাকুড়গাছের তলায় তো সে যায় নি, দেখবে কোত্থেকে? পাকুড়তলা আরো উত্তরে। গাছটা কি তমিজ কখনো দেখেছে? তার মনে পড়ে না বলে ভয় আরো বাড়ে, হুরমতুল্লার জমির ওই প্রাণী তা হলে মুনসির কেউ না-ও হতে পারে। আরো অপরিচিত, একেবারেই অচেনা কোনো কিছুর ভয়ে তমিজ যখন চোখ বন্ধ করে ফেলেছে তখন তাকে উদ্ধার করে হুরমতুল্লার কাশির আওয়াজ।

এই শীতের রাতেও বুড়ার চোখে ঘুম নাই। এখন সে এসেছে জমির তদবির করতে বুঝতে পেরেই তমিজের মনে পড়ে, কার্তিক মাসে এভাবেই সে পানি টেনে দিয়েছিলো তার জমি থেকে। তখন তো তার সঙ্গে ছিলো ফুলজান। এখন সে আসে নি? আসে নি কেন? নিজের ধানখেত ও হুরমতুল্লার মরিচখেতের মাঝখানে আলের ওপর দাঁড়িয়ে সে এদিকে ওদিক দেখে। আল্লার কী কাম, ঠিক সেই সময়েই এসে হাজির হলো ফুলজান। মোষের দিঘির ধারে এসেই সে 'বাপজান' বলে হাঁক দেয়। তার ডাক কেঁপে কেঁপে ওঠে, তমিজকে ছায়ার মতো ঠেকছিলো বলে সে হয়তো একটু ভয়ই পেয়েছে। কুয়াশা ও চাঁদনিতে তার কালো গতরটা সাদাটে কালো দেখায়, বলতে কি তার গায়ের রঙ এখন ফর্সার ধার ঘেঁষে।

কাছে এসে তমিজকে দেখে ফুলজান খুব অবাক, তবে তার বিস্ময়কে ছাপিয়ে ওঠে তার বদ খাসলত, 'ক্যা, গো, হামার পয়সাটা দিলা না? ধান কাটিচ্ছো সারা মুল্লুক জুড়্যা, পয়সা তো ভালোই কামাচ্ছো। খালি হামার হাওলাতটা শোধ করতে তোমার পাছা কামড়ায়, না?'

এইসব শুনেও তমিজের পাছা কেন, কোনো অঙ্গই একটুও কামড়ায় না। বরং তাকে পুরো আট আনা, আট আনাও নয়, বারো আনা পয়সা দিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। একটু তাড়াহুড়া করেই সে বলে, 'কাল দেমো। কালই দেমো। সুদও না হয় দেমো।'

'মাঝির কথার কোনো ঠিক ঠিকানা আছে?' বলতে বলতে ফুলজান বাপের দিকে

এগুলে হুরমতুল্লা বলে, 'আর অল্প এ্যানা জায়গা সাফ কর্যা উঠিচ্ছি। কতোক্ষণ লাগবি?' পাঁচুন দিয়ে জমির আগাছা তুলতে তুলতে সে আপনমনে বলে, চাঁদের আলো যখন আছে তখন কাজ করতে আর আপত্তি কী? আল্লা সুরুজ দিয়েছে মানুষের চাষবাসের সুবিধা হবে বলেই তো। আর যেসব রাতে আল্লা চাঁদ জ্বালিয়ে দেয় সেসব হলো কাজের রাত্রি, চাঁদনি রাতে রাতভর কাম করো।—আল্লার প্রতি শোকরানা গুজার তার চাপা পড়ে হঠাৎ কাশির দমকে।

ফুলজানও হঠাৎ বাচাল হয়ে ওঠে, গোঁ ধরার মতো করে বলে, 'না বাপজান, ঘরত যাও। কাল বেনবেলা বেলা ওঠার আগেই যাওয়া লাগবি গিরিরডাঙা, মণ্ডলবাড়ি থ্যাকা মানুষ আসিছিলো।'

আল্লা চাঁদটাকে নিভিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত হুরমতুল্লা উঠবে না বলে স্থির করেছিলো। কিন্তু ফুলজান তার পাশে বসে হাত থেকে পাঁচুনটা টেনে নিয়ে বলে, 'এখন ওঠো। তোমার না আজ বেনবেলা জ্বর আসিছিলো। কাল ব্যায়না পান্তা খায়ো না। কড়কড়া আছে, ত্যাল মরিচপোড়া দিয়া নবিতন ম্যাখ্যা দিবি, তাই খায়া যায়ো। তুমি যাও। তোমার পাঁচুন হুঁকা আর হোঁচা হামি লিয়া আসিচ্ছি।'

বড়ো মেয়ের এরকম আদুরে কিসিমের হুকুম হুরমতুল্লা জীবনে শোনে নি, বাপের ঠাণ্ডা লাগায় এমন উদ্বিগ্ন হওয়া কি আর এই মেয়ের ধাতে আছে? এ রকম সোয়াগের কথা বলে তার মেজোমেয়ে নবিতন। হুরমতের কাশি তো সবসময় লেগেই থাকে, আবার শীত বাড়ার সাথে সাথে ঘুসঘুসে জ্বরও তার নতুন কিছু নয়। ফুলজানের ঘ্যাগ থেকে গলা হয়ে বেরুনো এরকম আদরে সোয়াগে হুরমতুল্লার কাছে তার নিজের শরীর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, সত্যি সত্যি সে উঠে দাঁড়ায়। 'তাড়তাড়ি আয়।' বলে হুরমতুল্লা রওয়ানা হলে তার টলোমলো পা দেখে বোঝা কঠিন, সে কি আসন্ন জ্বরে কাঁপছে, না-কি ফুলজানের আদরে বিচলিত হয়ে পড়েছে।

ফুলজান কিন্তু পাঁচুন হোচা গুছিয়ে নিয়েও ওঠে না। হুরমতুল্লা তার দিকে পেছন ফিরে তাকালে সে ফের ওইরকম আদুরে হুকুম ছাড়ে, 'তুমি যাও। হামি আসিচ্ছি।' মেয়ের আদরের ঠেলায় কিংবা একবার কাজ ছেড়ে ওঠায় জ্বর তার হয়তো চেপে এসেছে বলে হুরমতুল্লা টলতে টলতে বাড়ির দিকে চলে যায়। ফুলজান আর একটু জায়গার আগাছা সাফ করতে নিড়ানি শুরু করে।

পাঁচুন দিয়ে ঘাস আগাছা কাটার কুচকুচ আওয়াজে ঘোড়ার ঘাস খাবার আভাস পেয়ে তমিজের পায়ের পাতা তিরতির করে কাঁপে এবং এই চাপা গতি দিয়ে সে যে কী করবে ঠিক বুঝতে পারে না। তার এক পাশে মরিচ খেত, মরিচ খেত ঢাকা রয়েছে পাতলা কুয়াশার মশারিতে, এর ভেতরে ঢুকে পড়ে চাঁদের রঙ আটকা পড়েছে অন্যরকম রঙে। এর সঙ্গে তার ধানখেতের ফারাক অনেক। মরিচ খেতে ঢুকে জ্যোৎস্না হয়ে গেছে হলদেটে সবুজ। ছোটো ছোটো ঝোপে জবুথবু হয়ে বসে জ্যোৎস্না অতি ধীরে তার বেগ সামলায়। এই অতি অল্প বেগে সবুজ সবুজ মরিচ একটু করে বাড়ে, সেই বাড়া এতোই ধীর যে এক মরিচ ছাড়া তা দেখার সাধ্যি আর কারুর নাই। তবে হুরমতুল্লা হয়তো টের পায়। বাপের কাজ থেকে সেটা টের পেতে শিখেছে হয়তো ফুলজান। ঘাস আগাছা কাটার কুচকুচ বোলে মরিচগুলো আরাম পায়, তারা বাড়ে আরেকটু তাড়াতাড়ি। তমিজের হাউস হয়, কুয়াশার মশারির মধ্যে ঢুকে সে-ও এই নিড়ানিতে ফুলজানের

শরিক হয়। মশারিটা ভালো করে গোঁজা আছে, সে ঢুকলেও চাঁদের আলো এর ভেতর থেকে সহজে বেরুতে পারবে না। তার ধানখেতের আলো যদি মিশে যায় এই মরিচের খেতের সাথে তো রাতভর দুজনে খালি জমির খেদমতই করবে। এখানে এক সাথে কাজ করলে ধান কাটার পরও ফুলজান তার পাশে পাশেই থাকতো। তমিজের জমিতে কাজের কী আর অভাব হবে? আমন উঠলে তমিজ তো আরও জমি বর্গা নিচ্ছে। তার ফসলের ফলন দেখে মণ্ডল কি তাকে জমি বর্গা না দিয়ে পারে?—তাকে জমি দিতে পারলে মানুষ বর্তে যাবে গো! দুই তিনটা খন্দ করতে পারলেই ভিটার লাগোয়া জমিটা মণ্ডলের কাছ থেকে কিনতে না পারুক, খাইখালাসি তো নিতে পারবে। ভিটার জমি, বাড়ির পেছনে বেরোলেই পা পড়ে সেই জমিতে। ফুলজান তখন আসতে পারে, পানি নিতে পারে, নিড়ানি তো দেবেই।—চাঁদ ও কুয়াশায় তার বাড়ি ও হুরমতুল্লার বাড়ি এবং কুলসুম ও ফুলজান সব মিলিমিশে যাচ্ছে।—তা মেয়েটা তার যখন এতোই করবে তো আর মরিচখেতে তমিজ কি একটু হাত লাগাতে পারে না?

কিন্তু আলের ওপর তমিজ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই মরিচের খেতের সব জ্যোৎস্না গলগল করে বাইরে আসার সুযোগ করে দিয়ে কুয়াশার মশারি তুলে বেরিয়ে আসে ফুলজান। তার বাঁ হাতে বাপের হুঁকা ও পাঁচুন এবং ডান হাতে ঘাস আগাছা ফেলার হোঁচা। সে তো এর চেয়ে অনেক অনেক বেশি জিনিস বয়ে নিয়ে হেঁটে বাড়ি যায়। তাহলে হয়তো শীতে সে নুয়ে নুয়ে পড়ছে, এখন নুয়ে একটু কাঁপতে কাঁপতে ফুলজান আল ধরে হাঁটতে লাগলো। মরিচ খেতের এখন সবটাই আন্ধার, ফুলজান খেত থেকে বেরুতে চাঁদনির সবটাই বার করে দিয়েছে। কিন্তু এই আল, আল পেরিয়ে মোষের দিঘির উঁচু পাড় সব চাঁদের আলোয় ফকফক করে। কেউ যেন চালের আটা গুলে ঢেলে দিয়েছে তামাম পাথারে, সবই দেখা যায়, কিন্তু চোখে ক্যাটক্যাট করে লাগে না।

সবই ভালো। হুরমতুল্লার বেটিরও সব ভালো, কিন্তু তমিজের কাছে তার কয়েক আনা পয়সার দাবি তুলছে না, একেবারে চুপচাপ হাঁটছে বলে তমিজ উসখুস করে। আগামীকাল পয়সা ফেরত পাবার ওয়াদা পেয়েই কি তার উদ্বেগ শেষ হয় গেলো? তমিজ আস্তে আস্তে বলে, 'পয়সাটা আর কয়েদিন বাদে লেওয়া যায় না?'

'কয়টা দিন বাদে?' বলে ঠোঁটে একটুখানি বাঁকা হাসি ফুটিয়ে ফুলজান তমিজের দিকে কেবল একবার তাকায়। তার চোখজোড়ার চেয়ে বাঁকা ঠোঁটটাই তমিজের চোখে সেঁটে থাকে অনেকক্ষণ, বলতে গেলে সারা রাত জুড়ে। তমিজ বোঝে চারদিকের এই চালের আটা গোলা আলো আসলে আসে ওই ঠোঁট থেকে। আসমানের চাঁদের সাধ্য কি এই ফকফকা আলোয় দুনিয়া ভাসিয়ে দেয়? আকাশের দিকে তাকিয়ে তমিজ দেখে সেখানে চাঁদের চিহ্নমাত্র নাই। তাহলে এতো আলো কি এমনি এমনি আসে? মেয়েটাকে তার একটু ভয় ভয় লাগে, আবার তার পাশ থেকে তার সরতেও ইচ্ছা করে না। তমিজ তাই আস্তে আস্তে বলে, 'ধানটা উঠলেই দিমু। না হয় কয়টা পয়সা বেশিই দিমু।'

ঠোঁটে চাঁদ জ্বালিয়ে রেখেই ফুলজান ফের হাসে, 'উগলান ঢঙের কথা থোও মাঝির বেটা। পয়সা হামার দরকার, বোঝো না? ছোলেক লিয়া হামি ডাক্তোরের কাছে যামু।' বলতে বলতে ফুলজান আরো কাঁপে, চারদিকের আলোও কেঁপে কেঁপে ওঠে।

ফুলজানের বেটার রোগের কথায়, না-কি তার কাঁপুনিতেই কে জানে, তমিজের বুকের ভেতরে তোলপাড় করে ওঠে। নিজে ঠিক ধরতে না পেরে 'তোমার খুব জাড়

করিচ্ছে, না?' বলে সে তার গায়ের সুতির র‍্যাপারটা ফেলে দেয় ফুলজানের পিঠে। ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে ফুলজান চাদরটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে বলে, 'ছোল বুঝি হামার বাঁচে না গো!' তার কথায় একটু ফোঁপানিও থাকে, 'আজ সাঁজবেলাত মুখোত ভাত তুললো না। একটা নওলা ভাতও যদি খাবার পারে!'

শুনে ফুলজানের ছেলের প্রতি গভীর দায়িত্ববোধে তমিজের মাথা ভারী হয়ে আসে। আবার ওই ভারী মাথায় তার ফুরফুরে হাওয়া খেলে যায় : আবদুল কাদেরকে তার এতো তোয়াজ করার দরকার কী? সে নিজেই না হয় ফুলজানের বেটাকে নিয়ে যাবে ছাইহাটার করিম ডাক্তারের বাড়িতে। তার জমির ধানটা কাটা হয়ে যাক। এইতো দুই ক্রোশ আড়াই ক্রোশ রাস্তা। সোজা চলে যাবে খুতিতে পাঁচটা টাকা নিয়ে। সে হাঁটবে এক পা আগে, পিছে পিছে চলবে ফুলজান, কোলে বেটা।

এখন অবশ্য ফুলজান চলছে তার পাশ ঘেঁষে। খয়েরি রঙের চাদরে শরীরের সবটা জড়িয়ে নেওয়ায় তার হলুদ ঘোমটা আলাদা করে বোঝা যাচ্ছে। তার কপালে এসে পড়েছে তার ঠোঁটের আলো।—আহা। বিমারি একটা বেটাকে এর কোলে ফেলে পাষণ্ড স্বামীটা কোথায় উধাও হয়ে গেলো, লোকটার কি একবার এর কথা মনেও পড়ে না? বিমারি ছেলেকে নিয়ে সে এখন রাত নাই দিন নাই খেটে মরে বাপের বাড়িতে। তার ছেলের চিকিৎসা করলে সে একটু আরাম পায়। আবার ওই পাষাণহিয়া হারামজাদাটকে ভালো একটা কোবান দিতে পারলেও এর জানটা ঠাণ্ডা হয়। এই দুটো কাজ করতেই তমিজ প্রস্তুত। এই সংকল্প মনে দৃঢ়ভাবে পোষণ করতে না করতেই ছয় ক্রোশ দূরের যমুনা নদীর সাত স্রোত উনপঞ্চাশ ঢেউয়ের ভেতর থেকে পাক খেয়ে বেরিয়ে বাতাসের একটা ঘূর্ণি উড়তে উড়তে বাঙালি নদীতে ভিজে একটু দুর্বল হয় এবং ডাঙায় খানিকটা আর্দ্রতা ঝেড়ে ফেলে ঝাপটা মারে নিজগিরিরডাঙার মোষের দিঘির উঁচু পাড়ে এবং সেই ঝাপটায় তমিজ তো বটেই, এমন কি রেড ক্রসের চাদর গায়ে জড়ানো ফুলজানও হিহি করে কাঁপে। এ ছাড়াও পেট-মোটা, সরু হাত পা এবং হলুদ চোখে নিভু নিভু মণি ছেলেটির ভাবনাতেও তারা কাঁপতে পারে। তমিজ এতোটাই কাঁপতে শুরু করে যে, তার শরীর আর নিজের দখলে থাকে না। তার হাত থেকে পড়ে যায় ফুলজানের বাপের হোঁচাটা এবং ওই হাতটাই হয়তো কাঁপতে কাঁপতেই পড়ে গিয়ে ফুলজানের পিঠে। নিজের ঢ্যাঙা কালো শরীরটার সবটা নিয়েই সে পড়ে যাচ্ছিলো। তবে তার আগেই সে জড়িয়ে ধরে ফুলজানকে। ফুলজানের ঠোঁট থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসছে জ্যোৎস্না। এমন কি জ্যোৎস্নার পেছনে আগুনের শিখায় আঁচ লাগে তমিজের সারা মুখে। সাদা কেরোসিন পাওয়া যায় না, ফুলজানের ঠোঁটের আলো জ্বলে লাল কেরোসিনে, তার ঝাঁঝে তমিজের মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করে ওঠে। তবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফুলজানের উঁচু বুক তার বুকে ঠেকলে সে বেশ আরাম পায় এবং ফুলজানের বুকের বেদনা অথবা তার স্তনজোড়া কিংবা দুটোই তমিজের গোটা শরীর জুড়ে প্রবল কোলাহল তুলতে থাকে। ফুলজানের আলো-জ্বলা ঠোঁটে তার ঠোঁট লাগাবার চেষ্টা করলে ফুলজান মুখ সরিয়ে নেয়, তখন তমিজের খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা গালে লাগে ফুলজানের ঘ্যাগ। এতে তার শরীরের কোলাহল কিছুমাত্র কমে না। ঠোঁটের আলো চুমুক দিয়ে সে নিতে পারে নি বটে, তবে এর মানে বোধহয় এ নয় যে, ফুলজান তাকে ফিরিয়ে দিলো। কারণ তার ঘ্যাগে তমিজের প্রবল চাপে মুখ ও গাল ঘষায় সে কৈ, কোনো আপত্তি করলো না তো।

তমিজের শরীরের উত্তাপ, উত্তেজনা ও উৎসাহ বাড়তে থাকে সমান তালে। ধানখেতের কয়েক হাত তফাতে মোষের দিঘির উঁচু পাড়ের পুব দিকের ঢালে তমিজ তাকে জড়িয়ে ধরে শোবার উদ্যোগ নিলে কোনোরকম জোর না খাটিয়ে ফুলজান যে কীভাবে তার হাতের ভেতর থেকে বেরিয়ে গেলো তমিজ কিছুই বুঝতে পারলো না। বেরিয়ে পড়েই সে যেন মিলে গেলো পাথারের ভেতর। সে কি জ্যোৎস্না হয়ে মিশে গেলো জ্যোৎস্নার মধ্যে?

'মাঝির বেটা, আসমানেত ছ্যাপ ফালাবার হাউস করিস কোন সাহসে?' ফুলজানের গলায় এই কথা সে শুনতে পায়, তবে সেটা তমিজের হাতের ভেতর সে থাকতে থাকতে না হাত থেকে গলিয়ে যাবার পর, তার খেয়াল নাই।—আরো ব্যাপার আছে।—ফুলজানের এই ছিছিক্কার মোষের দিঘির ধার থেকে তার কানে বাজে অনেকক্ষণ পরে। মোষের দিঘির পাড়ে ফুলজান হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেলে হাঁপাতে হাঁপাতে টলোমলো পায়ে তমিজ ঢুকে পড়ে নিজের ধানখেতে। সারা গায়ে তখন তার অবসাদ, হাতপা সব ঝিমঝিম করছে, তার সর্বাঙ্গে তখন ঝিঁ ঝিঁ ধরেছে। ধানের জমিতে ধপ করে বসে পড়ারও বেশ কিছুক্ষণ পর ফুলজানের কথা মরিচখেত হয়ে কচি মরিচের ঝাল মেখে নিয়ে তার দুই কানে দুটো চড় লাগালো। এতে তমিজের অবসাদটা কাটে, হাতে পায়ে ঝিঁ ঝিঁ কেটে গিয়ে সারা শরীর জ্বলতে লাগলো। তার অস্থির হাতের মুঠিতে গোছা গোছা ধানের শীষ ঢুকেও পিষে যায় না। গোছা ধরে ধানের শীষ তার খেউরি-না করা গালে ঘষতে সে বেশ আরাম পায়। তবে কয়েকটা শীষের মধ্যে থেকে ধানের দানা পড়ে গেলে তার ভয় হয়, ধান কাটতে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো?

বিলের উত্তর সিথান এড়াতে কিংবা নৌকায় বিল পাড়ি দিতে তমিজ রওয়ানা হয় দক্ষিণের দিকে। কিন্তু মণ্ডলের কোষা নৌকাটা বিলের ওপারে ফকিরের ঘাটে বাঁধা। তাই তাকে হাঁটতে হয় বিলের দক্ষিণ ধার ঘেঁষে। কিন্তু তার চোখ বিলের ওপারে। হাঁটতে হাঁটতে দেখে, একটি ছায়া চলেছে তার সঙ্গে সঙ্গে। গোটা বিল পার হয়ে তার ছায়া পড়বে বিলের ওপারে—এটা কি কখনো হতে পারে? না, ওই ছায়াটি তার নয়। ছায়া ছায়া মানুষটির ঘাড়ে তৌড়া জাল। ছায়া চলেছে উত্তরের দিকে। ভয়ে ও খানিকটা আশায় ভালো করে ঠাহর করলে তমিজ বোঝে, ওটা ছায়া নয়, লোকটি তমিজের বাপ। বাপ তার ঘুমের মধ্যে হেঁটে চলেছে উত্তরের দিকে। বিলের ওপারে তমিজের বাপ সুরা পড়ার মতো বিড়বিড় করে কী বলে; আর বিলের রুই কাৎলা, পাবদা ট্যাংরা, খলসে পুঁটি, কৈ মাগুরের নিশ্বাসে প্রশ্বাসের বুদবুদে টাটকা হয়ে বিলের পানিতে ডুবসাঁতার দিয়ে সেইসব কথা এসে ভেড়ে বিলের পূর্ব তটে। দাঁড়িয়ে একটু মনোযোগ দিলেই তমিজ তার বাপের সব কথা শুনতে পায় :

সুরুজে বিদায় মাঙে শীতেতে কাতর।
শীষের ভিতরে ধান কাঁপে থরথর॥
পশ্চিমে হইল রাঙা কালা পানি অচিন ডাঙা
ফকিরে করিবে মেলা রাত্রি দুই পহর।
ধানের আঁটি তোলো চাষা মাঝি ফেরে' ঘর॥

জীবনে কখনো শুনেছে কি-না মনে করতে না-পারা এই লম্বা শোলোকের প্রতিটি অক্ষরের ঠেলায় ঠেলায় তমিজ বাড়ি পৌঁছে গেলো বেশ তাড়াতাড়ি। তার বাপের ঘরের দরজা খুলে দিয়ে কুলসুম একটু সরে দাঁড়িয়ে বলে, 'এতো আতেত তুমি কোটে গেছিলা গো? তোমার বাপের ব্যারাম তোমাক ধরিছে?' দরজায় বাঁশের ডাঁশা লাগাতে লাগাতে সে হাসে, 'আজ তুমি কোটে কোটে ঘোরো আর তোমার বাপ নিন্দ পাড়ে ঘরের মধ্যে।'

চোপসানো বুকে তমিজ ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজ করে, 'তাঁই ঘরত?'

'তো?'

ঘরের ভেতর দিয়ে ভেতরের বারান্দায় গিয়ে তমিজ তখন ঢুকছিলো নিজের ঘরে। কুলসুমের কথা শুনে বাপের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলো, মাচার ওপরে বাপ তার শুয়ে রয়েছে কাঁথা মুড়ি দিয়ে। তাহলে? বিলের ধারে ধারে তৌড়া জাল কাঁধে হাঁটতে হাঁটতে তাহলে শ্লোক বলছিলো কে? বাপকে তমিজ এভাবে ঘুমিয়ে থাকতে দেখায় এবং শোলোকের একটি কথাও মনে করতে না পারায় তার সামনে থেকে ছোট্টো উঠানের জ্যোৎস্না নিভে যায়। সে তখন ঢুকে পড়ে নিজের ঘরের ভেতর। তারপর কাঁথা গায়ের ওপর দিয়ে শুয়েছে কি শোয় নি, কুলসুম হঠাৎ জোরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'হামার গিলাপ? গায়ের লয়া কাপড়খান হামার কুটি ফালায়া আসিছো?'

কুলসুমের ব্যাকুল জিজ্ঞাসার জবাবে তমিজের মাথা পড়ে যায় তেলচিটচিটে বালিশের ওপর। আর নতুন সুতির ব্যাপার নিয়ে উদ্বেগ ও আক্ষেপ জানাতে জানাতে কুলসুম করে কী, তমিজের মাথার কাছে নাক দিয়ে খুব টেনে টেনে নিশ্বাস নিতে থাকে। যতোটা তীব্রভাবে পারে, নিশ্বাস নিয়ে তমিজের মাথার গন্ধে গন্ধে নতুন গিলাপের হদিস সে করে ছাড়বে। তমিজের মাথায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে, এটা কী? সেই ছোঁয়ায় তার চোখ বুঁজে আসে। একটু-আগে-শোনা ও এখন ভুলে-যাওয়া শোলোক, সুর করে শোলোক বলতে বলতে তার বাপের উত্তরের পানে যাওয়া এবং সেই বাপেরই আবার কোথাও না গিয়ে ঘরের মাচায় ভোঁস ভোঁস করে ঘুমানো,—এতোসব এলোমেলো কাণ্ড এড়াতেই সে হয়তো চলে যাচ্ছে ঘুমের আড়ালে। কিন্তু ঘুমের একটা পরত পেরিয়ে পরের পরতটিতে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে মরিচখেতের মশারি খুলে গলগল করে বেরিয়ে আসে চালের আটা গোলানো চাঁদনি, সেটা আবার দপ করে জ্বলে ওঠে মোষের দিঘির পুব পাড়ে। সেখান থেকে তৌড়া জালে জড়িয়ে নিয়ে তাকে ফেলে দেওয়া হয় কাৎলাহারের গভীর নিচে। মস্ত একটা বেড় জাল গোটা বিল সেঁচে উত্তরদিকে গোটাতে শুরু করলে তার ঘুম বারবার ছিঁড়ে যায়। কী জ্বালা! তমিজ তখন পাশ ফিরে শোয় একটা হাত তার গালের নিচে রেখে।

হাতের চাপে তার কয়েকদিন না-কামানো দাড়ি গালে লাগে। তার গালে ধানের শীষ তখন খোঁচা খোঁচা চুমু দেয়। তার চোখ জুড়ে নামে রাজ্যের ঘুম। নতুন র‍্যাপারের হদিস জানতে কুলসুম আরো অনেকক্ষণ তার মাথার গন্ধ শুঁকেছে কি-না সে টের পায় নি। হয়তো শুঁকেছে। তবু সে ঘুমায়। কিংবা হয়তো এই জন্যেই ঘুম নামে তার দুই চোখ ঝেঁপে।

১৪

ধান কাটতে তমিজের আরো কয়েকটি দিন সবুর করতে হবে।—এর মধ্যে লাগলো হুমায়ুনের চল্লিশার ধুম। শরাফত মণ্ডলের বর্গাদারদের সবাই কয়েকটা দিন পেটে ভাতে খেটে দিলো। আপখোরাকি মজুরি দেওয়ার ইচ্ছা আজিজ ও কাদের দুজনেরই ছিলো, বাড়ির মাসুম ছেলেটার রুহের মাগফেরাতের জন্যে খরচ করতে তাদের কোনো দ্বিধা নাই, এখানে পয়সা ঢালা মানে আখেরাতের সঞ্চয়। কিন্তু মণ্ডলের বড়ো বর্গাদার হামিদ সাকিদার অভিমান মতো করে : যার জমি চাষ করে তাদের রেজেক, তার বাড়ির শোক উদযাপনে গতর খাটিয়ে তারা পয়সা নেয় কোন আক্কেলে? তাদের আল্লারসুল নাই? তাদের আখেরাত নাই? গরিব হলেও কেয়ামতের দিন তাদের জবাবদিহি করতে হবে না? তার কাকুতি মিনতিতেই শরাফত তাদের মজুরি না দিয়ে দুই বেলা গরম ভাত খাওয়াবার ব্যবস্থা করে। আবদুল আজিজ খাওয়াবার ঝামেলার মধ্যে যেতে চায় না বলেই পয়সা দিয়ে কাজ করাবার পক্ষে। পয়সা নাও, কাম করো। একেকজনের হাতির খোরাক জোটাবার চেয়ে পৌষ মাসের খেতমজুরির রেটে পয়সা দিলে বরং অনেকটা সাশ্রয় হয়। কিন্তু তার বর্গাদারদের দুনিয়াদারির সঙ্গে আখেরাতের দেখভালের জিম্মাদারি শরাফতের এখতিয়ারেই পড়ে। সুতরাং নতুন ধান ভানা, বর্গাদারদের কারো কারো বাড়ির গাছ কাটা, করতোয়ার ওপারে দশটিকার হাট থেকে ৭টা বড়ো বড়ো দামড়া কিনে তাদের হাঁটিয়ে নিয়ে আসা, কয়েক মণ আটা, আলু মশলাপাতির জোগাড়যন্তর করা, বাড়ির খুলিতে মস্ত মস্ত চুলা কাটা, কয়েক মাইল পুবে শিমুতলার মিয়াবাড়ি গিয়ে ভারে করে বড়ো বড়ো ডেকচি বয়ে আনা এবং চল্লিশার দিন রান্নাবান্না ও পরিবেশনের কাজ করার অনুমতি দিয়ে শরাফত তার আধিয়ারদের সওয়াব হাসিলের সুযোগ করে দেয়।

এতো বড়ো আয়োজন,—শরিক না হয়ে কি তমিজ পারে? তমিজের বাপ এই নিয়ে গাঁইগুঁই করে : কারো জমিতে মাঙুন কামলা খাটতে তমিজের এতো আপত্তি, শমশেরের ধান কাটার সময় মাঙুন কামলা খাটলো বলে বাপটাকে তমিজ তো কম হেনস্থা করে নি। আর মণ্ডলের বাড়িতে তুমি মাগনা খেটে মরো, তাতে তোমার খুব পোষায়?

বাপটাকে নিয়ে তমিজের পদে পদে বিপদ! বুড়ার বেটার গোঁ আর কমলো না। নিজের বেটা মরার আগে আবদুল আজিজ কতোবার খবর দিলো, তমিজও কতোবার বললো, আজিজের বৌ কি স্বপ্ন দেখেছে তাই নিয়ে কী বলবে,—তা বুড়া গেলো না তো গেলোই না। শেষপর্যন্ত কুলসুম না গেলে আবদুল আজিজ যে কী কাণ্ডটা করতো ভাবতেও তমিজের গা শিউরে ওঠে। আর সে-ই কি আর কাদেরের কাছে মুখ দেখাতে পারতো?

বাপের কথা শুনলে কী আর তমিজের চলে? আবুদল কাদের তো অনেকটা ভরসা করে তার ওপরেই। তার টাউনের মেহমানদের খেদমত করতে গফুর কলু একাই যথেষ্ট, কিন্তু চল্লিশার প্রস্তুতির কাজে কয়েকটা দিন তাকে ছেড়ে দিলে কাদেরের চলবে কী করে? কাদেরের দোকানে বসে তেল বেচার কাজটা গফুর একাই করে। ঘানিতে সর্ষে তেল বার করার চাইতে দোকানে বসে কেরোসিন তেল বেচা অনেক সোজা। এখানে ইজ্জতও আছে,—কন্ট্রোল রেটে আধ পোয়া তেল পেতে কতো মানুষ তাকে কী তোয়াজটাই না করে। আগে এইসব মানুষ কলুর বেটা বলে তাকে কতো হেলা করেছে। গফুরের কাজ আরো আছে। মুসলিম লীগের ছেলেরা দোকানে আসে দলের কাজে

করতে। কাদের না থাকলে তাদের বসতে দেওয়া, তাদের কাজের সুবিধা অসুবিধার দিকে খেয়াল রাখা এবং কাদের সম্বন্ধে কে কী বললো সেদিকে একটু নজর রাখাও বটে,—এসব করে কে?

ভদ্রলোক মেহমান যা অনুমান করা গিয়েছিলো তার চেয়ে কমই এসেছে। আবদুল আজিজের অফিসের লোকজন অতো দূর থেকে আসতে পারে না। টাউনের সিভিল সাপ্লাই অফিসে সে তার তিনজন বন্ধুকে দাওয়াত করেছিলো, এসেছে একজন। আবদুল কাদেরের মেহমান মেলা, তবে দাওয়াত করা হয়েছিলো আরো অনেককে। আজিজ বা কদেরের যতো খুশি মেহমানকে আপ্যায়ন করতে শরাফত মণ্ডলের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু কাঁচা রাস্তায় টমটমের ঝাঁকুনি খেতে খেতে টাউনের বাবুরা যে এই পর্যন্ত কতো আসবে সেটা তার ভালো করেই জানা আছে!

লাঠিডাঙা কাছারির মুসলমান পাইক বরকন্দাজদের সবাইকে বলা হয়েছিলো। কাদের খামাখা তড়পালো, নায়েববাবুর ভয়ে ওরা এক সঙ্গে এতোগুলো মানুষ কাছারি ছেড়ে আসবে কি-না সন্দেহ। শরাফত অবশ্য ঠিকই জানে কয়েক বছর আগে হলেও পাইক বরকন্দাজের এক দিনের কামাই নিয়ে নায়েববাবু হাম্বিতাম্বি করতো, কিন্তু বুড়ো হতে হতে লোকটা ধর্মকর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। কারো ধর্মের আচার অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়ার মানুষই সে নয়। নায়েববাবুর এখনকার কথাই হলো : আমার ধর্ম আমি মানি। তোমার ধর্ম ভুল হোক আর যাই হোক, সেটাই ঠিকমতো পালন করো। মানুষের সবই অনিত্য, এই ভবসংসারে সবই নশ্বর, কিন্তু ধর্ম আর জাত হলো জীবনের সার; ওটা গেলে মানুষের আর রইলো কী?'

কামারপাড়ায় নেমন্তন্ন করলে সেটা বরং নায়েববাবুর সইতো না। মোসলমানের মড়ার শ্রাদ্ধের ভাত গিলে জাত খোয়ানোর অধিকার ভগবান কিংবা নায়েববাবু কেউই তাদের দিতে পারে না। তবে কাদেরের বিয়ের সময় মণ্ডল তার কামারপড়ার আধিয়ারদের ঠেসে খাওয়াবে; শিমুলতলার মিয়ারা তো বাড়িতে বিয়েসাদি হলে একটা দিন খওয়ায় শুধু হিন্দুদের। মণ্ডলও তাই করবে।

তা হুমায়ুনের চল্লিশায় মানুষও হয়েছিলো বাপু! গিরিরডাঙা, নিজগিরিরডাঙা, গোলাবাড়ি, ছাইহাটা থেকে ওদিকে রানিরপাড়া পারানিরপাড়া মহিষাবান,—কোনো গ্রামের মানুষ বাদ পড়ে নি। চাষা বলো, মাঝি বলো, কলু বলো আর জোলা বলো সবাই এসেছে ঝাঁক বেঁধে, ছেলেপুলে নাতিপুতি নিয়ে। এতো এতো সব মানুষে গোটা গাঁও গমগম করে; কাৎলাহার বিলের সব মাছ ভিড় করে গিরিরডাঙার তটের দিকে। ফজরের নামাজের পরপরই মসজিদে দোয়া পড়া হলো। বলতে গেলে এই উপলক্ষেই মণ্ডলবাড়ির লাগোয়া জুম্মাঘরটার বেড়া নতুন করা হলো, জুম্মাঘরকে মসজিদ বলা শুরু হয়েছে এর আগে আগে। আহলে হাদিস জামাতের মসজিদ, এখানে মিলাদ পড়ানো চলে না। কাদের টাউনের টাইটেল পাস মৌলবিকে দিয়ে দোয়া পড়াতে চাইলেও মণ্ডল রাজি হয় নি, বাপদাদার আমলের রেওয়াজ মোতাবেক গাঁয়ের জুম্মাঘরের ইমাম সাহেব দোয়া পড়ুক। পরে নাহয় খাওয়া দাওয়া দেওয়ার পর নাজাতের দোয়া পড়বে টাউনের আলেম সাহেবরা।

খানকা ঘরের উঁচু বারান্দায় সতরঞ্চির ওপর দুই দিকে বালিশ দিয়ে সাজানো জায়নামাজে বসে নাজাতের দোয়া পড়ে টাউনের জামে মসজিদের ইমাম আলহাজ মওলানা হাফেজ আবু নসর বরকতুল্লাহ প্রতাপপুরী সাহেব। দুই পাশে বালিশের শিওরে

কাঁসার গ্লাসে চালের ভেতর গোঁজা আগরবাতির ধোঁয়ায় ভর করে মওলানা সাহেবের সুরেলা মিষ্টি গলার এহ্‌লান ছড়িয়ে পড়ে বাড়ির সামনে বিশাল জমায়েতে এবং দেখতে দেখতে তা মিশে যায় বড়ো বড়ো ডেকচির গোরুর গোশতের সুরুয়ার গরম ধোঁয়ায় এবং রূপান্তরিত হয় খিদে-বাড়ানো সৌরভে।

এতো এতো লোক দেখে হামিদ সাকিদার ও গফুর কলু ঘাবড়ে যায় এবং সারিতে সারিতে ভাত দেওয়ার ব্যাপারে একটু তাড়াহুড়াই করে। দোয়া পড়ার শুরুতেই কলাপাতার ভাত ও নুন দেওয়া হয়ে গিয়েছিলো, বালতিতে বালতিতে আটা দিয়ে পাক-করা গোরুর গোশত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পরিবেশনের জন্যে, তখন আরম্ভ হলো মোনাজাত। সারি সারি মানুষ অপেক্ষা করছে গোশতের জন্যে। গোশতের বালতি নিয়ে ছুটছে হুরমতুল্লা, কালুর বাপ, হামিদ সাকিদার, গফুর কলু, তমিজ,—মোনাজাতের দিকে এদের খেয়াল নাই। খানকা ঘরের বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে আবদুল আজিজ হঠাৎ জোরে নির্দেশ দেয়, 'মোনোজাত হচ্ছে, মোনাজাত; সবাই হাত তোলেন।' পরপরই মওলানার স্বর হঠাৎ করে চড়ে গেলো।

মওলানার মোনাজাত হচ্ছিলো উর্দুতে, উর্দুতে সমবেত জনতার অজ্ঞতা এই ভাষার প্রতি তাদের ভক্তিকে উস্কে দেয় এবং এর রহস্যময়তা আরবি আয়াতের সঙ্গে সবরকম ফারাক মোচন করে। ওদিকে পঙক্তিতে বসা লোকজনের অনেকেই অধৈর্য হয়ে নুন দিয়েই ভাত মেখে খেতে শুরু করেছে। এমন কি কারো কারো 'ক্যা গো তরকারি দিবা না?' 'ভাত কি শুধাই খাওয়া লাগিব?' 'তোমরা কিসের সাকিদারি করো? পাতেত গোশতো কুটি?' প্রভৃতি অভিযোগ ঠোকাঠুকি লাগে মোনাজাতের কথার সঙ্গে। এতে বিরক্ত হয়ে কাদের আজিজের পাশে দাঁড়িয়ে হুকুম ছাড়ে, 'খামোশ!' এই শব্দটির অর্থ পরিবেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকদেরও জানা না থাকায় ঘাবড়ে গিয়ে গোশতের বালতি মাটিতে রেখে তারা মোনাজাতের জন্যে হাত তোলে এবং তাদের দেখাদেখি হাত তোলে খেতে বসা মানুষের অনেকে। নুন দিয়ে ভাত যারা মেখে ফেলেছিলো তাদের নাকে লাগে ভাতের গন্ধ এবং ঘ্রাণে অর্ধ ভোজনং-এর তৃপ্তির বদলে তাদের পেটে তারা পায় খিদের নতুন মোচড়। মোনাজাতে নিষ্ঠার সঙ্গে শরিক হয়েছিলো সতরঞ্চি পাতা খানকা ঘর ও ওই ঘরের বারান্দায় বসা মেহমানরা। মাসুম বালক মোহাম্মদ হুমায়ুনের বেহেশত নসিবের জন্যে আল্লাপাকের দরবারে, মওলানা সাহেবের আকুল আবেদনে তাদের চোখ ভিজে যায়, 'আমিন' 'আমিন' বললে তাদের গলা থেকে গড়িয়ে পড়ে নোনতা আওয়াজ। এই মাসুম আওলাদের অছিলায় তার বাপমা, দাদাদাদী এবং সমস্ত পূর্বপুরুষের গোনাখাতা মাফ করার জন্য মিনতি জানানো হচ্ছিলো। আগরবাতির ধোঁয়া এই ঘরে ছিলো স্বচ্ছ উৎসের মতো, গোশতের গন্ধে বিলুপ্ত হবার জন্যে ছোটার আগে ওই ধোঁয়া এই ছোটো মজলিশে হুমায়ুনের তো বটেই, তার বাপদাদা এমন কি অপরিচিত পূর্বপুরুষের জন্যে লোকদের সংহত করে তোলে। হুমায়ুনের বড়ো ভাই বাবর বসেছিলো দাদুর কোল ঘেঁষে। পড়াশোনায় ভালো বলে এই নাতিটির জন্যে শরাফত মণ্ডলের টান একটু বেশি। দোয়ার প্রথম থেকে তার চোখ দিয়ে অবিরাম পানি ঝরছিলো, মোনাজাতের সময় ভাষার দুর্বোধ্যতা ছাপিয়ে মওলানা সাহেবের আকুল মিনতি তাকে ধাক্কা দেয় বেশ জোরেসোরে এবং সে কাঁদতে থাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আর শরাফত মণ্ডলের চোখ ছলছল করে, চোখের পানি আটকে থাকে চোখের গভীর গর্তে এবং নোনা

পানির পর্দা ফুঁড়ে সে তাকিয়ে থাকে মিয়াবাড়ির ছোটোমিয়ার সৌম্য চেহারার দিকে। ছোটোমিয়ার ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি ও পায়ের ওপর যেনতেনভাবে ছড়িয়ে রাখা একই রঙের কাশ্মীরি শাল থেকে আসা আতরের গন্ধ শরাফতের শোককে গৌরব দেয় এবং ছোটোমিয়ার প্রায়-বন্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে সে তার প্রতি কৃতজ্ঞতায় বুঁদ হয়ে যায়।

শিমুলতলার বুড়ো বুড়ো চার ভাইয়ের পানজর্দা খাওয়া ও গড়গড়া টানা চার জোড়া ঠোঁটের বাঁকা হাসির কুচিতে তার নিজের চোখজোড়া খচখচ করতে পারে—এই ঝুঁকি নিয়েও শরাফত দুইবার গিয়েছিলো তাদের দাওয়াত করতে। বড়ো বড়ো ডেকচি কাদের জোগাড় করতে পারতো তো টাউন থেকেই। কিন্তু মণ্ডল ছেলের কথায় কান না দিয়ে ওইসব চাইতে গেলো শিমুলতলার মিয়াদের বাড়িতে। এতে বড়ো বড়ো হাঁড়িপাতিল ও দামি বাসনপত্র সংগ্রহে মিয়াদের পুরনো সমৃদ্ধির ধারণাটির নবায়ন করা হয়। তা এতে কাজ হয়েছে; ছোটোমিয়া এসেছে তার মেজোভাইয়ের এক নাতিকে নিয়ে।

আবদুল কাদেরের মেহমানরা টাউনের যতো দাপটের বান্দা হোক না কেন, শরাফত মণ্ডলকে তারা ওপরে ওঠাবে কতোটা? তারা দল বেঁধে এসেছে, জমিয়ে গপ্পোগুজব করছে,—তারা পাকিস্তান, মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, গান্ধিজি, জিন্না সাহেব, ইলেকশন, জহরলাল, কৃষক প্রজা পার্টি, হক সাহেব, সোহ্‌রোয়ার্দি, আবুল হাশিম, নাজিমুদ্দিন, আলিগড়, ইসলামিয়া কলেজ নিয়ে মেলা বাক্য ছাড়বে। মানুষ হাঁ করে ওইসব শোনে এবং বেশিরভাগ কথা না বুঝে কিংবা বোঝে না বলেই অভিভূত হয়। তারপর 'স্লামালেকুম' বলে টমটমে চেপে তারা টাউনের দিকে রওয়ানা হলে লোকজন অনেকক্ষণ বিলীয়মান টমটমের দিকে তাকিয়ে থাকে। টমটম চোখের আড়াল হতেই তাদের কথা লোকে ভুলে যাবে, তাদের কথাবার্তার যেটুকু বুঝেছে তাও ভুলে যাবে। কিন্তু শিমুলতলার মিয়াদের সঙ্গে এক কাতারে না হলেও একই দিনে, একই জেয়াফতে, একই বাড়িতে ভাত খাবার কথা তারা জীবনে ভুলবে না।

শিমুলতলার মিয়ারা আজকের খানদান নয়, সেই কবে থেকে দীঘাপতিয়ার রাজাদের মস্ত তরফের খাজনা আদায় করে আসছে এরা। জেলার গোটা পুব এলাকার দীঘাপতিয়ার প্রজাপাটের ওপর চোটপাট করা, তাদের মারধোর করা, তেমন সুন্দরী মেয়ে চোখে পড়লে তাদের ভোগ করা,—সবই তো করে আসছে এরা। ইদানীং দুই পাতা লেখাপড়া করে ছোটো ঘরের কেউ কেউ বেয়াদব হয়ে উঠছে, এই ছোটোলোকের বাচ্চারা কাউকেই আমল দিতে চায় না। শরাফত তবু জানে, মরা হাতির দাম লাখ টাকা। শিমুলতলা পড়ে গেলেও এদের নাম থেকে এখনো আভা বেরোয়। এদের অবস্থা পড়ো পড়ো হয়েছে বলেই শরাফত এদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক করার সখ করতে সাহস পায়। বড়োমিয়ার এক নাতনিকে কাদেরের বৌ করে আনার কথা সে একবার ভেবেছিলো, জগদীশ সাহাকে দিয়ে মিয়াবাড়িতে ইশারাও দিলো। জগদীশ বললো, সত্যিমিথ্যা জগদীশই জানে, প্রস্তাব শুনেই বড়োমিয়া জ্বলে ওঠে, চাষার, সাহস তো কম নয়, তার ঘরের মেয়ে নিতে চায় নিজের ছেলের বৌ করে!

বড়োমিয়া ওরকম রাগ না করলেও তো পারে। শরাফত নিজের হাতে লাঙল ধরে না, তার বাপই লাঙল ধরা ছেড়েছে জোয়ান বয়সেই। এ কথা ঠিক, জমিজমা কি জোতসম্পত্তির দিক থেকে মিয়াদের তুলনায় তারা কিছুই নয়। কিন্তু মণ্ডলের ধানপান, বাঁশঝাড়ের আয়, গোলাবাড়ি হাটের দোকানে কেরোসিন তেল বেচার টাকা—এসব

ধরলে তার রোজগার তালুকদারদের কাছাকাছিই যাবে। জগদীশ সাহা অনেক রাত করে শিমুলতলায় তালুকদারদের বাড়ি যাওয়া আসা করে; এসবের মানে কি মণ্ডল বোঝে না? মিয়াদের নাক কারো কারো বেশ চাপাই, কিন্তু অবস্থা পড়তে শুরু করার পর থেকে তাদের নাক-উঁচু ভাবটা বাড়ছে।

এদের মধ্যে ছোটোমিয়াই বরং মানুষটা ভালো। টাউনে তার যাতায়াত বেশি। মাসে দুমাসে একবার কলকাতা যায়, দুই বছর পরপর দার্জিলিং ঘুরে আসে। আবার খদ্দরও ধরেছিলো কিছুদিন। দেশবন্ধু মারা যাবার সময় ছোটোমিয়া দার্জিলিঙে। দেশবন্ধুর শবদেহ নিয়ে কংগ্রেস ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে ছোটোমিয়া একই ট্রেনে কলকাতা গিয়েছিলো। ওই ট্রেনে মুসলমান ভলান্টিয়ার ছিলো আর কয়জন? এসব অবশ্য অনেক আগেকার কথা। রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছে তা বছর দশেক তো হবেই। এই লোকটা এখনো সবার সঙ্গে মিশতে পারে। ছোটোমিয়ার আর একটা ব্যাপার মণ্ডলের বড়ো পছন্দ, অবস্থাপন্ন ঘর হলেই তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে ছোটোমিয়ার আপত্তি নাই, অতো খানদানের ধার সে ধারে না। তবে তার ব্যারাম অন্যখানে। গ্র্যাজুয়েট না হলে তাদের বাড়ির জামাই হতে পারবে না। আরে এ কি গভর্নমেন্ট অফিসে অফিসার পোস্টে চাকরি দিচ্ছো যে বি এ পাস না হলে এ্যাপ্লাই করতে পারবে না?

গ্র্যাজুয়েট না হলেই বা আবদুল কাদের কম কিসে? ছোটোমিয়ার সঙ্গে কাদেরের আলাপ শুনতে শুনতে শরাফত মণ্ডল মুগ্ধ। বড়ো ছেলেটা তার সরকারি চাকরি করে, কিন্তু ভারিক্কি গোছের কি নামী দামি লোক দেখলে সরে সরে থাকে। গুজুরগাজুর ফুসুরফাসুর সব ওই সিভিল সাপ্লাইয়ের কেরানির সঙ্গেই। অথচ আবদুল কাদের কেমন দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে।

'আপনে ইসমাইল সাহেবকে বলেন, টিকেটের একটু চেষ্টা তদবির করুক। আমাদের এদিকে তার ফিল্ড খুব ভালো। আর বাঙালির পুবে যমুনার পশ্চিমে আপনাদের কথা কেউ ফেলতে পারবে না।'

কাদেরের কথায় ছোটোমিয়া মোটেই ফুলে ওঠে না, এসব কথা তারা জন্ম থেকেই শুনে আসছে। তবে ইসমাইলের প্রশংসা করায় লোকটা খুশি। ইসমাইল হোসেন তার আপন ভাস্তিজামাই, বড়োমিয়ার মেজোমেয়ের স্বামী। তবে ইলেকশনে সে নমিনেশন পাবে কি না তাতে ছোটোমিয়ার একটু সন্দেহ আছে, 'দামাদমিয়া টিকেট পাবে কী করে? এই এলাকায় তো তোমাদের পুরনো লোক অনেক।' কাদের এতে দমে না, বরং আরো উৎসাহিত হয়ে বলে, 'তা আছে। তারা তেমন কামের মানুষ নয়। কলকাতার নেতাদের সঙ্গে ইসমাইল ভায়ের খাতির কতো বেশি। ছাত্রনেতা ছিলেন তো। পাকিস্তান ইসু সারা বাঙলায় যারা প্রচার করে— ।'

পাকিস্তানের ব্যাপারে ছোটোমিয়ার উত্তেজনা কম, 'আমাদের বাবাজি পাকিস্তান ছাড়া কিছু বোঝে না। তুমিও তাই। তোমরা ছেলেমানুষ, মাথা গরম করা তোমাদের বয়সের ধর্ম।'

ছোটোমিয়া ইসমাইল হোসেন ও তাকে বয়সের ও মাথা গরম করার ব্যাপারে এক কাতারে ফেলায় কাদের এই লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, এই কৃতজ্ঞতাবোধ তাকে একটু লাই দেয়। ফলে উত্তেজিত হয়ে সে বলে, 'পাকিস্তান ছাড়া মোসলমানের টেকার পথ নাই। মোসলমান কী ছিলো আর আজ কোথায় নেমেছে— ।'

মুসলমানদের বর্তমান হাল ব্যাখ্যা করার ভার তার হাত থেকে স্বেচ্ছায় তুলে নেয় টাউনের মাঝবয়েসি নেতা ডাক্তার আমিরুদ্দিন আখন্দ। 'দেখেন না, শিক্ষদীক্ষা, স্কুল কলেজ, কোর্ট কাচারি, অফিস আদালত, বিজনেস সব হিন্দুদের হাতে। আর জমিদার তো নাইন্টি পার্সেন্টি হিন্দু।' লোকটা মনে হয় আজ সকালেই রিহার্সেল দিয়ে এসেছে, কিংবা নিজের চেম্বারে বসে রোজ রোজ বলতে বলতে তার মুখস্থ, 'মোসলমান হলো হিন্দু জমিদারের প্রজা, হিন্দু উকিলের মক্কেল, হিন্দু মহাজনের খাতক, হিন্দু মাস্টারের স্টুডেন্ট, হিন্দু ডাক্তারের পেশেন্ট।'

ছোটোমিয়া তার কথার স্রোত একটুখানি আটকায়, 'কেন আপনার কাছে মোসলমান পেশেন্ট যায় না?' ডাক্তার আমিরুদ্দিন জবাব দেয়, 'হিন্দু পেশেন্ট তো আমার কাছে যায়ই না, আবার মোসলমান সব ভালো ভালো শিক্ষিত মানুষের ধারণা, মোসলমান কখনো ভালো ডাক্তার হতে পারে না।'

'তাহলে খালি হিন্দুদের দোষ দেন কেন? মোসলমান ডাক্তার যদি ভালো হয় তো হিন্দু পেশেন্ট কি তার কাছে না গিয়ে পারবে? টাউনের চোখের ডাক্তার দুজনেই তো মোসলমান, হিন্দুরা তাদের দিয়ে চোখ দেখায় না? কলকাতায় সবচেয়ে বড়ো দাঁতের ডাক্তার তো মোসলমান, তার পেশেন্টদের মধ্যে হিন্দুর হার কতো বেশি তা হিসাব করে দেখেছেন?'

'এসব একসেপশন। টোটাল পজিশনটা কী?' প্রশ্ন করে আবার জবাব দেওয়ার কাজটিও সম্পন্ন করে ডাক্তার সাহেবই, 'বিজনেস ওদের হাতে, চাকরি বাকরিতে বড়ো বড়ো পোস্টও দখল করে আছে তো ওরাই। ভালো পজিশনে থাকলে জাতভাইদের টেনে তোলা যায়। আমাদের সেই অপরচুনিটি কোথায়?'

'গভর্নমেন্ট তো মুসলিম লীগের। লীগ তো বেঙ্গল রুল করছে অনেক দিন। এক ফেমিন ছাড়া এদের বড়ো কীর্তি আর কী বলেন তো?'

'এই তো ঠিক পয়েন্টে আসলেন।' ছোটোমিয়াকে জুতমতো ধরা গেছে এমন ভাব করে ডাক্তার, 'ফেমিনের সময় বেঙ্গল গভর্নমেন্ট চাল চাইলো বিহার গভর্নমেন্টের কাছে, হিন্দু ডমিনেটেড কংগ্রেস গভর্নমেন্ট না করে দিলো। এখানকার হিন্দু লিডাররা পুরো সায় দিলো বিহারকে। ওয়ারের নাম করে বৃটিশ চাল সব গায়েব করে দিলো। বদনাম হলো মুসলিম লীগের। পাকিস্তান হলে হেলপ করবে গোটা ইনডিয়ার মোসলমানরা। মোসলমান বিজনেস কমিউনিটি হেলপ করার স্কোপ পাবে।'

'মোসলমান জমিদার যারা আছে তারা এখন কী হেলপ করছে? হিন্দু জমিদার ছাড়া দেশে স্কুল কলেজ হতো? এই ডিস্টিক্টে এক জেলা স্কুল ছাড়া আর সবই হিন্দু জমিদারদের দান। টাউনে তো বড়ো বড়ো জমিদার দুজনেই মোসলমান, কোনো স্কুল কলেজের জন্যে একটা ইঁট দিয়েছে কেউ? ডাক্তার সাহেব, এসব কাজ করতে আলাদা মেন্টালিটি লাগে, বুঝলেন?'

'মেন্টালিটি তৈরি হবে পাকিস্তান হলে। নিজের দেশে পাওয়ার থাকবে নিজেদের হাতে, মুসলমান জমিদারদের তখন সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি গ্রো করবে।'

কিন্তু ডাক্তারের এই কথায় কাদেরের সায় নাই, সে বরং প্রতিবাদ করে, 'পাকিস্তানে জমিদারি সিস্টেম উচ্ছেদ করা হবে। বিনা খেসারতে জমিদারি উচ্ছেদ করা হবে। পাকিস্তানে নিয়ম হবে জমি তার লাঙল যার। পাকিস্তানের আমিরে গরিবে ফারাক থাকবে না।'

এই কথাগুলো অনেক গুছিয়ে বলতে পারে ইসমাইল হোসেন। কলকাতা থেকে বস্তা বস্তা কাগজ আসছে, পোস্টারে লিফলেটে এইসব কথা লেখা থাকে। 'পাকিস্তান' নামে বইও এসেছে। কাদের সেসব পড়ে, কিন্তু ঠিকমতো বলতে পারে না। তার অগোছালো উত্তেজনায় কেউ সায় দেয় না। আসিরুদ্দিন ডাক্তার বরং একটু বিরক্ত হয়। জমিদারি ব্যবস্থার অভাবে সম্পত্তির মালিকানায় অরাজকতা দেখা দেবে ভেবে শরাফত মণ্ডল ছেলের মন্তব্যে সায় দিতে পারে না। বরং নিশ্চিন্তে হাসে ছোটোমিয়াই, বলে, 'তোমরা জমিদারদের সম্পত্তি কেড়ে নেবে, বড়োলোকদের মারবে। কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তাহলে তোমাদের ফারাক কী? এদিকে দীন ইসলামের কথা বলো, ওদিকে নাস্তিকদের কথা ধার করে বলো। আমরা এখন কোনটা ধরি, বলো?'

'ইসলাম তো সব মানুষকে সমান অধিকার দিয়েছে। ইসলামে কোনো কাস্ট সিস্টেম নাই। আমাদের নবী এই কথা বলে গেছেন কতো আগে। কম্যুনিস্টরাই এসব ধার করেছে ইসলামের কাছ থেকে।' কাদেরের গলা আত্মবিশ্বাসে ঝাঁঝালো হয়ে উঠেছে। এই ঝাঁঝ ইসমাইলের কাছ থেকে ধার-করা—টের পেয়ে ছোটোমিয়া সন্তুষ্ট।—দামাদমিয়া এই এলাকায় সাগরেদ বেশ ভালো জুটিয়েছে। নমিনেশন পেলে ভোটটা ভালোভাবেই পাড়ি দেব। যাক, করতোয়ার পুব দিকটা তাহলে তাদের আত্মীয় কুটুম্বের দাপটে থাকে। ছোটোমিয়ার সন্তোষের আরেকটি কারণ হলো এই যে, ইসমাইলের সঙ্গে রাজিয়ার বিয়ের সম্পর্কটা পাকা হয় তার হাতেই। বড়ো ভাইয়ের তো ইচ্ছাই ছিলো না, মেজোভাইও তেমন গা করে নি। জমিজমা তেমন নাই; শুধু শহরের চাকুরে পরিবারের ছেলে হয়ে শিমুলতার মিয়াদের বাড়ির জামাই হওয়া অতো সোজা নয়। এই কঠিন কাজটি সম্পন্ন হলো কেবল ছোটোমিয়ার গোঁ ছিলো বলেই। আজ সেই জামাইয়ের সাফল্যের আভাস পেয়ে সে তো একটু খুশি হবেই। কাদেরকে তার ওই জামাইয়ের কথাগুলোর জবাব দিতেও তার ভালো লাগে, 'ইসলামে কি কারো সম্পত্তি দখল করার হুকুম আছে? আমাদের হজরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাহিসালাম কি হজরত ওসমান রাজিআল্লাহু আনহুর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন? বরং তাঁর সঙ্গে তিনি তাঁর দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। ধনী গরিব বড়ো কথা নয় বাবা। পরহেজগার মানুষ আমির হলেও ভালো, গরিব হলেও ভালো।'

এতোসব খুঁটিনাটি ব্যাপার কাদেরের জানা নাই, জবাবই বা সে দেবে কোত্থেকে? ইসমাইল ভাই আজ খামাখা কলকাতা গেলো। কর্পোরেশনের মেয়র ইলেকশনের এখনো এক মাস, অথচ সেই অছিলা করে লোকটা ছুটলো। সুযোগ পেলেই খালি কলকাতা ছোটে। ইসমাইল হোসেন আজ থাকলে এখানে চমৎকার মিটিং করা যেতো একটা। এক সাথে এতো মানুষ পাওয়া কি সোজা কথা?

'তোমাদের লীগের বড়ো বড়ো হোমরাচোমরা তো সবই জমিদার আর বড়োলোক। তাদের উচ্ছেদ করলে তোমাদের পার্টি টিকবে কী করে?' তার দীর্ঘ বক্তব্যের উপসংহার সেরে তার যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে ভেবে ছোটোমিয়া তৃপ্তি পায় এবং বিজয়ীর উদারতায় আবদুল কাদেরকে রেহাই দিতে সে প্রসঙ্গ পাল্টায়। আবদুল আজিজের বড়ো ছেলে বাবরকে কোলে কাছে টেনে নিয়ে তার নাম, কোন স্কুলে কোন ক্লাসে পড়ে, পরীক্ষায় কেমন করে, 'ধান গাছে বড়ো বড়ো তক্তা হয়' বাক্যটির ইংরেজি অনুবাদ কী প্রভৃতি জিগ্যেস করে এবং নিজের রসিকতায় হো হো করে হাসে। বাবর কিছুক্ষণ

উসখুস করে ছোটোমিয়ার কৌতূহল ও আদর সহ্য করে ঘর থেকে বাইরে চলে যায়। ছেলে হাতছাড়া হলে ছোটোমিয়া ধরে তার বাপকে। আবদুল আজিজের বস সাব-রেজিস্ট্রার সাহেবের জীবন বৃত্তান্ত তার প্রায় সবটাই জানা। মুর্শিদাবাদের কোন এক খান বাহাদুরের অকর্মণ্য ছেলে, আনওয়ার্দি সন অফ ওয়ার্দি ফাদার হিসাবে লোকটা চাকরি পেয়েছে কবে, সব কথা ছোটোমিয়া ফাঁস করে দেয়। আবার এটাও জানায়, সাব-রেজিস্ট্রারের সঙ্গে তাদের তিন পুরুষের আত্মীয়তা। ছোটোমিয়ার এক চাচী এসেছে ওই পরিবার থেকে এবং ওই চাচীর বাবা আবার ছোটোমিয়ার খালার দেওরের খালুশ্বশুর। তাদের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা জেনে আজিজ বড়োই পুলকিত। জয়পুরে অফিসে যোগ দিয়েই স্যারকে এটা জানাতে হবে। বেশ আনন্দিত চিত্তে এই খানকা ঘরের মেহমানদের খাওয়ার বন্দোবস্ত কতোটা হলো তার খবরদারি করতে সে রওয়ানা হলো বাড়ির ভেতর। এইসব খাস মেহমানদের রান্নাবান্না হচ্ছে বাড়ির ভেতরে রান্নাঘরে, রাঁধছে তার বৌ আর শাশুড়ি। এদের জন্যে দুটো খাসি জবাই করা হয়েছে, এদের কেউ হয়তো গোরু নাও খেতে পারে। আর শুধু গোরুর গোশত দিয়ে কি সবাইকে ভাত খাওয়ানো যায়? দৈয়ের জন্যে লোক পাঠানো হয়েছিলো হাতিবান্ধায়, গোপাল ঘোষ নিজে দৈ নিয়ে আসবে। এখন পর্যন্ত তার দেখা নাই। বেলা হয়ে যাচ্ছে। তবে খানকা ঘরের মেহমানদের আসার পরপরই ভারী নাশতা দেওয়া হয়েছে, তাদের খিদে লাগতে একটু সময় দেওয়ার দরকার।

এদিকে কিছুক্ষণের মধ্যেই জেয়াফতের মজলিশ থেকে জোরে জোরে ধমক দেওয়ার আওয়াজ পাওয়া গেলো; কী নিয়ে কে কাকে ধমক দিচ্ছে না এই খানকাঘর থেকে বোঝা না গেলেও একজনের গর্জনে আঁচ করা যায় যে, ওখানে কেউ সাংঘাতিক অপরাধ করে ফেলেছে। মজলিশের হৈ চৈতে এখানেও অস্বস্তিকর নীরবতা নামে। মুসলিম লীগের এক উত্তেজিত কর্মী এই সুযোগ পাকিস্তানের অপরিহার্যতা নিয়ে নতুন করে কথা বলতে শুরু করে। জমিয়ে আলাপ করার প্রস্তুতি নেয় আবদুল কাদের। কিন্তু শরাফত মণ্ডলের ইশারায় তাকে উঠে যেতে হয় বাইরে যেখানে কে যেন কাকে কষে ধমকাচ্ছে।

টিনের আটচালা ও নতুন চারচালার মাঝখানে চওড়া গলির ভেতর থেকে গোরুর গোশতের তরকারির বালতি হাতে তমিজকে ছুটে আসতে দেখে কাদের চোখে ও ভুরুতে প্রশ্ন ফুটিয়ে তুললে তমিজ বলে, 'হুরমত পরামাণিক ক্যাচাল করিচ্ছে।'

ঝামেলা হুরমতুল্লা শুরু করলেও এতে তীব্রতা দেওয়ার কৃতিত্ব গফুর কলুর। বাইরের উঠানে কয়েকশো মানুষ বসার পর মানুষ উপচে পড়লে ওই গলিতে মুখোমুখি দুটি সারিতে পঞ্চাশ ষাটজন মানুষ বসাবার হুকুম দিয়ে গিয়েছিলো কাদের নিজেই। এখান সেখানে যারা বসেছে তাদের মধ্যে আছে হুরতমুল্লা আর তমিজের বাপ। পরিবেশনের দায়িত্বে থাকলেও প্রথম দল বিদায় হবার পর হুরমতুল্লা খিদেয় অস্থির হয়ে আর অপেক্ষা করতে পারে না, গলির একটি সারিতে পাতা পেতে বসে পড়ে একটু চাপাচাপি করেই। কিন্তু পাশেই তমিজের বাপ। কেন বাপু, গোয়ালঘরের পেছনেই তো তোমাদের মাঝির জাতের মানুষের পাত পড়েছে, ওখানে সাকিদারি করার কাজও করছে মাঝিপাড়ার লোক। ওখানে বসলে তোমার পাতে ভাতের ভাগ কি কম পড়বে? না-কি গোশতের বালতি তোমাকে বাদ দিয়ে চলে যাবে সামনের দিকে? এক সারিতে বসলেও না হয় কথা ছিলো, তা তো নয়, তমিজের বাপ বসেছে তার গা ঘেঁষে। শালা মাঝির

এঁটো পাতের সুরুয়ার ছিটা কি ভাতের একটা দানা হুরমতুল্লার পাতে পড়লে সে সহ্য করে কী করে? হুরমতুল্লা তাই চ্যাঁচায়, 'মাঝি, তোমার জাতের মানুষ তো ওটি এক ঠেনে বসিছে। তুমি এটি পাত পাতো কোন আক্কেলে গো?'

তমিজের বাপ এসব কথায় কান না দিয়ে তার কলাপাতার টুকরাটা হাত দিয়ে মোছে, কলাপাতায় ময়লা দাগ পড়ে, বারবার মুছলে সবুজ রঙ চাপা পড়লেও সেদিকে তার খেয়াল নাই, তার দুই চোখেই সে তাকিয়ে থাকে ধোঁয়া-ওঠা ভাতের চাঙাড়ির দিকে, ওটা এ পর্যন্ত পৌঁছুতে আর কতো দেরি?

হুরমতুল্লার সব অভিযোগ শুনে গফুর কলু এগিয়ে আসে। তার মূল দায়িত্ব ভদ্রলোক মেহমানদের খেদমত করা। তারা তো এখানো খানকাঘরে বসে গপ্পো করেছ; এই সুযোগে সে কলুদের খাওয়ার দেখাশোনা করছিলো। কলুরা বসেছে শিমুলতলার বকের ঝাঁকের নিচে। তাদের জন্যে গোশতের বালতিতে সুরুয়ার সঙ্গে গোশতের পরিমাণ নিশ্চিত করতে সে নিজেই যাচ্ছিলো ভেতর উঠানের দিকে। এদিক দিয়ে হাঁটার সময় জাত তুলে কথা বলতে শুনে প্রথমেই সে ধমক দেয়, 'মোসলমানের আবার জাত কী গো? খবরদার, জাতের কথা কলে এই বাড়িত খাওয়া চলবি না।'

ধমকে হুরমতুল্লা ভয় পায়। কলু জাতের মানুষ হলেও গফুরের দাপট সম্বন্ধে হুরমতুল্লা ওয়াকিবহাল, তাই সে তাড়াতাড়ি অন্য নালিশ করে, 'জাতের কথা লয় বাপু, খালি জাতের কথা লয়। খ্যাপশা বুড়া খাবার বস্যা খালি পাদে, গোন্দে প্যাট হামার খালি ঘাঁটিচ্ছে। বুড়াক তুমি সর্যা বসবার কও।'

গোশতের খুশবুতে অন্য যে কোনো গন্ধই তো চাপা পড়বে। তবু তমিজের বাপের এই কাজটিকে গফুর কলু অনুমোদন করতে পারে না। থুথু ফেলে সে নাকে হাত দেয়। তার দেখাদেখি এবং তার সম্মানে আরো কয়েকজন নিজনিজ পাতের সামনে গোশতের সুরুয়া মেশানো আঠালো থুথু ফেলে। ততোক্ষণে হুরমতুল্লা ও তমিজের পাতে ভাত পড়েছে এবং গোশতের সুরুয়াও দেওয়া হয়েছে দুই হাতা করে। দুজনেই ভাতের গর্ত করে গোশতের টুকরাগুলি আলাদা করে একটু আড়াল করে রেখে সুরুয়ামাখা আঙুল চোষে। গোশত পাতে পড়ার আগেই অবশ্য নুনমাখা ভাতের কয়েকটি লোকমা তাদের মুখে উঠে পড়েছে।

গফুর কলু কপাল কুঁচকে তমিজের বাপের মুখে সরাসরি তাকায় এবং হঠাৎ বলে, 'ক্যা গো তুমি না গোয়ালঘরের পাছামুড়াত বস্যা খায়া আসলা। আবার এটি খাবার বসিছো? ওঠো, এখনি ওঠো। দুইবার কর্যা কাকো খাওয়া দেওয়া হবি না। একবার যতো খুশি খাও, প্যাট ডুমডুম্যা কর্যা খায়া ওঠো। কিন্তু দুইবার দেওয়া হবি না, পোটলাও বান্দবার দিমু না।' এই জেয়াফতে খাওয়ার বিধিমালা জানিয়ে সে বিধি প্রয়োগের উদ্যোগ নেয়, 'ওঠো! ল্যালপা বুড়া। ওঠো কলাম।'

তখন মোটা একটা হাড় থেকে মজ্জা বের করার কাজে তমিজের বাপ খুব ব্যস্ত, গফুর কলুর নির্দেশ মানা তার পক্ষে অসম্ভব। বরং গফুরের হুমকিতে তার খিদে বাড়ে দশ গুণ এবং মজ্জা চোষা স্থগিত রেখে ভাত মুখে দিতে থাকে, তখন তার একেকটা গ্রাস তেআঁটিয়া তালের সমান। তার আশেপাশের এবং সামনের সারির কেউই তার দুইবার খাওয়া একেবারেই অনুমোদন করে না, জেয়াফতে এসে একবারের বেশি খাওয়া যে খুবই বদ খাসলতের প্রকাশ এ ব্যাপারে তারা একমত। তবে তাদের ধিক্কার জ্ঞাপনও

পানসে। গফুর কলুকে খুশি করা তাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু এই নিয়ে বেশি কথা বলা মানে এখন সময়ের অপচয় বিবেচনা করে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে একটির পর একটি লোকমা মুখে তোলে। তমিজের বাপের দৃষ্টান্ত তাদের কাউকে কাউকে দ্বিতীয়বার চুপচাপ পাত পাতার ফন্দি আঁটতে উদ্বুদ্ধ করেও থাকতে পারে।

হুরমতুল্লা ও গফুর কলু দুইজনের দুই ধরনের আপত্তি সত্ত্বেও তমিজের বাপ ফের ভাত নেওয়ার জন্যে পাত থেকে মুখ তুলে এদিকে ওদিকে তাকায়। ওই সময় তমিজ ওই গলি দিয়ে যাচ্ছিলো গোশতের বালতি হাতে। মাঝিপাড়ার মানুষদের পরিবেশন করতে করতে গফুরের মতো সেও যাচ্ছিলো ভেতরের উঠানে তার বালতিটা ভরে নিতে। রান্নাবান্না বাইরে হলেও নিরাপত্তার স্বার্থে গোশতের বড়ো বড়ো ডেকচিগুলো রাখা হয়েছিলো বাড়ির ভেতরের উঠানে একটা নতুন চালার নিচে। তা তমিজ তো কিছুক্ষণ আগে নিজেই বাপকে পাত ভরে ডুমা ডুমা গোশত ঢেলে দিয়েছে। গোয়ালঘরের পেছনে এক পেট খেয়ে বাপকে ফের এখানে এসে বসতে দেখে তমিজের হাসিই পায় : বুড়ার বেটার খাবার হাউসটা একটু বেশি। তা খাক, বুড়া মানুষ, এরকম খাবার ফের কবে জোটে আল্লাই জানে। মণ্ডল এতো এতো খাওয়াচ্ছে, দুইবার কেন, তিনবার চারবার খেয়েও বাপের দিলটা যদি মণ্ডলের প্রতি একটু নরম হয় তো ভালো। বাপটাকে বেশি করে গোশত দেওয়া যায় কী করে এই ভাবতে ভাবতে সে শুনতে পায় গফুর কলুর কড়া নির্দেশ, 'ওঠো। তুমি ওঠো কলাম।' সঙ্গে সঙ্গে বাপের প্রতি প্রশ্রয় তার চাপা পড়ে তীব্র ক্ষোভের তলায়।—কয়টা দিন মণ্ডলবাড়ির এই জেয়াফতের জন্যে বেগার খাটলাম দেখ্যা বুড়া কী কথাটাই না হামাক শুনালো। আর তুমি এটি আসো ল্যালপা ফকিরের লাকান। তোমার দশগজি জিভখান লিয়া একবার গোলঘরের ওটি খায়া উঠ্যা তুমি ফির আরেক জায়গাত অ্যাস্যা পাত পাতো। খাওয়ার এতো লালচ তোমার?—উচ্চারণ করে বলতে না পারলেও মনে মনে সে এই কথাগুলি ঠিক এমনি করেই আওড়ায়। গফুর কলু যেমন হারামি, মাঝির ঘরের তালাক-খাওয়া মাগীকে বিয়ে করে আর কাদেরের পাছার পেছনে পেছনে ঘুরে ঘুরে শালা কি-না-জানি-হনু-রে ভাব নিয়ে থাকে, শালা বুড়া মানুষটাকে পাত থেকে না উঠিয়ে ছাড়বে না।—এতোগুলো মানুষের সামনে বাপের ভোগান্তি দেখা এড়াতে তমিজ হনহন করে হাঁটে গোয়ালঘরের দিকে, এমন কি গোশতের বালতি ভরে না নিয়েই। মাঝিদের পেট পুরে খাওয়াতে পারলে তাদের জানগুলো আরাম পায়। আবার তাদের মতো মাঝির ঘরের মানুষ হয়েও মণ্ডলবাড়িতে তমিজের দাপট দেখে ওই জানগুলোই হিংসায় চিনচিন করে। এতোগুলো জানের আরাম ও হিংসা তৈরির গৌরব ও সুখ থেকে সে বঞ্চিত হচ্ছে বাপের লালচের জন্যে।

চারচালা টিনের ঘরের জানলার কপাট একটু ফাঁক করে দুইজন মানুষের দুই ধরনের আপত্তি অগ্রাহ্য-করা এক বুড়োর প্রবল তেজে খাওয়া দেখছিলো আবদুল আজিজের শাশুড়ি। নাতি মরার পর দিন সে এসেছিলো টাটকা শোক নিয়ে। এবার দিন তিনেক হলো এসেছে মেয়ের শোক ও নাতির চল্লিশায় যোগ দিতে। মণ্ডলের দুই নম্বর বিবির অনুরোধে খাস মেহমানদের রান্নার দেখাশোনাও করছে সে-ই। এদের বাড়ি টাউনের সঙ্গেই। তাদের হাটবাজার, টুকটাক ব্যবসাপাতি, রোজগার কামাই সব টাউনেই। ছয় মাসে নয় মাসে ফার্স্ট শো টকি দেখে তাদের বাড়িতে মেয়েরা বাড়ি ফেরে শাড়ি-জড়ানো রিকশা করে।

টাউনের প্রভাবে এবং একটু টানাটানির জন্যেও বটে, তাদের খাওয়া-পরা, ঘোরাফেরা মোটামুটি ছিমছাম। উত্তেজনা যেটুকু আছে তাও প্রায় বাঁধা ধরা। টাউন তাদের একেবারেই ছোটো; কিন্তু চাষবাস নাই বলে রোজগার সম্বন্ধে মোটামুটি আগে থেকেই সব জানা। জীবনযাপনও তাই ধরাবাঁধাই বলা চলে। মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে নাতির চল্লিশায় হৈ চৈ, ভিড়ভাট্টা এবং অনির্ধারিত ও অকল্পনীয় উত্তেজনা দেখে এবং খানদানি মেহমানদের রান্নার তদারকি করার সুযোগ পেয়ে হিংসায়, খুশিতে, গর্বে আজিজের শাশুড়ি ছটফট করে এবং যেদিকে চোখ যায় তাই দেখে নেয় নয়ন ভরে। রান্না সেরে মুখে একটা পান পুরতে এবং মেয়েকে কাছে পেলে ভালো রান্না সম্বন্ধে এই বাড়ির মানুষের সীমাহীন অজ্ঞতা নিয়ে তাকে যথাযথ ধারণা দিতে সে এসেছিলো মেয়ের ঘরে। জানলার ঠিক বাইরে কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা একটা বুড়াকে এরকম হেনস্থা হতে দেখে সে হেসে ফেলে। ব্যাপারটা দেখে সে বেশ তারিয়ে তারিয়ে এবং যতোই দেখে, ততোই হাসে।

ভেতর উঠানে সারি সারি কলাপাতার সামনে বসা মেয়েদের এবং তাদের কোলেপিঠেবুকে আসা রোগা, বেঢপ মোটা, পেটফোলা, মাথায় ঘা, চোখে পিচুটি ও নাকে-সিকনি বাচ্চাদের খাওয়ার তদারকি করতে করতে হামিদার হঠাৎ হঠাৎ করে মনে পড়ে তার ছেলের কথা। এতোগুলো মানুষ আজ মেতে উঠেছে ভাতের উৎসবে, গোশতের উৎসবে। তার সোনার টুকরা, বুকের মাণিকের অছিলাতেই এই বাড়িতে আজ এতোগুলো মানুষের মুখে ভাতের গেরাস ওঠে। অথচ, হায় রে, ছেলেটা তার কিছুই দেখতে পারলো না।—চোখের পানি মুছতে মুছতে হামিদা তার নিজের ঘরে এসে বিছানায় বসে হুহু করে কাঁদে। কিন্তু কান্নার সময় কৈ তার? তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে তাকে ফের যেতে হয় উঠানে। সে নিজের হাতে যতো মানুষকে যতো তৃপ্তি দিয়ে খাওয়াতে পারবে, মাসুম ছেলেটার রুহে ততো শান্তি, ততো তৃপ্তি। এখনি ফের উঠানে যাবে বলে হামিদা উঠতে যাচ্ছিলো, জানলার পাশ থেকে ডাক দিলো তার মা, 'ও হামিদা, দেখ, মানুষটা ক্যাংকা কর্যা ভাত খাচ্ছে, দেখ। আর একবার বলে খায়া আসিছে। দেখ, একোটা লোকমা কতো বড়ো? গাঁয়ের মানুষ এতোও ভাত খাবার পারে গো!'

গ্রামের মানুষের বেশি বেশি ভাত খেতে দেখার প্রবৃত্তি হামিদার একেবারেই নাই। বিয়ের পর থেকেই এটা দেখে দেখে সে একেবারে অতিষ্ঠ। নেহায়েৎ মায়ের উৎসাহে হামিদা এসে দাঁড়ালো একটু-ফাঁক-করা জানলার পাশে।

ঐ সময়টায় গফুর কলু ও হুরমতুল্লার দুইরকম অভিযোগ ও ধিক্কার শুনতে শুনতে তমিজের বাপ আরো চারটে ভাতের আশায় পাত থেকে চোখ তুলে তাকিয়েছিলো ওপরের দিকে। এই ঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে তার মুখটা এবার স্পষ্ট দেখা গেলো। তমিজের বাপকে দেখেই হামিদা একটা জোর ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে পেছন দিকে। বিছানাটা ছিলো বলে বসে পড়লো ওটার পরেই। তা জানলা দিয়ে তমিজের বাপকে চোখে পড়ে এই বিছানা থেকেও। পাতে দ্বিতীয় দফা ভাত তখনো পায় নি বলে তমিজের বাপের মুখটা তখনো ওপরের দিকে ফিট-করা। সুতরাং হামিদা তাকে নয়ন ভরে দেখতেই থাকে। দেখতে দেখতেই সে কাঁপে এবং তার পাশে বসে মা তাকে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল হয়ে বলে, 'কী মা? কী হলো রে মা?'

ফ্যাকাশে চেহারার মুখ দিয়ে হামিদা ফিসফিস করে, 'এই মানুষই মা! এই মানুষটাই গো হুমায়ুন যাওয়ার আগের দিন রাতে, না-কি তার আগের রাতে, তোমাক কলাম না মা, কই নাই? এই মানুষটাই আসিছিলো গো।'

হামিদার মায়ের সব মনে আছে। হামিদার সেই কালরাত্রির অভিজ্ঞতার কথা হামিদার মা শুনেছে হুমায়ুনের মৃত্যুর পরদিনই এখানে এসে। এই বাড়ির সব মানুষ এই ঘটনা জানে। গ্রামের লোকও অনেকে শুনেছে আর হামিদা তার মাকে বলেছে অন্তত একশো বার।

১৫

মরার দুই দিন আগে হুমায়ুন সারা দিনে প্রস্রাব করলো তিন বার, প্রস্রাবে রক্তের ধারা। তার সারা শরীর জুড়ে জ্বর মেতে ওঠে মাতালের মতো, বাড়তে বাড়তে জ্বর উঠে পড়ে ১০৬ ডিগ্রিতে। মাথায় অনেকক্ষণ পানি ঢাললে তাপ একটু কমে। জ্বর তখন আড়ি পেতে থাকে বালিশের তলায়, তোষকের নিচে। রোগীর মাথায় পানির ধারা একটু থামতে না থামতে জ্বর ফের লাফিয়ে এসে আসন পেতে বসে হুমায়ুনের কপালে। হরেন ডাক্তার বলে গেলো, 'এতো পানি ঢাললে নিউমোনিয়া হতে পারে, বরং কপালে জলপট্টি দিলে হয়।'

অনেক রাত পর্যন্ত জলপট্টি দিলো মণ্ডলের ছোটোবিবি, পাশে পালা করে বসছিলো আজিজ ও কাদের। কিছুক্ষণ পরপর বাটির পানি পাল্টে দিচ্ছিলো হামিদা। নিজের ঘরে জলচৌকিতে রাকাতের পর রাকাত নামাজ পড়ে চললেও নাতির প্রতিটি মুহূর্তের খবর রাখছিলো শরাফত মণ্ডল। পুবদুয়ারি ঘরে বড়োবিবি হুমায়ুনের জ্বরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিয়মমাফিক গালাগালি করছিলো স্বামীকে, রাত বাড়তে বাড়তে ক্লান্ত হয়ে না খেয়ে ও এশার নামাজ না পড়েই সে ঘুমিয়ে পড়ে। রোগীর ঘরে এশার নামাজ পড়ার পর ছোটোবিবির হাত আর চলে না, চোখ খুলে রাখাও তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাদের চলে গিয়েছিলো আগেই। আজিজ আর হামিদা ছোটোবিবিকে একরকম জোর করেই পাঠিয়ে দিলো, অন্তত ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে আসুক। ছোটোবিবি চলে যাবার পরপরই আবদুল আজিজ ঝিমুতে শুরু করে, কখন গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়েছে ছেলের পায়ের কাছে সে বুঝতেই পারে নি। মিহি স্বরে তার নাক ডাকার আওয়াজ পেয়ে হামিদা আস্তে করে ডাকে, 'বাবরের বাপ। ও বাবরের বাপ।' এতে তার নাক ডাকা থামে, কিন্তু ঘুম ভাঙে না। ঘরটা সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যায়। টিনের চালে শুকনা পেয়ারা পাতা পড়ে তিন ফোঁটা শিশিরের ভারে, হালকা ভিজে শব্দে ঘরের নীরবতায় এক ফোঁটা ফাঁক থাকে না।

ঘরে একা জাগে হামিদা। জলপট্টির ভিজে ন্যাকড়া হুমায়ুনের শিওরের বালিশের পাশে রাখা কাঁসার জামবাটির পানিতে ভিজিয়ে হামিদা ওর কপালে রাখতে না রাখতে শুকিয়ে যায়, শুকিয়ে গরম হয়ে যায়। মানুষের শরীরে এতো তাপ? হুমায়ুনের শরীর থেকে ভাপ বেরোয়, এই ভাপে হামিদার চোখ জ্বলে। চোখ বুঁজলে একটু আরাম পাওয়া যায়। বেশ আরাম!—বাবা আমা., সোনা আমার, আমার আব্বা, আমার ময়না।—হামিদা তার ঠোঁট রাখে ছেলের কপালে, ঠোঁট রাখে ছেলের গালে। ঠোঁট রেখে সে ছেলেকে চুমু খেতে থাকে। চুমুর চুমুকে সে শুষে নেবে ছেলের সব তাপ, সব জ্বালা।—আল্লা, আল্লা

গো, আমার ছেলেকে তুমি ভালো করে দাও। আমার ছেলের সব রোগ, সব তাপ তুমি আমাকে দাও আল্লা। আমার হুমায়ুনকে তুমি ভালো করে দাও।—আল্লাকে সে এইসব কথা বলছে, এমন সময় হামিদার পিঠে লাগে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক। তাহলে আল্লা তার মিনতিতে সাড়া দিয়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা পাঠিয়ে দিলো, এই শীতল বাতাসে ছেলের গা জুড়াবে। এরপর হামিদার গায়ে লাগে আরেক ঝাপটা ঠাণ্ডা হাওয়া, তার মাথাটা আরো ঝরঝরে হয়। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নাকে লাগে লোবানের গন্ধ। লোবানের গন্ধে তার বুকে ধক করে আওয়াজ হয়, সে চট করে মাথা তোলে। তার সামনে সাদা ধবধবে কাপড়পরা কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা একটা মানুষ। লোকটার গলায় ঝোলানো লম্বা লোহার শেকল। হামিদার ডান হাতটি তখন ছেলের বুকের ওপর, সেই হাতটিতে তার ধরা রয়েছে জলপট্টির শুকনা ন্যাকড়া। তার হাতের ভারে ছেলেটা বুঝি হাঁসফাঁস করছে। কিন্তু হামিদা না পারে তার হাতটা তুলতে, না পারে সাদা কাপড় জড়ানো লোকটির চেহারা থেকে চোখ সরাতে। ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ; হুমায়ুন অসুখে পড়ার পর থেকে জানলাগুলো সব সময়েই বন্ধ থাকে, আর বিকাল হতে না হতে দরজা আটকে দেয় বড়োবিবি। তাহলে এই লোকটি ঘরে ঢুকলো কী করে,—এই প্রশ্নটি কিন্তু তখন হামিদার মাথায় ওঠে নি। বরং সুবেহ সাদেকের হালকা আলোর মতো একটি জিজ্ঞাসার আঁচ লাগে তার শরীর জুড়ে : এই মানুষটিকে সে কোথায় দেখেছে? কবে দেখেছে? ঘোলাটে লাল চোখে লোকটি হুমায়ুনকে দেখে। তার চোখের ঘোলাটে সাদা জমি জুড়ে ঘোলা আলো। মণিহীন চোখ সে ফেরায় হামিদার দিকে। তার ঠোঁট নড়ে না, কিন্তু বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে ফ্যাসফেসে কথা, 'আর কদ্দিন? বেটাকে এখন আরাম দে, আরাম দে!' লোবানের গন্ধ আরো তীব্র হয়।

এই খসখসে স্বর হামিদা আগেও শুনেছে। কোথায় শুনলো? কবে শুনলো? কোনোদিন কি শুনেছে?—এসব মনে করার চেষ্টা বাদ দিয়ে সে বলে ফেলে, 'যাও। যাও।' কিন্তু বোবা-ধরা মানুষের মতো তার গলা থেকে আওয়াজ বেরোয় না। দুই কামরার মাঝখানে খোলা দরজায় পেরেকে ঝোলানা হ্যারিকেনে সলতে জ্বলছিলো কালচে লাল আলোয়। সেই আলোয় মানুষটির পরনের সাদা কাপড়টিকে হামিদা কাফনের কাপড় বলে ঠাহর করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হ্যারিকেন দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেলো। বাতি নেভার আগে দপ-করে জ্বলে-ওঠা আলোয় কাফনের ওপর কয়েক জায়গায় ছোপ ছোপ মাটির দাগও হামিদার চোখে পড়ে। আলো যাওয়ার পর মানুষটিকে আর দেখা গেলো না। তবে এর পর উঠানে গুনগুন শোলোক শোনা যায়। গানের কথাগুলো হামিদা শুনতে পায় সবই, কিন্তু ঘর্ঘর গলার স্বর মিশে যেতে না যেতে হামিদা চিৎকার করে পড়ে যায় ছেলের বুক ঘেঁষে।

কিছুক্ষণের মধ্যে পানির ঝাপটায় তার জ্ঞান ফেরে, ঘরে তখন ঘরভরা মানুষ। বাকি রাতটায় হুমায়ুন ছাড়া আর কারো ঘুম হয় না। হঠাৎ করে তার জ্বর নেমে আসে ১০০ ডিগ্রিতে। হামিদা রাতভর তার দেখা দৃশ্য শব্দ ও গন্ধের বিবরণ দেয়, ভয়ে কাঁপা গলায় তার বর্ণনা ক্রমেই অস্পস্ট ও এলোমেলো হতে থাকে।

শরাফতের ছোটোবিবি টের পায়, এসব চেরাগ আলি ফকিরের কেরামতি। কাউকে না বলে সে কোথায় না কোথায় চলে গিয়েছে, কোথায় তার মরণ হয়েছে কে জানে? সে-ই কোনো ভেক ধরে এসে এই গাঁয়ের ছেলেদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে নিজের ঠিকানায়। হামিদার এই খোয়াবের মাজেজা যদি কেউ বার করতে পারে তো এক তমিজের বাপ

ছাড়া আর কেউ নয়। চেরাগ আলির সঙ্গে সঙ্গে থাকতো তো কেবল সেই। ফকিরের নাতনিকে বিয়ে করার পর তার যাবতীয় বিদ্যা, যাবতীয় বুদ্ধি, যাবতীয় ফন্দিফিকির এখন চলে এসেছে তার কবজায়। হামিদা বারবার জানায়, সে তো স্বপ্ন দেখে নি। স্বপ্নই যদি দেখবে তো হ্যারিকেন সত্যি সত্যি নিভে যায় কী করে? সে বেহুঁশ হয়ে পড়লে আবদুল আজিজ জেগে উঠে ঘর কি অন্ধকার পায় নি? তারপর, স্বপ্নে মানুষ কি আর লোবানের গন্ধ পায়? এই গন্ধটি কিন্তু ছোটোবিবির নাকেও ঢুকেছিলো।

পরদিন সকাল থেকে বাড়ির সবার মেজাজ ফুরফুরে। হুমায়ুনের জ্বর ৯৯.৫ ডিগ্রি, নেবুর রস দিয়ে সে বার্লিও খেয়েছে আধ বাটি। হামিদা কিন্তু ছেলের রোগশয্যা থেকে এক পা নড়ে না। কিছুক্ষণ পরপর সে কেবল শিউরে শিউরে ওঠে।

'তমিজের বাপেক ডাকো। বাবরের মায়ের খোয়াবের তাবির না শুনলে হুমায়ুনের কী হবি কেউ করার পরবি না।' মণ্ডলের ছোটোবিবি বারবার করে বললে আজিজেরও ভয় লাগে। ছেলের সঙ্গে বৌও পড়ে গেলে আবদুল আজিজের হালটা হবে কী? সুতরাং তমিজকে দিয়ে খবর পাঠানো হলো তার বাপকে। ঘরের ব্যাপারে চারকবাকর কি আধিয়ারদের জড়ানো শরাফত মণ্ডল কিংবা আজিজ একেবারেই পছন্দ করে না। কিন্তু হামিদার জোর হলো তার সংশাশুড়ি, ছোটোবিবির সঙ্গে লাগতে যাওয়া শরাফতের পক্ষে কঠিন। আর আজিজ কি আর নিজের বৌকে ভয় পেয়ে মরতে দেখবে?

তমিজের বাপ কিন্তু আসে নি। বেটার কাছে টুকরা টুকরা করে হামিদার স্বপ্ন বা জাগরণে দেখা ঘটনার সবটাই সে শোনে। প্রায় ঝিমাতে ঝিমাতে শোনে এবং শুনে ঝিম ধরে বসে থাকে। সন্ধ্যা হতে না হতে সানকিভরা ভাত খেয়ে মাচার ওপর চিৎপটাং হয়ে সে ঘুমায়। ঘুমের ভেতর তার যাবতীয় বিড়বিড় করা শুনতে সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত জেগে ছিলো কুলসুম। তমিজের বাপের মুখ থেকে মেলা আওয়াজই তো বেরোয়, কিন্তু এর কোনোটাই কুলসুমের কানে শব্দের গড়ন পায় না। তবে দাদার কোনো কোনো শোলোকের রেশ আঁচ করা যায়। এতে কুলসুমের মাথাটা শুধু কামড়ায়।

সেই রাতে নাকে লোবানের গন্ধ পেয়ে ও কানে গুনগুন শোলোক শুনে হামিদা নতুন করে ভয় পায়। ঘরভরা মানুষ সেদিন তার সঙ্গে জেগে ছিলো। হামিদার বড়ো বড়ো চোখে অপরিচিত ছায়া দেখে তাদের গা ছমছম করে। সকালবেলা কাদের তাড়া দেয় তমিজকে, তার বাপ এসে হামিদাকে অন্তত বানিয়ে বানিয়েও দুটো কথা বলুক। বাড়িতে তমিজ বাপকে রীতিমতো শাসায়, সে যদি মণ্ডলবাড়ি না যায় তো শরাফত তাদের জমি বর্গা করতে দেবে আর? বাপ এরকম করলে তমিজ কিন্তু এসপার ওসপার একটা কিছু করে ফেলবে। ছেলের হুমকিতে বাপ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, তাকিয়েই থাকে। এ ছাড়া তার আর কোনো প্রতিক্রিয়া বোঝা যায় না।

কুলসুম তখন নিজে মণ্ডলবাড়ি যাবার প্রস্তাব করে। তা কুলসুম গেলেও হয়। হাজার হলেও সে হলো চেরাগ আলি ফকিরের নাতনি। তমিজ জানে তার এই সৎমাটি কম মানুষ নয়। তার বাপটাকে এখনো ফকিরের কবজার মধ্যে ধরে রেখেছে এই কুলসুমই।

তমিজ ও কুলসুম পাশাপাশি হাঁটে এবং তমিজ মহা উৎসাহে হামিদার ভয় পাওয়ার গল্প বলে। অনেকটা এসে, বুলু মাঝির পালান পেরিয়ে তমিজ পেছনে তাকিয়ে দেখে, একটু দূরে ফকিরের ঘাটে দাঁড়িয়ে বাপ তাদের একসঙ্গে হাঁটা আর কথা বলা দেখছে। তমিজের বাপ দাঁড়িয়েই থাকে, তারা চলে মণ্ডলবাড়ির দিকে।

কুলসুমের কাছে হামিদা সেই রাতের বিস্তারিত বয়ান পেশ করে। সে শুরু

করেছিলো ওইদিন সন্ধ্যা থেকে হুমায়ুনের কপালে জলপট্টি দেওয়া, এশার নামাজের পর তার ক্লান্ত সৎশাশুড়ির পাশের ঘরে জিরোতে যাওয়া এবং ছেলের পায়ের কাছে আজিজের ঘুমিয়ে পড়ার বর্ণনা দিয়ে। যতোটা সময় জুড়ে এইসব কাণ্ড ঘটে, বর্ণনাতে সে বরাদ্দ নেয় প্রায় ততোটা সময়। এর ফাঁকে ফাঁকে তার ছেলের বিদ্যাবুদ্ধি, খেলাধুলায় তার পারঙ্গমতা, ছেলের ওপর তার টাউনবাসী মামুদের প্রভাব এবং বড়ো ছেলে বাবর ও ছোটো ছেলে হুমায়ুনের স্বভাবের মিল ও পার্থক্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য সে পরিবেশন করে যায়। অনেকগুলিই কুলসুম কিছু না বুঝলেও তার কাছে সেসব বিরক্তিকর কিংবা অপ্রাসঙ্গিক ঠেকে নি। হামিদার প্রত্যেকটি কথাই সে শুনছিলো নিবিষ্টচিত্তে, তার মুখ ছিলো সম্পূর্ণ বন্ধ। মাঝে মাঝে ঠাঁয় বসে থেকে একটুও না ঝুঁকে সে নাক টেনে গন্ধ নিচ্ছিলো, গন্ধে গন্ধে হামিদার স্বপ্নের ভুলে-যাওয়া টুকরাগুলো হয়তো কিছু পাওয়া যেতে পারে। তবে সেই রাতে ছেলের জ্বরতপ্ত কপালে হামিদার চুমু খাওয়ার কথায় কুলসুম কেঁপে ওঠে। কাঁপুনি চেপে রাখতে চেষ্টা করলে তোলপাড় ওঠে তার বুকে, খানিকটা পাঁজরার হাড়ে এবং এতেই সেখানে বেড়ে ওঠে চেরাগ আলির গলা। কুলসুম স্পষ্ট শোনে,

খোয়াবে জননী চুম্বে পুত্রের ললাটে।
ঝাঁপ দিয়া পড়ে বাছা মণ্ডতের ঘাটে॥
চুম্বিলে পুত্রেরে মা গো কী কহিব আর।
আজরাইল লুকায়া ছিলো ওষ্ঠেতে তোমার॥

তারপর হামিদার স্বপ্নে, হামিদা অবশ্য স্বপ্ন বলে মানতে চায় না, স্বপ্ন হলে হ্যারিকেন সত্যি সত্যি নিভে যায় কী করে?—কাফনপরা মানুষটি গায়েব হয়ে গেলে বাইরে যে শোলোক শোনা গিয়েছিলো কুলসুম সেটা শুনতে চায়। হামিদা তার একটি অক্ষরও মনে করতে পারে না, কুলসুমের বারবার তাগাদায় সে চোখ বন্ধ করে ভাবে, কিন্তু লাভ হয় না। ততোক্ষণে কুলসুম মাথার ভেতরে শোনে চেরাগ আলির দোতারার টুংটাং বাজনা। কুলসুম আস্তে করে বলে, 'হামি কই? মনে কর্যা দেখেন, এই শোলোক লয়?' এরপর কুলসুমের গলা একটু মোটা হয়, বোধহয় তার গলায় গাইতে শুরু করে চেরাগ আলি,

তপ্ত দেহে পোড়ে পাখি জননীর না পড়ে আঁখি
আঁখিটি মুঞ্জিলে পরে ঘরত পাখি নাই।
ওগো ওগো মা জননী ঢাকো তোমার চোক্ষের মণি
ডিমের ভেতরে ডানা কেমনে ঝাপটাই।
জননী মুঞ্জিলে চক্ষু উড়াল দিয়া যাই।
মা জননী ঘুমাও গো এবার বিদায় চাই॥

শুনতে শুনতে হামিদার চোখে নামে ভয় আর উত্তেজনা। এই ভরদুপুরে নামে হ্যারিকেন নিভে-যাওয়া ঘনঘোট আন্ধার রাত, এর মধ্যে কুলসুমের গলায় সে শোনে সেই রাত্রির শোলোক। ব্যাকুল হাতে সে জড়িয়ে ধরে কুলসুমের হাত এবং জড়ানো গলায় বলে, 'ওই শোলাকই তো। একটা কথার ফারাক নাই। আরেকবার ক বুবু, আরেকবার ক।'

বুবু সম্বোধনে কুলসুম বিগলিত হয়, এক্ষুনি গুনগুন করা শোলোক তার গুলিয়ে যায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে পুরো শোলোক ফের মনে করার চেষ্টা করে, হামিদা মিনতি করে, 'বুবু, তুই আমার মায়ের পেটের বোন। আরেকবার ক বুবু।' কিন্তু হামিদার চোখ তন্দ্রায় জড়িয়ে আসছে। কুলসুম ফের বলে,

চান্দ জাগে বাঁশ ঝাড়ে কতো কতো ডিম পাড়ে
ভাঙা ডিমে হলুদবরণ হইল সকল ঠাঁই।
উঁকি দিয়া দেখি হামার ফকির ঘরত নাই॥
ময়না পংখি উড়াল দিছে কোনঠে তারে পাই॥

'হুঁ, এই গানই করিছিলো গো, মানুষটা এই গানই করিছিলো গো, মানুষটা এই গানই করিছিলো।' জড়ানো জিভ থেকে তার কথা পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে, চোখজোড়া তার বুঁজে বুঁজে আসে। পিঁড়ি থেকে সে পড়েই যেতো, মণ্ডলের ছোটোবিবি পেছন থেকে তাকে ধরে ওঠায় এবং নিয়ে যায় হামিদার শোবার ঘরে। হুমায়ুনের পাশে তাকে শোয়াতে না শোয়াতে হামিদা ঘুমিয়ে পড়ে।

হুমায়ুনের দাফনের সময় হামিদার ভাই টাউনের এক জবরদস্ত মৌলবিকে নিয়ে এসে বাড়িটাকে সোয়াদরুদ পড়িয়ে ভালো করে বাঁধিয়ে দেয়। চল্লিশ দিন ধরে হামিদার ঘরে কোরান শরিফ পড়া হচ্ছে। তবে হামিদার দেখা কাফনপরা মানুষটার ব্যাপারে কারো কোনো গা নাই। সেই একটি রাতের পর হামিদাকে সেও তো একবার চোখের দেখাটাও দেখতে এলো না।

১৬

বেটার মরার কথা ইশারায় জানিয়ে দিয়ে পাকা দেড়টি মাস পর কাফনের কাপড় পাল্টে খয়েরি-নীল চেক-কাটা লুঙ্গি পরে এই ভর দুঁপুরবেলা ওই মানুষটা এসেছে ওই ছেলেরই চল্লিশার ভাত খেতে। তাও একবার খেয়ে তার আশ মেটে নি, বেহায়ার মতো ফের বসেছে কলাপাতা পেতে। হামিদা মানুষটাকে দেখে, ভালো করে দেখে; তার নজর লেগেই কি-না কে জানে, লোকটার কাঁচাপাকা দাড়িগুলো দেখতে দেখতে পেকে ওঠে এবং তার গলায় গজিয়ে ওঠে শেকলের মালা। এইসব কাণ্ডে হামিদার নজর দেওয়ার শক্তি লোপ পায় এবং তার চোখজোড়াও বুঁজে আসে। তবে তার শরীরের কাঁপুনি কমে না, ওই কাঁপুনির ধাক্কায় তার মায়ের শরীর কাঁপে দ্বিগুণ বেগে। তবে মেয়ের মতো তার জবান বন্ধ হয় নি। হামিদার মায়ের বিলাপে ভেতর-উঠান থেকে অনেকেই এই ঘরে আসে এবং তাদের অনেকেই হামিদার বিচলিত হওয়ার কারণ বুঝতে না পেরে তার ওপর বিরক্ত হয়। তবে সহানুভূতিও কারো কারো ছিলো বৈ কি? তারা জিভ দিয়ে ৎচ ৎচ এবং গলায় নানারকম ভিজে আওয়াজ করে। তবে তাদের কিছুই করবার নাই এবং

বৌয়ের প্রতি দায়িত্ব পালনের অধিকার তাদের এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নি ; তাদের সমবেদনা প্রকাশ অন্যদের বিরক্তিকে আরো বাড়ায়। রীতিমতো রাগ করে হামিদার শাশুড়ি, শরাফতের বড়োবিবি। বৌয়ের ওপর রাগের চোটে নাতির শোক তার স্থগিত থাকে এবং অনেকদিন পর হুমায়ুনের জন্যে উদ্বেগ ও কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ ক্রোধের হাওয়ায় তার নিজের রেওয়াজ বাতিল হয়ে যায়। পুবদুয়ারি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে।

বারবার ডাক পেয়ে আবদুল আজিজ একবার আসে। হামিদার এইসব ব্যাপারে সে বেশ বিব্রত, বিচলিতও বটে। শাশুড়ির সামনে বৌয়ের সঙ্গে রাগারাগি করার ঝুঁকিও নিতে পারে না, তাই হামিদাকে সে ধমকায় একটু আদুরে গলায়, 'বাবরের মা, তুমি একটু শক্ত না হলে চলে? মনটা শক্ত কর। আল্লার মাল আল্লার পছন্দ হছে, নিয়া গেছে — ।'

আজিজ ঘরে ঢুকতে তার শাশুড়ি সরে গিয়েছিলো দরজার আড়ালে। টাউনের শাশুড়ি, লজ্জাশরম কম, তাই ওখান থেকেই জামাইকে সরাসরি বলতে পারলো, 'হামিদা টাসকা ল্যাগ্যা গেছে বাবা, একটা বড়ো ব্যারাম হতে কতোক্ষণ? কাল না হয় হামি অক সাথে কর্যা লিয়া যাই।'

শুনে সবাই ঠোঁট বাঁকায়, বেটা যেন কারো আর মরে না! বেটার শোকে মায়ের কঠিন ব্যারাম হবে কেন? এটা আবার কোন দেশী কথা গো? টাউনের বুড়িগুলোর আক্কেল জ্ঞান কম।

এদিকে বৌয়ের রোগশোক নিয়ে পড়ে থাকলে আবদুল আজিজের চলে না। উঠানে সারি সারি বসা মেয়েদের পেছন দিয়ে সে চলে যায় বাইরে মজলিশের মাঝখানে। বৌ-সোহাগের সময় কোথায় তার? মানুষ এতো এসেছে, এরকম জেয়াফত তাদের বাড়িতে এই প্রথম। বংশে মানুষ কি আর মরে নি? তার দাদার চল্লিশায় ফকির খাওয়ানো হয়েছিলো, জনা পঁচিশেক মানুষ ছিলো কি-না সন্দেহ। আর আজ তার নিজের ছেলের মৃত্যুতে এতো বড়ো আয়োজন। আজিজের চোখ ছলছল করে, হুমায়ুন মরে গিয়ে বাড়িতে এতো মানুষের জমায়েতের পথ করে দিয়ে গেলো। অথচ আজিজের নিজের অফিসের একটি মানুষও এলো না। কেরানির চাকরি করে, তাকে পোঁছে কে? কিন্তু চাকরি সে যতো ছোটোই করুক, তার বাড়িতে কতো মানুষের উৎসব হতে পারে সাব-রেজিস্ট্রার সাহেবকে একবার দেখাতে পারলে লোকটা কথায় কথায় তার ইংরেজি ভুল ধরার বাতিকটা কাটিয়ে উঠতো। লোকটা নিজে না আসুক, অফিসের একটা চাপরাশি এসেও যদি এই বাড়ির আজকের হালটা দেখে যেতো তো জয়পুর ফিরে গিয়ে অফিসের আর সবাইকে অন্তত ওয়াকিবহাল তো করতে পারতো!

বয়স কম হলে কী হয়, কাদেরটা এদিক থেকে অনেক চালাক। টাউনে সব ব্যবস্থা করে এসেছিলো, সবাই একসঙ্গে হয়ে ১৫/২০ জন মানুষ টমটমে করে এসেছে হৈ চৈ করতে করতে। গাড়ি থেকে নেমেই তারা 'মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ', 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ', 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান', নাড়া দিয়ে গ্রাম কাঁপিয়ে তুললো। জেলার নেতাগোছের মানুষও এসেছিলো তিন জন। কাদেরের এই মেহমানদের যেভাবে আজ খাওয়ানো হলো তাতে টাউনে কাদেরের পজিশন কতো বাড়বে!

সেখানে আবদুল আজিজের হালটা কী?—শোক, আক্ষেপ ও চিনচিনে হিংসা থেকে আজিজকে উদ্ধার করে গোলাবাড়ি প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার আলিমুদ্দিন। লোকটা হাজির হলো একেবারে বিকালবেলা। এক স্কুল ছাড়া মানুষটা সব জায়গাতেই লেট। মানুষ

পেলেই দাঁড়ায়, আর চাষাভুষাদের সাথে তার জমে বেশি। বাড়ি অনেক দূরে, পশ্চিমে শান্তাহার কি আদমদিঘির ওদিকে, এখানে থাকে গোলাবাড়ির উত্তরে এক চাষার বাড়িতে। তার চাষবাসের কাজেও হাত লাগায়, নইলে চাষা তাকে থাকতে দেবে কেন? চাষাদের সঙ্গে তার মেলামেশা দেখে কাদের তার সঙ্গে লীগের ব্যাপার আলাপও করেছে, তেমন আমল বোধহয় পায় নি। আজ তাকে দেখে আবদুল আজিজ তার স্বভাবের অতিরিক্ত তৎপরতা দেখিয়ে আলাপ করে এবং খানকাঘরে নিয়ে তাকে বসায় মেহমানদের সঙ্গে। খাওয়া দাওয়া তখন তাদের শেষ। তবে কাদেরের লীগের কর্মীদের কেউ কেউ তখনো খায় নি। আলিম মাস্টারকে আজিজ তাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিলো।

নামীদামি মেহমানরা কাঁচা রাস্তায় টমটমে ফিরে যাবে, তারা একটু তাড়াহুড়া করে গাড়িতে ওঠে। শিমুলতলার ছোটোমিয়ার ফিটনগাড়িতে জোড়া ঘোড়া জুতে সহিস অপেক্ষা করছে। ছোটোমিয়া হাতের ছড়ি একটু একটু নাড়াচ্ছে আর মণ্ডলের সঙ্গে কথা বলছে। আবদুল আজিজ ছোটোমিয়ার কাছছাড়া হয় না, শেষ সময়ের কথাটাই মানুষের মনে থাকে।—সাব-রেজিস্ট্রার সাহেবের সঙ্গে দেখা হলেই ছোটোমিয়া যেন আজিজের প্রসঙ্গ তোলে।

আবদুল কাদেরের মেহমানদের মধ্যে কর্মী গোছের রয়ে গেলো পাঁচজন। আজ রাতে তারা মানুষের ঘরে ঘরে যাবে। দলের পোস্টার আর হ্যান্ডবিল আনতে কাদের গোলাবাড়ি লোক পাঠিয়েছে।

বিকাল শেষ হতে না হতে বেশ ঠাণ্ডা পড়লো। খানকাঘরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে শরাফত মণ্ডল দেখে শুকনা খড়কুটো জ্বালিয়ে আগুন পোয়াচ্ছে তার বাড়ির কামলাপাট, সঙ্গে আরো কিছু মানুষ জুটেছে। লোকগুলো জেয়াফত খেয়ে এখনো বাড়ি ফিরে যায় নি। এরা এতোক্ষণ করে কী? আহা থাক, শীতে কষ্ট পাচ্ছে, এখানে একটু গা গরম করে যাক! শরাফত ছলছল চোখে তাদের দেখে। তার ছোট্টো দাদাভাইকে আল্লা বেহেশত নসিব করবে, মাসুম বাচ্চাটার জন্যে এই লোকগুলোর দোয়া আল্লার আরসে পৌঁছুবে সবার আগে। গরিব মানুষকে আলাদা করে দোয়া পড়তে হয় না, ভুখা মানুষের তৃপ্তিই আল্লাকে সন্তুষ্ট করে, গরিব বান্দার ভরা পেটের চেয়ে সুখ আল্লার কাছে আর কী আছে? এই এলাকায় এতগুলো গরিব মানুষ ভুখা নাঙা মানুষ আছে বলেই তো তাদের খাইয়ে তৃপ্তি দেওয়ার সুযোগ আজ শরাফত মণ্ডলের হলো। আহা এরা থাক। নাঙা মানুষের গায়ে আগুনের ওম লাগলে সেই আরামে তার নাতির রুহের মাগফেরাত হবে।

শিমুলগাছের সাদা বকের ঝাঁক নিচের আগুনের তাপে ওম নিতে নিতে তাদের পাখাগুলো আস্তে আস্তে মেলে, কিন্তু গুটিয়ে নেয় ঝপ করে। কয়েকটা বক শান্ত ও অলস উড়ালে চলে যায় বিলের ওপরকার পাতলা কুয়াশার ভেতর, তারপর ছোটো ছোটো ঝাঁকে ভাগ হয়ে ডানায় কুয়াশার হিম মাখতে মাখতে বিলের ওপর ঘিরে ঘিরে ওড়ে।

গোলাবাড়ির রাস্তায় এখনো যারা হাঁটছে তারা সবাই ফিরে যাচ্ছে এই বাড়ি থেকেই। পাতলা কুয়াশায় তাদের গতি বোঝা যায় অনেক দূর পর্যন্ত। বিলের ওপারে শরাফত মণ্ডলের নিজের জমি এবং তার আকাঙ্ক্ষিত জমির ওপর কুয়াশা একটু ঘন। ধান কাটা হয়ে-যাওয়া জমির উদাম বুক ধানগাছের স্মৃতিতে কুয়াশার ভেতরে একটু কাঁপে। কাৎলাহার বিলের ওপরকার কুয়াশা আঁশটে পানির গন্ধে পুরুষ্ট হচ্ছে। ওদিকে তাকিয়ে শরাফতের বুক পেট মাথা ভরে যায় কান্নায় কান্নায়।

শীতের সন্ধ্যা নামে ঝপ করে, কুয়াশার কোলে-পিঠে অন্ধকার ক্রমে ঘন হয়। বিলের হাওয়া এসে লাগে শরাফতের কিস্তি টুপি-পরা মাথায়। ঘরের ভেতরে গিয়ে পশমি-টুপি মাথায় দিয়ে, গলায় মাফলার ও গায়ে খয়েরি শাল জড়িয়ে সে নামে বারান্দার নিচে। নিচে নামলে বিল চলে যায় চোখের আড়ালে। তখন আবছা আবছা শোনা যায় নামীদামি মানুষের কথাবার্তা। চোখের সামনে দোলে ছোটোমিয়ার হাতের ছড়ি। এই ছোট্টো দাদাভাইটা মরে গিয়ে শরাফতকে আজ কী ইজ্জতটাই না দিয়ে গেলো! আর সেই মাসুম বাচ্চাটাই পড়ে থাকে মাটির নিচে একা একা। সবই আল্লার ইচ্ছা!—শরাফতের দুই চোখ বেয়ে নামে পানির ধারা। সে তখন আস্তে আস্তে হাঁটে পশ্চিমের দিকে, বাড়ির পেছনে পালানে জোড়াপুকুরের ওপারে বেগুনখেত পেরিয়ে মস্ত বাঁশঝাড়। বাঁশঝাড়ের গা ঘেঁষে হুমায়ুনের কবর।

চল্লিশ দিনে হুমায়ুনের কবরে ঘাস গজিয়েছে, চারপাশে শীতের দাপটে ঘাসগুলো একটু রক্তশূন্য। এর ওপর টাঙানো কুয়াশার মশারি, সামনে গেলে মশারি পাতলা হয়ে আসে। শরাফতের বাবা, মা, সৎমা, বড়োভাই, ভাবী ও ছোটভাইয়ের কবর। সবই এলোমেলো। এই কবরগুলো এখানে তবু চেনা যায়। এছাড়া এই বড়ো জমিটা জুড়ে শুধু কবর আর কবর। সে গুলোকে আলাদা করে চেনা কঠিন। বড়ো বড়ো ঘাস আর গাছড়ার নিচে কোনোমতে মুখ গুঁজে থাকে। শুধু এই জমির শেষ মাথায়, একেবারে উত্তর পশ্চিম কোণে কালাম মাঝি মাঝে মাঝে এসে মোমবাতি জ্বালিয়ে যায়, সেটা নাকি ওর বাপের কবর। কবরে মোমবাতি দেওয়া বেদাত কাম, মোহাম্মদি জামাতের মানুষ হয়ে শরাফত এটা সহ্য করতে পারে না। কিন্তু কালাম মাঝি বড়ো ঘাড়ত্যাড়া মানুষ, তাকে দুই একবার বলে লাভ হয় নি, সে জবাব দেয়, 'হামাগোরে আলাদা জামাত, হানাফির গোরস্থান, হামার দাদা পরদাদা তার পরদাদা সোগলি এটি আছে। মোমবাতি হামার দেওয়াই লাগবি।' জায়গাটা অবশ্য আগে থেকেই গোরস্থান ছিলো, এখানে মাঝিদের কাছ থেকে জমি কেনার সময় শরাফতের বাপ দলিলে পুরো জমিটাই নিজের নামে লিখে নেয়। তবে শরাফতের বাপের আমলেও মাঝিদের লাশ কিন্তু দাফন হতো এখানেই। শরাফতের জমি বাড়তে লাগলো পশ্চিমে ও উত্তরে, এমন কি কালাম মাঝির এক ভাগীদারের কাছ থেকে গোরস্তানের দক্ষিণের মজা ডোবাটাও মণ্ডল কিনে নিয়েছে আকালের বছর। গোরস্তানের চারো দিকের জমি শরাফতের দখলে আসার পর সে এমন চাষবাস শুরু করে দিলো যে, মাঝিপাড়ার মানুষ এখানে গোর দেওয়ার রেওয়াজ চালু রাখতে আর সাহস পায় না। কাৎলাহার বিলের উত্তর পুবের একটা পতিত জমি শরাফত তাদের দেখিয়ে দিয়েছে, বেটারা সেখানেই মড়া পোঁতে আজকাল। এই কালাম মাঝির মতো রগত্যাড়া মানুষ মাঝে মাঝে এটা সেটা কয়। বাপের কবরে মোমবাতি দেওয়ার নাম করে মরা মাঝিদের অছিলায় এখানে জ্যান্ত মাঝিদের দখল কায়েম করার ফন্দি করে। বুলু মাঝি মরলে তাকে এখানে গোর দেওয়ার কথা উঠিয়েছিলো এই কালাম মাঝিই। তা কী করতে পারলো? বুলুর দাফনে শরাফত খরচা করলো কতো। কালাম মাঝির এতো বড়ো দোকান থেকে একটা পয়সা তো বেরুলো না। এরপর বুলু মাঝির দাফন কোথায় হবে সে নিয়ে মাঝির বেটারা আর কথা বলতে পারে? শরাফত মণ্ডল বিল ইজারা নেওয়ার পর থেকেই কালাম হিংসায় ফেটে যাচ্ছে। আরে বাবা, জমিদার তার এলাকার ভেতর কাকে কী দেবে সে জানে কেবল জমিদারই। হিংসা করে কালাম মাঝি কী করতে পারে? মাঝিপাড়ার সবাইকে জমি বর্গা দিয়ে শরাফত তাদের বিলের কথা ভুলিয়ে ছাড়বে। আজ জেয়াফতে মাঝিপাড়ার একটি প্রাণী বাদ পড়ে নি। কালাম মাঝি

প্রথমদিকে এলো না দেখে কাদের তমিজকে পাঠাতে চেয়েছিলো। মণ্ডল বললো, 'আসবি বাবা। দোকানপাট করে, কতো কাম তার। দেরি হবার পারে।' তা সে ঠিকই এসেছিলো। কালাম মাঝির ছেলে তহস্সেন বর্ধমান জেলায় কোথায় পুলিসের চাকরি পেয়েছে, ছুটিতে বাড়ি এসেছে। শরাফত সেদিন নিজে তাকে বলে এসেছিলো। সে তো এসে খানকাঘরে ভদ্রলোকদের মধ্যে দিব্যি খেয়ে গেলো। বিকালের দিকে কালাম কখন এসে গোয়ালঘরের পেছনে আর দশজন মাঝির কাতারে বসেছিলো, শরাফত সব খবরই রাখে। কালাম মাঝির জারি-জুরি আর কতোদিন? গোরস্থান দখল করার ফন্দি ওর আজই মিটে যাবে।

হুমায়ুনকে কবর দেওয়ার পর জায়গাটিকে মণ্ডলদের পারিবারিক গোরস্তানে পরিণত করার ব্যবস্থা এখন পোক্ত করা যায়। ছেলের কবরটা বাঁধাবার জন্যে আবদুল আজিজ কয়েক দিন ঘ্যানঘ্যান করলো। বড়োবেটাটা তার বড়ো বৌচাটা, বৌ ফোঁৎ ফোঁৎ করলেই তার মাথা খারাপ, বৌ যা বলে তাই করার জন্যে হন্যে হয়ে ওঠে। শরাফত বলেই দিয়েছে তাদের আহলে হাদিস জামাতে কবর সাজানো শেরেকি কাজ।

তবে এখন হুমায়ুনের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তার চোখ জুড়ে শুয়ে থাকে শিমুলতলার মিয়াদের বাড়ির গোরস্তানের সার সার কবর। মিয়াদের কোনো কোনো কবর কী সুন্দর করে বাঁধানো। কোনো কবরের শিওরে সিমেন্টের ওপর চাঁদ তারা, কোনো কবরে পাথরে খোদাই-করা আল্লার কালামের নিচে মরহুমের নাম, বাপের নাম, জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ। সেখানে গেলে সেই সব মরহুমের অছিলায় তাদের ছেলেমেয়ে নাতি পুতিদের জন্যেও ভক্তিতে বুকটা ভরে ওঠে। শিমুলতলার মিয়াদের খানদানি বোঝার জন্যে জ্যান্ত মানুষকে না দেখলেও চলে, ওইসব বাঁধানো কবরই হলো খানদানের নীরব নকিব।

তা হুমায়ুনের কবর বাঁধালে ক্ষতি কী? ছেলেটা তাদের কতো ইজ্জত এনে দিলো, মরার পর তার কি এটুকুও প্রাপ্য নয়?

ইট সিমেন্ট কবর বাঁধালে নায়েববাবু কি আপত্তি করতে পারে? কয়েক বছর আগে বিলের উত্তরে কাশবন কেটে চাষবাস করার উদ্যোগ নিয়ে ব্যর্থ হলে টাউনের উকিল রমেশ বাগচি ওখানে ইটের ভাঁটা করার কথা ভাবছিলো। উকিলবাবুর ভাগ্নে টুনুবাবু পয়সাকড়ি নিয়ে বোম্বাই না মাদ্রাজ ভাগলে এসব ভাবনা তারা ঝেড়ে ফেললো। তারপর কাদের একবার বাই তুললো ইটের ভাঁটা করবে। ওদিকে তো জঙ্গুলে জায়গা, কাঠের খরচ নাই : সস্তায় ইট করে প্রথমে না হয় নিজেদের বাড়িটাই পাকা করে ফেলবে। তা কাদেরের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা কী করে লাঠিডাঙা কাচারিতে পৌঁছুলে নায়েববাবুই একদিন মণ্ডলকে ডেকে পাঠিয়ে বলে, 'মণ্ডল, কর্তা আমাদের মাটির মানুষ। তার সহ্যশক্তিও অনেক। ভগবান একেকজন মানুষকে সৃষ্টিই করেন ওইভাবে। কিন্তু চাষাভুষা প্রজাপাটি সবাই যদি দরদালানে থাকতে শুরু করে তখন তাঁর সম্মানটা থাকে কোথায় বলো তো?' ইঙ্গিত ধরতে পেরে শরাফত বলে, 'সোগলি দালানেত থাকলে দালানের ইজ্জত থাকে ক্যাংকা কর‍্যা? কথা ঠিকই কছেন বাবু। ধরেন, হামার কথাই ধরেন। বাপের ছনের ঘর আছিলো, হামি করলাম টিনের ঘর। আশীর্বাদ করেন বাবু', নায়েবের আশীর্বাদ নিতে শরাফত অন্তত পাঁচ হাত দূরে মাটি ছুঁয়ে ফের উঠে দাঁড়ায়, 'আশীর্বাদ করেন, ওই টিনের ঘরত যেন মরবার পারি। ওই ঘরত যানি হামার মরণ হয়।' তখন কাচারিতে সে নিয়মিত ভেট দিয়ে যাচ্ছিলো, শরাফতের এক কথাতেই নায়েব গুজবটা বাতিল করে দেয়।

তবে কবর বাঁধালে নায়েববাবু আপত্তি করবে কেন? বাড়ি আর কবর কি আর এক হলো?

কিন্তু অসুবিধা আর একটা আছে। সেটা অন্যরকম। কী—এখানে তো শরাফতের মুরুব্বিরাও আছে। বাপজান আছে, মা আছে, মিয়াভাই আছে,—এদের কবর পাকা না করে হুমায়ুনের কবরে সে ইঁট বসায় কী করে?

তাহলে হুমায়ুনের জন্যে, তার লাশ হেফাজতের জন্যে শরাফত কি কিছুই করতে পারে না? এটা কি তার সঙ্গে নিমকহারামি করা হচ্ছে না?—এই ভাবনা ও উদ্বেগে তার জিয়ারতের দোয়া বারবার এলোমেলো হয়ে যায়। নতুন করে সমস্ত মনোযোগ সে নিয়োগ করে দোয়ার দিকে। 'আসসালামু আলাকুম ইয়া আহলাল কুবরে, মিনাল মুসলিমিনা, ওয়াল মুমিনিনা, আন্তম লানা' পর্যন্ত বলেছে, তখন তার পাশে এসে দাঁড়ালো আবদুল আজিজ। জিয়ারতে সে শরিক হয়, কিন্তু মোমবাতি ও আগরবাতি জড়ানো কাগজের মোড়কে তার একটা হাত বন্ধ, মোনাজাতের জন্যে হাত তোলা তার পক্ষে বেশ মুশকিল। দোয়া শেষ হলে হাতের প্যাকেটার জন্যে আবদুল আজিজ বাপের দিকে তাকায় অপরাধী চোখে। তাদের জামাতে গোরে বাতি দেওয়া একেবারেই নিষেধ। মিনমিন করে সে কৈফিয়ৎ দেয়, 'বাবরের মাও খালি কান্দিচ্ছে', বাপের সঙ্গে দূরত্ব না রাখার জন্যে কিংবা শোকেও হতে পারে, তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে ছোটোবেলার বুলি, 'খালি কান্দে আর কয়, বেটাটা হামার ঘুটঘুট্যা আন্ধারের মধ্যে একলা পড়্যা থাকে। তাই হামি—'

শরাফত চুপচাপ ছেলের হাত থেকে মোমবাতি নিয়ে হুমায়ুনের শিওরে সাজায়, তারপর আজিজের কাছ থেকে দেশলাই নিয়ে মোমবাতি ও আগরবাতি সব এক এক করে ধরিয়ে কবরের চারদিকে মাটিতে গুঁজে গুঁজে দেয়। এই করতে করতে, হয়তো মোমবাতির আলো ও আগরবাতির সুবাসেই হবে, শরাফতের মাথায় ঝিলিক দিয়ে ওঠে, তার বাপ-মা কি মিয়াভাই তো নিজেদের কবর বাঁধাবার জন্য কোনো অসিয়ত করে যায় নি। তারা পাকা আহলে হাদিস। মিয়াভায়ের নাম শেতল মণ্ডল পাল্টে শমশের আলি মণ্ডল হলো তো মওলানা আবদুল্লাহেল বাকির কথায়। না, তাদের কবর পাকা করলে তাদের রুহ কষ্ট পাবে। কিন্তু হুমায়ুন এক মাসুম বাচ্চা, নাবালক। তার কবর কী হবে না হবে সেটা ঠিক করবে তার মুরুব্বিরা। তার কবরে কোনো শেরেকি কাজ তারা করবে না, শুধু পাকা দেওয়ালে ঘিরে দেবে যাতে ভবিষ্যৎ বংশধররা শিশুটিকে চিনতে পারে, শিশুটি তাদের পরিবারে অনেক মর্যাদা দিয়েছে।

সিদ্ধান্তটি শরাফত ঠিক তক্ষুনি আজিজের কাছে প্রকাশ করে না। কিন্তু হুমায়ুনের প্রতি দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে ভেবে তার মাথার জট খুলে যায় বলে হুমায়ুনের জন্যে শোকের প্রতি মনপ্রাণ নিবেদন করতে পারে। এর মধ্যে আবদুল আজিজ কবরের ওপর গোলাপজল ছিটিয়ে দিয়েছে এবং আগরবাতি ও গোলাপজলের খুসবু মোমবাতির কচি আলোর আভায় ছড়িয়ে পড়ে তামাম গোরস্তান জুড়ে। এইভাবে অনেক অনেক আগে দাফন-হওয়া মাঝিদের কবরগুলোও চলে আসে হুমায়ুনের কবরের আওতার ভেতরে। চল্লিশার অনুষ্ঠানের এমন নিটোল উপসংহারে শরাফত মণ্ডলের মাথা খুব হালকা হয়ে যায়, তার চোখ থেকে প্রবাহিত নোনা পানি আগরবাতির মিষ্টি গন্ধ ও মোমবাতির কচি আলো কবুল করে নিয়ে হয়ে ওঠে মিষ্টি ও স্বচ্ছ।

অন্ধকার গাঢ় হয়। বাপেবেটায় এবার বাড়ি ফেরার জন্যে পা ফেলে পুব দিকে।

কিন্তু পাশের বাঁশঝাড়ে কিসের শব্দ পেয়ে দুজনেই থমকে দাঁড়ায়। শরাফত মণ্ডল কপাল কোঁচকায় : মাঝিদের পুরনো কোনো লাশ কি মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে গোরস্তানে টহল দেওয়ার জন্যে? আর আবদুল আজিজের ভাবনা কি ভয় পাবার শক্তির সবটাই ঢুকে পড়েছে সেই টহল-দেওয়া লাশের শূন্য কবরের ভেতর, সে কেবল প্রাণপণে চেষ্টা করছে কোনোমতে নিজের পা দুটির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে। এতো বড়ো বাঁশঝাড়টা এখন এরা পেরোবে কী করে? দুই জনের একটি পা-ও এক পা নড়তে পারে না।

কিন্তু কয়েক মুহূর্তেই শরাফত স্বস্তি ও ক্রোধের নিশ্বাস ফেলে। আলহামদুলিল্লাহ! না, সেরকম কিছু নয়। বাঁশঝাড়ে বসে পায়খানা করছে কোনো শালা ছোটোলোকের বাচ্চা। আজ জেয়াফতে গোগ্রাসে গেলা এবং হজম-বদহজম-হওয়া খানা সে খালাস করছে মিহি ও মোটা নানারকম ধ্বনি তুলতে তুলতে। ভূতপেত্নী আর যাই হোক হাগামোতা করে না, এই ভরসায় শরাফত তেজি গলায় হাঁক ছাড়ে, 'কেটা রে? কেটা হাগে? এটি হাগে কোন হারামজাদা?'

বাঁশঝাড় থেকে মলত্যাগকারীর গলার আওয়াজও পাওয়া যায় এখন। কোঁৎ দেওয়ার ও পায়খানা করার আওয়াজ বাজে যুগলবন্দি হয়ে, লোকটা তাড়াতাড়ি কাজ সম্পন্ন করার জন্যে মরিয়া হয়ে লেগেছে। শরাফত মণ্ডল দ্বিতীয়বার হুংকার ছাড়ার পরেও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় দুজনকে। তারপর বাঁশঝাড় থেকে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে আসে তমিজের বাপ। তার শরীরে উৎকট দুর্গন্ধ। গন্ধ ধাঁ করে ঢুকে পড়ে আজিজের গলায়, সেখান থেকে পেটেও চলে যেতে পারে। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সে বমি করে ফেলে। তার বমির তরল ছিটায় হুমায়ুনের কবরের শিওরে একটি মোমবাতির শিখা একটু কেঁপে দপ করে নিভে যায়।

শরাফত মণ্ডলের দিকে তাকিয়ে তমিজের বাপ অপরাধী গলায় বলে, 'বাড়িত যাচ্ছিলাম। ঘাটাত বাহ্যি চাপলো, আর পারলাম না। হামাগোরে গোরস্তানের এটি বাঁশঝাড়ের মধ্যে—'

তমিজের বাপের গুয়ের গন্ধ এখন দখল করে নিয়েছে গোটা গোরস্তান। এখানে ফেরেশতা আসবে কীভাবে? শরাফত ও আজিজের পক্ষেই তো টেকা দায় হয়ে পড়েছে।

ঘরে যেতে যেতে শরাফতের ভুরু কুঁচকে আসে, তমিজের বাপ এই পথে বাড়ি ফেরে কেন? মাঝিপাড়ার মানুষের জন্যে এই পথে চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই। এই গোরস্তান কি এখনো শালাদের 'হামাগোরে গোরস্তান?' এতো সাহস ও পায় কোথেকে? কালাম মাঝি আবার লেলিয়ে দেয় নি তো?

আর আবদুল আজিজের করোটিতে বেঁধে একটির পর একটি কাঁটা, কিংবা একটি কাঁটারই শাখাকাঁটা উপকাঁটা : এই লোকটাই না? দুপুরবেলা এই লোকটাকে দেখেই তো হামিদা অমন ভয় পেয়ে গেলো? আজিজ এখন বোঝে, এই তমিজের বাপই সেই রাত্রে কাফনের কাপড় পরে ওই রাতে এসেছিলো হুমায়ুনকে নিয়ে যেতে। ছেলেটা মরার পরেও সে তার পিছু ছাড়ছে না। সন্ধ্যার পর পায়খানা করার জন্যে সে কি হুমায়ুনের কবরের পাশে ছাড়া আর জায়গা পেলো না? লোকটা আসলে কী? তমিজের বাপ কি আসলেই তমিজের বাপ? লোকটা কে?—ভয়ে আবদুল আজিজ থরথর করে কাঁপে। কাঁপুনির বেগে সে ঘরে পৌঁছে যায় শরাফতের অনেক আগে। তমিজের বাপের আচরণ শরাফতকে বেশ ভাবনায় ফেলে দিয়েছে, ভাবনায় তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত বেশ ভারী। তার গতি একটু মন্থর।

১৭

ধান কাটার দিন ভোর হওয়ার বেশ আগেই, আন্ধার থাকতে থাকতে আলের উপর কুলগাছতলায় দাঁড়িয়ে তার দুই বিঘা সাত শতাংশ জমি তমিজ দেখে নিচ্ছিলো দুই চোখ ভরে। এ বছর জমির এমন ভরা বুক তো সে আর দেখতে পারবে না। পাকা ধান মাথায় নিয়ে ধানগাছগুলো খানিকটা হেলে পড়েছে, আবার জায়গায় জায়গায় তমিজ ধানগাছ এলিয়ে দিয়েছে নিজেই, ধান যাতে সমানভাবে পাকে। কোলে ধান কাঁখে ধান নিয়ে একেকটি গাছ নিঃসাড়ে ঘুমায়। কুয়াশা চুঁয়ে শিশিরের এক-একটি বিন্দু শীষের ওপর স্বপ্নের তরল ফোঁটার মতো পড়লে ধানগাছের ঘুম আরো গাঢ় হয়। ধানখেতের স্বপ্নের ঝাপটায় তমিজের গা কাঁপে, দেখতে দেখতে সে বসে পড়ে আলের ওপর।

ধানগাছের স্বপ্নের ধাক্কায় দুলতে দুলতে তমিজ হাতের কাস্তের ধার দেখে আলগোছে, কাস্তের কচি কচি দাঁতে তার হাতে সুড়সুড়ি লাগে, ভোতা আঙুলের মাথা বেয়ে তাই ছড়িয়ে পড়ে তার সারা শরীরে। দশরথ কর্মকারের পাশে বসে সে কাস্তে ধার করে নিয়ে এলো পরশুদিন। কাস্তে কোদালে ধার দশরথের মতো দিতে পারে—এ তল্লাটে তেমন আর কেউ নাই। মানুষটা কথা কয় কম, দিনরাত হাঁপর টানে, হাঁপর টানে আর ফাঁকে ফাঁকে এটা ওটা ধার দিয়ে দেয়। তবে প্যাচাল পাড়ে তার বেটাটা। বাপ কেমন চুপচাপ হাঁপর চালাচ্ছে। আর দেখো এক নাগাড়ে কথা বলে চলে যুধিষ্ঠির।—কী?—না, গোলায় ধান তোলার সময় মণ্ডল নাকি তার সঙ্গে খুব প্যাগনা করেছে। মণ্ডল খালি এটা চায়, ওটা চায়। এই খরচ দাও, ওই খরচ দাও। খরচ দিতে না পারো তো তোমার ভাগের ধান থেকে এ বাবদ এতো ধান দাও, ওই বাবদ অতো ধান দাও। যুধিষ্ঠির তমিজকে ভয় দেখায়, 'তোমার তো মেলা ধান হছে। হামি লিজেই দেখ্যা আসিছি। কতো ধান ঘরত তুলবার পারো দেখো!'

আগেভাগে এসব অলক্ষুণে কথা বলার দরকারটা কী বাপু? তমিজের রাগই হচ্ছিলো যুধিষ্ঠিরের ওপর, যার জমি তুমি বর্গা করো, যার জমিতে তোমার লক্ষ্মী তার নামে এমন গিবত করলে তোমার ধর্মে সইবে?—'ধান মাপা আরম্ভ হলে মণ্ডল খালি প্যাগনা করবি।'—এই দেখো, শীতের অন্ধকার ভোরে যুধিষ্ঠিরের বাড়ির হাঁপরের আঁচ লাগে, এই আঁচে ধানখেতের ওপরকার কুয়াশা উড়ে যাচ্ছে ধোঁয়া হয়ে, শিশিরবিন্দু শুকিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে জমির ভেতরে। আসমান সাফ হয়ে আসছে।

এই সময় বাপকে কাস্তে হাতে আসতে দেখে তমিজ উঠে দাঁড়ালো। না গো, বুড়া দেরি করে নি। বাপ বেটায় এখনি জমিতে নামা যায়।

কিন্তু দুজনে জমিতে নামার আগেই এসে হাজির হলো হুরমতুল্লা ও তার পেছনে আরো তিন জন কামলা। এরা সব নিজগিরিরডাঙার পুবপাড়ার মানুষ।

'নামো, নামো।' হুরমতুল্লা এসেই তাগাদা দেয়, 'কামেত নামো গো। বেলা ডোবার আগেই ব্যামাক আঁটি হামার বাড়িত তোলা লাগবি।'

কিন্তু কামলা নেওয়ার কথা তো তমিজের ছিলো না। মণ্ডলের সঙ্গে এমন কথা তো হয় নি। তবো এগুলো কী?—না,কামলা নিতে হবে। শরাফত মণ্ডলের হুকুম। এই জমির ধান কাটতে হবে এক দিনে। তমিজ একলা কাটলে এক সপ্তাহেও কুলাতে পারবে না।

'হামার বাপ তো হামার সাথে আছে। তাঁই হাত লাগালে তোমার দুই কামলার কাম সারবার পারে, সেই খবর রাখো?'

তমিজের কথায় হুরমতুল্লা আমল দেয় না। ধান বেশি পেকে গেছে। কয়েক দিন

ধরে কাটলে এর মধ্যে অর্ধেক ধান ঝরে পড়বে মাটিতে, ঝরা ধানে বরকত নাই। শরাফত তাই কাল রাত্রে হুরমতুল্লাকে ডেকে কামলা জোগাড়ের ভার দিয়েছে।

সবাই মাঠে নেমে পড়লে 'তিন মুঠা কাটা হলে আঁটি বান্দো', 'হুঁশিয়ার হয়া কাম করো', 'কাঁচি ধরার কায়দা আছে বাপু, ইটা তোমার জাল মারা লয়। ধান যানি ঝর্যা না পড়ে', হুরমতুল্লার প্রভৃতি উপদেশে শরাফতের হুকুমই গমগম করে ওঠে। তবে বাপের কাস্তের অতি দ্রুতগতিতে তমিজ তার ভোরবেলার, এমন কি, আরো আগেকার তেজ ফিরে পায় এবং হাম্বিতাম্বি শুরু করে নিজেই, 'দেখো! চোখ দিয়া চায়া দেখো। বুড়া মানুষটার ছ্যাও দেখ্যা তোমরা শিখ্যা লেও।'

বাপের কাজে অসাধারণ ক্ষিপ্রতা ও পটুত্বের কল্যাণে দুপুরবেলার মধ্যেই জমি জুড়ে তমিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে ধানের পরিমাণে, আকারে, পুষ্টিতে ও সৌন্দর্যে অভিভূত হওয়ার সুযোগ সে পায় এবং এই জমিতে নিজের মেহনত ও কৌশল নিয়ে নানা কিসিমের বাক্যি ছাড়ে। তমিজের বাপ কথা কয় না। ধানের ফলনে বেটার কৃতিত্বে সে খুশি কি-না তার কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু তার কাস্তের গতি ও তমিজের চোপার নিচে চাপা পড়ে হুরমতুল্লার দাপট।

বাপের চুপ মেরে যাওয়া সুদে-আসলে তোলে হুরতুল্লার বেটি ফুলজান। বাঁকের দুই দিকে ভারে ভারে ধানের আঁটি এনে হুরতুল্লার উঠানে কামলারা সাজিয়ে রাখছিলো থাক থাক করে, ফুলজান তখন চলে আসে সামনে। কামলাগুলো না থাকলে সে হয়তো মাঠেই চলে যেতো।

দুই দিন ধরে সব ধান কাটা শেষ হলে কামলারা চলে যায়, এখন থেকে ধানের সমস্ত তদবির করতে হবে তমিজকে একা। বাপটা ঘরেই পড়ে থাকে, জমি থেকে ধান কেটে দেওয়ার পর তার আর কোনো উৎসাহ নাই। তমিজ বললে হয়তো আসতো। তা তমিজ কিন্তু বাপকে কিছু বলে নি। ফুলজানের চোপার কিছু ঠিক নাই, কার সামনে কী বলে বসে কে জানে? তমিজ অবশ্য রোজ ভোরবেলা এই বাড়িতে ঢোকার সময় বুকে বল জুগিয়ে নেয়, সে কি ফুলজানের খায় না পরে, না-কি তার বাপের জমিতে বর্গা চাষ করে যে তাকে ভয় করতে হবে? আবার তার বিমারি বেটাকে দেখে তমিজের মায়াও লাগে, আহা ছেলের জন্যে মায়ের কষ্টের আর শেষ নাই। তা বেটাকে নিয়ে টাউনে যাবার কথা সে তুলবে, আগে ধানটা মণ্ডলের গোলায় তোলা হোক। ফুলজানের বেটা নবিতনের কোলে বসে ঘোলাটে চোখে জুলজুল নজরে তমিজের ধান পেটানো দেখে। ফ্যাকাশে মুখে তার চোখজোড়া চকচক করে দেখে তমিজের ধান পেটানো হাত শিথিল হয়ে আসে : দুত্তোরি! ছোঁড়াটা মনে হয় ভালোই হয়ে গেলো! ওকে নিয়ে প্রশান্ত কম্পাউনডারের কাছে যাবার কথা ছিলো, তা বুঝি আর হলো না!

'ধানের কোবান দেওয়ার কায়দা আছে, বুঝিছো?' কিন্তু কাঠের তক্তায় ধানের আঁটি বাড়ি মারার কৌশলটি দেখিয়ে না দিয়েই ফুলজান বলে, 'খালি গায়ের জোর খাটালেই ব্যামাক কাম হয় না গো মাঝির বেটা। বুদ্ধি খাটান লাগে।'

তার কাজের খুঁত ধরতে ফুলজান সবসময় কাছে থাকে। তমিজের একেক দিন রাগ হয়, ইচ্ছা করে, মাগীর পাওনা পয়সা কয়টা ঝনাৎ করে ফেলে দেবে সামনে। বলবে, 'ভালো কর্যা গুন্যা লেও।' কিন্তু ফুলজান তো পয়সা চায় না। তমিজও ভাবে, ধান ঘরে ওঠার আগে এতো খরচ করা ভালো নয়। তবে নিজেকে ফুলজান যে এতো কামলি মেয়েমানুষ বলে মনে করে, এই দেখে দেখে তমিজ ভাবে, এখানে কুলসুমকে একবার

এনে ফেললে হয়। কাম তো আর ফুলজান একলা জানে না। কয়টা বছর আগেও কুলসুম মণ্ডলবাড়িতে ধান ভানার কাজ কম করে নি। আর বিয়ের আগে কালাম মাঝির বাড়িতে কতো হাঁড়ি ধান যে সেদ্ধ করতো তার কোনো হিসাব আছে? আর এমনিতে কুলসুমের পাশে এই মাগী কি আর দাঁড়াতে পারে নাকি? ফুলজানের যে জায়গাটায় মস্ত ঘ্যাগ ঝোলে একটা, কুলসুমের ওইখানটা দেখতে কী মসৃণ। কুলসুমের রঙ কালো হলে কী হয়, তার মুখের দিকে তাকালে তাকে বড়োলোকের বাড়ির মেয়েদের মতো দেখায়। তমিজের সৎমা হলেও কুলসুম তাকে কখনো হিংসা করে নি। মাঝির বংশ নিয়ে তাকে খোঁটা দেয় বটে, কিন্তু সেটা কেবল তার বাপদাদা নিয়ে তমিজ কথা শোনালেই। কুলসুম এখানে থাকলে ফুলজানের নাহক খোঁটা মারা, তাকে হেয় করাটা বন্ধ হবে। তার নিজের বর্গা করা জমির প্রথম ধান উঠছে। মণ্ডল বাগড়া না দিলে তো জমি থেকে ধান সে তুলতো সোজা বাড়িতেই। কুলসুম বাড়ির বাইরের উঠানটা নিকাবার আয়োজনও করেই রেখেছিলো। নিজের বাড়িতে না হোক, নিজের জমির ধান ঝাড়ার সময় তমিজ কুলসুমকে পাশে পাবে না, তা কী করে হয়?

ভোরবেলা কাৎলাহার পেরিয়ে নিজগিরিরডাঙার হুরমতুল্লার বাড়িতে গিয়ে দিনভর কাজ করবে কুলসুম,—এতে তমিজের বাপের তেমন সায় ছিলো না। কুলসুম বলেই ফেললো, 'ইগলা আলগা ফুটানিই তোমার সব্বোনাশ করলো!' তবে ধান ঝাড়ার চেয়ে কুলসুম মরিয়া হয়ে উঠেছে ফুলজানের নামে এটা ওটা শুনতে শুনতে। কুলসুম রাগে জ্বলে! মা গো মা, মাগীমানুষ বলে এতো দজ্জাল হয়? এমন না হলে স্বামীটা কি তার এমনি এমনি ভাগে? এখন আবার লেগেছে পরের ছেলে তমিজের পেছনে। স্বামীকে বেশি কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কুলসুম ভোররাতে বেরিয়ে যায় তমিজের সঙ্গে।

তমিজের বাপ তখন মাচায় শুয়ে চোখ মেলে তাকিয়েছিলো বাইরের দিকে। তার বেটা আগে এবং পিছে বৌ চলতে চলতে ডোবার ওপারে গিয়ে হাঁটতে লাগলো পাশাপাশি। তমিজের বাপ পাশ ফিরে শুয়ে ফের ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু কুলসুমের রাগারাগি বলো, ঝগড়াঝাটি আর মুখ ঝামটা দেওয়া বলো, সবই তার বাড়ির ভেতর। হুরমতুল্লার ভিটায় পা দিয়েই সে একরকম চুপ হয়ে যায়। ফুলজানের দিকে আড়চোখে তাকায়, যেন জীবনে এই পয়লা দেখছে তাকে।

সেদিন তমিজ আর কুলসুমের পৌছুবার পরপরই শুরু হলো গোরু দিয়ে ধানের আঁটি মাড়াই। কাঠের তক্তায় পিটিয়ে ধান ঝরানো আঁটিগুলো উঠানের পাশে গাদা করে রাখা ছিলো। ফুলজান আর হুরমতুল্লা আগেই কয়েকটা আঁটি খুলে বিছিয়ে রেখেছিলো উঠানে। গলায় গলায় বাঁধা ও মুখে ঠুলি পরানো জোড়া গোরুর পেছনে পান্টি হাতে ঘুরতে লাগলো তমিজ। উঠানের অন্যদিকে ধানের স্তূপ থেকে কুলায় ধান নিতে নিতে ফুলজান চ্যাচায়, 'ও নবিতন, কাঁড়ালটা লিয়া মাঝির বেটার পিছে যা না!' নবিতন বারান্দায় বসেছিলো কাঁথা সেলাই করতে। বেশ মন দিয়ে নকশা তুলছিলো, বোনের ডাকে সাড়া না দিয়ে নকশাই তুলে চললো। এই মেয়েটিকে তমিজ প্রায় সবসময়ই কাঁথা সেলাই করতে দেখে, ধানের কাজে তার উৎসাহ নাই। ফুলজান আরেকবার চিৎকার করলে জোড়া গোরু ও তমিজের পিছে পিছে কাঁড়াল হাতে নামলো সে। কাঁড়ালের আঁকশি দিয়ে ছড়িয়ে দিতে লাগলো ভাঙা আঁটিগুলো। পেটাবার পর এই কয়েকদিনে আঁটির ধানগুলো লাল হয়ে এসেছে, এই ধানের চালও লাল হবে, ভাতে স্বাদ নাই।

তমিজ বেশ বুক চিতিয়ে এগোয়. তার কোবানো আঁটিতে ঘুলানা ধান থাকে না, তার কয়েকটা বাড়িতেই আঁটির ধান সব ঝরে পড়ে।

'ঘুলানা ধান তো তোমার হলোই না গো। ব্যামাক ধানই বার কর‍্যা লিছো?' নবিতন তাকে সাবাশি দিতে এই কথা বলতে না বলতে ফুলজান বলে ওঠে, 'হাভাতা মাঝির বেটা, ধান কি আঁটিত কিছুই থোয়া লাগে না?'

আঁটি পেটানোর পটুত্বও তার ফুলজান স্বীকার করে না, এটাকে সে বিবেচনা করে হাভাতেপনা বলে। তমিজকে এভাবে হেয় করাটা কুলসুমের গায়ে একটু লাগে, একটু নিচু গলাতেই সে বলে, 'ঘুলানা ধানের চাউল হামরা খাই না বাপু!'

'কিসক? ভিক্ষা কর‍্যা বেড়াছো, তখন মানষে ঘুলানা চাউল দিলে ফিক্যা মারিছো?' ফুলজান কথাটা বলে কুলসুমকে, কিন্তু তাকে এই কথা বলার সুযোগ দেওয়ায় তমিজের রাগ হয় কুলসুমের ওপর। গোরুর পিঠে আলগোছে পান্টির বাড়ি মেরে সে বলে, 'ভিক্ষা হামরা করি নাই। ফকিরের বেটিক লিকা কর‍্যা হামার বাপ ঘরজামাই হয়া যায় নাই। ঘুলানা চাউল হামাগোরে খাওয়া লাগে না।'

তমিজের কথায় ফুলজান বোধহয় আরাম পেয়েছে, নইলে এর পিঠে তার কিছু না কিছু বলার কথা। কুলসুম তো এখন অনেক কথাই বলতে পারতো।—তমিজের বাপের সংসারে ঘুলানা চালের ভাত তাকে কম খেতে হয় নি। তমিজের কথায় দুঃখ পাওয়ার চেয়ে সে অসহায় বোধ করে বেশি। বিচলিত হয়ে ফুলজানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ধান ঝাড়ার কুলাটা সে ধরে দক্ষিণ দিকে। তাই দেখে ফুলজান হাসে খিলখিল করে, তার ঘ্যাগের ভেতর দিয়ে আসতে আসতে খিলখিল স্বরটি লুপ্ত হয় এবং শোনা যায় ঘর্ঘর শব্দ। শীতের বাতাস তো বইছে সবই উত্তর থেকে, সেই বাতাসে কুলার চিটাধান কি খড়কুটো উড়ে পড়ে নিচে, কুলায় রয়ে যায় ভালো ধানগুলো। ফুলজানের মুখোমুখি দাঁড়াবার ফলেই কুলসুম কুলা ধরে উল্টোদিকে। তা এতে ফুলজানের এতো হাসির কী হলো? ফুলজানের এই তুচ্ছ-করা হাসির প্রতিবাদে, না কুলসুমের অযোগ্যতায় বিরক্ত হয়ে,—ঠিক বোঝা মুশকিল—তমিজ দুটো গোরুর পিঠেই পান্টির বাড়ি লাগায় কষে। এই বাড়ির জন্যে একেবারেই অপ্রস্তুত গোরু দুটো হঠাৎ একটু দৌড় দিলে তমিজ হুমড়ি খেতে খেতে সামলে নেয়। তার এই দশায় হেসে ফেলে নবিতন, তার হাসিতে নির্ভেজাল খিলখিল বোল। ফুলজান কিন্তু এবার হাসে না, জিভ দিয়ে ৎচ ৎচ আওয়াজ করে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'হায়রে, চাষা হাওয়ার হাউস! মাঝি বলে হাউস করিছে চাষা হবি!'

একটু আগে ফুলজানের ঘর্ঘরে হাসিতে কিন্তু কুলসুমের আনাড়িপনার জন্যে একটু প্রশ্রয়ও ছিলো। বিদ্রূপ কিংবা প্রশ্রয়—কোনোটাতেই কুলসুম স্বস্তি পায় না। নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গেই সে কুলা ধরেছিলো উত্তরদিকে, উত্তরের হাওয়াকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনেও তার অস্বস্তি কাটে না।

জোড়া গোরুর পিছে পিছে মলন দিতে দিতে তমিজ কিন্তু সবই দেখে। কুলসুমের কালো ও লম্বা আঙুলওয়ালা হাতের হালকা নাচন ধানের ওপরকার চিটাধান ও খড়কুটো উড়িয়ে ফেলে দিচ্ছে মাটিতে, সেখানে হলুদ ও হালকা কালচে হলুদ ছোটো স্তূপ তৈরী হচ্ছে তার স্তনের মতো। ফুলজানের কুলায় মোটা মোটা গাবদা গোবদা হাতের হালকা পিটুনিতে কিন্তু কাজ এগোয় অনেক তাড়াতাড়ি। কিন্তু ঘেগি মাগী আজ এমন ছটফট করে কেন? কিছুক্ষণ পরেই সে ছোটোবোনকে বলে, 'ধর তো নবিতন।' কুলাটা তার হাতে তুলে দিয়ে সে হাতিয়ে নেয় তার কাঁড়াল এবং একটু জোর কদমে অনুসরণ করতে

থাকে তমিজকে। ফলে তমিজকেও কদম বাড়াতে হয় এবং তার প্রভাব পড়ে গোরুজোড়ার ওপর। গোরুর টানে ও ফুলজানের ঠেলায় তমিজের বুক ও পিঠ শিরশির করে। গোরু সে ঠিকই সামলে নেয়, কিন্তু বুকটা টিপটিপ ও পিঠটা শিরশির করতেই থাকে।—বাঁশের কাঁড়াল দিয়ে ফুলজান তার পিঠে একটা খোঁচা না মারে! কাঁড়ালের আঁকশিতে সে আবার তমিজের গলায় আটকে একটা হ্যাঁচকা টান না দেয়! আহা ফুলজান একটা হালকা খোঁচা যদি দেয়! তমিজের পিঠের কি আর সেই কপাল হবে?

কিন্তু ফুলজান নিয়োজিত কেবল খড়ের আঁটিগুলো আলগা করে দেওয়ার কাজে। এখানেও সে কতো তাড়াতাড়ি কাম করে। কাঁড়ালের আঁকশি বিঁধে দেয় আঁটির একেবারে নিচে, তারপর কাঁড়ালের পেছনটায় এমন জোরে মোচড় দেয় যে আঁটি একেবারে আলগা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এর ওপর দিয়ে গোরু হেঁটে আরাম পায়, খড়ও মোলায়েম হয়। ওদিকে কুলা ঝেড়েই চলেছে কুলসুম; তার আঙুল নড়ে খুঁড়িয়ে, এতেক্ষণ ধরে ঝেড়েও তার চিটাধান ও খড়কুটোর পরিমাণ ফুলজানের স্তূপের চেয়ে কতো ছোটো।

ফুলজানের হাতের কাম কত পাকা! তার বাপের বৌটা যদি ওরকম হতো! এরকম একজন কেউ পাশে থাকলে তমিজ বিঘার পর বিঘা জমি চাষ করতে পারে একা। ধান ঝাড়ার এরকম কেউ থাকে তো তমিজের লাঙলের ফলা ঢুকে যাবে মাটির অনেকটা নিচে, সেখান থেকে এমনকি পানিও তুলে আনতে পারে সে। তখন জমিতে পানি সেচার জন্যে আর মণ্ডলের হাতে পায়ে ধরতে হয় না।

সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার আগে তমিজ আবছা আন্ধারে দেখে তার ধানের স্তূপ। আল্লায় দিলে কতো ধান তার হয়েছে। এই ধান কাল যাবে মণ্ডলবাড়ি। ভাগাভাগির পর তার নিজের ভাগ নিয়ে তমিজ কালই ওঠাবে তার উঠানে। এতো ধান কি কুলসুম সেদ্ধ করতে পারবে? কালাম মাঝির বাড়িতে সে ধান সেদ্ধ করেছে তখন তো তার বিয়েই হয় নি, ছোটো ছিলো। কালাম মাঝি বৌঝিদের সাথে সাথে থাকতো, কুলসুম হাত লাগিয়েছে মাত্র। এখন এতো ধান সেদ্ধ করে শুকিয়ে ঘরে তোলা কি অর সাধ্যে কুলাবে? এখন কী আর করা যায়? ফুলজান কি তার বাড়ি উজিয়ে গিয়ে তার ধান সেদ্ধ করে শুকিয়ে দিয়ে আসবে নাকি?

কুলসুমের সামনে ফুলজানের কথা এভাবে ভাবতেও তমিজের এমন বাধো বাধো ঠেকে কেন? কুলসুমকে তার এতো পরোয়া করার দরকারটা কী? এর ভয়ে কি ফুলজানের বেটার ব্যারামের খবরটাও নিতে পারবে না? মরিয়া হয়ে একটু উঁচু গলাতেই ফুলজানকে জিগ্যেস করে, 'বেটা তোমার ক্যাংকা আছে গো? এই কয়টা দিন যাক, চলো একদিন টাউনেত যাই। দেরি করা ভালো লয়।'

'টাউনেত গেলে তোমার পাছ ধরা লাগবি কিসক? বেটাক লিয়া হামি হামার বাপের সাথে যাবার পারি না?' ফুলজানের জবাবে তমিজ কষ্ট করে হাসতে চেষ্টা করে, লাভ হয় না। মাঝখান থেকে তার চোয়াল ও ঠোঁট ব্যথা করে।

তখন সন্ধ্যা, সন্ধ্যার কুয়াশা কালচে লাল হয় বারান্দায় রাখা কুপির আলোয়। তমিজের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই ফুলজানের ঘরের ভেতরে গিয়ে তার ছেলেকে নিয়ে আসে, কোলের ওপর রুগ্ন ছেলেটিকে সে নিয়ে এসেছে একটি নতুন র‍্যাপারে জড়িয়ে। কুপির আলো পড়েছে ফুলজানের বেটার গায়ের কাপড়টিতে। এই কালচে লাল আলোতেও কাপড়টা চিনতে তমিজের একটুও দেরি হয় না। সঙ্গে সঙ্গে সে তাকায় কুলসমের দিকে, কুলসুমও ওই কাপড়টাই দেখছে খুব খুটিয়ে খুটিয়ে। তমিজের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুখ ফিরিয়ে নিলো।

সারাটা রাস্তা কুলসুম রেডক্রসের সেই র‍্যাপারের কথা তুললো না। সেই চাঁদনি রাতে তমিজ ওই যে ফুলজানের গায়ে র‍্যাপার চড়িয়ে দিয়ে এসেছিলো, এরপর কুলসুম না হোক একশোবার ওটার কথা বলেছে। তমিজ একেকবার একেক জবাব দিয়েছে। আচ্ছা, সত্যি কথাটা বলতে তার অসুবিধাটা কী ছিলো? তমিজের গা চড়চড় করে : সে কি তার বাপের বৌয়ের খায় না পরে? তাকে তার এতো ভয় করার কী হলো? ফুলজানকে র‍্যাপার দিয়েছে, ঠিক করেছে। তাকে কি কুলসুমের মুখ চেয়ে চলতে হবে? তাকে সংসার করতে হবে না? দুই চার বিঘা জমি করতে হবে না? তার দিকে দেখে কে? বাপ তো তার হিসাবের বাইরে। রাত নাই, দিন নাই আবোরের লাকান খালি টোপ পাড়ে আর নিন্দ পাড়ে। নিন্দের মধ্যে কীসব খোয়াব দেখে আর এদিক ওদিক হাঁটে।–কুলসুম কি স্বামীকে কখনো এভাবে ঝিমাতে আর ঘুমাতে আর হাঁটতে না করেছে কখনো?

ঘুমের পাঁকের মধ্যে পড়েই তো বাপ তার খোয়াব দেখে আর কামকাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। স্বামীর এই খাসলত তো কুলসুমই বরং উস্কে উস্কে দেয়। আর কোনো মেয়েমানুষ কি স্বামী ঘুমের ভেতর কী বিড়বিড় করে তাই শুনতে তার মুখের কাছে কান পেতে থাকে? বাপের এই খাসলতেই সংসারটা তাদের ছারেখারে গেলো। এখন হিসাব করো তো, এই খাসলত সে পেলো কোথায়? চেরাগ আলি ফকিরের পোঁদে পোঁদে ঘুরেই তো তার এই দশা। খোয়াব দেখার কী ভয়ানক নেশা ফকির তার মধ্যে সেঁধিয়ে দিলো যে ঘর সংসার ভুলে মানুষটা তাতেই বুঁদ হয়ে থাকে এই বুড়া বয়সেও! যে মানুষ বড়ো হওয়া পর্যন্ত ঘুরঘুর করলো মণ্ডলদের বাড়িতে, যাদের এঁটোকাঁটা খেয়ে যার শরীর পুরুষ্টু হলো, সে-ই কিনা ওই বাড়ির নাম পর্যন্ত শুনতে পারে না। ফকির তাকে কী এলেম যে দিয়ে গেলো। শরাফত মণ্ডলের এতো কষ্ট করে, এতো তদবির করে, নায়েববাবুর পেছনে এতো খরচা করে ইজারা নেওয়া বিল, সেই বিলের ধারে ধারে আন্ধারে মান্দারে তমিজের বাপ যদি ঘুরে বেড়ায় তো মণ্ডল তাকে সন্দেহ করবে না কেন? চেরাগ আলি তার নাতনিটাকে গছিয়ে দিয়ে গেলো বাপের ঘাড়ে, কী মন্তর পড়ে দিয়ে গেছে কে জানে? না-কি ফকিরের মন্ত্রে কুলসুমই তাকে এমন করে রেখেছে? তা ছাড়া আবার কী? ঘরের দুষমন এই মেয়েমানুষটাকে তোয়াক্কা করলে কি তমিজের চলে?

১৮

ইসমাইল হোসেনের বাড়িতে সেদিন মেলা মানুষ। দুই দিকে পাথরের ওপর গথিক অক্ষরে যথাক্রমে 'হোসেন মঞ্জিল' ও 'এম. টি হোসেন' খোদাই-করা দুই পিলারের মাঝখানে কাঠের ফ্রেমে বাঁধা টিনের গেট হাট করে খোলা। দুই পাশের কামিনী গাছ দুটো পড়ে গেছে গেটের দুই পাল্লার আড়ালে।

ভেতরে পাঁচিল ঘেঁষে দুটো গোলঞ্চ, একটা বকুল ও একটা কণকচাঁপা গাছ। প্রতিটি গাছের নিচে দুই থেকে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে জটলা করছে। তাদের কেউ কেউ কাদেরের মুখ-চেনা, কিন্তু তারা তাকে আমল না দিয়ে নিজেদের মধ্যে গুজুরগাজুর

চালিয়ে যায়। লন পেরিয়ে জোড়া ঝাউগাছের মাঝখানে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠেও কাদেরের সুবিধা হয় না, সেখানে পেতে রাখা চেয়ার ও বেঞ্চের একটিও খালি নাই। হলঘরের কপাট একটা ভেজানো, আরেকটা প্রায়-খোলা। খোলা কপাটের সামনে দাঁড়িয়েই কাদের ইসমাইলের হাতের ইশারা টের পায়। ঘরের ভেতরেও বসবার আসন সব ভর্তি। কর্মী গোছের কয়েকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাদেরকেও দাঁড়িয়েই থাকতে হয়।

সোফায় বসে অবিরাম কথা বলে চলেছে ডাক্তার শামসুদ্দিন খোন্দকার। জেলা মুসলিম লীগের প্রবীণ নেতা, থার্টি সেভেনে প্রজা পার্টির টিকেটে এম এল এ হয়ে বছর তিনেক পর মুসলিম লীগে জয়েন করে। মানুষটা রাশভারী না হলেও স্বল্পবাক, এ্যাসেম্বলি কিংবা বাইরে কখনো মুখ খোলে না। রোগীদের সঙ্গে প্যাঁচাল পাড়তে হয় বলে ডাক্তারি ছেড়েছে এম বি পাস করার দুই বছরের মাথায়। এখন রাইস মিল, বাংলা সাবানের কারখানা ও কেরোসিনের ডিলারশিপ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। লীগ অফিসেও তার যোগাযোগ নাই বললেই চলে। রাজনীতি সম্বন্ধে তার চিন্তাভাবনা বা প্রতিক্রিয়া যা প্রকাশ করার সব পেশ করে আসে জেলা মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট খান বাহাদুর সৈয়দ আলি আহমদের দরবারে।

তা সেই মানুষ আজ এসেছে ইসমাইলের বাড়িতে এবং এতোটাই সবাক হয়ে উঠেছে যে, সবাই চুপচাপ তার কথা শোনে। শ্রোতাদের নিরঙ্কুশ মনোযোগে তার বাক্য পায় বাণীর মর্যাদা, 'সূর্যের চড়া তাপ সহ্য করা যায়। না কী বলেন? কিন্তু তপ্ত বালুতে হাঁটতে গেলে পায়ে ফোস্কা পড়ে। না কী?'

শ্রোতাদের মৌনকে সম্মতির লক্ষণ বিবেচনা করে খন্দকার তার বাণীর ব্যাখ্যা শোনায়, 'বুঝলেন না?' সবার দিকে ঘাড় ঘুড়িয়ে শ্রোতাদের বোঝার ক্ষমতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে সে বোঝায়, 'জমিদারের অত্যাচার সহ্য করা যায়। কেন? না, তার আগামাথা আছে, নিয়মকানুন আছে। কিন্তু ছোটলোকরা তো নিয়ম জানে না, আইন মানে না। না কী? এইগুলো হলো বেয়াদব, বেয়াদবের জুলুম গায়ে জ্বলে। জ্বলে না? এখন মুসলিম লীগের ওয়ার্কাররা যদি এদের সঙ্গে থাকে তো পার্টি করতে পারবেন? বলেন, পারবেন?'

ইসমাইল তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে, 'আরে ডাক্তার সাহেব, ওসব হলো তেভাগার এরিয়া। আমাদের ওয়ার্কারদের মধ্যে বর্গা খেটে খায় প্রায় সবাই। এখন অন্য বর্গা চাষীদের তারা অপোজ করে কীভাবে?'

এবার ইসমাইলকে উপদেশ দেওয়ার সুযোগ নেয় সাদেক উকিল, 'ছোঁড়াদের ডেকে বলে দাও, তোমরা ইসলামের কথা বলো। মাথা গরম না করে পাকিস্তান হাঁসেলের কথা বলো। ইসলাম গরিবদের হক আদায় করে। ইন পাকিস্তান উই উইল ইনট্রোডিউস জাকাত। আল্লা যাকে দৌলত দিয়েছেন সে তার প্রপার্টির টু এ্যান্ড হাফ পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউট করবে জাকাত ফান্ডে। ইসলাম ইজ এ ফুল কোড অফ লাইফ। আর কোনো রিলিজিওনে গরিবকে এতো রাইট দেওয়া হয়েছে? আবার কারো প্রপার্টি লুটপাট করাও ইসলাম এ্যাপ্রুভ করে না। কায়েদে আজমের মটোই হলো, লিভ এ্যান্ড লেট লিভ। অর্থাৎ নিজে—।'

সাদেক উকিলের কথা বলা মানেই বক্তৃতা দেওয়া, তার ইংরেজি বাক্যের বাঙলা অনুবাদ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই শামসুদ্দিন ডাক্তার তার ও কায়েদে আজমের সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করে, 'আমি তো তাই বলি। ওইসব ছোঁড়ারা যা করছে তাতে এলাকার

ভদ্রলোকদের পক্ষে আমাদের পার্টিতে থাকা অসম্ভব।'

আদমদিঘির মজিদ সরকার বসেছিলো শামসুদ্দিন ডাক্তারের পাশে এবং অনেকটা তার আশ্রয়েও বটে। ইসমাইল তার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসে, 'দলের ওয়ার্কারদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি এতোই খারাপ? ওদের ওপর আপনার হোল্ড নেই? অন্তত আপনাকে তো মানবে!'

ইসমাইলকে এবার বেশ জুত করে ধরা যাচ্ছে দেখে ডাক্তার পুলকিত হয়, 'আরে এরা তো সব আপনার রিক্রুট।' বলে পুরো অবস্থাটার বিবরণ দেয় দ্বিতীয়বার। আবদুল কাদের প্রথমবার মিস করেছিলো, কিন্তু অন্যান্য শ্রোতার মনোযোগও তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।—জেলার পশ্চিমে অনেকটা এলাকা জুড়ে আধিয়াররা ধান কেটে তুলছে নিজেদের ঘরে। তুলুক। কিন্তু নিজেরাই ধান মেপে এক ভাগ দিতে চায় জোতদারকে আর দুই ভাগ নেবে নিজে। তা এ উৎপাত তো অনেক দিন থেকেই হচ্ছে। টাউনের মানুষ ইসমাইলের তাতে কী? কিন্তু আশঙ্কার কথা হলো এই যে, ওইসব বর্গাচাষীদের অনেকেই মুসলিম লীগের ওয়ার্কার, লীগের লোক বলে তাদের সবাই চেনে। এমন কি আদমদিঘির দুই মাইল পুবে শান্তিগড় বাজারে মুসলিম লীগের সাইনবোর্ড টাঙানো ঘরটিও ওদেরই দখলে।—এরা নিজেরা জোতদারদের পাওনা তো দিচ্ছেই না, এমন কি কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ভিড়ে ধান সব নিজ নিজ ঘরে তোলার জন্যে নিরীহ গ্রামবাসীদের উস্কানি দিচ্ছে; ফলে পাকিস্তান ইস্যু মার খাচ্ছে। এলাকার ভদ্রলোকদের সাপোর্ট ছাড়া দল টেকে কী করে?

সাদেক উকিল তার বক্তৃতা সম্পূর্ণ করার আশা ছেড়ে দিয়ে একটু রাগ করেই পড়তে শুরু করে দিয়েছিলো আগের দিনের 'দৈনিক আজাদ'। দার্জিলিং মেলে কাগজটা টাউনে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গেই সে নিশ্চয়ই এটা তন্ন তন্ন করে পড়ে ফেলেছে। এই দৈনিকের চিঠিপত্র কলামে স্থানীয় সমস্যা, স্কুল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা, ইসলামের আলোকে নানা সমস্যার সমাধান প্রভৃতি বিষয়ে তার লেখা ছাপা হয় তিন মাসে অন্তত একবার। সাদেক এখন কাগজের কোন পৃষ্ঠা পড়ছে আড়চোখে তাই দেখে নিয়ে নিশ্চিত হয়ে কথা বলছিলো শামসুদ্দিন ডাক্তার। কিন্তু এবার বাধা আসে অন্যদিক থেকে। মজিদ সরকার কথা বলতে চেষ্টা করছিলো অনেকক্ষণ ধরে, এবার সে ডাক্তারের দীর্ঘ কাশিজনিত বিরতির সুযোগ নেয়, 'হামাগোরে সর্বস্বান্ত কর্যা দিলো। আরে হামার বর্গাচাষা হামার জমির ধান লিয়া গেলো লিজের ঘরত, আবার শুনি ওই চাষা বলে হামারই পার্টির মানুষ। মানষে হাস্লে, ইগলান কী পার্টি করো গো?—আক্কেলপুর ইস্টিশনত ট্রেন লেট করায়া তমিজুদ্দিন খান সাহেবকে দিয়া লেকচার দেওয়ালাম। গাঁয়ের মধ্যে থ্যাকা মানুষ লিয়া আসিছি। কতো ওয়ার্কারেক চিঁড়াগুড় খিলালাম। এখন ওই নেমকহারামরাই হামার বর্গাদারেক উস্কানি দেয়। হামাক সর্বস্বান্ত কর্যা ফালালো।'

তিন হাজার বিঘা জমির মালিকের সর্বস্বান্ত হওয়ার সম্ভাবনায় সবাই খুব চিন্তিত। তাদের সমবেত দীর্ঘশ্বাস পড়ে, এই দীর্ঘশ্বাস ইসমাইলের প্রতি প্রতিবাদ প্রকাশও বটে। কারণ ওই এলাকায় ওইসব ছোটলোকদের লীগে ঢোকার সুযোগ করে দিয়েছে ইসমাইল। ইসমাইল হোসেন আসলে পুব এলাকার মানুষ। তাও আবার দুই তিন পুরুষ টাউনের বাসিন্দা। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সে ছিলো কলকাতায়। জেলার কোথায় কী হাল সে তার জানেটা কী? তখনি তাকে ইশারা দেওয়া হয়েছিলো, দল করতে গিয়ে যে সে মানুষের কাছে যাওয়াটা পরে দলের জন্যে বিপজ্জনক হতে পারে। হচ্ছেও তো তাই।

ইসমাইল কোণঠাসা হয়েছে বুঝতে পেরে ডাক্তারের উত্তেজনায় মেশে উল্লাস, কিন্তু নিজেকে সংযত রেখে সে ছোটো ছেলেকে বোঝাবার ভঙ্গিতে ইসমাইলকে বলে, 'মজিদ সরকার, আলি মামুদ খাঁ, আলতাফ মণ্ডল, আবুল হোসেন, মোহাম্মদ হোসেন পাইকার এরা আজকের বড়োলোক নয়, একেকটা থানা জুড়ে এদের প্রতিপত্তি। এদের মতামত নিয়ে ওইসব এলাকার পুলিস যায় চোর ডাকাত ধরতে। এদের সম্পত্তিতে গতর খাটিয়ে সমস্ত এলাকার মানুষের রেজেক আসে। এমন কি পুব এলাকার চাষারা ধান কাটার সময় রোজগার করতে যায় এদের জমিতেই। এখন এইসব মাথা মাথা মানুষের মাজা ভেঙে দিলে ওখানে মুসলিম লীগ করবে কে? ওইসব বেয়াদব ছোটোলোকদের কাছে লীগকে বন্ধক দিলে প্যাকিস্তান টাকিস্তান সব ফাঁকি।'

ইসমাইল এর মধ্যে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে, 'আরে রাখেন। জয়পুর, আদমদিঘি, পাঁচবিবি, আক্কেলপুরে ফর্টি ওয়ানে আমরা গিয়েছি না? আবুল হাশেম সাহেব এসেছিলেন, মনে আছে ডাক্তার সাহেব?'

কিন্তু ডাক্তার শামসুদ্দিন খোন্দকারের স্মরণশক্তির পরীক্ষা না নিয়েই সে বলে চলে, 'ওদিকে কোনো জোতদারের কোঅপারেশন পাওয়া গেলো না। শ্যামা-হক ক্যাবিনেট, বড়োলোকরা অন্যদিকে ঝুঁকতে ভয় পায়। আরে ভাই, কোথাও মিটিং করা যায় না। পাঁচবিবিতে নাসের মণ্ডল খুব পাওয়ারফুল লোক, তিনি আছেন কম্যুনিস্টদের সঙ্গে।' তিন বছর আগের কথা বলতে বলতে ইসমাইল চাঙা হয়ে ওঠে, 'শেষকালে নাটোরের উকিল কিরণ বাবুর সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন, কিরণ মৈত্র, পুরনো কংগ্রেসি, বললেন, নাসির মণ্ডলকে ভালো করে ধরো, তাঁকে হাত করতে পারলে তোমাদের মিটিং হবে। তো গেলাম। বুড়ো কি রাজি হয়?'

এই গল্প ডাক্তার ও সাদেক উকিলের জন্যে অস্বস্তিকর, নাসির মণ্ডল এদের কাউকেই এ পর্যন্ত তার এলাকায় ঢুকতে দেয় নি। সাদেক উকিল অস্বস্তি কাটাতে বলে, 'আরে আপনার নাসির মণ্ডলকে তো আমি এক হাত নিলাম একবার শান্তাহারে। বললাম, আপনারা লড়াই করেন আল্লার বিরুদ্ধে, আমরা জেহাদ করি আল্লার হুকুমত কায়েম করতে। ইসলাম ইজ এ ফুল কোড —।' এবারেও তার ভাষণ অসমাপ্ত থাকে ইসমাইলের কথার তোড়ে, 'আঃ! শোনেন না। আমি গিয়ে বুড়োকে বললাম, মণ্ডল সাহেব, আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েও যদি কম্যুনিস্টদের শেলটার দিতে পারেন তো আমরা কী দোষ করলাম? আমাদের মিটিং প্রিজাইড করবেন আপনি। আমাদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা তাই বলবেন। কিন্তু আমাদের নেতাকেও বলতে দিতে হবে। বুড়ো তখন রাজি। নিজের লোকজন নিয়ে মিটিং অর্গানাইজ করালেন। হাশেম সাহেব পাক্কা দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা করলেন। দারুণ রেসপন্স পাওয়া গেলো। আমরা তো চাষীদের কথাই বললাম। কয়েকটা ইয়াং ছেলে, চাষী ঘরের ছেলে, আমাদের সঙ্গে জয়েন করলো। ওদের দিয়ে লোকাল কমিটি ফর্ম করে রাত্রে নাসির মণ্ডলের বাড়িতে ভুরিভোজন সেরে দার্জিলিং মেলে নামলাম শান্তাহার।'

'বুঝলাম। কিন্তু ছেলেগুলো কি আসলে আমাদের ইডিওলজিতে' সাদেকের কথায় ফের বাধা দেয় ইসমাইল, তার গল্প এখনো শেষ হয় নি, 'শোনেন না! শান্তাহারে নেমে দেখি কিরণবাবু। আমাদের মিটিঙের খবর শুনে মহা খুশি। শান্তাহার রেলওয়ে এন্টারটেনমেন্ট রুমে আমাদের লাঞ্চ করালেন। এতো খুশি কেন? তাহলে—এবার তাঁরা কংগ্রেসের মিটিং করতে পারবেন। করুন। আমাদের কী? হিন্দুরা যতো খুশি কংগ্রেস

করুক। মুসলমান ছেলেরা তো আমাদের সঙ্গেই চলে এলো। ওই মিটিংটা না হলে ছোঁড়াগুলোকে কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে সরানো যেতো?'

'সরিয়ে লাভ কী হলো?' ইসমাইল হোসেনের কৃতিত্বকে নস্যাৎ করার উদ্যোগ নেয় সাদেক উকিল, 'ওদের মাইন্ড তো চেঞ্জ করতে পারলেন না । পাকিস্তানের ইডিওলজি কি ওরা মেনে নিয়েছে?'

'মাঝখান থেকে মুসলমান ভদ্রলোকেদের বিপদে ফেললেন। মুসলিম লীগের মেম্বার হয়ে মুসলমানদের মধ্যে ডিভিশন তৈরি করতে উঠে পড়ে লেগেছে।' ডাক্তারের অভিযোগের পুনরাবৃত্তি বন্ধ করে চণ্ডিহারের আলতাফ মণ্ডল, 'কিসের মোসলমান? ওঠাবসা সব সাঁওতালগোরে সাথে। সাঁওতালরা আগে কী সুন্দর বর্গা করিচ্ছিলো, ওরা জমিত হাত দিলেই ফসল, ভাগাভাগির সময় কোনো ক্যাচাল নাই। আপনের এই ছোঁড়াগুলার পাল্লাত পড়্যা ওরাও এখন ধান তোলে নিজের ঘরত। সাঁওতাল মোসলমান আধিয়াররা একজোট, আপনের কিসের পাকিস্তান? উপায়ন্তর না দেখ্যা হামরা ডাক্তার সায়েব আর উকিল সায়েবেক ধর্যা আজ গেলাম খান বাহাদুর সাহেবের দরবারে। তা সাহেব কলেন,— ।'

প্রসঙ্গটি তোলা ডাক্তারের পছন্দ হয় নি। আলতাফ মণ্ডলকে সে থামিয়ে দেয়, 'আরে তিনি হলেন শরিফ মানুষ। বেন্ন্যার ঘরের বেতমিজ ছোকরাদের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন নাকি?'

কিন্তু ছোটোঘরের বেতমিজ ছোকরাদের ঠেকাতে না পারলে আলতাফ মণ্ডলের ধানপান, জোতজমি, মানইজ্জত সব রসাতলে যায়। বাঁচার জন্যে খড়কুটো ধরতেও সে ব্যগ্র, 'তা খান বাহাদুর সাহেব মনে হলো খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়েছেন। কলেন, ওরা সব ইসমাইলের লোক। ইসমাইলকে বলেন, ওদের ঠাণ্ডা করুক।'

খান বাহাদুরের দুর্বলতার কোনোরকম প্রকাশ ডাক্তার শামসুদ্দিন খোন্দকারের নিজের অপদস্থ হওয়ার সামিল। সে তাই বিরক্ত হয়ে বলে, 'আরে আলতাফ মিয়া, অতো ভয় পান কেন? দুশ্চিন্তা তো খান বাহাদুর করেন না, দুশ্চিন্তায় মরেন আপনারা। অতো ঘাবড়ান কেন? দেখেন না, সপ্তাহখানেকের মধ্যে নাজিমুদ্দিন সাহেব আসবেন বালুরঘাট। আমাদের খান বাহাদুর সাহেবও যাবেন। ঢাকা ফেরার পথে খান বাহাদুর যদি নাজিমুদ্দিন সাহেবকে এদিকে এনে জয়পুর কি শান্তাহারে একটা মিটিং করাতে পারেন তো তাতেই কাজ হবে। ভালো একটা মিটিং হলে এইসব ছোঁড়াদের পিটিয়ে গ্রামছাড়া করা যাবে।'

'আরে রাখেন!' ইসমাইল তাকে কিংবা নাজিমুদ্দিন কিংবা দুজনকেই উড়িয়ে দিতে পাশের টেবিলে জোরে চাপড় মারে। টেবিলের ওপর কাপ পিরিচ ঝনঝন করে বাজলে তার প্রভাব পড়ে ইসমাইলের গলায়, 'ওইসব ছেলেদের হোস্টাইল করে রেখে নাজিমুদ্দিন শান্তাহারে নামতে পারবে? জয়পুর দিয়ে পাস করতে পারে কি-না দেখেন। ইন ফ্যাক্ট, দে আর আওয়ার বেস্ট ওয়ার্কার্স ইন দি হোল ডিস্ট্রিক্ট।'

আলতাফ মণ্ডল উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গি করে, 'তাহলে আর কী? আপনারা ওই চ্যাংড়াপ্যাংড়াক লিয়াই থাকেন। হামরা আর থাকি ক্যাংকা কর্যা?'

ডাক্তার তার হাত ধরে বসিয়ে দেয়, 'আরে, পলিটিক্স করেন, এতো রাগ করলে চলে? বসেন।'

ভালো করে বসেও আলতাফ মণ্ডলের রাগ আর পড়ে না, 'হামরা কি আর পলিটিক্স করি? পাড়াগাঁয়ের মানুষ, পলিটিক্সের হামরা বুঝি কী? আপনারা পাকিস্তানের কথা কন, পাকিস্তান হলে এসলামের ইজ্জত হয়, মোসলমানের মাথাটা উঁচা হয়। এসলামের খেদমত

করলে আল্লা খুশি হয়, লিজের জানটাও শান্তি পায়। তাই কৃষক প্রজা বাদ দিয়া নাম লেখালাম মুসলিম লীগের খাতাত। হায় আল্লা, এখন দেখি, আল্লারসুল মানে না, নামাজরোজার তো ধারই ধারে না, এইসব মানুষের পিছে ছোটে যিগলান চ্যাংড়া আপনারা লীগের চাবি দিয়া থুছেন সেইগুলার হাতে। ঠিক আছে, লীগ পাট্টি তারাই করুক।'

আলতাফ মণ্ডলের কথার ঝাঁঝে সবাই একটু নড়েচড়ে বসলে আলি মামুদ খাঁ খুব খুশি হয়, আবার মণ্ডলের এক নাগাড়ে এতো কথা বলার শক্তিতে তার হিংসাও একটু হয়। সে বলে, 'লাল লিশানের পাট্টির চ্যাংড়াপ্যাংড়া লিয়া আপনার লীগের ফায়দা হবি না। গণেশতলাত হামার মামুগোরে জমি বর্গা করে এক চাষা, তার বেটা, বুধা কর‍্যা কয়, এক্কেরে হালুয়া চাষা, উই একজোট হছে ওই তেভাগার হুজুগেত। শালা হালুয়া চাষার বেটা, আল্লারসুল তো মানেই না। সেটা আল্লাই বিচার করবি, ছোঁড়া লিজের আখেরাত লিজেই খোয়ায়, হামার কী?—কথা সেটা লয়— ।' কথাটা কী তাই বলতে গলার স্বর একটু নামায় সে, 'আপনারা বিশ্বাস করবেন না। হামার মামু লিজে কছে। মামু হামার হাজি মানুষ, নামাজ কাজা করে না। মিছা কথার মানুষ লয়।' সত্যবাদী মামার সরবরাহকৃত তথ্যটি জানাতে তার গলা নামে আরো নিচে, ফিসফিস করে বলে, 'বুধা শালা কাছিমের মাংসও খায়! হারামখোর শালা!' তারপর তার গলায় ফের জোর আসে, 'ইগলান মানষেক ইমাম মানিছে আপনার মুসলিম লীগের চ্যাংড়াপ্যাংড়া।'

'এদের সোজা এক্সপেল করে দেওয়া হবে।' কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে ডাক্তার শামসুদ্দিন খোন্দকার, 'এসব তো আর ছেলেখেলা নয়। সামনে ইলেকশন, আধিয়ার চাষার হাতে ভোট কটা আছে? ছয় আনা ট্যাক্স দেয় কয়জন?'

ইসমাইল বলে, 'কিন্তু মুসলিম লীগের প্রোগ্রামে তো চাষীদের দাবিই বেশি। বিনা খেসারতে জমিদারি উচ্ছেদ,—'

'কিন্তু আমাদের মজিদ সরকার, আলফাত মণ্ডল, আলি মামুদ খাঁ এঁরা কি কেউ জমিদার? না মহাজন? জমিদারদের খাজনা দিতে এঁদের জান বেরিয়ে যাচ্ছে। এডুকেশন সেস ধরেছে জমিদারের ওপর, জমিদার এই টাকা জোগাড় করবে কোত্থেকে?'

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্যে ধার্য এডুকেশন সেসের চাপে জমিদাররা একেবারে হেলে পড়েছে, সেই হাহাকার এরা একটু আগে শুনে এসেছে খান বাহাদুর সৈয়দ আলি আহমদের অসহায় কণ্ঠে। খান বাহাদুরের এমন সংকটে এরাও খুব দুঃখিত। তবে দুঃখের আর একটি কারণ হলো এই যে, ওই খাজনা তো জমিদার আদায় করবে প্রজাদের ঘাড় ভেঙে। চাষারাই কী কেবল প্রজা? বড়ো প্রজা তো জোতদার। ইসমাইল কি ওই বেয়াদব ছোঁড়াদের বোঝাতে পারে না যে, জোতদাররাও কেমন জুলুমের শিকার?'

খান বাহাদুরের ওখানে নিজের বেদনার জন্যে চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাসটি মজিদ সরকার ছাড়ে এখানে, 'আমাদের উপরে জুলুম দুই দিক দিয়া। জমিদার লিত্যি খাজনা ধরে। ফ্লাউট কমিশন রেপোর্ট দিলো, কই কিছু তো হয় না। জমিদারি উচ্ছেদ তো হামরাও চাই। আবার দেখেন লিচের দিকের বিপদ, জমির ফসল লিয়া যাচ্ছে আধিয়াররা। হামরা এখন করি কী? উদিন কবির তরফদার সাহেব কলেন, 'কৃষক প্রজা পার্টি কৃষকের দিকে দেখে, প্রজার দিকেও দেখে। বড়ো প্রজা কারা?—আপনারাই কন।'

সাদেক উকিল ভয় পায়, এরা আবার নতুন করে কৃষক প্রজার সঙ্গে না ভেড়ে, 'আরে ওটা একটা পার্টি হলো? হক সাহেব আউট, পার্টিও শেষ। ইনডিয়ান মুসলমানের পার্টি একটাই। অল ইনডিয়া মুসলিম লীগ।'

'তা তো বটেই।' ইসমাইল সুযোগ নেয়, 'মুসলমানদের মধ্যে মেজরিটি তো চাষাই। লীগের দাবির বেশিরভাগই তো চাষাদের জন্যে।—কম্পালসারি ফ্রি প্রাইমারি এডুকেশন হলে স্কুলে যেতে পারবে তো তাদের ছেলেমেয়েরাই। হাটে এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টস বিক্রির সময় টোল বন্ধ করার দাবি। সবই তো তাদের জন্যেই। তাদের ছেলেরা পার্টির ওয়ার্কার তো হবেই।'

'কিন্তু ইসমাইল সাহেব, আপনার পার্টির প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্ট করতে হলে ইলেকশনে আসতে হবে না?' শামসুদ্দিন ডাক্তারের আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে, 'গ্রামের মুরুব্বিদের সর্বনাশ করে আপনি ভোট পাবেন না। হিন্দু ক্যানডিডেট সব আসবে কংগ্রেস থেকে, ওদের ইউনিটি আছে। মুসলিম কনস্টিটিউয়েনসিতে জোতদাররা আমাদের সাপোর্ট নাও দিতে পারে, আমাদের ওয়ার্কাররা ওদের জমি লুট করবে আর ওরা আমাদের পক্ষে থাকবে, এটা আশা করেন কীভাবে? কংগ্রেস, কৃষক প্রজা পার্টি মুসলিম ক্যানডিডেট দেবে। দেবে না? মুসলমান ভোট ভাগ হয়ে গেলে কে আসবে শিওর করে বলতে পারেন? গ্রামে ভোট অর্গানাইজ করবে কারা? কারা করবে?—গ্রামের মুরুব্বিরাই তো, না কী?'

ইসমাইল একটু গম্ভীর হয়ে পড়লে সাদেক উকিল বলে, 'জোতদারদের ধান লুট করা কি মুসলিম লীগের প্রোগ্রামের মধ্যে আছে নাকি? ইসলামে কি এসব লুটপাট জায়েজ করা হয়েছে?'

ইসমাইল চুপচাপ তাকিয়ে থাকে। তাদের দলের ভালো ভালো কর্মীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে কম্যুনিস্ট পার্টি,—এটা তো ঠিক হচ্ছে না। আর ইলেকশনে গ্রামের মাতব্বররা বড়ো ফ্যাক্টর। ছাত্রজীবনে মেয়র ইলেকশনে কাজ করতে গিয়ে দেখা গেছে, কলকাতার শিক্ষিত মানুষও ভোট দেয় দল বেঁধে। তাদের মুরুব্বি আছে, সমাজ আছে, সমাজের ভেতর উপ-সমাজ আছে। ইলেকশন করতে গেলে এসব খেয়াল করতে হয়। এখানে ভোটার হলো পাড়াগাঁয়ের মানুষ। তাদের মধ্যে আবার ছয় আনা ট্যাকস দেয় যারা ভোট দেবে কেবল তারাই। বিয়েশাদি, আকিকা, মুর্দার দাফন, চেহলাম, ভোট এসব তারা করে সমাজ মেনে।

কম্যুনিস্টদের সঙ্গে কাজ করছিলো এরকম কিছু ছেলে লীগে আসায় তার খুব ভালো লাগছিলো। জেলার পশ্চিমে কয়েকটা জায়গায় তেভাগার বেশ জোর, এই ছেলেগুলোকে ধরে রাখতে না পারলে এরা সবাই তো কম্যুনিস্ট হয়ে যাবে। এই বুড়োগুলো এটা বোঝে না কেন? আবার সে নিজে কম্যুনিস্ট না হয়েও যদি গরিব মুসলমানদের কিছু হেলপ করতে পারে কম্যুনিস্টদের সাহায্যে, তাতে তো বরং তার দলেরই লাভ। ওর ছেলেবেলার বন্ধু অজয় আর ওর বোন প্রতিমা তো তার রেডক্রসের দুধ বিলি করতে মেলা সাহায্য করলো। ফেমিনের সময় ইসমাইল কতো লোককে দাফন করেছে, তখন এইসব বুড়ো ছিলো কোথায়? বীরেন, সমীর, সুকুমার এরাই তো সঙ্গে সঙ্গে থাকতো। গোলাবাড়িতে মুসলিম লীগের সাইনবোর্ড লটকানো কাদেরের দোকান থেকে রেডক্রসের রিলিফের মাল দিলো, এই নিয়ে কংগ্রেসের লোকজন তো ওপরে নালিশও করেছিলো। রেডক্রসের বৃটিশ সাহেব এই ব্যাপারে ইনকুয়ারি করতে এলে অজয়ই তো ইসমাইলের পক্ষে মেলা যুক্তি খাড়া করিয়ে সাহেবকে বুঝিয়ে দিলো। সবই ভালো—কিন্তু তার দলের ছেলেদের দিয়ে ওরা যদি মুসলমানদের মধ্যে ডিভিশন তৈরী করে তো পাকিস্তান দূরের কথা, মুসলিম লীগ টিকিয়ে রাখাই মুশকিল হবে।

ইসমাইলের এই নীরব অস্বস্তিকর ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে চলে সাদেক উকিলের সরব সিদ্ধান্ত, 'আপনারা ভাববেন না। আপনাদের ওদিকে মিটিং অর্গানাইজ করেন। ইসলামিক ইডিওলজি ভালো করে বোঝাতে হবে। তাহলেই ওসব লুটপাতের ভুত ঝাড়ানো যাবে।' তার ছাড়া ছাড়া কথাগুলোই ইসমাইলকে বেশ ভাবনায় ফেলেছে দেখে নিজের সাফল্যে তৃপ্ত হয়ে সে বেশ লম্বা ডায়ালগ ছাড়ে, 'লেট আস আর্নেস্টলি হোপ এ্যান্ড ট্রাস্ট দ্যাট দি মোস্ট নোবল টিচিং এ্যানড একজাম্পলস অফ আওয়ার হোলি প্রফেট উইল বি ফলোড বাই অল দি মুসলমানস, দ্যাট ইজ ল্যান্ড টিলার্স এ্যান্ড শেয়ারক্রপার্স, জোতদারস এ্যান্ড ল্যান্ডলর্ডস, পুওর এ্যান্ড রিচ, এডুকেটেড এ্যান্ড ইললিটারেট নট ওনলি অফ দি এরিয়া উই আর টকিং এ্যাবাউট বাট থ্রুআউট দি লেংথ এ্যান্ড ব্রেডথ অফ ইনডিয়া। ব্রাদার্স, নেভার ফরগেট দ্যাট ইসলাম ইজ এ ফুল কোড অফ লাইফ। ইট গিভস আস এভরিথিং উই নিড। ইট অফারস আস দি উইপন টু ফাইট ফর পাকিস্তান হুইচ রিমেইনস আওয়ার গোল টিল উই এ্যাচিভ ইট।'

ইসমাইল হোসেন যথেষ্ট কোণঠাসা হয়েছে বিবেচনা করে শামসুদ্দিন ডাক্তার ব্যাপারটা এখানেই খান্ত করতে চায়। ইসমাইলটা চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে বেশি। খান বাহাদুরের সামনে প্রায়ই বেয়াদব হয়ে পড়ে, 'মুসলিম লীগকে নবাব নাইটদের পকেট থেকে বের করে আনতে হবে' বলে তড়পায়। খান বাহাদুরের সামনে তাকে এমনি ঘায়েল করতে পারলে কাজের মতো কাজ হতো একটা! এতো খানদানি লোকটাকে ইসমাইল কম বেইজ্জত করে না। আগে মুসলিম লীগের অফিস ছিলো খান বাহাদুরের বাড়িতে, এই ইসমাইল এখানে এসে জোর করেই ঝাউতলায় অফিস ভাড়া করলো, লোহার প্যাঁচানো সিঁড়ি দিয়ে দোতলার সেই খুপরি ঘরে উঠতে খান বাহাদুর হাঁপিয়ে যায়। ফর্সা টকটকে মানুষ, লাল হয়ে যায়। একদিন তার সামনে একে একটু শিক্ষা দিতে হবে। আজ এই পর্যন্তই থাক। একে ঘায়েল অবস্থায় দেখে যাওয়াই ভালো। সাদেক উকিলের লম্বা ইংরেজি ডায়ালগে গেঁয়ো জোতদারগুলো আর ওয়ার্কাররা একেবারে মুগ্ধ হয়ে রয়েছে। ইসমাইলকে ইংরেজি বলার সুযোগ দিলে এই মুগ্ধতা স্থানান্তরিত হতে পারে। ঝুঁকি নেওয়ার দরকার কী?

সবাই উঠে দাঁড়ালে শামসুদ্দিন ডাক্তার ইসমাইলকে একটু তফাতে ডেকে নিয়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কী যেন বলে।

১৯

ডাক্তার শামসুদ্দিন খোন্দকারের ওই গোপন কথাটি ইসমাইল আবদুল কাদেরকে জানায় সপ্তাহখানেক পর। 'উত্তরবঙ্গের প্রজাসাধারণের একমাত্র মুখপত্র সাপ্তাহিক প্রজাবাহিনী'তে দি কুবের ব্যাংক লিঃ-এর একটি নিলামের বিজ্ঞাপন দেখে সেদিন টাউনে যাচ্ছিলো আবদুল কাদের, হোসেন মঞ্জিলে ঢুকলো ইসমাইলের সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে। খাকি প্যান্ট, ছাই রঙের কোট পরে ও সোলার হ্যাট হাতে ইসমাইল

বেরুচ্ছিলো, কাদেরকে দেখে বাড়ির ভেতরের দিকে মুখ করে দুই কাপ চায়ের জন্যে হাঁক দিয়ে বারান্দায় বসলো চেয়ার টেনে।

'নিলাম? মানে? কিসের নিলাম?'

"টাউনের থানা রোডে অবস্থিত 'দি নিউ স্বদেশী ভাণ্ডার' নামীয় দোকানের কতগুলি প্যাকিং বাকস মধ্যস্থিত দ্রব্যাদি (সাধারণতঃ তৈল, সাবান, চা, কালী, পাউডার, সিন্দুর, সেন্ট প্রভৃতি) এবং উত্তম বিলাতি ল্যাম্প দি কুবের ব্যাংক লিঃ-এর প্রাপ্য অর্থ আদায় করার নিমিত্ত ব্যাংকের বড়গোলাস্থ মোকামে নিম্নবর্ণিত তারিখ ও সময়ে প্রকাশ্য নিলামে সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইবে। ক্রয়করনেচ্ছুক সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।"

'সাপ্তাহিক প্রজাবাহিনী' ইসমাইলের পছন্দ নয়, ভাঙাচোরা কৃষক প্রজা পার্টির পয়সাওয়ালা কিছু লোক এখনো ছেপে চলেছে, এদের টার্গেট মুসলিম লীগ। বুড়োগুলোর ওপর হক সাহেবের ছায়া লেপ্টেই থাকে। কাদেরের বাপ নিশ্চয়ই এটার গ্রাহক। ইসমাইল নিজে এটা নিয়মিতই পড়ে, কিন্তু দলের কর্মীদের হাতে দেখলে ভুরু কোঁচকায়। কাগজটা টেবিলে একটু ঠেলে রেখে ইসমাইল বলে, 'স্বদেশী ভাণ্ডার মানে অখিলবাবুর দোকান, অখিল কুণ্ডু। বাপ মারা গেলে ছেলেরা ভাগাভাগি করে ফেললো, এটা মনে হয় ছোটো ছেলে প্রতাপের। লক্ষ্মীছাড়াটা দোকান রাখতে পারলো না।'

দোকানটা সম্বন্ধে ইসমাইল যথেষ্ট ওয়াকিবহাল দেখে কাদেরের আশা হয়, নিলাম সে-ই ডাকতে পারবে কিন্তু ইসমাইল বলে, 'তা তুমি এসব জিনিস দিয়ে করবে কী? তুমি কি সেন্ট মাখো নাকি আজকাল? প্যাকেট প্যাকেট তেল সাবান মাখবে কী করে?'

কাদের কাচুমাচু হয়ে বলে, 'তা নয়। ধরেন গোলাবাড়ি হাটে আমার দোকানঘরেই একটা সাইডে এই মালগুলি বিক্রির ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?'

'গ্রামে স্টেশনারি দোকান? কিনবে কে? ইংলিশ ল্যাম্প কেনার মানুষ তোমাদের গ্রামে কোথায়? এর চিমনি খুলতে গেলে ভেঙে ফেলবে, হাতও কেটে ফেলবে।'

ল্যাম্প আবদুল কাদের কিনতে চায় নিজের বাড়ির জন্যেই। ইসমাইলের বাড়িতে ঘরে ঘরে এই বাতি জ্বলে। কাচের ডোমের ভেতর আলো হয় কেমন নরম সাদা, একটা জ্বললে ঘরের চেহারা পাল্টে যায়। টাউনের লোকজন যে জিনভূতকে তেমন আমল দেয় না সে তো এই আলোর জন্যেই। টাইনে সন্ধ্যা লাগতে না লাগতে মিউনিসিপ্যালিটির লোক মই নিয়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বাতি জ্বালিয়ে যায়। সিনেমা হলের সামনে জ্বলে ডায়নামোর বিদ্যুৎ, দোকানে দোকানে ঝোলে হ্যাজাক বাতি। এই আলো থাকলে জিন-পরি আসে কী করে? সেদিন হুমায়ুনের ঘরে একটা হ্যাজাক জ্বললে ভাবির চোখের সামনে কাফনের কাপড় জড়ানো ওই মানুষটা কি ঢোকার সাহস পায়?

'আলতা দিয়ে কী করবে? বিয়ে টিয়ে করার মতলব নাকি?'

আবদুল কাদের মেঝের দিকে চোখ রেখে লাজুক হাসি ছাড়লে ইসমাইল তার বিয়ের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে ফের বলে, 'আর সিঁদুর? তোমাদের বাড়ির মেয়েরা সিঁদুর পরে নাকি?'

'কী যে বলেন। আমরা মোহাম্মদি জামাতের মানুষ, বেদাত শেরেকি কাম কি আমরা করবার পারি?'

ইসমাইল হো হো করে হাসে। এই অট্টহাসি আবদুল কাদের বাড়িতে চেষ্টা করেও রপ্ত করতে পারে নি। এসব বোধহয় ওয়ারিশসূত্রে পাওয়া। হাসি থিতিয়ে এলে ইসমাইল বলে, 'ওইসব মোহাম্মদি আর হানাফির বাহাস তোমাদের আজও গেলো না?

মুসলমানদের মধ্যে তোমরা কি কাস্ট সিস্টেম চালু করতে চাও নাকি?' এই নিয়ে এখন তার অনেক ঠাট্টা করার কথা, কিন্তু নিলামে আবদুল কাদেরের শৌখিন জিনিসপত্র কেনার হাউসের কথা সে ভোলে না, 'তা হলে সিঁদুর দিয়ে করবেটা কী? তোমাদের ওই বিলে জিন না ভূত একটা কী আছে, তারই পূজা করবে নাকি? ওটা শেরেকি কাজ হলো না?'

কাৎলাহার বিল নিয়ে কাদেরই অনেক গল্প করেছে। তার বাপ এটা পত্তন নিয়েছে, এটা তাদের পারিবারিক সম্পত্তি। বিলের উত্তর সিথানে পাকুড়গাছে বসে মুনসি তাদের বিলের ওপর, বিলের দুই ধারের গিরিরডাঙা-নিজগিরিরডাঙার ওপর নজর রাখছে। মুনসির নেকনজরে আছে বলেই তাদের আয় উন্নতি। বালা মুসিবত থেকে বেঁচেও থাকে তারা মুনসির হুঁশিয়ার চোখের জন্যে। তাদের বাড়ির শিমুলগাছের সাদা বকের ঝাঁকও তো মুনসির পোষা, তারা তার হুকুমে আকাশে ওড়ে, আবার বিল তদন্ত করে ফিরে আসে তারই ইশারায়। মুনসিকে নিয়ে ইসমাইলের এ রকম ঠাট্টামজাক শুনে কাদের প্রথম প্রথম খুব কষ্ট পেতো। আজকাল অস্বস্তি লাগে। আবার কেমন ভয় ভয় করে, ইসমাইলের ওপর মুনসির নিনজর পড়বে না তো?

এই ঠাট্টা করার স্বভাবের জন্যে মুরুব্বি মানুষেরা ইসমাইলের সামনে উসখুস করে, অনেকেই তাকে পছন্দ করে না। আবার গ্রামে গেলে গরিব মানুষের সঙ্গে কি লীগের ওয়ার্কারদের সঙ্গে তার গল্পগুজব অন্যরকম, সেখানে তাকে নিয়ে ঠাট্টাইয়ার্কি করলেও সে মহা খুশি। লোকটার বাঁকাচোরা কথাবার্তা সহ্য করতে পারলে তার কাছে সাহায্য পাওয়া যায়। পারুক চাই না পারুক, মানুষের জন্যে তদবির করতে ইসমাইল মহা পটু। এই যে মুনসিকে নিয়ে এতো সব খারাপ খারাপ কথা বললো, আবার টিন থেকে সিগ্রেট নিয়ে ধরাতে ধরাতে বলে, 'কুবের ব্যাংকের ম্যানেজার তো গোপেনবাবু। বাবার বন্ধুর ছেলে। বীরভূমের লোক, আমরা সিউড়িতে থাকতে বাবার সঙ্গে গোপেনদার বাবা নলীনাক্ষ কাকার খুব মেলামেশা ছিলো। চলো তো, গোপেনদাকে বলে দেখি। নিলামের বিট আবার কী? ম্যানেজার যাকে চাইবে তাকেই দিতে পারে।'

কিন্তু আবদুল কাদেরকে ইসমাইল সেদিন শামসুদ্দিন ডাক্তারের কাছে শোনা গোপন কথাটি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে। ব্যাপারটা কী?—একটা লোক সম্বন্ধে কাদেরকে একটু খোঁজখবর নিতে হবে।

জয়পুরের কাছে দিন পনেরো আগে যে দাঙাহাঙামা হলো, তার পরপরই লোকটা পালিয়ে এসেছে। আলি মামুদ খাঁর জমির ধান ভাগাভাগি নিয়ে আধিয়ারদের সঙ্গে জোতদারের লোকদের খুব একচোট হয়ে গেছে। আলি মামুদের ভাগ্নে না ভাস্তে, না-কি ভাগ্নীজামাই না ভাস্তিজামাই, অথবা ভাগ্নে-কাম-জামাই কিংবা ভাস্তে-কাম-জামাই—তার মাথা আধিয়াররা এমন করে ফাটিয়ে দিয়েছে যে লোকটা মরে কি বাঁচে তার ঠিক নাই। আহত লোকটির সঙ্গে আলি মামুদের সম্পর্ক নিয়ে ইসমাইল অনেকক্ষণ ধরে মজা করে। তার ধারণা, জোতদার আর তালুকদার আর জমিদারদের সম্পত্তির ওপর লোভের কোনো সীমা পরিসীমা নাই, সম্পত্তি নিজেদের দখলে রাখার জন্যে এরা বিয়েশাদি দেয় সব নিজেদের মধ্যে। সুতরাং আহত লোকটি যখন আলি মামুদ খাঁর ভাস্তে কিংবা ভাগ্নে, তখন বিয়েও দিয়েছে নিশ্চয়ই নিজের অন্য কোনো ভাস্তি বা ভাগ্নীর সঙ্গেই। এখন চাষাদের হাতে ঠ্যাঙানি খেয়ে লোকটা যদি মরে তো আলি মামুদের ভাস্তে কিংবা ভাগ্নেও যায়, আবার জামাইও যায়। একসঙ্গে দুই দুইজন আত্মীয়ের মৃত্যুশোক বেচারা সামলাবে কী করে? শামসুদ্দিন ডাক্তার কি সাদেক উকিল হাজার ক্লিক করেও তখন তাকে উদ্ধার

করতে পারবে? না-কি খান বাহাদুরের কাছে এর প্রতিকার তৈরি হয়েই রয়েছে? তবে, ইসমাইল আবার এটাও বলে যে, সম্পত্তি ঠিক থাকলে কোনো সুখ-দুঃখই এদের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারবে না।

'তেভাগা যদি একবার হয়েই যায় তো সেই দুঃখে এইসব লোক পটাপট হার্টফেল করবে। এখনি তো টাউনে এলে আর বাড়ি ফিরতে চায় না, আলি আহমদ সাহেবের বাড়িতে ধন্না দিয়ে পড়ে থাকে। এই সাহস নিয়ে এরা করে পলিটিকস?'

তেভাগা হলে কাদেরের বাপই কি আর খুশি হবে? আলি মামুদের সুখ-দুঃখ ও বিপদ নিয়ে ইসমাইলের এরকম ঠাট্টায় কাদের সায় দিতে পারে না। আলি মামুদ মানুষটা সুবিধার নয়, সে তো বোঝাই যায়। সেদিন ইসমাইলের বাড়িতে বসে কতো হায় হায় করলো, এদিকে তার ভাড়াটে লোকজন যে আধিয়ারদের সঙ্গে লাগতে গিয়ে বেদম মার খেয়ে ভেগেছে, এটা কিন্তু একবারও বললো না।

তার এলাকার ভালো ভালো ওয়ার্কারদের যে মুসলিম লীগ থেকে বের না করে সে ছাড়বে না। কিন্তু যতোই হোক, মানুষটার এতো বড়ো বিপদ নিয়ে এভাবে কথা ইসমাইল না বললেই পারে।

ইসমাইলকে ঘাটানোও তো কাদেরের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আলি মামুদের লোভ আর ভয় নিয়ে তাকে অনেক কথা শুনতে হয়। কথার রঙ চড়াতে চড়াতে ইসমাইল তাকে একই সঙ্গে একটি পাকা শয়তান ও আস্ত ভাঁড় বানিয়ে ছাড়ে। তারপর বাজারের কাছে এসে রিকশায় উঠে তোলে ওই ফেরারি লোকটির কথা।

ঠিক ফেরারি নয়। তবে হাঙামার সময় তাকে দেখা গেছে আধিয়ারদের সঙ্গে। আলি মামুদ খাঁ থানায় ওর নামও দিয়েছে। শামসুদ্দিন ডাক্তার অবশ্য সবই জানে। সেই লোকের বাড়ি পুবের দিকে, বাঙালি নদীরও পুবে, যমুনার ধারে কিংবা যমুনার ভেতরের কোনো চরেও হতে পারে। পশ্চিমে খিয়ার এলাকায় সে ধান কাটতে যায় আকালের সময়। ভবঘুরে বাউণ্ডেলে লোকটা নাকি জয়পুর, পাঁচবিবি, আক্কেলপুরের দিকে তেভাগার নেতাদের পিছে পিছে ঘুরতো আর চাষাদের উস্কানি দিতো। এদিককার থানার পুলিস তাকে ধরার ব্যাপারে তেমন গা করছে না, তবে কেউ যদি ঠিকঠাক খবর পৌঁছে দেয় থানায়, তো তাকে ঠিকই ধরা হবে। শামসুদ্দিন ডাক্তার বললো, বাঙালি নদীর পশ্চিমেই নাকি তাকে কোথায় দেখা গেছে।

আবদুল কাদের অনেক ভেবেও এরকম কোনো লোককে মনে করতে পারে না।

ইসমাইল আরেকটু হদিস দেয়, 'লোকটা নাকি গান করে। চাষাদের মধ্যে গান করতো। আলি মামুদ নিজে তাকে গান করতে দেখেছে।'

'বুড়া মানুষ? এক ফকির ছিলো, চেরাগ আলি। তার বাড়িও পুবের দিকে। যমুনায় তার বাড়িঘর ভেঙে ফেললে আমাদের ওখানে এসে উঠেছিলো। তার নাতনিকে বিয়ে দিয়েছে গিরিরডাঙারই এক মাঝির সঙ্গে। ওই মাঝির ছেলেকে আপনি দেখেছেন। তমিজ, মাঝির আগের পক্ষের ছেলে। তা এ বুড়া ফকির বহুদিন থেকে নিরুদ্দেশ।'

'আরে না, অল্প বয়েস। আলি মামুদ আমাকে পরশুদিন বললো, একটু খেয়াল রেখো।'

'খবর পেলে কি পুলিসে ইনফর্ম করবো?'

'পুলিসে জানাবে?' পলাতক চাষা-কাম-গায়ককে নিয়ে ইসমাইল ভবনায় পড়ে। শ্যাওড়াপাড়া সাবগ্রাম থেকে শুরু করে বাঙালি নদী পার হয়ে যমুনার পশ্চিম তীর পর্যন্ত চমৎকার অর্গানাইজ করা গেছে। এদিককার রিপোর্ট পড়ে হাশিম সাহেব সোহরোওয়ার্দি

সাহেব খুব খুশি। পুব এলাকায় তেভাগার গোলমাল নাই। এদিকে বড়ো জোতদার কম, প্রচুর জমির মালিক শিমুলতলার তালুকদাররা, তা ওটা হলো ইসমাইলের শ্বশুরবাড়ি। ওদের বিরুদ্ধে যাদের ক্ষোভ আছে তারা সব ইসমাইলের খাস লোক। এদিকে স্কুল অনেক, ছাত্রদের প্রায় সবাই মুসলিম লীগের কাজ করে। যারা রাজশাহী কি কলকাতা কি এই টাউনেই কলেজে পড়াশোনা করে, বাড়ি গিয়ে তারাও পাকিস্তান জিন্দাবাদ করে বেড়ায়। কিন্তু ফেরারি আসামি যদি গ্রামে গ্রামে উস্কানি দিয়ে বেড়ায় তো গোলমাল দানা বাঁধতে কতোক্ষণ? চাষার গোঁ বড়ো ভয়ানক জিনিস। জয়পুর, পাঁচবিবি, আক্কেলপুরের কর্মীদের কতো বলেছে ইসমাইল, একটু সবুর করো, পাকিস্তান হলেই জোতদারদের আঁটো করা হবে। এ্যাসেমব্লিতে জমিদারি উচ্ছেদের বিলের সঙ্গে তেভাগার বিলও তোলা হবে। 'মিল্লাত' পত্রিকায় এরকম কথা লেখাও হয়েছে। বিল একবার এ্যাক্টে পরিণত হলে জোতদাররা বাপ বাপ করে দুই ভাগ ধান তুলে দেবে আধিয়াদের গোলায়। কোনো আধিয়ারকে উচ্ছেদ করা যাবে না।—নাঃ! কে শোনে কার কথা? আরে এসব কথা তো আর পাবলিক মিটিঙে ঘোষণা করা যায় না। জোতদারদের তো হাতে রাখতে হবে অন্তত ইলেকশন পর্যন্ত তো বটেই। তারপর আইনের মধ্যে দিয়ে তেভাগা প্রতিষ্ঠিত হলে চাষীর অধিকার নষ্ট করে কে?—নাঃ! কে শোনে কার কথা? স্কুল কলেজের ছেলেদের দলে টানা গেছে, কিন্তু চাষারা গোলমাল করতেই লাগলো। কথা শুনতে হয় ইসমাইলকে। নেতারা বোঝে না, এইসব ছোঁড়াদের বাবা বাছা বলে ধরে রাখতে না পারলে এরা সব লাল ঝাণ্ডার দিকে চলে যাবে। তবে একটা কথা।—ইসমাইল ওই ফেরারি লোকটি সম্বন্ধে নতুন করে ভাবে। ওকে হাত করে নিতে পারলে কাজ হয়। এরকম একটা মানুষ থাকলে আধিয়ারদের সবসময় সঙ্গে পাওয়া যায়।

কাদের ফের জিগ্যেস করে, পলাতক মানুষের সন্ধান পেলে সে কী করবে?

'আমাকে বলে যেও। চুপ করে বলে যেও। চট করে পুলিসের কাছে না যাওয়াই ভালো।'

২০

'একে এক। দুয়ে দুই, দুই দুই। তিনে তিন, তিন তিন। চারে চার, চার চার।'

মণ্ডলবাড়ির বাইরের উঠানে বসে ধান মাপে হামিদ সাকিদার। কয়েক হাত তফাতে শরাফত মণ্ডল বসে রয়েছে ইজি চেয়ারে। আবদুল আজিজ ঘুমে-কাতর চোখজোড়া জোর করে খুলে রেখে নজর রাখছিলো দাঁড়িপাল্লার কাঁটার দিকে, ঘুম তাড়াতে তাকে মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়াতে হচ্ছিলো কাঠের চেয়ার ছেড়ে। এই ধান তোলার সময়টা তাকে ঘন ঘন বাড়ি আসতেই হয়। কিন্তু এতো ছুটি তাকে দেবে কে? শনিবার বিকালে জয়পুরে ট্রেনে চেপে টাউনে নেমে টমটমে বাড়ি আসে রাত সাড়ে নটা দশটার দিকে। কাল মিনিট তিনেকের জন্যে শান্তহারে কানেকটিং ট্রেন মিস করায় বাড়ি পৌছুতে পৌছুতে ভোররাত হয়ে গিয়েছিলো, ঘণ্টাখানেকের বেশি ঘুমাতে পারে নি। যাক, এইতো কটা দিন। বর্গাদারদের ওপর সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকা যায় না। বাপজান

বুড়া মানুষ, তার ওপর আর কতো চাপ দেবে?

দাঁড়িপাল্লার দিকে শরাফতের অতো নজর নাই, হামিদ সাকিদারের ওপর ভরসা করা যায়। শরাফত বেশিরভাগ সময়েই দেখছিলো শিমুলগাছের মাথার দিকে। বকগুলো ভোরবেলায় চলে গিয়েছিলো বিলের ওপর। ছোটো ছোটো ঝাঁকে তাদের অনেকেই ফিরে এসে বসছে নিজেদের পছন্দসই ডালে। তাদের নজর উঠানের ধানের ওপর।

হাতের ভাপা পিঠায় আনমনে কামড় দিতে দিতে বারবার বিলের দিকে চলে যাচ্ছিলো আজিজের বড়ো ছেলে বাবর। শরাফত তাকে কয়েকবার কাছে ডেকে তার হাত ধরে বসিয়েছিলো ইজি চেয়ারের হাতলে। ছেলেটা বসে না, পিছলে পিছলে সরে পড়ে। এমনিতে শান্ত ছেলে, পড়ুয়া ছেলে, একমাত্র ভাইটা মরে যাবার পর কথাবার্তা তার যেন একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ধান মাপার দিকে শরাফত মন দিতে পারে না। চোখ দুটো তার ঝাপসা হয়ে আসে। বকের ঝাঁক পালা করে করে ধানের স্তূপের ওপর দিয়ে ছোট্টো উড়াল দেয়। নিশ্চিন্ত শরাফতের চোখে মৃত নাতির শোকে ও জ্যান্ত নাতির বিষণ্ণতায় বাষ্প জমে ঘন হয়ে।

শিমুলগাছের নিচে বসেছিলো হুরমতুল্লা, আর ছিলো শমশের পরামাণিক, যুধিষ্ঠির কর্মকার। তাদের সবার সামনে মাটির খোরা ভরা দুধপিঠা, তাদের কোঁচড়ে কোঁচড়ে মুড়ি। তমিজ ছিলো হামিদ সাকিদারের গা ঘেঁষে। পিঠা কি মুড়িতে তার মনোযোগ নাই, শরীরের সমস্ত শক্তি দুই চোখে নিযুক্ত করে সে দেখে দাঁড়িপাল্লার ওঠানামা। দেখতে দেখতে ধানের স্তূপ উঁচু হয়ে ওঠে। ২ বিঘা ৭ শতাংশ জমির পাঁকির ১৮ মণ ১২ সের ধানের দিকে শমশের ও যুধিষ্ঠির তো বটেই, হুরমুতুল্লা পর্যন্ত তাকিয়ে থাকে মুগ্ধ চোখে। দাঁড়িপাল্লায় তমিজের নজর সেঁটে গেছে জিগার আঠার মতো, সেই নজর ছিঁড়তে গেলে চোখ দিয়ে তার রক্ত বেরুতে পারে। ফুলজানকে এই সাজানো ধান একবার দেখাতে পারলে হতো। —'মাঝির বেটা', 'মাঝির বেটা' বলে রাতদিন খোঁটা দিস, কোনো শালা চাষার বেটা এই পরিমাণ জমিতে এতো ধান ফলাতে পারবে? একবার দেখে যা মাগী, চোখ দুইটা দিয়্যা লয়ন ভর্যা দেখ।

'পিঠা কয়টা খায়া সুস্থির মতো ভাগ করো।' হামিদ সাকিদারের প্রতি শরাফতের এই নির্দেশ ছিনিয়ে নেয় তমিজের চোখের অর্ধেক জোর। ধানের এমন সোন্দর পালাটা মনে হচ্ছে কুড়াল দিয়ে টুকরা করে ফেলবে। বেশি লয়, আর একটা দিন কি এই ধানের পালাটা আমান রাখা যায় না? ফুলজানটাকে একবার দেখানো যায়। মণ্ডলের নোকসানটা কী? কাল আবদুল কাদেরের সামনে ভাগাভাগিটা করলে তমিজ একটু বল পায়।—কিন্তু এতোগুলো মানুষের সামনে তমিজ কথাগুলো বলে কী করে?

হামিদ সাকিদারের পিঠা খাওয়া শেষ হলে শরাফত জারি করে পরবর্তী আদেশ, 'ভাগ করার আগে হাল, গোরু, লাঙল, মই আর কামলাপাট,—জমির কামলা, হুরমতুল্লার বাড়িত কামকাজের মজুরি—ব্যামাক হিসাব করা লাগে।'

হিসাব তো শরাফতের সবই মুখস্থ। তবু হাল, গোরু, লাঙল, মই আর কামলাপাটের কোনটা কতো দিন এবং কীভাবে খাটানো হয়েছে মুখে মুখে সে গুনতে থাকে। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করে এবং হিসাব মোতাবেক কয়েক মণ প্রথমেই আলাদা করে তার নিজের ভাগে রাখতে বলে। হামিদ সাকিদার ফের পাল্লা ধরলে নিংড়ানো বুকে ও চোপসানো মুখে তমিজ মিনমিন করে, 'হাল, গোরু ইগলানের হিসাব আর এ্যানা কম কর্যা ধরলে হয়। আর—'

শরাফত সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেয়, 'তাই সই। তুই হামার লয়া আধিয়ার, খন্দ করলু ভালো। হামিদ, এটি থ্যাকা পাঁচ সের ধান অর ভাগোত দাও। দাও না বাপু, হামি কচ্ছি, দাও।'

তমিজ তবু উসখুস করে। তার কালো মুখ লাল হতে হতে বেগুনির ওদিকে আর যেতে পারে না, 'এই কয়টা ধান দিলে হামাক আর কি দেওয়া হলো কন? আর কামলাপাটের হিসাব ধরেন? কামলা তো আপনে লিজেই নিলেন। না হলে হামরা বাপবেটায় কয় দিনে ব্যামাক ধানই তুল্যা ফেলবার পারি না?'

একটা খড় ধরে টানতে টানতে তমিজ আড়চোখে যুধিষ্ঠিরকে দেখে। তার চোখে কোনো ইশারা ছিলো কি-না বোঝা যায় না, থাকলেও কামারের বেটা তাকিয়ে ছিলো অন্যদিকে। তমিজের দিকে এখন শরাফতের চোখ, সেই চোখে খানিক আগের বাষ্পের লেশমাত্র নাই। চোখের তুলনায় গলা অনেক নরম করে সে বলে, 'লেয্য যা পাস তার চায়া তোক অনেক বেশি দিলাম। হিসাব কর্যা দেখিস?'

আবদুল আজিজের চোখ থেকে ঘুম তখন একেবারে কেটে গিয়েছে, বাবাকে সে মনে করিয়ে দেয়, 'বাপজান, পানির বাবদ তো কিছু ধরা লাগে। ওইটা কিছু কলেন না।'

পানির জন্যে ফের কিছু ধান ধার্য করার কথায় তমিজের গলায় কারবালা ঢুকতে শুরু করে, এক গলা কারবালা নিয়ে সে হাঁসফাঁস করে। আবদুল আজিজ ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে এইভাবে।—কাৎলাহার বিল থেকে নালা কেটে জমিতে পানি দেওয়া হয়েছিলো, নইলে ওই জমিতে এতো ধান হয় কী করে? তো পানির খরচ ধরতে হবে। বিলের মালিককে দাম ধরে দিলে তার অর্ধেক দেবে জোতদার আর অর্ধেক বর্গাচাষী। বিলের মালিক হিসাবে পানির দাম পাবে শরাফত মণ্ডল, আবার জোতদার হিসাবে সে দেবে এর অর্ধেক, বাকি অর্ধেক দেবে তমিজ।

সবাই অবাক হয়ে আজিজের ব্যাখ্যা শোনে। তাদের বিস্ময় মোচনের দায়িত্বও আজিজের।—মোষের দিঘি থেকে নালা কাটার অনুমতি পেলে নায়েববাবুকে তো কিছু ধরে দিতেই হতো। তোমরা নায়েববাবুকে পয়সা দিতে পারো, আর মুসলমান জোতদারকে ন্যায্য পাওনা দিতে তোমাদের বুক টাটায়। এটা কী?

কিন্তু যুধিষ্ঠির বলে ওঠে, 'বাবু, জলের দামই যদি ধরেন তো হামার কথাটা বিবেচনা করা লাগে।' কেন, তার কথা আসে কেন?—'আপনের জমিত হামি লিজে জল দিছি কামারপাড়ার খাল থ্যাকা। খাটনি ষোলো আনা হামার, জলও হামাগোরে কামারপাড়ার খালের। সেটার খরচ ধরলে হামার কিছু পাওনা হয় না বাবু?'

আবদুল আজিজের এই পানির ব্যাপারটা তোলা শরাফত অনুমোদন করতে পারে না। মাঝিদের সামনে কাৎলাহার বিল নিয়ে এতো কথা ওঠাবার দরকার কী? তা এখন তো আর কিছু হটার জো নাই। হালটা ধরতে হয় শরাফতকেই। প্রথমে সামলাতে হবে যুধিষ্ঠিরকে, 'কামারপাড়ার খাল গেছে ওই জমির পাঁজরা দিয়া। খালের মধ্যে সেঁউতি ডুবালু আর জমিত পানি সেঁচলু, লয়? এর মধ্যে খাটনি কিসের? খাল কি তোর একলার? খালের দুই পাশের ছয় আনি সাড়ে ছয় আনি জমি তো হামার। পয়সা ধরার কথা আর কস না, ধরলে তোরই নোকসান।'

আজিজ কিন্তু ওই খালের পানি নিয়ে যুধিষ্ঠিরের আর্জি বিবেচনা করার পক্ষে। সরকারি কর্মচারীদের কাছে আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। বৃটিশ রাজত্বে সূর্য যেমন অস্ত যায় না, তেমনি সেই সূর্যের কিরণ যাতে সব জায়গায় সমানভাবে পড়ে

সেদিকে দৃষ্টি রাখাও বৃটিশ সরকার বাহাদুরের পবিত্র দায়িত্ব। এরকম একটি জুতের উপমা প্রয়োগ করে তৃপ্তি পেয়ে আজিজ যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দেয়, হিসাবনিকাশ করে তার যদি প্রাপ্য বেরোয় তো তাকে কড়ায়গণ্ডায় বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

কিন্তু আবদুল আজিজের এসব হাকিম কিসিমের কথাবার্তা তমিজের কানে ঢোকে কি-না সন্দেহ। সে বলে, 'নালা কাটনু তো হামি একলা। একদিন খালি কোদাল ধরিছিলো বুলুর বেটা। হামি কনু, তুই চ্যাংড়া মানুষ, পারবু না। হামি একলাই তো কাটনু। পানির দাম কী কচ্ছেন হামি বুঝিচ্ছি না।'

'বুলুক তো হামি নিয়োগ করনু। বুলু ওই কয়টা দিন হামার গোরুবাছুর দেখলো না। এখন তুই তাক দিয়া কি করিছু তুই জানিস।' বলে আর শরাফত তার বাষ্প-শুকিয়ে যাওয়া চোখ মোছে। করকর-করা চোখ নিয়েই সে বলে, 'তমিজ, তুই বেশি কথা কস। তখন হাতেপায়ে ধরলু, তোক জমি দিলাম। বর্গা করা তোর আরম্ভ হলো। লে, আরো কর। হাল কর, গোরু কর, লিজের হালগোরু লিয়া জমিত নাম। তোক মানা করিছে কেটা? এংকা ক্যাচাল করিস না বাপু।'

হালগোরুর কথায় তমিজ চুপসে যায়, শরাফত হুমকি দিচ্ছে। ওই জমিতে পেঁয়াজ রসুনের আবাদ করার সুযোগ হারাবার ভয়ে সে চুপ করে থাকে।

'অর উকিল আজ গরহাজির, কথা না কয়া আসামির আর উপায় আছে?' আবদুল আজিজ তমিজের দিকে কাদেরের পক্ষপাতিত্বের ইঙ্গিত করলে তমিজের রাগ হয় কাদেরের ওপর। কাদের আজ বেরিয়ে গেছে খুব ভোরে, সন্ধ্যার আগে ফিরবে না। আজ কি তার টাউনে না গেলেই হতো না?

পানি বাবদ আরো কিছু ধান মণ্ডলের ভাগে সরে গেলে নিজের ধান বস্তায় ভরতে তমিজের হাত আর সরে না। আজিজ এবার মনোযোগ দেবে অন্য বর্গাদারের ধান নিয়ে কেবল এসেছে যে গোরুর গাড়িটি সেই দিকে। আফজাল গাড়িয়াল বস্তা নামাচ্ছে তার গাড়ি থেকে। তমিজের দিকে তাকিয়ে সে জানতে চায়, 'গাড়ি লাগবি? চলো দিয়া আসি।' তমিজ বলে, 'এইকোনা ধান। তার আবার গাড়ি লাগবি?' তমিজ ভারের ওপর তার ধানের বস্তা সাজায়।

আফজাল গাড়ি থেকে ধান নামানো শেষ করে শিমুলগাছের তলায় বসলে আবদুল আজিজ যুধিষ্ঠিরকে বলে, 'পৌষ মাস গেলো না, তুই আসিছিস ধান কর্জ লিবার। সোমাচারটা কী বাপু?'

'আপনাগোরে জমি বর্গা কর‍্যা ধান যা পানু তাত তো দুই মাসের খোরাক হবি না। বাবা কচ্ছে, কয় মণ ধান কর্জ লিয়া আয়, জষ্টি মাসত পদুমশহরে লিশানের মেলার পরে না হয় লগদ ট্যাকা দিয়া শোধ করমু।'

'বুঝিছি।' আবদুল আজিজের সঙ্গে আর সবাই বোঝে। নিশানের মেলায় লাঙলের ফলা, কোদাল, কুড়াল, কাস্তে, বঁটি এসব খুব ওঠে। অনেক দূরদূরান্ত থেকে চাষীরা আসে। করতোয়ার পুব থেকে যমুনার পশ্চিম পর্যন্ত কর্মকারদের থোক রোজগার হয় ওই মেলাতেই। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের কথায় শরাফত আমল দেয় না, 'যে ধান পাছু তাই আগে খায়া শ্যাষ কর। পরে আসিস।'

'না বাবু। ধান হামার এখনি দরকার।' ধান নেওয়ার কারণ গোপন করতে যুধিষ্ঠির হিমসিম খায়, 'বাবার হাঁপরের মাল কেনা লাগবি।'

'মিছা কথা কস কিসক? গণেশ কর্মকারের জমির বায়না দিবু, তোর তো মেলা পয়সার দরকার।' ধরা পড়ে গিয়ে যুধিষ্ঠির চুপ করে থাকে। আবদুল আজিজ তাকে পরামর্শ দেয়, 'জগদীশের কাছে যাস না কিসক? তোর জাতের মানুষ, যায়াই দেখ।'

যুধিষ্ঠির জিভ কাটে, 'কি যে কন বাবু, উনিরা কতো বড়ো জাত। হামরা এক জাতের মানুষ হই ক্যাংকা কর্যা?'

'শালা সাহা হলো বড়ো জাতের মানুষ? আর আমরা আর তোরা একই জাতের পয়দা? কী কস?' শুনে যুধিষ্ঠির দ্বিতীয়বার জিভ কাটে, 'কী যে কন? কী যে কন?' কিন্তু তার মুখে আর কিছু আসে না। তাকে আর জেরার মধ্যে না ফেলে শরাফত বলে, 'কয়দিন বাদে আয় বাবা। হামার ধান সব আসুক।' যুধিষ্ঠির তমিজের পিছে পিছে চলে গেলে শরাফত আজিজকে আস্তে করে ধমকায়, 'অতো জগদীশ জগদীশ করো কিসক? ট্যাকাটা হাতোত পালেই যুধিষ্ঠির গণেশ কর্মকারের জমি বায়না দিবি, বোঝো না? কয়টা দিন এটি ঘুরুক, গণেশ লিজেই হামার কাছে হাজির হবি।'

ওদিকে বাড়ির খুলিতে ভার নামিয়ে তমিজ কাঁধের বাঁকটা বেড়ার সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখতে না রাখতে ছুটে আসে কুলসুম। নিজেদের ধান ঘরে এলে কী করতে হয় বুঝতে না পেরে সে দুই হাতই ঢুকিয়ে দেয় ধানের বস্তার ভেতরে, 'ধান তোমার কি সোন্দর হছে গো।' 'এই ধানেত বছরের খোরাক হয়াও আরো থাকবি।' 'এই ধানের বরকত আছে গো।'—কুলসুম প্রলাপ বকার মতো অবিরাম বলেই চলে। তমিজ তখন মাটিতে বসে পড়েছে হাঁটু ভেঙে, ডোবার ওপারে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলছে যুধিষ্ঠির। কিছুক্ষণ কুলসুমের প্রলাপ শুনে তমিজ বলে, 'লাও, হছে। ভার আর ছালা আজাড় কর্যা দাও। ধান লিয়া আসি।'

বস্তা খালি করে ভারে রেখে কুলসুম এসে দাঁড়ায় তমিজের পাশে। শীতের দুপুরে তার ঘাড় ঘামে ভিজে গেছে। বাঁক বয়ে বয়ে তার ঘাড়ের ওপরে খানিকটা জায়গা একটু শক্ত, সেখানেও ঘামের বুদবুদ। কুলসুম তার শাড়ির আঁচলে তমিজের ঘাড় মুছতে মুছতে বলে, 'খুব ঘামিছো গো। খানিকক্ষণ জিরাও।'

তমিজের বাপ ঘর থেকে বেরিয়েই বেড়া থেকে বাঁক ও মাটি থেকে ভার তুলে নিয়ে রওয়ানা হয় মণ্ডলবাড়ির দিকে, বলে, 'তুই জিরায়া লে। হামি না হয় কয় ভার লিয়া আসি।'

কুলসুমের শাড়ির আঁচল ফিরে আসে তার নিজের হাতে, তমিজ সটান উঠে দাঁড়ায়। মণ্ডলবাড়িতে তমিজের ধানের পরিমাণ দেখে তার বাপের মেজাজটা আবার বিগড়ে যাবে, মণ্ডলকে কী বলতে ফের কী বলে ফেলবে, তার ঠিক নাই। শরাফত কি আজিজ যদি রেগে যায় তো জমিটা এবার তমিজ পাবে না। না, বাপকে যেতে না দেওয়াই ভলো। পা চালিয়ে ডোবার ওপারে গিয়ে তমিজ বাপকে ধরে ফেলে। বুড়া এতো জোরে জোরে পা ফেলছিলো কি ধানের খুশিতে? না-কি কারো ওপর জেদ করে? তমিজ আরো বেশি জেদ করে, 'তুমি ইগলান ধান ব্যামাক খুলির মধ্যে মেল্যা দাও। আর একটা ওদ দেওয়া লাগবি। বাকি ধান হামি লিয়া আসিচ্ছি। যুধিষ্ঠির আছে হামার সাথে।'

শেষ কয়েক ভারে আসে খড়। যুধিষ্ঠির আর শমশেরও কয়েকবার বাঁক কাঁধে নিয়েছিলো। এই করতে করতে শীতের দুপুর একেবারে শেষ হয়ে আসে। তিন জনে ডোবায় নেমে গোসল করে হি হি করে কাঁপে। অল্প পানিতে ভালো করে গোসল হলো না, মাঝখান থেকে হাত পা সব জমে যায় ঠাণ্ডায়। গতরে হিমের কামড়ে কাঁপতেও

ওদের মহা আমোদ, ওরা চলে গেলেও আমোদের রেশ থেকেই যায়। এই ছোটো অনিয়মটাকেই ধান তোলার উৎসব গণ্য করে তমিজের বাপ কিছুক্ষণ গুড়ুর গুড়ুর করে হুঁকা টেনে ওটা রেখে দেয় ছেলের পেছনে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'ধান তো কিছুই দেয় নাই মণ্ডল। ধান কাটনু, তখন মনে হলো—'

'গোরু বেচ্যা দিছো, নাঙল হাল কিছুই তো ঘরত থোও নাই। ধান আর পাবা কতো?' তমিজ রাগ করে প্রথমে বাপের ওপর, পরে কুলসুমকেও শাসায়, 'ও ফকিরের বেটি, আগে গোরু কেনা লাগবি, হাল নাঙল ইগলান করার পরে খাওয়া দাওয়া, বুঝিছো?'

'কী সোন্দর বাসনা গো তোমার ধানের।' বুক ভরে ধানের গন্ধ নেয় কুলসুম, 'তামান ঘর, খুলি, আইঙনা ধানের বাসনাত ভুরভুর করিচ্ছে গো। পাগারের গোন্দ কুটি পলাছে দিশা পায় নাই।'

ধানের সৌরভে ডোবার দুর্গন্ধ পালিয়ে গেছে এই তথ্যে কিছুমাত্র বিহ্বল না হয়ে তমিজের বাপ খেঁকিয়ে ওঠে, 'খালি বাসনা শুঁকলেই হবি? এই চাউলের ভাত লিত্যি খাওয়া যায়? এই ধান বেচ্যা আউশ কেনা লাগবি।'

এদের কারো কথাই গ্রাহ্য করে না তমিজ, 'ধান লয়, ধান লয়। ধান কেনা হবি না। এই ধান সেদ্ধ কর‍্যা চাউল বেচ্যা দিয়া আসমু গোকুলের হাটত, বুঝিছো?' কিন্তু বাপ কি সৎমা কারো গায়েই তার কথাগুলো লাগলো না দেখে তমিজ ফের বলে, 'খালি খাওয়ার চিন্তা! ফকিরের বেটি, জিভখানা এ্যানা খাটো করো গো, খাটো করো! চাউল হামি এক হাটোত বেচমু, আবার ওই দিনই পাঁচ কোশ উত্তরে দশটিকার গোরুর হাটত যায়া গোরু লিয়া আসমু।'

ধানের খুশিতে কুলসুম খিলখিল করে হাসে, 'তোমার জিভখান এখন থামাও তো বাপু।'

তার বাক্য মেনে তমিজ চুপ করে। ওখানে বসেই গোয়ালঘর করার একটা জায়গা খোঁজে। আকালের আগে যেখানে গোরু থাকতো সেখানে এখন তমিজের ঘর। ওই ঘরের উত্তর পশ্চিমে একটুখানি জায়গায় ছোটো একটা একচালা করে দিলেই দুটো গোরু থাকতে পারে। দুটো গোরু, হাল, লাঙল, জোয়াল, মই,—সবই সে করে ফেলবে সামনের খন্দ তোলার পরেই। তার বাপের খোরাকটা বড়ো বেশি। কুলসুমটাও বেশি খলবল করে।—এই যে পঁচসেরি ধামায় ধান নিয়ে 'কালাম চাচার ঢেঁকিত যাই। আজই তোমাগোরে পিঠা খাওয়ামু। ধান ঘরত তুল্যাই পিঠা খির না হলে ওই ধান বরকত দিবি না গো।' বলতে বলতে সে চলে যায় ঢেঁকির আওয়াজ মুখরিত কালাম মাঝির বাড়ির দিকে। তার খিলখিল হাসির কুচি পড়ে থাকে সারা বাড়ি জুড়ে, সেই আওয়াজে মিশেল ছিলো জোড়া গোরুর মিষ্টি নিশ্বাস। আর ছিঁলো ধানের পালার চূড়ায় আরো ধান রাখার ঝরঝর ঝরঝর আওয়াজ।—আবদুল কাদেরকে বলে মণ্ডলের কাছ থেকে আরো কিছু ধান নেওয়া যায় না? বিলের পানি বাবদ ধান কেটে নেওয়ার ইচ্ছা শরাফতের তো ছিলোই না। বড়ো বেটার কথায় মেনে নিয়েছে। এখন কাদের যদি বাপকে ভালো করে বোঝায় তো মণ্ডল কি তার কথা শুনবে না? সন্ধ্যা তো হয়েই এসেছে, গোলাবাড়ি গেলে এখন কাদেরকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

'ক্যা গো, আজ না হাটবার। যাই দেখি, মাছ টাছ কিছু পাই যদি।' তমিজের হাঁকে সাড়া দেবে কে? কুলসুম তো এখন কালাম মাঝির বাড়িতে। তমিজ নিজেই ঘরে ঢুকে মাছের খলুই নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ফের ঘরে ঢুকে সর্ষের তেলের শিশিটা ঝুলিয়ে নিলো আঙুলের মাথায়।

গোলাবাড়ি হাটের কাছাকাছি পৌঁছুলে বোঝা যায়, হাট এখন ভাঙার পথে। সন্ধ্যা নামছে গাঢ় হয়ে। হাটুরেরা সব বাড়ি ফিরে যাচ্ছে; তাদের বেশিরভাগের হাতে একটা ঝোলা কি মাছের খলুই। আরেক হাতে ঝোলানো তেলের শিশি। কারো শিশি দুটো, একটায় সর্ষের তেল, আরেকটায় কেরোসিন। তারা সব মাছের দাম নিয়ে চালের দর নিয়ে আলাপ করে। সামনে যে হাটুরেকেই পায় তমিজ তাকেই চালের দর জিগ্যেস করে, শুনে বলে, 'চালের দর মনে হয় এবার আর উঠবি না। নোকসান হবি।' গলায় সে জোতদারদের মতো এক ধরনের হতাশা তৈরির চেষ্টা করে।

কাদেরের দোকানে হ্যাজাক জ্বলছে, তার মানে এখনো মেলা মানুষ আছে। ভেতরটা লোকে ভর্তি। ক্যাশবাকসের পাশে নতুন একটা বড়ো জলচৌকি, একটু উঁচু এই জলচৌকিতে সাজানো আয়না, চিরুনি, কাঁকই, আলতা, সিঁদুর কৌটা, পাউডার। আরো অনেক কিছু আছে, তমিজ ওগুলো চেনে না। জলচৌকির পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে গফুর কলু। এখন বেচাকেনা বন্ধ হয়ে গেছে। তা হলে ওই শালা কলুর বেটা ওখানে করে কী? সে বোধহয় জিনিসপত্র পাহারা দিচ্ছে। কর শালা চৌকিদারের কামই কর। টাউনে এইসবের দোকান তমিজ কয়েকটা দেখেছে, তবে ওখানে যারা বিক্রিবাটার কাজ করে তারা কি আর কলুর বেটার মতো লুঙি পরে নাকি? ধুতিপরা সেসব মানুষের চেহারা আলাদা। তবে কেরোসিনের সঙ্গে এখানে হালকা মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, এই গন্ধ টাউনের ওই দোকানগুলোর সামনে দিয়ে যাবার সময় সে পেয়েছে।

ঘরের মানুষগুলির মধ্যে খদ্দের কেউ নাই, এরা সব কাদেরের পার্টির মানুষ। কয়েকটা ছেলেকে কাদের বোঝাচ্ছে, 'তোমরা সবাইকে বলবো, মোসলমানের মধ্যে তো চাষাই বেশি। অবস্থা ভালো আর কয় জনের? মোসলমানের দল চাষার স্বার্থ না দেখলে আর কে দেখবে? বুঝিছো? এটা তো ঠিক কথাই যে, হক সাহেব খুব বড়ো নেতা। মোসলমান একদিন একবাক্যে তাকে ইমাম মানিছে, তার কথায় ওঠাবসা করিছে। কিন্তু তিনি তো গেলেন হিন্দু মহাসভার সাথে। যে হিন্দু মোসলমানের হাতে পানি খায় না, মোসলমান দেখলে ঘিননা করে, দেখো না নায়েববাবু বুড়া বুড়া মুরুব্বি মানুষের সাথে তুই তোকারি করে কথা কয়, সেই হিন্দু জাতের সাথে হাত মেলালে হক সাহেবকে নেতা মানি কীভাবে? ভালো কর‍্যা বুঝায়া কবা, বুঝিছো?'

রানীরপাড়া স্কুলের একটি ছেলে কী জিগ্যেস করলে কাদের কয়েক পলকের জন্যে চুপ করে কী একটা ভেবে নেয়। তারপর দ্বিগুণ উৎসাহে বলতে শুরু করে, 'আরে গরিবের জন্যেই তো পাকিস্তান দাবি করা হচ্ছে, এটা বোঝাবার পারো না? পাকিস্তানে ধনীরা জাকাত ফান্ডে টাকা না দিলে পুলিস ওই ধনী লোককে এ্যারেস্ট করবে। আইন পাস হবে। গরিব না খেয়ে থাকবে না, জাকাতের টাকায় হক থাকবে গরিবের।'

'জাকাতের কথা ওঠে কেন বাপু? চাষাক ভিক্ষা দেওয়ার কথা ওঠে কেন? চাষার পাওনাটা দিয়া দিলেই তো মিট্যা যায়। চাষার যা খাটনি, আদ্দেক ফসলে তার পোষায়, তুমিই কও তো বাপু?'

পেছনের বেঞ্চ থেকে আলিম মাস্টারকে হঠাৎ কথা বলতে দেখে কাদের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়, 'আরে মাস্টার সাহেব, আসেন, এখানে আসেন। আপনে চ্যাংড়াপ্যাংড়ার সাথে পেছনে বসিছেন কেন?' আলিম মাস্টার সামনে গিয়ে আরেকটি বেঞ্চে বসে বলে, 'বাবাজি, আমার কথাটার জবাব দিলা না? গরিবের দেশ হলে জাকাতের দরকার কী?'

'না। মানে, দুই চারটা বড়োলোক যারা আছে তাদের টাকা আদায় কর্‌্যা গরিব মানুষের মধ্যে দেওয়া হবে। পাকিস্তান হলে চাষার হক আদায় করার আইন পাস হবে। জমিদারি প্রথা উঠায়া দেওয়া হবে। তাহলে জমির মালিক হবে কে? আপনি বলেন।'

'মোসলমান জোতদাররাই তখন জমিদারের কামগুলান করবি। চাষার লাভ কী?'

'কী যে কন? তেভাগা পাস হলেই চাষার হক কায়েম হয়।' কিন্তু মাস্টারের জবাব এখনো দেওয়া হয় নি বুঝতে পেরে কাদের নতুন প্রসঙ্গ তোলে, 'দাঁড়ান, একটা বই দেই আপনাকে। দেখেন, প্রাইমারি শিক্ষা ফ্রি করা হবে, কম্পালসারি ফ্রি এডুকেশন। তাতে তো লাভ চাষীদের, না কী?'

'বুঝলাম। কম্পালসারি করো, আর ফ্রি করো, আধিয়ার চাষা কোনোদিন বেটাক ইস্কুলে দিবার পারবি না। চাষার উপযুক্ত হিস্যা দাও, তার অবস্থা ভালো হলে পয়সা খরচ কর্‌্যা ইস্কুলে ভর্তি কর্‌্যা দিবি। এই ন্যায্য হিস্যার কথা তুললে জোতদাররা পুলিস ডাকে, এটা কেমন কথা বাপু?'

কাদেরের সন্দেহ হয়, এই আলিম মাস্টার লোকটা কোন পক্ষের মানুষ? একটু গম্ভীর হয়ে সে বলে, 'মাস্টার সাহেব, খিয়ার এলাকায় আধিয়াররা যা করতিছে, তাতে মোসলমানের একতা নষ্ট হচ্ছে না?'

'কিন্তু জোতদার তো মোসলমান কম নাই। মোসলমান চাষা হিস্যা চাইলে তারা পুলিস ডাকে কিসক?'

এবার কাদের চূড়ান্ত সমাধানের কথার পুনরাবৃত্তি করে, 'পাকিস্তান হোক, চাষার হিস্যা ষোলো আনাই পাওয়া যাবি। এখন গোলমাল করলে সবারই লোকসান।'

এই তর্কের যেটুকু তমিজ বুঝেছে তাতেই সে বেশ উত্তেজিত। এইবার কাদেরকে বলে তার বাপের কাছ থেকে মণখানেক ধানও যদি নেওয়া যায়। উত্তেজনায় ওখানে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকাও মুশকিল। এদিকে কাদেরের দোকান থেকে ছেলেপিলে কখন যে চলে যাবে তারও ঠিক নাই। বাইরে বেরিয়ে দেখে, কালাম মাঝির দোকানে কুপি জ্বলছে। কালাম কয়েকদিন বাড়িতেই ধান তোলা নিয়ে ব্যস্ত, দোকানে বসেছে লালু, কালাম মাঝির সম্পর্কে ভাস্তে। মাছ তো আজ কেনাই হলো না। লালুর কাছ থেকে সর্ষের তেল আর বুটের ডাল নেওয়া যায়। বুটের ডাল অনেক দিন খাওয়া হয় না। কুলসুম চিতই পিঠা করলে বুটের ডাল দিয়ে খাওয়া যাবে। কিন্তু কালাম মাঝির দোকানে পৌঁছুবার আগেই ডাক দেয় বৈকুণ্ঠ।

বটতলায় বাঁধানো চাতালে একটা কুপি জ্বলছে, পাশে একটা নকুলদানার ডালা। নকুলদানাওয়ালা বোধহয় ডালাটা বৈকুণ্ঠের হেফাজতে রেখে কোথায় গিয়েছে; কিন্তু এ যেভাবে একটু একটু করে মুখে তুলছে তাতে লোকটা ফিরে এসে শুধু ডালাটাই পাবে। 'আর খায়ো না' বলে ডালার দিকে একটু এগোতে তমিজের মাথা টলে যায় : এ কী? চেরাগ আলি? কুয়াশা ও অন্ধকারে লোকটার কালো মুখ লম্বাটে হয়ে মিশে গেছে আরো ঘন অন্ধকারে, তার বাবরি চুলও হাটের অন্ধকার এই জায়গাটির অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। তমিজের সামনে অন্ধকার দোলে, কয়েকটা দোকান পরে মুকুন্দ সাহার আড়ত, আড়তের মশলার গন্ধ বটতলার কুপির আলো উস্কে দেয়, সেই কালো আলোতে ভর করে বটতলা সরে যায় অনেক দিন আগে এবং এই অন্ধকার লোকটির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গলা মেলায় কালো ছিপছিপে একটি বালিকা। কালো আলোয় এর হাতের দোতারা দেখা যাচ্ছে না, সেটা কি সে লুকিয়ে রেখেছে তার মস্ত লালকালো তালি দেওয়া আলখাল্লার

ভেতরে? তার হাতের সেই লোহার লাঠিটা তবে কোথায়? গান করার ফাঁকে ফাঁকে চেরাগ আলি ফকির হঠাৎ হঠাৎ করে থেমে দম নিচ্ছিলো আর তখন ওই কথাগুলো গাইছিলো ওই কালো মেয়েটি, 'খোয়াবে কান্দিল বেটা না থাকে উদ্দিশ।' গাইতে দিয়ে চেরাগ আলির মুখের হাঁ খুব বড়ো হয়ে গেলে তমিজ হেসে কুটি কুটি হচ্ছিলো, কে যেন তাকে ধমকে দেয়। কে সে? তবে রাগে ও কষ্টে ছলছল চোখ করে মেয়েটি তার দিকে তাকিয়েছিলো, সেটা কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে। অনেক বছর উজিয়ে সেই মেয়েটিকে নিয়ে চেরাগ আলি কি ফের প্রথম থেকে হাজির হলো এখানে?

'তোর বাপ কুটি রে?' বৈকুণ্ঠ গিরি জিগ্যেস করলেও আন্ধারে ওই ছবি চট করে নিভে যায় না। তবে তার রঙ ফিকে হয়ে আসে। 'হামি কনু, তমিজের বাপ হাটোত আসেই না আজকাল। তাঁইও একরকমের ফকিরই হয়া গেছে এখন। মানষে কয়, তমিজের বাপে ঘরত বস্যা খালি টোপ পাড়ে আর রাত হলে নিন্দের মধ্যে পাকুড়তলা যায়া ঘোরে। মানষে তো আসল কথা জানে না।' বৈকুণ্ঠ অবিরাম কথা বলে, 'ক্যারে তমিজ, চিনিস?' চেরাগ আলির পরিচয় দেয়, 'চিনিস না, না? চেরাগ আলি ফকিরের শিষ্য আছিলো, সাগরেদ, সাগরেদ। এটিকার মানুষ লয়। ফকিরের সাথে চেনা আছিলো অনেক আগে, কিন্তু মেলামেশা হছে খিয়ারেত গেলে। লয় ফকির?'

লোকটা যে চেরাগ আলি ফকির নয় বোঝার সঙ্গে সঙ্গে চেরাগ আলি এবং ছিপছিপে বালিকা তমিজের সামনে থেকে মুছে যায় এবং ওই সাথে উড়াল দেয় সেই অনেক আগেকার মেঘলা বিকালবেলাটিও। বৈকুণ্ঠ এলোমেলোভাবে তার সম্বন্ধে অনেক কথা বলে। চেরাগ আলি নাকি লোকটিকে বলে দিয়েছে, সে যেন গিরিরডাঙা গ্রামে গিয়ে তার নাতনি আর নাতজামাইয়ের সঙ্গে দেখা করে। তমিজের বাপকে সে অনেক গোপন কথা বলবে, সেসব তত্ত্বকথা, এখানে কি সেই কথা বলা যায়?

তমিজ জিগ্যেস করে, 'আপনের বাড়ি?'

'বাড়ি আমার পুবে।' তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বৈকুণ্ঠই তার পরিচয় দেয়। আকালের সময় এই কাছেই, নিজগিরিরডাঙা গ্রামে তার বৌবাচ্চা রেখে সে চলে যায় খিয়ারে। তার হলো গান গাওয়ার নেশা। খিয়ারের মানুষের মধ্যে তার গান খুব চলে, টাউনেও তার গানের চাহিদা খুব। এখন শুধু গানই করে বেড়ায়।

তমিজের সন্দেহ হয়, এই হলো ফুলজানের হারিয়ে-যাওয়া স্বামী। এখন তমিজের সামনে এই অন্ধকারে কুপির আলো থেকে হলদে জ্যোৎস্না ঝরতে শুরু করে। সেই জ্যোৎস্নায় ডুবুডুবু ধানখেতের পাশে সরু আল, সরু আলের ওপর দাঁড়িয়ে-থাকা জমাট-বাঁধা জ্যোৎস্নাকে ছুঁতে গেলে সে সরে যায় মোষের দিঘির ওদিকে, তমিজ তাকে ধরতে সেদিকে যেতেই সেই জমানো জ্যোৎস্না উড়াল দেয় মোষের দিঘির ওপর, দিঘির গোলাপি পানির আভায় তার কালো মুখের ছায়া। কালো ছায়ায় চিবুকের নিচে ঘ্যাগের আবছা আকার নিয়ে ছোট্টো একটি বিন্দুতে ঢুকে পড়ে সে মিশে যায় কুয়াশার খাপের ভেতর। আর আকাশ জুড়ে ওড়ে তমিজেরই দেওয়া রেড ক্রসের র‍্যাপার। কেরামত আলির গায়ের চাদর কি ওটাই নাকি? তমিজ বারবার তাকে দেখে। এতে লোকটা একটু উসখুস করে। হয়তো অস্বস্তি কাটাতেই সে বলে, 'তোমার নাম তমিজ? তোমার বাপের সাথে মেলা কথা ছিলো গো। ফকিরের বেটিকও অনেক কথা কওয়ার আছে। কাল পরশু তোমাদের বাড়ি যাবো।'

'লিচ্চয়। হামার সাথে যাবা। ঘাটা চিনায়া লিয়া যামু।' বৈকুণ্ঠ তার সঙ্গী হওয়ার

প্রস্তাব করেই অনুরোধ করে, 'ওই গানটা আর একবার গাও তো। তোমার গলাখান বড়ো মিঠা।'

এর মধ্যে ১৫/১৬ বছরের একটি ছেলে এসে তার নকুলদানার ডালা তুলে নেয়, বলে, 'ও বৈকুণ্ঠদা, তুমি ব্যামাক খায়া ফালাছো গো। পয়সা দিবা না?'

বৈকুণ্ঠের হাতে তখনো কয়েকটা নকুলদানা। ছেলেটিকে সে ধমক দেয়, 'আরে ফকির মানুষ তোর নকুলদানা খাছে, তোর ভাগ্য। দে তো তমিজ, চারটা পয়সা দে তো এই ছোঁড়াক।'

কেরামত একটা দুয়ানি ছেলেটির হাতে দিলে বৈকুণ্ঠ একটুখানি ক্ষোভ জানায়, 'আরে, জগদ্বন্ধুর বেটা, তোর বাপ কতো মানষেক বাদাম খিলাছে মাগনে, আর তুই আজ পয়সা লিলু ফকির মানষের কাছ থ্যাকা?'

'আমরা ফকির নই।' কেরামত আলি প্রতিবাদ করে, 'ফকির হওয়া কি মুখের কথা? আমরা গান বান্দি, শায়েরি করি। গান লিখি, গান ছাপায়া বেচি। আমরা ফকির নই।' এই কথা থেকে তার বিনয় বা অহংকার বোঝা কঠিন।

'ওই তো হলো।' বলে বৈকুণ্ঠ কেরামত আলির হাত ধরে টানে, 'চলো, ওই ঘরত চলো। ওটি লিগ্যি সভা হয়। মেলা মানুষ পাবা। একটা গান কর‍্যা যাও।'

কাদেরের ঘরের আলোচনাকে অগ্রাহ্য করে দরজায় দাঁড়িয়ে বৈকুণ্ঠ হাঁক দেয়, 'ও দাদা, দেখো। কোন মানষেক ধর‍্যা লিয়া আসিছি, দেখো।' গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তার মাঝখানে এরকম উটকো কথায় কাদের বিরক্ত হয়ে তার দিকে তাকালে সে ফের প্রায় চেঁচিয়েই বলে, 'দাদা, হামাগোরে লিজগিরিরডাঙার জামাই গো।' তারপর কেরামতের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে একই স্বরে জানতে চায়, 'ও, সেই বৌয়ের সাথে তোমার তালাক হয়া গেছে না? তোমাগোরে জাতেত তো আবার মুখের কথাতই তালাক, মুখের কথাতই লিকা।'

জাত তোলায় লীগের কর্মীদের রাগ করার কথা। কিন্তু কাদের ভায়ের কাছে এই লোকটার সাত খুন মাফ। তবে বিরক্ত হয়েছে সবাই। বৈকুণ্ঠ তার শ্বশুরবাড়ির কথা বলায় কেরামত আলিও ভুরু কোঁচকায়। সে নিজেই এবার সবার কাছে নিজের পরিচয় নিবেদন করে, 'জে, আমার নাম কেরামত আলি, নিবাস পুবে, যমুনার পশ্চিমে, গাঁয়ের নাম আতামারি!'

কে যেন বলে, 'আতামারি? চরের মানুষ?'

'জে না। আমরা কায়েমি জায়গার মানুষ ছিলাম। আকালের সময় আমাদের এলাকার মানুষ সব মরলো, দশ আনা মানুষই শ্যাষ হলো। আকালে মানুষ খালো তো ফাঁকা গাঁওখান গিললো যমুনা। আমাকে চরুয়া বলে হেলা করবেন না। মান্যজনের নিকট এই আমার নিবেদন।'

তার হাত জোড় করে কথা বলা দেখে সবাই হাসে। সবচেয়ে বেশি হাসে বৈকুণ্ঠ, কেরামত আলির যাবতীয় কৃতিত্বে সে গর্বিত। বলে, 'যি সি মানুষ লয়, ফকির চেরাগ আলির সাগরেদ। নামেই চেনা যায়, গুরুর নাম চেরাগ আলি, শিষ্য হলো কেরামত আলি। শিষ্য এখন লিজেই ফকির হয়া দ্যাশ জুড়া গান কর‍্যা বেড়ায়।'

'জে না। আমরা ফকির নই। ফকিরি গান করি না। আমরা গান বান্দি, নিজে গান বান্দি, নিজে গান লেখি, হাটে হাটে গান করি, গানের বই বেচি।'

কাদের বলে, 'গান লেখো? বাঃ গানের বই আছে তোমার?'

'জে। চারখান বই আমার বাজারে চালু। তবে উপস্থিত নাই, বই তো মজুত রাখবার পারি না। পাইকাররা একেক হাটে পঞ্চাশ ষাটখান বই লিয়া যায়। আপনাদের বাপমায়ের দোয়ায় আর তেনার রহমতে বই আমার পড়ে থাকে না।'

'ভালো ভালো।' কাদের এই কবিকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে চায়, 'ভালো। কাল বিকালে আসো তোমার গান শোনা হবে। ভালো হলে পাকিস্তানের দাবি লিয়া একটা গান লেখায়া নেবো। দেখি ইসমাইল সাহেবকে দিয়ে তোমার গান তেমন হলে নাহয় ছাপাবার বন্দোবস্ত করা যাবে।'

আলিমুদ্দিন মাস্টার অনুরোধ করে, 'এখন একটা গান শোনাও তো দেখি।'

আলিম মাস্টারের এই নির্দেশ কাদেরের কাছে অনধিকারচর্চা মনে হলেও তার পক্ষে প্রতিবাদ করাও মুশকিল। লোকটিকে তার পছন্দ হলেও নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে তাকে জোরে হুকুম দিতে হয়, 'কও। দুই লাইন শুনি।'

বৈকুণ্ঠ উৎসাহ দেয়, 'গাও, ওইটা গাও। হামাক শোনালা না? ওইটা গাও।'

কেরামত আলি চাদরের নিচে একটা ঝোলায় হাত ঢুকিয়ে পৃষ্ঠা চারেকের রোগা একটা ছাপানো বই বের করে চোখের সামনে মেলে ধরে মাথা ঝাঁকিয়ে বাবরি চুল পেছনে ঠেলে দেয়। তারপর গুণগুণ করে,

> বিসমিল্লা বলিয়া শুরু করে কেরামত।
> ভারতবাসীর উপরে আল্লা কর রহমত– শুন সব্বজনে
> শুন সব্বজনে শুর্ধ মনে হিন্দু মোসলমান।
> সোনার বাঙলার চাষীর দুক্ষে ফাড়িবে পরাণ– রক্ত করি জল
> রক্ত করি জল সোনার ফসল চাষা ফলায় মাঠে।
> অনাহারে উপর্বাসে জেবন তাহার কাটে॥

'চাষার গান?' গান থামিয়ে কাদের বলে, 'বাঃ বাঃ। কাল তুমি একবার আসো। দেখি তোমাক দিয়া ভালো একটা গান লেখানো যায় কি-না।' হাই তুলতে তুলতে বলে, 'রাত হলো। কামের কাম কিছুই হলো না।' কর্মীদের বলে, 'তোমরা কাল সকাল সকাল আসো, সন্ধার আগেই আসো। রাত হলে এর গানও শোনা যাবে। না কি কও হে কবি?' এসব কথায় কেরামতের গানের প্রতি তার অনুরাগ বা উদাসীনতা কিছুই বোঝা যায় না। কেরামত আলি গাইতে শুরু করতে না করতেই তাকে থামিয়ে দিয়ে আলিম মাস্টারের নির্দেশটি অকার্যকর করার তৃপ্তিতে খালি পেটের দরুন ঢেকুর তুলতে না পেরে সে আরেকবার সশব্দ ও লম্বা হাই তোলে।

গানটি ভালোভাবে গাইতে না পারলেও এরই মধ্যে কেরামতের বাবরি চুলের ওঠানামা সবচেয়ে বেশি মনোযোগ পেয়েছে তমিজের। এক লাইনে কেরামত তার বাবরি চুল মাথার এক ঝাঁকুনিতে নিয়ে আসে সামনে, চোখমুখ ঢেকে তার মুখ অন্ধকার হয়ে যায় এবং পরের লাইনে এসে আরেকটি ঝাঁকিতে মেঘ কাটালে হ্যাজাকের আলোয় জ্বলজ্বল করে তার চোখ দুটি। বাবরিতে কী যে আছে যে একেকটা ঝাঁকির সঙ্গে চুলগুলো একেবারে ফুঁসে ফুঁসে ওঠে। মাত্র কয়েকটা কথাই সে গাইলো, তার গান শোনার পিপাসায় তমিজের বুকটা খাঁ খাঁ করতে থাকে। গানের সব কথা সে ধরতে পারে নি। গায়কের চুলের ঢেউ খেলানোর দিকে বেশি মন দেওয়ায় গানের কথার অনেকটাই তার কান পিছলে গেছে। কিন্তু এর মধ্যেই কানের ভেতরে ঢোকা কথাগুলো তার মাথায় কুটকুট করে কামড়ায়। আরো শুনতে পারলে কামড়ানিটা হয়তো সারতো।

ধান যে তমিজের আরেকটু প্রাপ্য, অন্তত বিলের পানি ও কামলা বাবদ তার কাছ থেকে বেশিই নেওয়া হয়েছে, আবদুল কাদের এটা মানে।—'তোর কথা ন্যায্য। কিন্তু ভাইজান বাগড়া দিবি।'

সপ্তাহের ছয়টা দিনই তো ভাইজান বাড়ি থাকে না, কিন্তু কাদের কিছু করতে পারলো না। ভাইজান নাই, আছে ভাবি। আবদুল কাদেরের সমস্যাটা তমিজ বোঝে। আবদুল আজিজের শ্বশুরবাড়ি তো টাউনের কাছে, টাউনবন্দরের মানুষকে তমিজের চেনা আছে। ভাবিজানের হাতটা একটু খাটো। আবার বড়ো বেটা না থাকলে বর্গাদার কি কামলাপাটকে দেওয়া থোওয়ার ব্যাপারে বেটার বৌয়ের কথা মণ্ডল খুব শোনে। বড়োবিবি তার হাজারটা ব্যাপার নিয়ে রাতদিন যতোই ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান করুক, শরাফত শেষপর্যন্ত সায় দেয় বেটার বৌয়ের কথায়। এমন কি ছোটোবিবির মিহি গলার তেরছা কথায় মণ্ডল দিনমান যতোই ভিজুক আর নিজে রাত্রিবেলা তকে যতোই ভিজিয়ে দিক, ধানের হিসাবে নিকাশে তার কথার দাম নাই। ছোটোবিবিকে বলেও তমিজের তাই সুবিধা হলো না।

তো কী আর করে, তমিজ নিজেই একদিন আল্লা ভরসা করে মণ্ডলবাড়ি গিয়ে কাদেরের সামনে শরাফতের কাছে কাকুবাকু শুরু করে। শরাফত সরাসরি না করে দেয়, 'কাদের তো লিত্যি তোর কথা কচ্ছে। জাহেল মাঝি, হিসাব বুঝিস না। হিসাব কর‍্যা দেখলে ধান তোক বেশি দেওয়া হছে। আর কাদের, তুমি একজন শিক্ষিত ছেলে হয়া এই সোজা হিসাবটা বোঝো না?'

তমিজের হয়ে কাদের বাপের সঙ্গে কথা বলেছে মোটে একবার। শরাফত বাড়িয়ে বললো, কাদেরের সম্মানটা এতে বাড়লো তমিজের কাছে, এই অতিরিক্ত সম্মানপ্রাপ্তির জোরে বুক ফুলিয়ে সে বাপকে বলে, 'বাপজান, পানি বাবদ খরচটা ধরেন কীভাবে? আর কামলার খরচ যা ধরিছেন— ।'

'মাগনা কোনো কিছু পাওয়া ভালো লয় বাপু। তুমি পানি সেচবা, পানিটা কার সেটা হিসাব করবা না? বিল কি হামি পয়সা দিয়া ইজারা লেই নাই?'

কাদের জবাব না দিলে পানির ব্যাপারটা ফয়সালা হয়ে গেছে ধরে নিয়ে মণ্ডল আসে কামলার প্রসঙ্গে, 'তোমরাই না মিটিং কর‍্যা কামলা কিষাণের কথা কও? কোরান হাদিসের কথা, মজুরের গায়ের ঘাম শুকাবার আগে তার পাওনা মিটায়া দাও। এখন তুমি কামলাক পয়সা দিবার মানা করো কোন বুদ্ধিতে?'

'না না, বাপজান, কথা তো সেটা নয়।' কিন্তু কথাটা যে কী তা বলতেও তার একটু দেরিই হয়। শেষপর্যন্ত অবশ্য বলতে পারে, 'ধান কাটার সময় তমিজের বাপ যখন আছিলো তখন আর কামলা নেওয়ার দরকার কী? তারপর ধরেন তমিজের বাড়িত যদি ধান ক্যাটা লিয়া আসা যায় তো ওর বাপ আছে, ওর সৎমা আছে— ।'

'ওই জমির ধান ওরা বাপবেটা কাটলে এক সপ্তাহের কমে পারে না। ধান যেমন পাকিছিলো, অতোদিনে মেলা ধান নষ্ট হতো। বেশি কামলা দেওয়া লাগলো তাই।' এ ব্যাপারটিরও ফয়সালা হলো, সুতরাং শরাফত তোলে পরের প্রশ্নটি, 'আর তমিজের বাড়িত ধান লিয়া গেলে সব ধানই লষ্ট হয়। তমিজের বাপ তো একটা আবোর মানুষ, আবার শয়তানের একশেষ, আর বৌটা ফকিরের বেটি; ধানের অরা বোঝে কী?

হুরমতুল্লার বেটি কও, বৌ কও, হুরমতুল্লার লিজের কথাও কওয়া লাগে, সোগলি ফসলের কামই করে। ওই বাড়িত না লিলে এতো ধান বার হয়?' কাদেরকে কিছুক্ষণ কথা বলার সুযোগ দিতে শরাফত চুপ করে, তা সুযোগের সদ্ব্যবহার সে না করলে শরাফত ধীরেসুস্থে জানায়, 'হাজার হলেও তমিজ হলো মাঝির বেটা। আর কয়েকটা বছর চাষবাসের কাম করুক, তখন লিজেই সব বুঝবি। তা তুমি এই চ্যাংড়াটাক বুঝবার দাও, অর সাথে তোমার লাফ পাড়লে চলে?'

লাফ পাড়ার সময়ও কাদেরের নাই। পোড়াদহ মাঠে সন্ন্যাসী মেলার আয়োজন শুরু হয়েছে, সেখানে মানুষ আসছে নানা জায়গা থেকে। ইসমাইল সাহেব আজ টমটমে শিমুলতলা যাবে, যাবার পথে পোড়দহ মাঠে ঘণ্টাখানেক বসে লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে। গোলাবাড়ি থেকে তার সঙ্গে আসবে কাদের। ইসমাইল যাবে শ্বশুরবাড়ি, কিন্তু তার আসল কাজ হলো ওই বাড়ির প্রজা পার্টির সাপোর্টারদের লীগে ভেড়াবার চেষ্টা করা। শিমুলতলার মিয়াবাড়ি হাত করতে না পারলে ওদিকে ছোটোবড়ো কোনো ঘর থেকে একটা ভোটও পাওয়া যাবে না।

আবদুল কাদের চলে গেলে তমিজ একেবারে চুপ মেরে গেলো। শরাফত চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে দেখে তমিজের হঠাৎ ভয় হয়, মণ্ডলের সঙ্গে তার জীবনে আর কথা বলার সুযোগ হবে না। মণ্ডলের পায়ের কাছে বসে সে হঠাৎ বলে, 'ওই জমিত হামি পিঁয়াজ করবার হাউস করছিলাম।'

'এই খন্দটা হুরমতুল্লা করুক।' শরাফত সোজাসুজি বলে, 'তুই বাপু আগে হালগোরু কর।' তার কাজের প্রশংসাও করে শরাফত, সে মেহনত করতে জানে, আল্লা তার পুরস্কারও দেয়। কিন্তু নিজের হালগোরু ছাড়া জমি বর্গা নিলে নানারকম ক্যাচাল হয়, দুই পক্ষেই সন্দেহ করে, তার প্রাপ্য ঠিক পাওয়া গেলো না।—মণ্ডল রাগ করে না, ধমক দেয় না, গালাগালি করে না, মুখও খারাপ করে না। নাতির মৃত্যুর পর সে বরং আরো নরম হয়েছে, নাতির চেহলামের পর কথাবার্তায় সবার সঙ্গে সে খুব বিনীত। কিন্তু তার স্বভাব ও ব্যবহারের বদল হয় আর তমিজের সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়ে, তমিজ এখন তার দিকে ভালো করে তাকাতেও পারে না।

তবে তমিজের একটা ব্যবস্থা সে করে দেয়, 'তুই না হয় ওই জমিত বছরকামলা খাট। বিলের ওইপারে তো হুরমতুল্লা হামার মেলা জমি করিচ্ছে, কাম তোর একটা না একটা হবিই। পিঁয়াজ রসুনের আবাদ করবার চাস, তো কর। মানা করিচ্ছে কেটা? হুরমতুল্লার সাথে থাকলে কামও শিখবার পারবু।'

শরাফত মণ্ডলের এই নতুন বন্দোবস্তের কথা শুনে তমিজ একেবারে বসেই পড়ে, ধ্বসেও পড়ে বলা যায়। শরাফত সেটা আঁচ করে গলার আওয়াজ কমিয়ে গোপন কথা বলার ভঙ্গি করে, 'তুই থাকিস তো খন্দ উঠলে হুরমতুল্লা টাল্টিবাল্টি করবার পারবি না। আর বেটিটা তো শুনি জমিতই পড়্যা থাকে, ধামা ধামা পিয়াজ রসুন সরালে ধরবি কেটা?'

প্রায় টলতে টলতে বাড়ি ফিরলো তমিজ। বাপের ওপর, কুলসুমের ওপর ঝাল ঝাড়তে পারলে তার টলোমলোটা কমে। কিন্তু কুলসুম তখন ধানভরা মাটির হাঁড়ি তুলে দিয়েছে উনানের ওপর, ধোঁয়ার আড়ালে দেখা যায়, তার চোখমুখে গালে চিবুকে ধানের সুখ সাঁটা রয়েছে মেচেতার দাগের মতো। এক পলক সেই দাগ দেখে নিয়ে তমিজ ঢুকলো বাপের ঘরে। বাপটা তখন বাইরে থেকে ঘরে ঢুকলো একটা বেড় জাল হাতে। তার চোখে

ও দাড়িতে খুশির ছটা, উঠানে যেতে যেতে বলে, 'কালাম দিলো। অর বাপের আমলের জাল। কয়েক জায়গাত সুতা নাই, জোড়া দিলেই এই জালে আরেক জেবন চলবি।'

তমিজের সব ক্ষোভ আর কষ্ট চাপা পড়ে তীব্র উৎকণ্ঠায়, 'তুমি কি আবার কাৎলাহার বিলত যাচ্ছো মাছ ধরবার? মণ্ডল তোমার ঠ্যাং দুইটাই ভ্যাঙা দিবি না?'

বাপের জোড়া ঠ্যাং ভাঙার সম্ভাবনাতেই তমিজের অবসাদ কাটে, মণ্ডলের লাঠিতে বাপটা তার যদি সত্যি সত্যি পড়ে যায় তো সেই এক বাড়িতেই সে নিজেও ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে শরাফতের কবজা থেকে। আবার ওদিকে বেড় জালের ভেতর দিয়ে বাঘাড় মাছের তেজ যেন ঢুকে পড়েছে তমিজের বাপের গতরে, সেই তেজে ছোটে তার মুখ, 'কাৎলাহার বিল ছাড়া দুনিয়াত আর পানি নাই? দুনিয়ার ব্যামাক পানি কি মণ্ডলের বেটা একলাই দখল করিছে? বাঙালি নাই? যমুনা নাই? পচ্চিমমুখে করতোয়া নাই?'

একনাগাড়ে এতো কথা বলে তমিজের বাপের চোখে ঢুলুনি নামে, সেই ঢুলুনিতেও তেজ তার কমে না, 'ধান যা লিয়া আসিচ্ছু, বেচলে কয়টা মাসের খোরাক হয় রে?' তার গর্জন ক্রমে ক্রমে নেমে আসে বিড়বিড় ধ্বনিতে, 'পোড়াদহ মেলাত যদি একটা বাঘাড় তুলবার পারি তো—।' বাক্য অসমাপ্ত রেখেই একটু উঁচু গলায় জিগ্যেস করে, 'মণ্ডল তোক এবার বর্গা তো দিচ্ছে না। কামলাই খাটবু?'

মণ্ডলের পেটের খবর বাপ পায় কী করে? বুড়া গত রাত্রে কি বিলের সিথানে গিয়েছিলো? পাকুড়তলা থেকেই কি সে এতো তেজ নিয়ে এসেছে গতর ভরে? তা বুড়ার সাথে মুনসির এতো খায়খাতির তো মুনসিকে দিয়ে সে মণ্ডলের মনটা একটু ফেরাতে পারে না? রাতভর বিলের ধারে ধারে এতো হাঁটাহাঁটি করে তমিজের বাপের ফায়দাটা হলো কী? বর্গা জমিটা তার বেহাত হয়ে গেলো, বুড়া কি মুনসিকে খবরটা জানাতে পারে না?—শূন্য জমি যে দিনরাত তমিজের জন্যে আহাজারি করছে, মুনসি কি তার কিছুই শুনতে পারে না? জমির নিশ্বাসে কি মুনসি এতোটুকু সাড়া দিতে পারে না? তো সে কিসের মুনসি?

দুপুরবেলা নিজগিরিরডাঙায় মোষের দিঘির পাশের সেই ধান-কাটা জমি গা এলিয়ে দিব্যি উদাম গা পোহায়। পাশে হুরমতুল্লার মরিচখেতের সবুজ ও লাল আভায় এই জমির গা কি একটুও কাঁপে না? ছটফট করে বরং তমিজ। হুরমতুল্লাকে হাতে পায়ে ধরে মণ্ডলকে বলিয়ে তমিজ কি এবারের মতো, শুধু এবারের মতো হালগোরু ছাড়া জমিটা বর্গা পেতে পারে না?

কিন্তু হুরমতুল্লার বাড়িতে লোকজন কোথায়? শুকনা কলাপাতার পর্দার বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তমিজ অনেকক্ষণ পর শুনতে পায় শিশুকণ্ঠের কোঁকানি। গলা খাঁকারি দিয়ে সে ভেতরে ঢুকলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ফুলজান। ছেলেটির গলা থেকে ক্ষীণ কোঁকানি বেরিয়ে বাড়িটিতে আরোপ করেছে ধূ ধূ করা মাঠের ছন্দ। হুরমতুল্লাকে তমিজের খুব দরকার,—এই ব্যাপারটি আড়ালে পড়ে যায়। তমিজের বুক ধুক ধুক করে, বাড়িতে আর কেউ নাই?

'মাঝির বেটা, ছোল হামার বুঝি আর বাঁচে না গো?'

তার এই উৎকণ্ঠায় সাড়া না দিয়ে কিংবা ভালো করে সাড়া দেওয়ার প্রস্তুতি নিতে তমিজ জিগ্যেস করে, 'তোমার বাপ কোটে? নবিতন কোটে? মাও?'

'বাজান গেলো মণ্ডলবাড়িত। বাজান মনে হয় বিল পার হয়ই নাই, ছোলের হামার

বমি আরম্ভ হলো। বমি এখন থামিছে, সখন থ্যাকা খালি ক্যামা কোঁকাচ্ছে। লাকোত লিশ্বাস মনে হয় নাই।'

নিশ্বাসবিহীন প্রাণীর পক্ষে কোঁকানো সম্ভব নয়, শিশুটির জীবন সম্বন্ধে তমিজ নিশ্চিন্ত। শূন্য রান্নাঘর ও শূন্য উঠানের দিকে দেখে তমিজ শিশুটিকে ঘাড় ঝুঁকিয়ে দেখে, কপালে হাত দেয়, গালে হাত বুলায় এবং প্রায় ডাক্তারেদের মতো করে বলে, 'না। ভালো হয়া যাবি। চ্যাংড়াপ্যাংড়ার বমি ওংকা হয়ই। তোমার মাও কোটে? নবিতন বাড়িত নাই?'

'হামার বড়োমামু আসিছিলো, মায়েক লিয়া গেলো, সাথে গেলো নবিতন আর ফালানি।' তার ছেলে সম্বন্ধে তমিজের বিজ্ঞ বিজ্ঞ কথায় ফুলজান হয়তো আশ্বস্ত হয়েছে, 'নাইওর লিয়া গেলো। দুইদিন বাদে পোড়াদহের মেলা লয়? মামু কয়, তোমার জামাই তো আর আসবি না। ফুলজানের বাপ হামাগোরে বুড়া জামাই, তাকই লিবার আসিছি।'

পোড়াদহের মেলা উপলক্ষে একজন প্রবীণ জামাইয়ের শ্বশুরবাড়িতে আমন্ত্রিত হবার খবরে তমিজ কিন্তু হাসে না। কিন্তু অস্পষ্ট খুশির ঝিলিক ওঠে ফুলজানের ঠোঁটে, এই আবছা হাসির হালকা টোকায় বিমারি বেটার জন্যে জমে-ওঠা অশ্রু ফুটে ওঠে গোল বিন্দুতে এবং তমিজ একটু লাই পায়, 'পোড়াদহের মেলা পাড়ি দিয়া আসবি? তুমি যাও নাই যে?'

এই রুগ্ন ছেলেকে নিয়ে ফুলজান যেতে পারে নি, তাকে একা রেখে বাপজানই বা যায় কী করে? এইসব জানাতে জানাতে ফুলজানের অশ্রু বিন্দুটি গড়িয়ে পড়ে গালে, কিন্তু শুকিয়ে যায় না। বাড়িতে ফুলজান আর তার ছেলে ছাড়া আর কেউ নাই, এটা জানার পর বাড়ির নির্জনতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হলে শুরু হয় তমিজের নতুন উদ্বেগ : এই নির্জনতা কি তাকে কোনো সুযোগ নেওয়ার দায়িত্ব চাপিয়ে দিলো?—এই বাড়িতে তার আবার দায়িত্ব কী? এখন কী করবে তমিজ? হুরমতুল্লা তার জমি হাতিয়ে নিচ্ছে, ফুলজানকে বলে লাভ কী? তা হলে? ফুলজানকে কিছু একটা বলতে তো হবে। কী বলবে?—এই দমবন্ধ দশা থেকে তাকে বাঁচায় ফুলজানের বেটা, হঠাৎ সে বমি করে ফেলে মায়ের কোলেই। তার বমি নিঃশব্দ, যেন তরল কিছু জিনিস মুখ থেকে ফেলে দিলো আলগোছে। তারপর মাথাটা এলিয়ে দিলো মায়ের কোলে, যেন বাঁচার জন্যে চেষ্টা করার শক্তিই তার নাই।

'বেহুঁশ হয়া গেলো? দেখি দেখি!' বলতে বলতে ছেলেটিকে নিজের কোলে তুলে নেয় তমিজ। ফুলজানের বেটার বেঢপ পেট আরো ফুলে উঠেছে, চোখজোড়া বুঁজে গেলেও দুই চোখের পাতায় একটু ফাঁক রয়েই গেছে, চোখ বন্ধ করার ক্ষমতাও তার লোপ পেয়েছে। তার গালের কালচে হলুদ রঙ আরো গাঢ় হয়েছে, পাটের আঁশের মতো চুল সব মাথার খুলির সঙ্গে লেপটানো। তমিজ ওই বমির লালা লাগা গালে গাঢ় একটি চুমু খায়। গাল বেশ গরম, তমিজের ঠোঁটে যেন ছ্যাকা লাগে। তার গরম নিশ্বাসে তমিজের মাথার জট কাটে, ফুলজানের বিলাপের জবাবে সে ধকম দিয়ে বলে, 'ছোলের জ্বর উঠিচ্ছে, মাথাত পানি ঢালা লাগবি, ভাণ্ড দে। বদনা লিয়া আয়।'

ফুলজান বড়ো মালসা আর কলসিভরা পানি আর বদনা নিয়ে এলে ছেলেটিকে কোলে নিয়ে তমিজ বসে মাটিতে। ফুলজান কিছুক্ষণ তার মাথায় পানির ধারা দেওয়ার পর ছেলেটি চোখ মেলে কাঁদতে শুরু করলে তমিজের ইশারায় ফুলজান তার মাথায়

পানি ঢালতেই থাকে। কলসির পানি শেষ হলে তমিজের ইশারাতেই পানি ঢালা সে বন্ধ করে এবং তার মাথা মুছে দেয় আঁচল দিয়ে। তমিজ নিজেই তাকে মাচার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বেশ ভারী গলায় বলে, 'জ্বর কমিছে। কালই ডাক্তারের কাছ লিয়া যামু। ব্যায়না মেলা করা লাগবি।'

ফুলজানের বেটা বোধহয় এখন একটু আরাম পাচ্ছে, কিংবা খুব দুর্বল হয়ে গেছে বলেও হতে পারে, কিছুক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করে ঘুমিয়ে পড়ে। তমিজ হুকুম ছড়ে, 'ছোলের জাড় করিচ্ছে, বুঝিস না? তোক একখান এ্যাপার দিছিনু, সেটা কোটে?' র‍্যাপার কথাটির শুদ্ধ বা অশুদ্ধ কোনো রূপের সঙ্গেই পরিচিত না থাকায় কিংবা সেটা হয়তো নবিতন নিয়ে গেছে মামাবাড়িতে সে জন্যেও হতে পারে, বেটার গায়ে সে বিছিয়ে দেয় নবিতনের ফুল-তোলা একটা কাঁথা। কাঁথা জুড়ে ছড়ানো ছোটো ছোটো ফুল তমিজ দেখছে, এমন সময় ডুকরে কেঁদে ওঠে ফুলজান, 'একটা ওষুদ লয়, পানি-পড়া লয়, ছোল হামার এমনি এমনি মরে? কেউ দেখলো না!'

'কান্দিস কিসক?' তমিজ হঠাৎ তাকে ধমক দিয়ে ওঠে, 'কান্দনের কী হলো? বাপের বাড়িত বান্দি হয়া আছু, বেটার চিকিচ্ছা করবু ক্যাংকা কর্যা?' তমিজের এই সান্ত্বনা-কাম-ধমকে ফুলজান ফোঁপানো ছেড়ে ডুকরে কাঁদতে শুরু করে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'হামার কপাল মন্দ। হামার নসিব মন্দ। ছোলের বাপ থ্যাকাও নাই। একটা দিন খবর লেয় না মরলো কি বাঁচলো!'

'তোর সোয়ামির কথা কোস? সোয়ামি তোর আছেই? আরে তাঁই তো গান কর্যা বেড়ায়, তুই খপর আখিস না? আজ এই হাট কাল ওই হাট করিচ্চে, এটি আসে নাই?'

ফের ফোঁপানিতে ফিরে এসে ফুলজান এবার কান্না থামায়। 'কেটা কলো? মিছা কথা কও কিসক?' ফুলজান কেরামতের খবর জানে এটা অনুমান করতে তমিজের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে ফুলজানের এই ছোট্টো ভাণটুকু ভারী মিষ্টি। বেশ আত্মবিশ্বাসী কিসিমের একটা খুচরা হাসি ছেড়ে তমিজ বলে, 'মিছা কথা কয়া হামার লাভ? আরে কালই তো গোলাবাড়ি হাটোত দেখা, তোমার কথা কয়, ওই বিয়া তো হামার তালাক হয়া গেছে। হামি কনু, বেটাক তো আর তালাক দিবার পারো না। বেটার তোমার কঠিন ব্যারাম, দেখবার যাবা না? তো চুপ কর্যা থাকে। হাটের মধ্যে সোগলির সামানেই কথা হলো!'

তমিজের দিকে চোখ বড়ো করে তাকিয়ে ফুলজান মাথা নিচু করলে ওই চোখ দিয়ে তার পানি পড়ে টপটপ করে। তমিজ তৎপর হয়ে দুই হাতে ফুলজানের চোখের পানি মোছে, মুছেই চলে। চোখের পানি এরকম পড়তেই থাকলে সে আর হাত সরায় কী করে? হাত ওভাবে রেখেই বলে, 'সারাটা জেবন তুই বান্দিগিরিই করবু? তোর বিয়া বসা লাগবি না?' ফুলজান দ্বিগুণ বেগে কাঁদতে শুরু করলে তমিজ তার গোটা মাথাটাকেই চেপে ধরে নিজের বুকে, তারপর চুমু খেতে থাকে তার নোনতা গালে ও নোনতা চোখে, এমন কি তার ঘ্যাগ হয়ে বুক পর্যন্ত। চুমুর এমন প্রবল বর্ষণে ফুলজানের শরীর এলিয়ে পড়ে মাচার ওপর তার ছেলের গা ঘেঁষে। 'তোর বেটা তো হামারও বেটাই হবি, তখন তার দ্যাখশোন হামিই করমু।' কাঁপতে কাঁপতে তমিজ বলে এবং নিজের কথায় তার নিজের শরীরের কাঁপুনি আরো বাড়ে। কাঁপুনি ঠেকাতেই তাকে শুয়ে পড়তে হয় ফুলজানকে জড়িয়ে ধরে।

ফুলজান তাকে ঠেকাতে একটু চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত পারে না, সে নিজেও খুব কাঁপছিলো। তার বেটার ঘুম ভেঙে যায়, সে কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদে। ফুলজানের সারা শরীর জুড়ে তখন মাঝির বেটার গতরের দাপাদাপি; তার নাক তো বটেই, তার চোখ, কান, মুখ, গলা, ঘ্যাগ, বুক, পেট, উরু, পা ও পায়ের পাতা, পিঠ, পাছা প্রভৃতি অঙ্গে মাঝির বেটার গতরের আঁশটে গন্ধ।

তমিজ উঠে দাঁড়ালেও ফুলজান শুয়ে শুয়েই ছেলেকে টেনে নেয় বুকের ভেতর। তমিজ বলে, 'তোর বাপোক কই? আজই কই?' তমিজ জানে কাজটা একটু কঠিন। অথচ বুড়া পরামাণিক বোঝে না, তাকে জামাই করলে হুরমতুল্লার সব জমিতে সে যে খন্দটা তুলবে বুড়া জীবনে তা স্বপ্নেও দেখে নি।

বাইরে শোনা যায় হুরমতুল্লার কাশির আওয়াজ। কাশতে কাশতেই সে গোরুর পেট এতো বেলা পর্যন্ত খালি কেন তার কৈফিয়ৎ তলব করছিলো মেয়ের কাছে। তমিজ তাড়াতাড়ি উঠানে নামে এবং হুরমতুল্লাকে প্রায় অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে যায় শুকনা কলাপাতার পর্দা পর্যন্ত।

'ক্যা গো, তুমি আসিছো? হামি বলে কতোক্ষণ ধর্যা তোমার জন্যে দেরি করিছি।' তমিজের গলা শুকনা, কিন্তু খামাখা উঁচু গলায় কথা বলায় সেখানে খরার দুপুরবেলার গরম হাওয়া বয়।

'মণ্ডল ছাড়বার চায় না, দেরি হয়া গেলো।' হুরমতুল্লা বলতেই তমিজ জিগ্যেস করে, 'জমির বন্দোবস্ত লিবার জন্যে মণ্ডলের পাও ধরবার গেছিলা, না?'

'হামি যামু কিসক? মণ্ডলই হামাক ডাকিছে। মণ্ডল ধরিছে, ওই জমি এবার বর্গা করাই লাগবি। এখন জোতদারে একটা কথা কলে তো আর ফালাবার পারি না।' প্রসঙ্গ পাল্টাতে ভেতরের দিকে তাকিয়ে অতিরিক্ত জোরে বলে ওঠে, 'ক্যা রে ফুলজান মরিছু? এঁড়াটার প্যাট ওঠে নাই কিসক?'

বেটা কোলে ফুলজান বেরিয়ে এসে বলে, 'ছোল হামার মরবার ধরিছিলো।' আর কোনো ব্যাখ্যা কি গোরুর প্রতি অবহেলার জন্যে কৈফিয়ৎ দেওয়ার কোনো চেষ্টাই সে করে না।

তমিজ ফুলজানকে অকারণে উঁচু গলায় হুকুম দেয়, 'কাল ডাক্তারের কাছে যাওয়া লাগবি কলাম। ব্যায়না ব্যায়না মেলা না করলে ডাক্তারের সাথে দেখা হবি না।'

নিজের মেয়ে ও তমিজের এরকম ঠাস ঠাস কথায় হুরমতুল্লা একটু ধান্দায় পড়ে। উঠানে হাঁটু ভেঙে বসে সে তমিজকে বলে, 'তুই না হয় তোর ভিটার সাথেকার জমিটার কথা ক। মণ্ডলের হাতেপায়ে ধরলে ওই জমিটা তোক বর্গা দিবার পারে।'

'মণ্ডলের পায়েত পড়ার হামার দরকার নাই। মণ্ডল হামাক বস্যা খাওয়াবি?'

হুরমতুল্লা নরম হয়ে পড়ে, 'তা বাপু হালগোরু না থাকলে জমি বর্গা করার ক্যাচাল কম লয়। মণ্ডল কলো, তোক বলে হামার সাথে কামলা খাটবার দিবি। হামার তো মানুষ লাগে না। হামার বেটিগুলাই—'

এবারে দপ করে জ্বলে ওঠে তমিজ, 'উগলান ফন্দি ছাড়ো বুড়ার বেটা। গিরস্থের ঘরের বৌ বেটি জমির মধ্যে গতর খাটায় এটা খুব ভালো কথা হলো? বেটিক তুমি আর জমিত খাটাবার পারবা না কয়া দিলাম।'

হনহন করে হেঁটে বিলের কাছাকাছি এসে তমিজ ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় উত্তরের

দিকে। বিলের সিথান এখান থেকে দূরে নয়, মোষের দিঘি ঘুরে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগোলে কাছেই পড়ে। ওইখানে পাকুড়গাছ থেকে মুনসি গোটা বিল নিয়ে আসে তার হাতের বেড় জালের ভেতর। বিলের গজার মাছগুলোকে ভেড়ার আদল দিলে তামাম রাত ধরে হাবুডুবু খেতে খেতে সাঁতার কাটে তারা, ভোর হওয়ার আগে আগে তাদের নিজেদের সুরত ফিরিয়ে দিলে দিনমান তারা পাহারা দেয় পানির অনেক নিচে। তাদের চোখে চোখে বড়ো হয় রুই কাৎলা, শোল, শিঙিমাগুর, ট্যাংরা পাবদা, খলসে পুঁটি। মুনসি তখন কী করে গো? বিলের শিওরে পাকুড়গছের মগডালে শকুনের চোখের মণি হয়ে ছুঁচলো চোখে সে সুরুজের আকাশ পাড়ি দেওয়া দেখবে, দেখতে দেখতে রোদের মধ্যে রোদ হয়ে বিলের পানিতে শুয়ে ওম দেবে বিলের গজার আর রুই কাৎলা আর শোল আর শিঙিমাগুর আর কৈ আর পাবদা ট্যাংরা আর খলসে পুঁটির হিম শরীরে। আর? আর কী করবে? হয়রান হয়ে পড়লে পাকুড়গাছের ডালে ঘন পাতার আড়ালে হরিয়াল পাখির ডানার নিচে লোমের ভেতর ছোটো লোম হয়ে পাখির নরম মাংসের ওমে টানা ঘুম দেবে একেবারে সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত।

তা মুনসির কি এখন দিনের পর দিন ধরে ঘুমের আসর চলছে? মণ্ডলের বছর কামলার মতো সে কি মাসকাবারি ঘুমের চুক্তি নিলো নাকি গো? তমিজের একবার জেদ হয়, হেঁটে হেঁটে এখনি সে চলে যায় পাকুড়তলার দিকে। পাকুড়গাছে জোরেসোরে ঝাঁকুনি দিয়ে মুনসির মরণের ঘুমটা ভাঙিয়ে দেয়। মোষের দিঘি পেরিয়ে সত্যি সত্যি ঝোপঝাড় জঙ্গল পেরিয়ে সে পাকুড়গাছ খুঁজতে লাগলো। এতো গাছ, বড়ো ছোটো এতো গাছ, গাছের ওপারে, জঙ্গলের ওপারে কাশবন। কাশবন পর্যন্ত এসেও সে পাকুড়গাছ আর সনাক্ত করতে পারে না। তখন তার গা শিরশির করে। গা ছমছম করে। নাঃ। সে বেশ হাপসে যায়। কিন্তু তমিজ পাকুড়গাছ চিনতে পারবে না, তা কী করে হয়? সে ফের এদিক ওদিক তাকায়। পাকুড়গাছ তা হলে কোনদিকে?

২২

'তোর জন্যে দেরি করবার পারনু না রে তমিজ। বেল গেছে কুটি, তোর বাড়িত আসার সময় হলো এখন?'

কথা বললে বৈকুণ্ঠের মুখের সামনে চিবানো মুড়ির কুয়াশা ওঠে। ধুতির কোঁচড় থেকে হাতের মস্ত মুঠি ভরে সে মুড়ি তোলে, মুখের ভেতরে মুড়ি ফেলতে ফেলতেও কথা বলা তার থামে না, কথা বলতে বলতেই মাটির ওপর কলাপাতায় রাখা গুড়ের টুকরা তুলে নেয় ডান হাতে।

ডোবার উরুপানিতে কোনোমতে একটা ডুব দিয়ে তমিজ ভেতরের বারান্দায় কেরামতের পাশে বসে আড়চোখে তাকায় বৈকুণ্ঠের দিকে : কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত

মুড়ি ভাজছিলো কুলসুম, শালা গিরির বেটা এসেছে সেগুলোর সদগতি করতে। আবার তার পাশেই কেরামত আলি; তমিজের বাপ তার পাতে থাবা থাবা ভাত তুলে দিচ্ছে হাঁড়ি থেকে। এতো ভাত! এতো মুড়ি!–তার জমির ধানটা তো মনে হয় এরাই শেষ করবে। ওদিকে তমিজের বাপের মুখ তো বন্ধই, পাতের কোণে খলসে মাছের দিকে নজর দিয়েই সানকি সানকি ভাত সে উজাড় করে ফেলবে। এরকম পেটে পেটে ধামা ধামা চাল চালান হয়ে গেলে তমিজের গোরুই বা হয় কোত্থেকে, আর হালই বা সে কেনে কী করে? রাগটা সে ঝাড়ে কুলসুমের ওপর যখন সে দফায় দফায় তার পাতে ভাত তুলে দেয়, ভাতগুলো সব খেতে খেতেই তমিজ ধমকে ওঠে, 'কতো ভাত দাও গো? মানষে বলে এতো ভাত খাবার পারে?' এতে অবশ্য তমিজের বাপের কি কেরামত আলির ভাত গেলা কিংবা বৈকুণ্ঠের মুড়ি চিবানোর ব্যাঘাত ঘটে না।

খাওয়া দাওয়ার পর বৈকুণ্ঠের জর্দার নেশা-ধরা গন্ধে ছোটো বারান্দাটা আরো চাপা হয়ে আসে। এমন কি ছোটো উঠানটাও উঠে আসে ধানের তুষের গন্ধ নিয়ে। তারপর তমিজের বাপের ঘরটাও এই বারান্দায় আসন পাততে চাইলে তমিজের পা ছুঁয়ে যায় কেরামতের হাটুর সঙ্গে। তমিজের পা শিরশির করে : লোকটা কাল সকালে হুরমতের বাড়ি গিয়ে তার বৌয়ের সঙ্গে কথা বললেই তো তমিজের জলজ্যান্ত মিছা কথাগুলো সব ফাঁস হয়ে পড়বে। তারপর তমিজ ফুলজানের সামনে আর যাবে কী করে?

'এবার তুমি একটা গান ধরো বাপু! না হয় ফকিরের গানই করো।' বৈকুণ্ঠের কথার শেষ দিকটা বেরিয়ে আসে দীর্ঘশ্বাসের ভেতর দিয়ে, 'ফকির নাই! ফকিরের গান আর কুনোদিন শুনবার পারমু না গো!' তার দীর্ঘশ্বাসে পানির ঝাপটা; নোনতা হাওয়া বইয়ে দিতে দিতে সে বলে, 'সারাটা জেবন হামরা ঘুরিছি ফকিরের পাছে পাছে। আর তাঁই মরলো তোমার হাতের উপরে। ভগবানের লীলা!'

ভেতর থেকে চাপা গোঙানি বারান্দা ও বাড়ির সামনের ছোটো উঠানের নোনা বাতাসকে ভারী করে তুললে তমিজ দরজা দিয়ে উঁকি দেয় ভেতরে। সারা গায়ে কাঁথা জড়িয়ে মাচায় শুয়ে রয়েছে কুলসুম। কান্না চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টায় তার শরীর কুঁকড়ে কুঁকড়ে আসছে।

বারান্দা থেকেই বৈকুণ্ঠ বলে, 'ও কুলসুম, কান্দিস না, কান্দিস না, খায়া লে। ঠাকুদ্দা কি কারো সারা জেবন থাকে রে দিদি?' তার গলা ভারী হয়ে আসে এবং ভারী গলায় সে এবার দেয় অন্যরকম নির্দেশ, 'কান্দ্, বুক খুল্যা কান্দ্ রে দিদি, পরান ভর্যা কান্দ্। খবরটা শোনার পর থ্যাকা তো কথাই কলু না। এখন ক্যান্দা বুকটা হালকা কর। কান্দ্।'

কুলসুম বৈকুণ্ঠের কোনো নির্দেশই মানে না। সে থামেও না, আবার প্রাণ খুলে কাঁদার কোণো লক্ষণও তার নাই। তমিজের বাপ চুপচাপ হুঁকা টানে। বাইরের উঠানে রোদ পড়ে আসার সাথে ঘরে বারান্দায় শীতশীত করে। ডোবার ওপারে রাস্তায় লোকজন খুব কম। রাস্তার ওপারে ধানশূন্য মাঠ আকাশ পর্যন্ত যেতে যেতে হাপশে গিয়ে ঢুকে পড়েছে শেষ বিকালের খাপের ভেতরে। অকাশও এখন ঝাপসা।

কেরামত আলি আস্তে আস্তে বলে, 'ফকির কয়, "কেরামত, করতোয়ার পুবে ছয় কোশ পথ গেলে গোলাবাড়ি হাট, হাটের দক্ষিণে কোশখানিক হাঁটলেই গিরিরডাঙা গাঁও। হামার লাতনি থাকে, হামাক বড়ো মায়া করিছে গো। কোনোদিন যাও তো হামার খবরটা দিও।" একটু থেমে সে ফের বলে, 'তমিজের বাপের কথা কয়, "জামাই

সাধাসিধা মানুষ। গাঁয়ের মানুষ কয় আবোর, হাবা। হলে কী হয়, তার মধ্যে জিনিস আছে, ছাইচাপা আগুন।" এই বা৴ুর দম্পতি সম্বন্ধে চেরাগ আলি ফকিরের শেষ মন্তব্য জানিয়ে কেরামত মাথা নিচু করে বসে থাকে। তার এই সব কথার ঝাপটায় কুলসুমের গোঙানি পায় মিহি কান্নার গড়ন, সে একটানা কেঁদেই চলে। দাদা তো তার বহুদিন চোখের আড়ালে। সে কতোকাল হয়ে গেলো! তার ছেঁড়াখোঁড়া ওই কী ছাইয়ের বইটার গন্ধ ছাড়া তার আর কিছু ছুঁয়ে দেখার সম্ভাবনাও তো ছিলো না। সেই দাদার মরার খবর শুনে কুলসুমের নাক চোখমুখ একবারে কোঁচকালো না পর্যন্ত। খবরটা নিয়ে-আসা কেরামত আর কেরামতকে সঙ্গে নিয়ে-আসা বৈকুণ্ঠকে পেট ভরে খাওয়াবার পর ঘরের মাচায় উঠে দাদার বইয়ের গন্ধ বুক ভরে নিতে নিতে নাক ভিজে আসে, তারপর ভেজে তার চোখ। তখন নাকের জলে চোখের জলে ডুবে প্রথমে তার গলায় আসে গুনগুন ধ্বনি, বৈকুণ্ঠের কথায় সেই গুঞ্জন এখন টানা কান্নার স্রোত হয়ে বাড়ির বাইরের উঠানের ধারে বসা মানুষগুলোকে ভিজিয়ে দিতে শুরু করেছে। বৈকুণ্ঠ গলা খাঁকারি দিয়ে নিজের গলা শুকাতে চেষ্টা করে বলে, 'ফকিরের একটা গান ধরো না বাপু!'

'মরার আগে ফকির একটা গান কয়দিন খুব করলো। ভালো মনে নাই।' কেরামত দোনোমনো করলে বৈকুণ্ঠ মিনতি করে, 'মনে কর্যা গাও গো। তুমি আরম্ভ করলে হামি বাকিটা তোমাক মনে করায়া দিমু। ফকিরের ব্যামাক গানই হামি জানি।'

চেরাগ আলি ফকিরের শেষ গান মনে করার জন্যে কেরামত আলি ধ্যানে বসার মতো সোজা হয়ে বসে চোখ বন্ধ করে থাকে। তার এই ধ্যান মূর্তিতে আর তিনজনে একেবারে চুপ করে যায় এবং এই নীবরতার সুযোগে কুলসুমের একটানা কান্না চেপে বসে গোটা বাড়িতে, বাড়ির সামনের ডোবা এবং ডোবারও ওপারে রাস্তা, রাস্তা ডিঙিয়ে শেষ বিকালের ধানকাটা জমিও সেই কান্নার কবজা হয়ে একটি অখণ্ড পিণ্ডের আকার নেয়। একটু একটু ভয়ে এবং অনেক অনেক আশায় তমিজের বাপ তাকায় ওপরের দিকে : মুনসির বেড়জাল কি আজ সন্ধ্যা না লাগতেই ছড়ানো শুরু হয়ে গেলো? বিলের গজার মাছগুলো কি ভেড়া হয়ে ভাসতে ভাসতে ডাঙায় উঠে গুটিগুটি পায়ে চলে আসবে এই গিরিরডাঙা গাঁয়ে? কিন্তু তার আগেই কুলসুমের কান্নার স্বর ফুটে ওঠে কেরামত আলির গলায় :

গোল করিও না তোমরা ফকিরে ঘুমায়।
ও ও ও ও গোল করিও না তোমরা ফকিরে ঘুমায়॥

গানের সুরে তাল দিয়ে ঘরের অন্ধকার ভেতর থেকে ওঠে দোতারার টুংটাং। কেরামতের বিরল সুর এতে ছক পায়, ঘাড় ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে গায়, 'গোল করিও না তোমরা ফকিরে ঘুমায়।'

কিন্তু দোতারা বাজাচ্ছে কে? এখানে দোতারা বাজাবে কে মনে হতেই তার গলা শুকিয়ে আসে ভয়ে। বৈকুণ্ঠ তার সঙ্গে গলা মেলাচ্ছিলো, কিন্তু কেরামত থামতেই তার স্বরও থমকে পড়ে। এতে গান কিন্তু থামে না। চেরাগ আলির মোটা গলায় গান শোনা যায় ঘরের ভেতর থেকে। তমিজের বাপ ও বৈকুণ্ঠ মাথা নিচু করে থাকে, বহুকাল পর চেরাগ আলীর গলা শুনে দুজনেই চোখের পানিতে একাগ্রচিত্ত হয়। আর উসখুস করে কেরামত আলি।—চেরাগ আলি আসবে কী করে? এরা কি তার মরণের খবরটা

অবিশ্বাস করছে? কেরামত নিজেও ধন্দে পড়ে, তা হলে পাঁচবিবির উত্তরে নাজির মণ্ডলের বাড়ির পালানে সে দাফন করে এসেছে কার লাশ? সেই মানুষকে গান গাইতে শুনে কেরামতের চোখে গাঁথা হয়ে যায় পাঁচবিবি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে গাইতে গাইতে আস্তে করে বসে-পড়া চেরাগ আলি, বসতে বসতে তার গানের লয় ধীর হয়। প্ল্যাটফর্মেই শুয়ে পড়ার ঘণ্টা দুয়েক পর চেরাগ আলি মরলো, কেরামত ঠিক ওই সময়ে গিয়েছিলো ভাত খেতে। কিন্তু চেরাগ আলি মারা গেছে তার হাতের ওপর মাথা রেখে এটা বলতে বলতে এমন হয়েছে যে, কখনো ঘুমের মধ্যে নিজের ডান হাতের তালুতে তার ভার ভার ঠেকে। এটা চেরাগ আলির মাথার ভার ছাড়া আর কী? কিন্তু এখন তার হাত একেবারে খালি। কারণ ঘরের ভেতর মাচায় বসে মোটা গলায় ধীর লয়ে গান করে চলেছে চেরাগ আলি ফকির। ওটা কি চেরাগ আলি? না-কি তার নাতনি কুলসুম? কুলসুম যদি হবে তো দোতারা বাজায় কে?—এইসব খটকার খোঁচায় খোঁচায় গানের কথা, গানের সুর, লয় ও তাল আরো স্পষ্ট হতে থাকে।

ওই চারজন পুরুষমানুষের কেউ ঘরের ভেতরে তাকিয়ে এবং কেউ কেউ না তাকিয়েও ঘরের ভেতরে মাচায় চেরাগ আলির গান শুনতে পায় ঠিকই :

গোল করিও না তোমরা ফকিরে ঘুমায়।
গলা ঝাঁঝরা কোম্পানির কামানের গোলায়।
নিন্দের সোয়ারি ফকির ধীরে দাঁড় বায়।
বাবরি চুলের ছইখানি ওপরে চেরাগদানি
চেরাগে আতশ নাই নাও ডুবে যায়।
দেহ জখম কোম্পানির কামানের গোলায়।
গোল করিও না সাগরেদ ফকিরে ঘুমায়॥
রৌদ্রে ফাটে ঝাঁঝরা গলা তামাম নদীর পানি ঘোলা
আঁজলা ভরা পানি তাহার পিয়াস না মিটায়।
নিন্দের সোয়ারি ফকির ধীরে দাঁড় বায়।
গোল করিও না বান্দা ফকিরে ঘুমায়॥

গানের শেষের দিকে এসে আওয়াজ চলে যায় দূরে। বাড়ির সামনের খুলি পার হয়ে ডোবার কোমর পানিতে অল্প একটু বুদবুদ তুলে বুদবুদের টুপটাপ বোল নিজের শরীরে বরণ করে আওয়াজটি রাস্তা ডিঙিয়ে ওই বোলের সবটাই ঝেড়ে ফেলে শিশির পড়ার ফিসফিসানি মেনে নিয়ে ঢুকে পড়ে সন্ধ্যার খাপের মধ্যে এবং কুয়াশা ঝোলানো কালচে গোলাপি আসমানকে মিশমিশে কালো করে আসমানকে তো বটেই, ওই সঙ্গে নিজেকেও একেবারে আড়াল করে দেয়। বলতে কী, চেরাগ আলি ফকিরের গানের গড়িয়ে চলাতেই গিরিরডাঙায় সেদিন রাত্রি নামলো একটু আগেই।

সেই সঙ্গে ঘুম নামে তমিজের বাপের গতর জুড়ে। চেরাগ আলির গান ডোবার কোমর পানি ডিঙাবার আগেই দরজার চৌকাঠে মাথা রেখে ঘরের মেঝেতে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়েছে তমিজের বাপ। ঘুমের মধ্যে তার তমিজের মায়ের আমলের উরুর ঘা এবং কুলসুমের আমলের হাঁটুর ঘা চুলকায়, গানের স্পন্দনে চলতে থাকে তার ঘুমের মধ্যে বাইরে যাবার আয়োজন।

গানের আওয়াজ বাইরের অন্ধকার আকাশে মিশে যাবার পরপরই ঘরের মাচায় ক্যাঁচকাঁচ শব্দ শুনে তমিজ, বৈকুণ্ঠ ও কেরামত আলি ওদিকে চোখ ফেরায়। গায়ে মাথায় কাঁথা জড়ানো কুলসুম মাচার ওপরেই পাশ ফিরলো। দমক দমক কান্নার রেশ তার আর গানচাপা নাই। তবে তার ঘুমের ভেতর এই কান্নায় চেরাগ আলির গানের রেশ কানে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

গোলাবাড়ি ফেরার সময় বৈকুণ্ঠের হাঁটার তালে তালে ফকিরের গানের নেশা ঘন হতে থাকে। আর কেরামত আলির শিরশির করা গায়ে লাগে চেরাগ আলি ফকিরের চোখের ছটফটে চাউনি। গোলাবাড়ি হাটে বৈকুণ্ঠের সঙ্গে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসবার পর আলিম মাস্টারের জায়গিরবাড়ি পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে, এমন কি ওখানে পৌঁছেও সেই চাউনি থেকে তার চোখ রেহাই পায় না। কেরামতের ঘুম হয় না। ভোর হতে না হতে সে চলে যায় গোলাবাড়ি হাটে মুকুন্দ সাহার গদিতে।

বটতলায় বৈকুণ্ঠের সঙ্গে চিড়াগুড় খেতে খেতেও কেরামতের ভয় কাটে না। আস্তে আস্তে বলে, 'ফকির মনে হয় কাল নাতনির ওপর আসর করিছিলো।' সে নিশ্চিত, কুলসুম কিছুতেই ওই গলায় গাইতে পারে না। চেরাগ আলির গলা মোটা এবং একটু রুখা, মাঝে মাঝে কর্কশও বটে। কিন্তু শুনলে কিছুক্ষণের মধ্যে সারা শরীর জেগে ওঠে, মানুষ ওই গান থেকে সরে যেতে পারে না। কেরামত হাজার চেষ্টা করলেও তার মোলায়েম গলায় ওই স্বর আনতে পারে না। আর কুলসুমের গলা তো রীতিমতো মিষ্টি, তার পক্ষে কি 'গোল করিও না তোমরা ফকিরে ঘুমায়' গাইবার সময় শ্রোতাকে ওইভাবে ধমক দেওয়া সম্ভব?—চেরাগ আলি নির্ঘাৎ কাল ভর করেছিল কুলসুমের ওপর।

কিন্তু কেরামতের ধারণা নস্যাৎ করে দেয় বৈকুণ্ঠ, একটু রাগ করেই সে বলে, 'ইগলান কী কথা কও? আসর করবি কিসক? মাচার উপরে ফকিরেক হামরা দেখনু না? ফকির না আসলে দোতারা বাজালো কেটা?' কেমরামতের চোখ থেকে তবু সন্দেহ যায় না দেখে তার রাগ বাড়ে, রাগের চোটে সে এক গ্রাসে মুখে অনেকটা চিড়া ফেলে এবং শুকনা চিড়া গলায় আটকে যাওয়ার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও বলে, 'হামার চোখ এখনো লষ্ট হয় নাই, বুঝলা? তোমাগোরে জাতের যা তা খাওয়ার অভ্যাস, তোমাগোরে লাকান হামরা যা তা খাই না, বুঝলা? হামি বলে লিজের চোখে দেখনু, মাচার উপরে খ্যাতা মুড়ি দিয়া বস্যা মাথা ঝুঁকায়া ঝুঁকায়া ফকির গান করিচ্ছে। গানের মধ্যে স্বপনের কথা কলো, কিছু বুঝিছো? তোমরা হলা যমুনার মধ্যেকার চরুয়া চাষা, মুনসির বিত্তান্ত তুমি কী বুঝবা?'.

'না বোঝার কী হলো? ফকির লিজের মরার কথা আগাম কয়া গেছে। নিন্দের সোয়ারি—'।

মুখ ভরা চিড়া নিয়ে বৈকুণ্ঠ হাসে, 'বোঝা অতো সোজা লয়। শোনো ফকিরে লিজের কথা কয় না। তার লিজের কী পরের কী? কাৎলাহার বিলের চারো পাশের ব্যামাক মানুষ জানে, ওই ফকিরের খুঁটি হলো পাকুড়গাছের মুনসি। বুঝিছো?'

'তুমি ঠিক জানো?' কেরামতের এই প্রশ্নে সন্দেহের চেয়ে বরং আত্মসমর্পণের লক্ষণ দেখে বৈকুণ্ঠ মহা উৎসাহে কোঁচড়ের বাকি চিড়ার সদ্ব্যবহার করে, কলপাড়ে গিয়ে টিউবওয়েলের জল খায় আঁজলা আঁজলা এবং মুখে জোড়া পান ঢুকিয়ে জানায়, 'ইগলান কথা হামি জানি না তো জানে কোন শালা?' এরপর সে ব্যাখ্যা করে তার অধিকারের কথা।—আরে সে হলো গিরিবংশের মানুষ, তার রক্তে দশনামার এক নামা গিরির রক্ত

টগবগ করে ফুটছে। এই যে দেখো গিরিরডাঙা, নিজগিরিরডাঙা; এই যে গোলাবাড়ির হাট, পোড়াদহের মেলার মাঠ, এসব তো ছিলো তাদেরই রাজত্ব। ভবানী পাঠকের মানুষ তারা, তার হুকুমে যুদ্ধ করেছে কোম্পানির গোরাদের সঙ্গে। কোম্পানির কামানের গোলায় ভবানী পাঠক দেহ রাখলো মানাস নদীর জলে, তার দলের লোকজন সব ছিটকে পড়লো এদিক ওদিক। কেন, কেরামত এতো ঘুরেছে, সে কি মাহীখালির জমিদার বুলন গিরি গোঁসায়ের নাম শোনে নি?—ওই লোকটার ঠাকুর্দার বাপ না-কি তারও ঠাকুর্দা,—কোন শালা তার খবর রাখে,—সে ছিলো ভবানী পাঠকের লাঠিয়াল। ওই শালাকে ঠাকুর ন্যস্ত করেছিলো বৈকুণ্ঠের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার বাপ, না-কি তার বাপের হাতে, তা ওই নেমকহারামটা কোম্পানির কোন ম্যাজিস্টরের হাতে পায়ে ধরে জমিদারি হাতিয়ে নিয়ে গোরাদের চাকর বনে গেলো। আর বৈকুণ্ঠের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা, না-কি তার বাপ, না-কি তারও ঠাকুর্দা—সেই সন্ন্যাসী সরে পড়লো সেরপুরের দক্ষিণে। সেখানে তখন ঘন জঙ্গল, বাসিন্দাদের মধ্যে এক বাঘ আর সিংহ আর জংলি হাতির পাল। জঙ্গল সাফ করে, বাঘ সিংহ মেরে হাতিগুলোকে নিজেদের বশ করে তারা জোত করলো, জমি করলো; আখুন্দিয়া, মীর্জাপুরে তাদের বিঘা বিঘা জমি। বৈকুণ্ঠের ঠাকুর্দার সৎভাইদের চক্রান্তে তার বাপ গরিব হয়ে গেলো, বাপ মরলে বৈকুণ্ঠ হলো ঘরছাড়া। সে এখন তেলি সাহাদের গদিতে সামান্য চাকরি করে খায়। তারা হলো সন্ন্যাসী, তাদের ক্ষত্রিয় ধর্ম, জাতে সন্ন্যাসী। তার আজ এই হাল!—তবে এখানে সে পড়ে আছে কি এমনি এমনি? সে আজ মামলা করে তো তার জ্ঞাতিরা কালই বাপ বাপ করে তার জমি জিরেত সব তাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। এখানে থাকার কারণ আছে। অন্য কারণ আছে।

কেরামতের চোখের মুগ্ধ কৌতূহলে তৃপ্ত বৈকুণ্ঠ তার এখানে বাস করার কারণটি বলবে কি-না তাই নিয়ে ভাবনায় পড়ে। 'তুমি ভিন জাতের মানুষ, তোমাক কি কওয়া যাবি?' কিন্তু না বলে তার এখন আর উপায় নাই। তাই সে জানায়, এই যে পোড়াদহের মেলা, এই মেলা প্রথম চালু করে ভবানী পাঠক, আহা বড়ো সখের মেলা তার। দেহ রাখার পর তিনি প্রস্থান করেছেন কৈলাসে, কিন্তু বছরকার একটি দিন তাঁকে এখানে দেখা যায়। কে দেখে?—যে সে জাতের মানুষ কি আর দেখতে পারবে? এদিকে এখন সব মোসলমান আর সাহা আর কুমার আর কামার আর মাঝি আর কলু,—ঠাকুরকে তারা দেখবে কোত্থেকে? বামুন কায়েতকেও ঠাকুর দর্শন দেবেন না। দেবতা হলে কী হয়, বামুন কায়েতরাও ওই যুদ্ধের সময় দাসখত লিখে দিয়েছিলো গোরাদের পায়ে।—সন্ন্যাসী জাতের মানুষ যদি শুদ্ধ বস্ত্রে, শুদ্ধ চিত্তে মেলার আগের দিনে ব্রাহ্ম-মুহূর্তে মোষের দিঘির উঁচু পাড়ে তালগাছের তলায় দাঁড়ায় তো ঠাকুর তাকে দর্শন দিলেও দিতে পারে। বৈকুণ্ঠের স্বর্গীয় পিতৃদেব তাকে বারবার বলে দিয়েছে, এখানে যদি সে চারদিকে একটু দৃষ্টি রাখে তো তার খাওয়া পরার অভাব হবে না, লোকালয়ে সবার সম্মান সে পাবে এবং পরজন্মে কী পাবে না পাবে তা আর নাই বললো। সেটা জানে শুধু ঠাকুর।

বৈকুণ্ঠের এই ব্যাখ্যায় কেরামতের বিভ্রান্তি কাটে না। ভবানী পাঠকের সঙ্গে চেরাগ আলি ফকিরের মরণোত্তর গান গাওয়ার সম্পর্ক কী? যমুনার পশ্চিম ধারে সে বরং দেখেছে মজনু শাহের দাপট। যমুনার-পেটে-যাওয়া মাদারিপাড়ার মানুষজনের ভাবসাব দেখে মনে হতো, ওরা সবাই মজনু শাহের একেকটা পালোয়ান। শালারা খেতে পায় না, পাছায় কাপড় নাই, এক ছটাক জমি নাই, এদিকে গলার তেজ ষোলো আনা। লাঠি

হাতে করে ভিক্ষা করে, ভিক্ষা না দিলে শাপমণ্যি করে, ভয় দেখায়। চেরাগ আলি তো ওই পালোয়ানদের গুষ্টির মানুষ। কেরামত তার মুখেই শুনেছে, করতোয়ার পুবে পশ্চিমে 'সবই ছিলো মজনুর দাপটে, গোরারা জবর দখল করিছে।'

'কথা ঠিক।' বৈকুণ্ঠ খানিকটা মেনে নেয়, 'মুনসি আছিলো ভবানী পাঠকের সেনাপতি। গান শোনো নাই, 'ভবানী নামিল রণে, পাঠান সেনাপতি সনে', এই সেনাপতিটা কও তো কেটা?'

কেরামতের নীরবতায় তার অজ্ঞতা প্রমাণিত হয়েছে ভেবে বৈকুণ্ঠের আত্মবিশ্বাস বাড়ে, 'পাকুড়গাছের মুনসি হলো ওই সেনাপতি। মজনু শাহের লিজের মানুষ আছিলো তাঁই। এখনো কালীপূজার আত্রে ভবানী পাঠকের আদেশে মুনসি কাৎরা ভাসায়া দেয় বিলের মধ্যে, ওই কাৎরার মধ্যে কালা পাঁঠা বলি দিবার পারে তো তোমার সর্ব পাপ মোচন হবি। আরে এই খপর তো এটিকার ক্যাচলা ছোলও জানে।'

কেরামত জানে, 'কিন্তু ফকির কতোবার কছে, গানের মধ্যেও কছে, মুনসি আছিলো মজনু শাহের খাস মানুষ।'

এতেও বৈকুণ্ঠের আপত্তি নাই, 'কথা ঠিক। ভবানী পাঠকের কাছে মজনু বার্তা পাঠালো। কী? না—তোমার আছে আলি, হামার আছে কালি; তোমার তাকত আলির হাতত আর হামার শক্তি আছে মা কালির কাছে;—ঠিক কি-না?—হামরা একত্তর হই। আলি আর কালি একত্তর হলে কোম্পানি এক ঘড়ি খাড়া হয়া থাকবার পারে?—তা হলে বোঝো। তখন দুইজনের মানুষ আর আলাদা থাকলো না। মুনসি তখন ভবানী সন্ন্যাসীর হুকুম শুনবি না কিসক?' দৃষ্টান্ত পর্যন্ত দেয় বৈকুণ্ঠ, 'না হলে এখনো মুনসি বিলের মধ্যে কাৎরা ভাসায় কিসক?'

এই প্রমাণ দাখিলের পর আর কথা বলা নিরর্থক। এর মধ্যে মুকুন্দ সাহাও এসে পড়েছে দোকানে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ তবু বলেই চলে, 'চেরাগ আলি ফকির থাকলে ইগলান মীমাংসা হয়া গোলো নি। কাল গানের মধ্যে শুনলা না? স্বপনের বিত্তান্ত কলো ক্যাংকা কর‍্যা, বুঝছো না?'

ফকিরের গতকালের গানে স্বপ্নের বৃত্তান্ত কোথায়?—কেরামতের অজ্ঞতায় বৈকুণ্ঠ ঠোঁট বাঁকায়, 'লিজে তুমি গান বান্দো, ইগলান কথা বোঝো না? "বাবরি চুলের ছইখানি, তার উপরে চেরাগদানি।" মানে লাওয়ের উপরে প্রদীপ আছে, সেটা জ্বলে না। কিসক? আগুন নাই, জ্বলে ক্যাংকা কর‍্যা? লাও ডোবে, মাঝি ঘোলা জল খায়। কোম্পানির সেপাইয়ের গুলি খায়া মুনসি মরলো, তার আগে আগে উগলান স্বপন দেখিছে। ফকির কছে, মানষে মরার আগে স্বপনে ইশারা পায়।'

দোকানের দিকে পা ফেললে কেরামত তার পিছু ছাড়ে না, বলে, 'চেরাগ আলি মরার আগে মনে হয় লিজেই উগলান স্বপ্ন দেখেছি। তাই ওই গান বান্দিলো।'

'তোমার বাপু মাথা মোটা!' বিরক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠ দাঁড়ায়, 'আরে ফকির তো গান বান্দে নাই, তার গান সব পাওনা শোলোক। ফকির লিজের কথা কবি কিসক? মুনসিক বাদ দিয়া কি লিজের কথা কবার পারে? তোমাগোরে লাকান বেয়াদব আছিলো না তাঁই। তুমি তাক কয়দিন দেখিছো? হামরা তার পাছে পাছে ঘুরিছি, তার সাথে বস্যা থাকিছি। মানুষে আসিছে, স্বপনের কথা কছে, ফকির তার মঙ্গল অমঙ্গল কয়া দিছে। হামরা শুনিছি।' বলতে বলতে মুকুন্দ সাহার দোকানের বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে সে বলে, 'এখন মনে হয় তমিজের বাপ কিছু জানে। ফকিরের বইখানও তো দিয়া গেছে তমিজের

বাপেক। সেটা কি এমনি এমনি? রহস্য বোঝে না?'

দোকানের ভেতর থেকে মুকুন্দ সাহা হাঁক ছাড়ে, 'বৈকুণ্ঠ, সকালবেলা দোকানেত ঢোকার আগে কার সাথে কি খায়া আসলু রে?' সাতসকালে বেজাতের মানুষের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে দোকানে কারো প্রবেশ সে অনুমোদন করে না।

বৈকুণ্ঠ বলে, 'আসিচ্ছি বাবু।'

বটতলায় এসে কেরামত আলি ওপরের দিকে তাকালে বটগাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র লাল ফল চোখে পড়ে। প্রত্যেকটি ফলে চেরাগ আলির মণি-ছেঁড়া চাউনি। এখানে এসে চেরাগ আলি নাকি প্রথম গান করে এই বটতলায় দাঁড়িয়েই। বটতলা বড়ো পয়মন্ত জায়গা। ফকিরের পসার তো কম হয় নি। ওদিকে গেলে জয়পুর, পাঁচবিবি, আক্কেলপুর, আদমদিঘি, হিলি, পাহাড়পুর, এমন কি শান্তাহার জংশনে পর্যন্ত চেরাগ আলির গান শুনতে মানুষের ভিড় জমে গেছে। মানুষটা অনেক জানতো, কেরামত তাকে নিয়ে ঠাট্টা করতো, কিন্তু কৈ, চেষ্টা করেও তার গলার রুখা স্বরটা তো সে রপ্ত করতে পারলো না। তারপর চেরাগ আলি খোয়াবের সব বৃত্তান্ত বলতে পারতো। তারপর কী যে হলো, কেউ জানে না, কেবল বৈকুণ্ঠ একদিন বলেছে, মুনসি নাকি ওকে নিষেধ করায় খোয়াবের খোঁড়াখুঁড়ি ছেড়ে সে দেশান্তরি হয়ে গেলো। পাঁচবিবিতে এই মুনসির কথা ফকির তাকে কয়েকবার বলেছে। কেরামত পাত্তা দেয় নি, 'উগলান কথা থোও বাপু। তোমার মুনসি কও আর জিন কও আর দেও কও, তার সাথে তোমার যতোই খাতির থাকুক, তারা তোমাক শোলোক কয়া দিবি না। তোমার শোলোক লেখা লাগবি তোমাক লিজে। হামার গান বান্দি হামি লিজেই।'—এইসব ঠাট্টা শুনে চেরাগ আলি কিন্তু জবাব দেয় নি। একদিন কেবল তার শেষ গানটা শুনে বিহ্বল কেরামতের চোখে চোখ রেখে বলেছিলো, 'এই গান লেখবার পারবা? না হামি পারমু? গান বান্দা এক কথা আর পাওনা শোলোক আরেক জিনিস।' সে নিজেই বলেছে তার নাকি খোয়াবের বৃত্তান্ত লেখা বইও একটা আছে, সেটা রেখে এসেছে নাতনির কাছে। তা তার নাতজামাইটাকে তো কেরামত দেখলো। ওটা কি মানুষ নাকি? দাদাশ্বশুরের মরার খবর শুনে তার তো কিছুই হলো না, মরা মানুষ এসে ঘরের অন্ধকার কোণে দোতারা বাজিয়ে গান করে আর ওই হাবাটা মেঝেতে শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমায়। আর সেই মানুষের আছে কি-না গচ্ছিত থাকে চেরাগ আলির খোয়াবের বই। চালাকচতুর বরং ফকিরের নাতনিটা। ঘোমটার আড়ালে তার মুখ যেটুকু দেখা গেলো তাতেই বোঝা যায়, সুন্দরী মেয়ে। তার কালো হাতের আঙুলগুলো কী সুন্দর লম্বা লম্বা। দাদার মৃত্যুসংবাদ শুনে তার যেন কোনো ভাবান্তরই হলো না। তাদের জন্যে পাকশাক করলো, কতো যত্নআত্তিই না করলো। আবার চেরাগ আলিকে নিয়ে কেরামত যাই বললো সবই শুনলো সে দুই কান খাড়া করে। তারপর সবাইকে খিলানদিলান করিয়ে ঘরের অন্ধকার কোণে মাচায় শুয়ে শুরু করলো চাপা কান্না। এমনি কান্না যে মনে হয়, মাচার ওপর থেকে নয়, মাটির অনেক নিচে গাছপালার শেকড়বাকড় যেন পানির অভাবে মরার আগে শেষ কান্না কেঁদে বিদায় নিচ্ছে। এই মেয়েটিকে নিয়ে একটা বড়ো পদ্য লিখতে পারলে কেরামত আলির জীবনের আর অন্য কিছু লেখার দরকার হতো না। ওই বইয়ের রোজগারে তার সারা জীবন চলে যায়। ফকিরের বইটা দেখলে হয় একবার। তমিজের বাপ না জানে লেখা না জানে পড়া। একে জাহেল মানুষ, তাইতে আবার হাবা। আবার সে নাকি ঘুমের মধ্যে

হেঁটে হেঁটে চলে যায় কোথায় কোথায়। তাইতেই বৈকুণ্ঠ একেবারে মুগ্ধ। আরে, ঘুমের মধ্যে মানুষ যদি কাজকাম সব সারতে পারবে তো আল্লা এতো বড়ো একটা সুরুজ দিয়েছে কেন আর সেই সুরুজের এতো রোশনাই বা থাকবে কেন?

কিন্তু তমিজের বাপকে ঘরে পাওয়া যায় না। সারারাত্রি কোথায় কোথায় ঘুরে এসে ভোররাত্রির দিকে সে নাকি একটুখানি ঘুমিয়েছিলো। ঘরের ভেতর থেকে কুলসুম জানায়, ঘুম থেকে উঠে একটু আগে বেড়জাল হাতে সে চলে গেছে পুবের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে গেছে কালাম মাঝির ভাগ্নে। ফিরবে পোড়াদহেল মেলা সেরে।

কুলসুম কথা বলে ঘরের ভেতর থেকে। কাল মাথায় ঘোমটা দিয়ে হলেও সবাইকে এতো আদর যত্ন করলো, আর তার এতো পর্দা করার দরকার কী? কেরামত তবু দাঁড়িয়ে বলে, 'তমিজ নাই? তার সাথে কথা আছিলো।' এতে একটু কাজ হয়। শরীর সম্পূর্ণ দরজার কপাটের আড়ালে রেখে একটা পিঁড়ি বার করে দিয়ে কুলসুম বলে, 'বাড়ির খুলিত বসেন। তার বেটা আসবি।'

বাইরের উঠানে ঘরের দরজা ঘেঁষে পিঁড়িতে বসে কেরামত জোরে জোরে বলে, 'ফকির চেরাগ আলি মিয়া তোমার কথা খুব কছে। তোমাক ওই কথাগুলা কওয়া দরকার। মরার আগে উনি কি অসিয়ত করলো, তোমাক কওয়া আমার ফরজ।' দাদার শেষ উপদেশ কিংবা বাণী শুনতে কুলসুম তেমন আগ্রহ দেখায় না। কিন্তু কর্তব্য পালনের তাগিদে কেরামতকে বলতেই হয়, 'ফকির তোমার জন্যে আফশোস করিছে। কছে, একটাই ফরজন্দা আমার। বাপ-মা মরা মেয়ে।' এবার দরজার ঠিক ওপাশেই এসে দাঁড়িয়েছে কুলসুম, বুঝতে পেরে কেরামত গলা একটু নামায়, 'তমিজের বাপ তো মানুষ খুব ভালো, মনটা একেবারে সাদা। কিন্তু তোমার দাদা কছে, আমি জানি না. তোমার দাদাই কছে, তমিজের বাপের বয়েসটা একটু বেশি। বুদ্ধিশুদ্ধিও আল্লা তাক একটু কমই দিছে। লেখাপড়াও তো করে নাই। মাঝির ঘরে লেখাই কী আর পড়াই কী? ওটা তো কোনো দোষের কথা নয়। কিন্তু ফকির চেরাগ আলি মিয়া তার বই নাকি থুয়া গেছে তারই কাছে। তমিজের বাপ কি ওই বই কিছু পড়বার পারে?' কুলসুম কিছুই না বললে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কেরামত ফের বলে, 'বইটা একবার দেখবার চাইছিলাম। ফকির সাহেব বলিছে, কেরামত তুমি বই লেখো, আমার বইয়ের রহস্য তুমি বুঝবা। আমি বই লেখি, হাটে বাজারে মেলায় বই পড়ি, মানুষ খুশি হয়া কেনে, পাইকাররা কিন্যা নেয়। আর ফকিরের বইয়ের শোলোক সব পাওনা গান, আগিলা জমানার শোলোক, কেউ লেখে নাই। তা বইখান একবার দেখলে হয়—।'

'বই তো এখন দেওয়া যাবি না', কুলসুম ভেতর থেকে জবাব দেয়, 'ঘরের মানুষ আসুক।' কেরামত তবু উঠতে চায় না। এখানে আসার পর থেকে চেরাগ আলির কথা এখানে শুনতে শুনতে তার কানে তালা লেগে গেলো। বৈকুণ্ঠ কেরামতের গান খুব শুনতে চায়, কিন্তু তার মন সম্পূর্ণ পড়ে থাকে চেরাগ আলির গানের দিকে। কেরামতের একটা গান শুনে সে হয়তো বুঁদ হয়ে আছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর সে গুনগুন করতে শুরু করে অন্য কোনো গান। তার বুঁদ হওয়াটা তখন সমর্পিত হয় চেরাগ আলির শোলোকে। কেরামতের গানে খুশি আলিম মাস্টার। কিন্তু বলে, 'ইগলান গান এদিকে এখনো মানুষে লিবি না। এটিকার মানুষ এখনো জোতদারের পিছে লাগে নাই।' অথচ জোতদারের লোকদের হাত থেকে ফসল ছিনিয়ে নেবার সময় পাঁচবিবির জয়পুরের আধিয়ার চাষাদের গা গরম হতো তো তারই শোলোক শুনে। ধলাহারে পালামি বর্মণের

মায়ের হাতে লাগলো জোতদারের ভাড়াটে পুলিসের গুলি, কনুই থেকে রক্ত রেবুচ্ছে ফিনকি দিয়ে, বুড়ি মাটিতে পড়ে গিয়ে কেরামতকে সামনে দেখে বলে, 'বাপ, তুই গাহান বন্ধ করিছিস কেনে? গান ক, গাহান ক বাপ।' অথচ পুলিসের ভয়ে এদিকে এসে কেরামত তার গানের আর ভক্ত পায় না। এদিকে তার কাছে পয়সাকড়ি নাই। আলিম মাস্টারের সঙ্গে থাকে। মাস্টার তো জায়গির থাকে নিজেই, তাও এক আধিয়ার চাষার বাড়িতে। জমির কাছে চাষার সঙ্গে হাত লাগায় বলেই না তাকে থাকতে দিয়েছে। তার খাতিরে কেরামত এখন পর্যন্ত দুইবেলা দুই মুঠো খেতে পাচ্ছে। এই খাতির টিকবে কতোদিন? নতুন ধান উঠেছে, খেতে দিচ্ছে। কয়েক মাস পর চাষার নিজের ভাত জুটবে না, তখন মাস্টার তার মাসের বেতনও যদি ওই লোকের হাতে তুলে দেয় তো কেরামত সেখানে পাত পাততে পারবে?—তার চেয়ে বৈকুণ্ঠের কথা মতো সে যদি ফকিরের গান গায়, তবে পেটটা চলে। সেসব তো এই এলাকার গান, যে কেউ গাইতে পারে, তাতে দোষের কিছু নাই। বৈকুণ্ঠ বলে ওইসব গান চালু থাকলে ফকিরের আত্মাটা শান্তি পায়। আরে ফকিরের আত্মার শান্তি ফকির নিজেই জোগাড় করুক। আপাতত তার বইটা পেলে কেরামত না হয় উল্টেপাল্টে একটু দেখে।

'তাঁই তো দুই দিন বাড়িত আসবি না। আপনে না হয় মেলা পার কর্যা দিয়া আসেন।' ভেতর থেকে কুলসুম এই নির্দেশ ছাড়লে কেরামতকে উঠতেই হয়। তবু যাবার আগে একবার বলে, 'পিয়াস লাগিছে, পানি খাওয়া যাবি?'

মাটির খোরায় পানি এনে কুলসুম রেখে দেয় দরজার বাইরে। তার কালো হাতের একটু ফ্যাকাশে লম্বা আঙুলগুলো দেখে কেরামতের পিপাসা চড়ে তার সর্বাঙ্গ জুড়ে। পানি খেয়ে রাস্তায় নেমে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে নিজের গান গাইবার পিপাসা বাড়তে থাকলে তার শরীরের পিপাসার আর সীমা পরিসীমা থাকে না। কেরামত এখন করবেটা কী?

ফুলজানের কাছে যেতে তমিজের বেশ দেরিই হয়ে গিয়েছিলো।

বাপের ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে গাওয়া চেরাগ আলির গান শুনে সে ভয় পায় নি, আবার এতে দিওয়ানা বনে যাবার মানুষও সে নয়। চেরাগ আলি হলো কাৎলাহারের মুনসির খাস লোক, জিন্দা হোক মুর্দা হোক অনেক কিছুই সে করতে পারে। গানের পর কাঁথা মুড়ি দিয়ে কুলসুম শুয়ে পড়েছিলো ফোঁপাতে ফোঁপাতে। হাঁড়িতে আর ভাত ছিলো না এক দানা। খালি পেটে ঘুম আসতে দেরি হয় তমিজের, আবার ভোরবেলা ঘরের দরজায় হাঁক ছাড়ে গফুর 'এ তমিজ, তমিজ। তাড়াতাড়ি হাটোত আয়। কাদের ভাই যাবার কছে রে। মেলা কাম আছে।'

হাটে গেলে কাদের তাকে লাগিয়ে দিলো গফুর কলুর সঙ্গে। এ কেমন কথা গো? কলুর হুকুম তামিল করতে হবে তাকে? বলতে গেলে, কলুর বেটাকে এড়াতেই সে কাদেরের পিছে পিছে কাঁধে বাঁক নিয়ে চললো লাঠিডাঙা কাচারিতে। কাচারি থেকে চেয়ার, লাল সালু, সামিয়ানার কাপড় বয়ে নিয়ে এলো গোলাবাড়ি।

পরশু পোড়াদহের মেলা। মেলা উপলক্ষে আশেপাশের মেয়েরা এসে গেছে বাপের বাড়ি, জামাইরা এখনো আসছে। পোড়াদহের চারদিকে গ্রামগুলো মানুষজনে গিজগিজ করছে। ইসমাইল এই সুযোগটা ছাড়তে চায় না। মেলার একদিন আগে গোলাবাড়ি হাটে মুসলিম লীগের সভা। ইসমাইল হোসেন তো বলবেই, শামসুদ্দিন ডাক্তার কথা দিয়েছে খান বাহাদুর সাহেবকে নিয়ে আসার জন্যে সে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবে, বাকি

আল্লার ইচ্ছা। বটতলা ঘেঁষে মঞ্চ তৈরি হবে, মঞ্চের জন্যে তক্তপোষ পাওয়া গেছে মুকুন্দ সাহার কাছ থেকে, চেয়ার দেবে নায়েববাবু।

নায়েববাবু চেয়ার তো দিলোই, খান বাহাদুর আসবে শুনে সামিয়ানাটা পর্যন্ত বরাদ্দ করলো নিজে থেকেই। এমন কি কাদেরকে চেয়ারে বসতে বললো পর্যন্ত, 'আরে বসো, বসো। খান বাহাদুর সাহেব আমাদের বাবুর বড়ো ছেলের বাল্যবন্ধু, কলকাতায় ওঁদের ওঠাবাসা সব একসঙ্গে। তা তিনি এলে আমাকে তো একবার যেতেই হয় বাপু।'

তারপর গলা নামিয়ে নায়েববাবু বলে, 'তোমার তো পাকিস্তান পাকিস্তান করছো। করো। জমিদারি নাকি থাকবে না। তাও না হয় নিয়েই নিলে। কিন্তু নিজেদের জমিজমা ঠিক রাখতে পারবে তো? নিজের জমির ফসল যদি না পাও তো জমিও যা, জঙ্গলও তাই। জয়পুর পাঁচবিবির ঘটনা তো জানোই। ওইটা ঠেকাতে না পারলে কিন্তু ঝাড়েবংশে শেষ হয়ে যাবে। ওদিকে সব চাষারা জোতদারদের গোলা লুট করলো, কাল জোতদারের মেয়ে বিয়ে করতে চাইবে। কথাটা খেয়াল রেখো বাপু।'

কাঁধে বাঁক থাকায় তমিজকে চলতে হয় দুলকি চালে, সে গোলাবাড়ি পৌঁছে যায় বেশ তাড়াতাড়ি। সে অবশ্য চলছিলো অতিরিক্ত জোর কদমে, পা ফেলছিলো চাপ দিয়ে দিয়ে।—এটা কি ফুলজানের বেটাকে টাউনে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে বলে, না-কি জয়পুর পাঁচবিবির চাষাদের ধাক্কায় তা ঠিক করে বলা মুশকিল।

গোলাবাড়ি হাটে কাদেরের দোকানের সামনে ভার রেখে কাউকে কিছু না বলেই তমিজ সোজা হাঁটা দেয়। কয়েক পা চলার পরেই আকাশের দিক তাকিয়ে দেখে বেলা উঠেছে অনেক দূর। তবে সময় আছে। ফুলজান তো তৈরী হয়েই থাকবে। কাজের মেয়ে, খামাখা বসে বসে ঝিমায় না। এমন মেয়ের কপালে এতো দুঃখ? কাল তমিজ যা দেখে এসেছে তার বেটার যে আজ কী হলো আল্লা মালুম। মা বেটাকে নিয়ে গোলাবাড়ি পর্যন্ত এসে না হয় টমটম নেবে একটা। সকালে বাড়ি থেকে তমিজ বেরিয়েছে পুরো সাড়ে ছয় টাকা হাতে নিয়ে। টমটম ভাড়া, ওষুধপত্র সব মিটিয়েও পয়সা নিশ্চয়ই বাঁচবে। টাউনে পৌঁছে না হয় রিকশা নেবে একটা। রিকশায় জড়াবার জন্যে ফুলজানকে শাড়িও একটা নিতে বলবে। রিকশা না নিলে দুই আনা পয়সা তার বাঁচে, কিন্তু বিমারি ছেলেকে কোলে নিয়ে ফুলজানের যদি হাঁটতে কষ্ট হয়? প্রশান্ত কম্পাউনডারের হাতে পায়ে ধরলে পয়সা নাও নিতে পারে। অবশ্য পায়ে পড়লেও অন্তত আধ হাত দূরে থাকতে হবে, ছুঁয়ে ফেললে আবার একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসবে। তারপর রোগী দেখানো শেষ হলে ফুলজানকে সিনেমা হলের সামনে থেকে নকুলদানা কি বাদামভাজা কিনে দেওয়া যায়। জীবনে এই প্রথম টাউনে গিয়ে ফুলজান কি একটু বেড়াবার সখ করবে না? খিয়ার এলাকা থেকে ধান কেটে ফেরার পথে টাউনে নেমে ঘুরতে ঘুরতে তমিজ একবার মস্ত একটা বাগানের সামনে দাঁড়িয়েছিলো, টাউনের লোকেরা পার্ক না কী যেন বলে, ভেতরে কতো ফুলে গাছ, বসার জায়গা। ভেতরে ঢোকার সাহস হয় নি। না, ওদিকে না ঢোকাই ভালো। ঢুকতে না দিলে মেয়েছেলের সামনে বেইজ্জতি।

হুরমতুল্লার ভিটায় উঠে তমিজ গলা খাকারি দিলেও কেউ সাড়া দেয় না। অথচ ভেতরে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। হুরমতুল্লা কি মেয়েকে মরিচের জমি নিড়াতে যেতে বলছে নাকি?—এবার থেকে এসব বন্ধ করা হবে।—না কি ফুলজানের বেটার অসুখ বাড়লো? ডাক্তারের কাছে যাবার সময় হবে তো?—মণ্ডলদের পিছে পিছে ঘুরে তার প্রেবনটা বরবাদ হয়ে যাবে?

ভয়ে ভয়েই তমিজ কলাপাতার পর্দা তুলে ভেতরের উঠানে ঢোকে। ঘরের কথাবার্তা এবার স্পষ্ট। ফুলজান কার সঙ্গে কথা বলে? ঘরের সামনে দাঁড়িয়েই তমিজ থমকে দাঁড়ায়। ঘরের ভেতরে মাচায় বসে রয়েছে সে নিজে, তার কোলে ফুলজানের বিমারি বেটা এবং পাশে ফুলজান। পলকের ভেতর তমিজ গতকাল থেকে ফিরে আসে আজকে এবং নিজের আসনে দেখতে পায় কেরামত আলিকে। আর সব কালকের মতোই।

তাকে দেখে ফুলজান ঘোমটা টেনে বসে মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে। কেরামত আলি অবাক হয়ে তাকায়, 'তুমি? কী সোমাচার?' তারপর তার গলায় আসে শ্বশুরবাড়ির অধিকার, 'আসো আসো। তোমার বাড়িত গেছিলাম গো। তুমিও নাই, তোমার বাপও বলে গেছে পুবে। মাছ ধরবার গেছে, না?'

ঘোমটার ভেতর থেকেই ফুলজান আস্তে করে বলে, 'মাঝি মানুষ মাছ ধরবার যাবি না?' তারপর ঘরের বাইরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে সে কেরামতকে বলে, 'মাঝির বেটাক সর‍্যা খাড়া হবার কন।'

তমিজ সরে দাঁড়ালে ফুলজান উঠানে যায়, সেখান থেকে রান্নাঘরে।

কোলে শোয়ানো ছেলের কপালে হাত বুলাতে বুলাতে কেরামত বলে, 'আমার বেটাটার অসুখ খুব বেশি। গাঁয়ের মধ্যে ডাক্তার কোবরাজ তো কিছু নাই। এরা তো চিকিচ্ছা করবার জানে না। খালি হেলা করে। টাউনেত নেওয়া ছাড়া আর কোনো বুদ্ধি দেখি না। এখন করি কী?' দুশ্চিন্তায় কপাল তার কুঁচকে যায়, 'আমি করি কী? গোলাবাড়ি হাটে আজ সভা, সভাত আবার গান গাওয়া লাগবি। এতোগুলা মানুষের আবদার, না-ও করবার পারি না।' তার কথাবার্তা ও ভাবসাবে মনেও হয় না, বৌবেটার সঙ্গে আজ তার দেখা কয়েক বছর পর। তমিজ তার দিকে সরাসরি তাকাতে পারে না। ফুলজান কী সব বলে দিয়েছে নাকি? কিন্তু তার কথাবার্তা শুনে বোঝা যায়, তার তালাক টালাক নিয়ে তমিজের মিছে কথাগুলো ফুলজান তাকে কিছুই জানায় নি।

'তুমিও তো মণ্ডলের জমি বর্গা করলা, না? তাঁই তো খন্দের ভাগ তোমাক কমই দিছে।'

তমিজ কথা বললো এতোক্ষণে, 'কেটা কলো?'

'সবই জানি। আমার জানা লাগে। ফুলজানের বাপ সাদাসিধা মানুষ, মণ্ডল যা দেয় তাই নেয়। উগলান চলবি না। খিয়ারের খবর তো শুনিছো?'

ওইসব খবর শুনতে তমিজের উত্তেজনা হয় ভয়ও লাগে। সে জিগ্যেস করে, 'পরামাণিক কুটি?'

'আমার শ্বশুর গেছে তার শ্বশুরবাড়ি। আরে, শ্বশুর গেছে শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুরবাড়ির পানশুপারি। দাঁত নাই তাই খাইতে নারি। মুখোত মারো হামানদিস্তার বাড়ি।' ছড়াটি বলে কেরামত খুব হাসে। তারপর ব্যাখ্যা করে, 'পোড়াদহ মেলার সময় বাড়িত জামাই আসিছে, বুঝলা না? শ্বশুর গেছে আমার শাশুড়ি আর শালিক আনতে। আরে শালি না থাকলে মানষে কি আর শ্বশুরবাড়ি আসে? বোঝো না, বৌ হলো ডালভাতের থালি। রসের হাঁড়ি জোয়ান শালি।' রসিকতা সম্পন্ন করে সে ফের আনে ফসলের প্রসঙ্গ, 'তুমি বলে মেলা ধান করিছো? আরে ধান তো করলা, ভাগ পাছো কেমন? আদ্দেকও তো পাও নাই। জয়পুর পাঁচবিবি আক্কেলপুরের চাষারা কিন্তু দুই ভাগ না পালে জোতদারের গোলা নিজেরাই সাফ করিচ্ছে। খবর রাখো?'

কোরান ও সুন্নার আদের্শ জীবন যাপন করার লক্ষে পাকিস্তান কায়েমের জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান বাঙলা ভাষায় জানালেও নিজের পেশাগত অভ্যাসের কারণে এবং সৈয়দ আমির আলির 'স্পিরিট অফ ইসলাম'-এর প্রায় অর্ধেকটাই মুখস্থ থাকার ফলে সাদেক উকিলের বেশিরভাগ কথাই বেরিয়ে আসে ইংরেজিতে। ইসলামের বিজয়গাথা প্রচার ও সেই সঙ্গে রাজভাষার ব্যাকরণগত শুদ্ধতা বজায় রাখতে তার মনোযোগ, যত্ন ও নিষ্ঠা একেবারে নিরঙ্কুশ। তবে দুটো হ্যাজাক ছাড়াও মঞ্চ আলো করার একটি প্রধান উপাদান খান বাহাদুর আলি আহমদের কোনো আমির আলি এখন পর্যন্ত দুর্গাভ্যক্রমে আবির্ভূত না হওয়ায় তার মহানুভবতা, ইসলামের জন্যে তার ত্যাগ ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতার কথাগুলো সাদেক আলিকে বলতে হয় বাঙলাতেই। কিছুক্ষণের মধ্যে সে ফের ইংরেজিতে গড়ালে তার গুণকীর্তনের পাত্র স্থানান্তরিত হচ্ছে জেনে এবং ইংরেজি ভাষায় অভিভূত শ্রোতারা তার কথা কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না তা ওয়াকিবহাল থাকায় শামসুদ্দিন ডাক্তার আস্তে করে টান দেয় মীর মোহাম্মদ সাদেক আলির ডোরাকাটা খয়েরি শেরোয়ানির লম্বা ঝুলের প্রান্ত ধরে এবং এই টান দেওয়াটা প্রায় টানাটানিতে দাঁড়ালে টানটান মনোযোগ প্রয়োগ করা থেকে শ্রোতাদের অব্যাহতি দিয়ে ভাষণ সংক্ষিপ্ত করতে সে বাধ্য হয়।

এবারে হাজেরানে মজলিশের সামনে দাঁড়ায় খান বাহাদুর সৈয়দ আহমদ আলি। কয়েক পুরুষের জমিদারি, পিতামহের মন্ত্রিত্ব ও এক পুরুষ গ্যাপ দিয়ে নিজের উপমন্ত্রিত্ব এবং তিন পুরুষ ধরে বিয়ে-করা ও না-করা ইংরেজ ও এ্যাংলো ইনডিয়ান মেমসায়েবদের সঙ্গে প্রেম ও যৌন সঙ্গম প্রভৃতি কারণে খাঁটি সায়েবদের সাহচর্যের ফলে খান বাহাদুরের গলার ভেতর থেকে বেরুতে বেরুতে বাঙলা ভাষা অনেকটাই দুমড়ে যায়। বাঁকা বাঙলা, ভাঙা উর্দু ও সায়েবদের চেয়েও সায়েবি ইংরেজির মিশেলে মুসলমান কৃষকের ওপর হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের জুলুমের কথা বলতে বলতে তার গলা ভারাক্রান্ত হয়, আট মিনিটের বেশি বলা তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। এ ছাড়াও দলের একটি কাজে তাকে এক্ষুনি টাউনে যেতে হবে। সুতরাং দুঃখিত হয়ে খান বাহাদুর সভাস্থল ত্যাগ করার এজাজত চায় দুই হাত জোড় করে। হ্যাজাকের আলোয় ধবধবে ফর্সা হাতজোড়া তার লালচে দেখায় এবং হাতের রঙ ও বিনয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধতা চড়ে যায় চরম পর্যায়ে। করজোড়ে তার মাফ চাওয়ায় অভিভূত কোনো কোনো বুড়া শ্রোতা বুকে ঠাণ্ডা লাগানোর ঝুঁকি নিয়েও গায়ের কাঁথা টেনে নিজেদের ছানি-পড়বো-পড়বো চোখের কোণ মোছে।

নায়েববাবু দাঁড়িয়েছিলো মঞ্চের পেছনে। জমিদারবাবুর বড়ো ছেলে আজ পদার্পণ করেছে লাঠিডাঙা কাচারিতে, খান বাহাদুরের সঙ্গে টাউনে যাবে বলে সেখানে অপেক্ষা করছে। নায়েবাবুর ইশারা পেয়ে খান বাহাদুর তাকে নিজের গাড়িতে উঠতে পাল্টা ইশারা দেয়।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গত কয়েক বছরে গোলাবাড়ি হাটের ওপর দিয়ে মোটরগাড়ি গিয়েছে অন্তত পাঁচবার। কিন্তু মোটরগাড়ির দীর্ঘকালীন অবস্থান এখানে এই প্রথম বলে স্থানীয় লোকজন ও মেলা উপলক্ষে আসা অন্য এলাকার জামাইরা তাদের ছেলেপুলে নিয়ে বেশ উত্তেজিত। খান বাহাদুরের সঙ্গে নায়েবাবু ও শামসুদ্দিন ডাক্তার ওঠার পর ফোর্ড গাড়ির চাকা গড়াতে না গড়াতে শ্রোতাদের উত্তেজনা নেমে আসে নিজনিজ পায়ে এবং তাদের প্রায় অর্ধেকই ছুটতে থাকে গাড়ির পেছনে। বাকি অর্ধেক

কি তার একটু বেশি শ্রোতা তাকিয়ে থাকে ধাবমান গাড়ির দিকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য-হওয়া গাড়ির শক্তি, সৌন্দর্য ও গতি নিয়ে তারা জরুরি আলোচনায় নিয়োজিত হয়। মঞ্চ থেকে ইসমাইল হোসেন চোঙায় মুখ লাগিয়ে চিৎকার করে, 'হাজেরানে মজলিশ, ভাইসব, ভাইসব, আপনারা বসে পড়ুন, এখানে বসে পড়ুন। সভার কাজ আবার শুরু হচ্ছে, ছোটাছুটি করবেন না ভাইসব। বসে পড়ুন।'

কিন্তু শ্রোতাদের আগ্রহ মোটরগাড়ির লুপ্ত আওয়াজের রেশের দিকে, ইসমাইলের আবেদনে তারা কান দেয় না। ইসমাইলের হুকুমে আবদুল কাদের প্রাণপণে 'নারায়ে তকবির', 'লড়কে লেঙে', 'পাকিস্তান' ও 'কায়েদে আজম' বলে স্লোগান তুললেও এর জবাবে যথাক্রমে 'আল্লাহ্ আকবর', 'পাকিস্তান', 'জিন্দাবাদ' ও জিন্দাবাদ' সাড়া দিতে হয় বলতে গেলে তাকে একাই, কারণ কর্মীদের সবাই আপাতত ফোর্ড গাড়ির পেছনে মাটির রাস্তার ধুলা, ধোঁয়া ও কুয়াশায় হারিয়ে গেছে।

ইসমাইল কাদেরকেই বলে, 'এসব কী? কোনো ডিসিপ্লিন নাই। যাও তোমার ওয়ার্কারদের নিয়ে এসো। সেই কবি কোথায়? ওকে নিয়ে এসো। গান হলে পাব্লিক ফিরে আসবে। যাও।'

কিন্তু পাকিস্তান নিয়ে কেরামত আলি এখন পর্যন্ত গান লিখতে পারে নি বলে এবং আলিম মাস্টারের সঙ্গে এর মাখামাখিতে বিরক্ত হয়ে কাদের আজ বিকালেই সভায় তার গান গাইবার আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এখন ইসমাইলের হুকুমে সে বিব্রত হয়, আমতা আমতা করে বলে, 'কিন্তু কেরামত আলির গানে তো পাকিস্তানের কথা নাই। এতোবার বললাম! এখনো লেখে নাই।'

'আঃ! যা বলি শোনো। গান হলেই চলবে।'

ইসমাইলের তাগাদায় আবুদল কাদের খুঁজতে বেরিয়ে কেরামতকে পায় মুকুন্দ সাহার দোকানের সামনে। আলিম মাস্টার আর বৈকুণ্ঠের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে খুব গপ্পো মারছে। প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসে কাদের তাকে উঠিয়ে দিলো মঞ্চের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ইসমাইল বলে, 'ভাইসব, আপনারা বসে পড়ুন। এবার গান হবে। হাজেরানে মজলিশের সামনে পাকিস্তানের গান শোনাবে—' কাদেরের কানের কাছে মুখ নিয়ে কবির নাম জানতে চাইলে কাদের ফিসফিস করে বলে, 'কিন্তু পাকিস্তানের গান তো লেখে নাই।' ইসমাইল ধমক দেয়, 'আঃ! নামটা বলো না।' নাম জেনে নিয়ে সে ঘোষণা করে, 'কবি কেরামত আলি।'

ঘোষণা শুনে কেরামত একটার পর একটা ঢোঁক গেলে। জয়পুর, পাঁচবিবি, আক্কেলপুর, আমদদিঘি, হিলি, এমন কি রেলওয়ে জংশন শান্তাহারে পর্যন্ত সে গান গেয়ে গেয়ে গানের বই বিক্রি করেছে ডজন ডজন। কিন্তু সাদেক উকিলের অতি শুদ্ধ ইংরেজি এবং খান বাহাদুরের বাঁকাচোরা বাঙলা, ভাঙা উর্দু ও সায়েবদের চেয়েও সায়েবি ইংরেজি এবং সর্বোপরি মোটরগাড়ির আওয়াজে এই সভা গমগম করছে। তার উত্তাপে কালো কালো ঘামের ফোঁটা বেরোয় কেরামতের মুখ ফুড়ে। সে শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, সামনে কাউকে দেখতে পায় কি-না সন্দেহ।

তবে মঞ্চের ঠিক নিচে তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে বৈকুণ্ঠ গিরি। কেরামতকে অভয় দিয়ে সে বলে, 'তুমি একবার ধরো না! ফকির ওই যে তমিজের বাপের ঘরোত গান কর‍্যা গেলা, ওইটাই ধরো।' কেরামত তবু চুপচাপ থাকলে বৈকুণ্ঠ তাকে আশ্বাস দেয়, 'তুমি ধরো তো! ফকিরই তোমাক দিয়া কওয়াবি!'

কেরামত এতে আরো ঘাবড়ে যায়। ভয়ে ভয়ে সে তাকায় **পেছনে। পেছনে বটতলা** ও বটগাছও বটে। ফকিরের ভরসায় নয়, বরং ফকির এসে **ফের তার ওপর ভর না করে** এই ভয়েই কেরামত শুরু করে,

বিসমিল্লা বলিয়া শুরু করে কেরামত।
ভারতবাসীর উপরে আল্লা করো রহমত॥
শুন শুনি সব্বজনে হিন্দু মোসলমান।
সোনার বাঙলার চাষার দুঃক্ষে ফাটিবে পরান॥

শেষ দুই লাইন সে কয়েকবার করে আবৃত্তি করে। লোকজন জমতে থাকে ফের। লীগের কর্মীরা ফিরে এসে সবাইকে বসিয়ে দেয়, 'বসেন গো, তোমরা বসো। গান হবি। গান শোনেন।'

মঞ্চের নিচে দাঁড়িয়ে অভয় দেয় বৈকুণ্ঠ, 'কেরামত আলি, ফকির আসিছে। হামি দিশা পাচ্ছি, তোমার পাঁজরার মুড়াত খাড়া হয়া আছে। তুমি তার গান ধরো। মনে পড়িচ্ছে না? আরে "গোল করিও না তোমরা ফকিরে ঘুমায়।" শুরু করো তো, ঠাকুরের নাম লিয়া গানটা ধরো। মনে ভুল্যা গেলে ফকির তো আছেই।'

কেরামত আলির সেদিকে নজর নাই। মঞ্চের এদিক থেকে ওদিক এবং ওদিক থেকে এদিক সে পায়চারি করে এবং পায়চারি করতে করতেই চাদরের ভেতর থেকে চার পৃষ্ঠার রোগা একটি বই বার করে পড়বার প্রস্তুতি নেয়। বই না দেখেই সে গাইতে পারে, বলতে কী বইয়ের সামনে চোখ তার বড়ো একটা থাকে না। কিন্তু বই হাতে রাখলে আত্মবিশ্বাস তার বাড়ে। এ ছাড়া বইয়ের প্রচারও তো দরকার। চোখের সামনে রোগা বইটা ধরে একটু মোটা গলায় সে শুরু করে, একই সঙ্গে চলে তার প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকানো,

যাহার হাতে নাঙল। যাহার হাতে নাঙল, ফলায় ফসল অন্ন নাই তার পাতে।
জমির পর্চা লইয়া জোতদার থাকে দুধেভাতে। রক্ত করি পানি
র অ ক্ত করি পানি মাটি ছানি ভাদ্রে রোপাই ধান।
চার মাসের মেন্নতে দেহে নাহি থাকে পরান। পৌষে ধান কাটি
পৌষে ধান কাটি, বাঁটাবাঁটি করিল জোতদার।
ভাগে পাইলাম আধা ফসল চলে না সংসার। চাষার মেন্নতের দাম,

তার গান শুনতে শুনতে বৈকুণ্ঠের ধার ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে আলিম মাস্টার। কেরামতের দিকে তাকিয়ে সে চোখের নানারকম ইশারা করে। সেই সব ইশারায় সে কেরামতকে উৎসাহ দেয়, না হুঁশিয়ার করে বোঝা মুশকিল। কেরামত তার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। তার নজর সামনের দিকে, শ্রোতাদের ওপর দিয়ে চোখ মেলে সে দেখছে সামনের রাস্তার অন্ধকার।

সভার লোকজন একে একে বসে পড়ছে। কিছুক্ষণ আগে সাদেক উকিল ও খান বাহাদুরের বক্তৃতার সামনে অখণ্ড নীরবতা এখন আর নাই। লোকজন এখন গান শুনতে শুনতে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়ে আরেকটু সামনে এগোয়, কেউ কেউ বসে বসেই এগোয়, দুই একজন চেরাগ আলি ফকিরের সঙ্গে কেরামতের তুলনা করে, গানের কথা না জেনেও কেউ কেউ কেরামতের সঙ্গে গুনগুন করে সুর ভাঁজে। তাদের নিচু স্বরে কথাবার্তা সম্পূর্ণ নতুন গানের কথায় তাদের উৎসাহ ও উত্তেজনা তাদের

সুরেলা ও বেসুরো গুনগুন করার ভেতরে ভেতরে সাঁতার কেটে চলে কেরামতের গান :

চাষার মেন্নতের দাম খালি আকাম জোতদারেরই কাছে।
দুই মাস গেলে চাষা ঘোরে মহাজনের পাছে৷ জোতদার মহাজনে
জো ও তদার মহাজনে মনে মনে উহাদের পিরীত।
চাষার মুখের গেরাস খাওয়া দুইজনেরই রীত৷ চাষার বড়ো দুষমন
চাষার বড়ো দুষমন এই দুইজন যেমন পাখির দুষমন খাঁচা।
চোরের দুষমন চান্দের পহর পোকের দুষমন প্যাঁচা৷ রাবণের দুষমন
রাবণের দুষমন ভাই বিভীষণ রামের অনুচর।
ধর্মেরে করিল বরণ অধর্মেরে পর৷ দেহের দুষমন
আর দেহের দুষমন ভেদবমন গাছের দুষমন লতা।
চাষার দুষমন জমিদার জোতদার অতি লেহ্য কথা৷ বলি জমিদারি
ব অ লি জমিদারি উচ্ছেদ করি এমন আইন চাই।
জোতদার পাবে এক ভাগ ফসল চাষায় দুই ভাগ পাই৷ তাই তেভাগার ডাক
তা ই তেভাগার ডাক দাও জোরে হাঁক বলো চাষার জয়।
চাষা বিনা জগৎ মিছা সব্বজনে কয়। দেখো বর্মণী মায়ে
আহা বর্মণী মায়ে পুলিসের ঘায়ে হইয়াছে জখম।
পায়ে গুলি খাইয়াও বুকের বল তো নাহি কম৷ সকল চাষীজনে
চাষীমজুরজনে নাহি মানে জোতদারের জুলুম।
চাষীর রক্তে জোতদার বাঁচে সকলের মালুম৷

গানের শ্রোতার সংখ্যা বাড়ে খুব দ্রুত। মোটরগাড়ির পেছনে ছোটা লোকদের কেউ কেউ রাস্তা থেকেই চলে গিয়েছে নিজের নিজের বাড়ি, তবে বেশিরভাগই ফিরে এসেছে গান শুরু হলেই। এবং কেরামতের মাথা ঝাঁকাবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারা মাথা দোলায়। গফুর কলুর নেতৃত্বে দাঁড়িয়ে থাকা একদল কর্মী ঘাড় নাড়িয়েই চলেছে, গফুর কলু অবশ্য মাঝে মাঝে দেখছে কাদেরকে। শুকনা মুখে কাদের তাকিয়ে থাকে ইসমাইলের দিকে। তবে এই গানে ইসমাইলের প্রতিক্রিয়া বোঝা মুশকিল। গায়কের চেয়ে তার দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করে শ্রোতারা, সে দেখে শ্রোতাদের মুখ। আরো কিছুক্ষণ পর কেরামত চলে আসে গানের শেষ জায়গায়,

কেরামতের কথা। কে এ রামতের কথা রাখো গাঁথা সকলের হিরদয়ে।
চাষা যদি একজোট হয় ভাই দুষমন কাঁপে ভয়ে৷

কেরামত একটু সরে দাঁড়াতেই ইসমাইল সম্বোধন করে শ্রোতাদের, 'হাজেরানে মজলিশ, ভাইসব, জমিদারদের হাত থেকে, মহাজনদের হাত থেকে, জোতদারদের হাত থেকে মুসলমান প্রজাদের বাঁচাবার জন্যেই ভারতের দশ কোটি মুসলমানের নেতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ আজ পাকিস্তান হাঁসেলের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কবি কেরামত আলি তার গানের মধ্যে দিয়ে মুসলিম লীগের কথাই বলে গেলো। রাতের ঘুম আর দিনের আরাম হারাম করে আমরা—'

'গান হোক। গান হোক।' জনতার দাবির মুখে ইসমাইল একটু বিরতি দিলো। সাদেক উকিল আস্তে চাপ দেয় ইসমাইলের পিঠে, ফিসফিস করে বলে, 'গান করতে দাও। পাবলিক রাউডি হয়ে গেলে—'

তার আবেদনে ভ্রূক্ষেপ না করে ইসমাইল প্রায় ধমক দেয় শ্রোতাদের, 'খামোশ! আমার কথা শুনুন। খালি গান শুনলে কাজ হবে না। মানুষ কাজও করে, গানও শোনে। রোজগারের জন্যে আপনারা দিনরাত খাটেন, হয়রান হয়ে গান শুনে, গান গেয়ে, গল্প করে ক্লান্তি দূর করেন। দিনরাত ফুর্তি করে বেড়ালে জমিতে ফসল ফলাতে পারবেন?'

শেষ প্রশ্নটির জবাব শুনতে সে কয়েক পলক অপেক্ষা করে। কেউ কিছু বলে না, তবে সবাই চুপ করে। ইসমাইল বলে, 'কাজের ফাঁকে ফাঁকে গান হলে মনটা ভালো থাকে। এবার জরুরি কথা বলি, পরে আবার গান শুনবেন।'

শ্রোতারা এবার একেবারেই চুপ করে যায়। ইসমাইল বেশ ধীরে সুস্থে, কখনো চড়া গলায় আবার কখনো নিচু স্বরে ঘণ্টাখানেক ধরে বক্তৃতা করে। কেরামতের গানের সঙ্গে তার কথার কোথাও কোথাও সামঞ্জস্য আছে বুঝে শ্রোতাদের আগ্রহ বাড়ে। ইসমাইল বলে, মুসলিম লীগ জমিদারদের সংগঠন নয়, বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে জমিদার আর কয়জন? যে কয়জন জমিদার জোতদার এই প্রতিষ্ঠানে আছে, দলের আদর্শ মেনে নিয়েই তারা দলে যোগ দিয়েছে। মুসলিম লীগের নীতির সঙ্গে মীরজাফরি করলে মুসলিম লীগ বিনা দ্বিধায় দল থেকে তাদের বহিষ্কার করবে। একটু থেমে শ্রোতাদের নিরঙ্কুশ মনোযোগ তৈরী করে সে জানায়, 'দরকার হলে আমাদের জেলার নেতা জেলা মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট খান বাহাদুর সৈয়দ আলি আহমদকেও আমরা দল থেকে বহিষ্কার করবো।'

এই কথায় শ্রোতারা স্তম্ভিত। মুহূর্তের মধ্যে তাদের বিস্ময় পরিণত হয় উত্তেজনা ও পুলকে এবং সভায় খুব হাততালি পড়তে থাকে। এমন কি, খান বাহাদুরের বিনয়ে একটু আগে অভিভূত হওয়ায় যাদের চোখ ছলছল করছিলো, তারা পর্যন্ত দ্বিতীয়বার ঠাণ্ডা লাগানোর ঝুঁকি নিয়ে কাঁথা থেকে দুই হাত বার করে হাততালি দিতে থাকে।

সভাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে ইসমাইল ডান হাত তুলে শ্রোতাদের হাততালি বন্ধ করার ইঙ্গিত দেয়। তারপর সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে বলে, আজ দেশের কোথাও কোথাও কৃষকদের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে তার সঙ্গত কারণ আছে। এর সমাধান সম্ভব কেবল পাকিস্তানেই, সেখানে কৃষকের পক্ষে আইন তৈরী করতে বাধা দেওয়ার অধিকার কারো থাকবে না। এখন দেখতে হবে, কৃষকরা আজ যাদের নেতৃত্বে সংঘাতে নেমেছে তার কোন জাতির মানুষ। হিন্দু জমিদাররাই তো কৃষকদের শোষণ করে আসছে বৃটিশ শাসনের শুরু থেকে। পলাশির আম্রকুঞ্জে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর থেকে ব্রিটিশের পায়রাবি করে তারাই তো মুসলমানদের অর্থসম্পদ, মানইজ্জত নিয়ে বাঁচার পথে বাধা দিয়ে আসছে। মুসলমান কৃষককে সংঘাতের পথে ঠেলে দিয়ে তারা বিভেদ সৃষ্টি করছে মুসলমানদের মধ্যে। এতে স্বার্থ হাঁসিল হচ্ছে কার? রক্তপাতের পথে না গিয়ে মুসলমান কৃষক যদি পাকিস্তান আন্দোলনে সামিল হয় এবং পাকিস্তান যদি তারা কায়েম করতে পারে, তবে তাদের সমস্যার সমাধান হতে বাধ্য।

নানারকম দৃষ্টান্ত দিয়ে ইসমাইল তার লম্বা বক্তৃতা শেষ করলে কাদেরের নেতৃত্বে একটার পর একটা স্লোগান উঠতে থাকে। এমন কি এই স্লোগানে শরিক হয় কেরামত আলিও।

মঞ্চ থেকে নামতে নামতে সাদেক উকিল ইসমাইলের কানে কানে বলে, 'মিটিং তো ভালোই হলো। কিন্তু মুসলিম লীগের সভায় তেভাগার গান কেমন শোনায়?'

ইসমাইল নিজের সাফল্যে গলা একটু উঁচু করে, 'আজ তেভাগার গান করলো।

কালই আবার এই লোকটাই পাকিস্তানের গান লিখবে। আপনি এটাও পারবেন না, ওটাও পারবেন না।'

কেরামত হেঁটে যাচ্ছিলো আলিম মাস্টারের সঙ্গে, তার পাশে বৈকুণ্ঠ। যুধিষ্ঠির কর্মকার কোত্থেকে এসে তাদের পিছু নেয়। সুযোগ বুঝে আস্তে করে জিগ্যেস করে, 'গানের মধ্যে তেভাগার কথা কওয়া হলো, তেভাগা কি হবি?'

কেরামতের হয়ে জবাব দেয় বৈকুণ্ঠ, 'গানের রহস্য বোঝা সহজ লয় বাপু। ফকিরে গান করিছে, একোটা গান হামরা কতোবার কর‍্যা শুনিছি। উগলান গান এটিকার মানুষ জানে কোনদিন থ্যাকা! তো তার রহস্য বোঝে কয়জনা? আর কেরামতের গান, লতুন গান, একবার শুনলা আর বুঝবার পারলা, অতোই সোজা?'

কেরামতের গান আবার তমিজের মাথাতেও কাঁটা বিঁধিয়ে দিয়েছে। খিয়ার এলাকায় তেভাগার কাণ্ড তো সে নিজেও দেখে এসেছে। 'গানের কথা বাদ দাও। গানে কতো কথা থাকে, উগলান সব ধরলে চলে?' বলতে বলতে তমিজ কেরামতের দিকে তাকায় আড়চোখে, তাকে একটু ঘায়েল করা গেছে ভেবে খুশিতে তার বুকের বল বাড়ে, 'খিয়ারেতে হামি লিজে দেখিছি। জোতদার শালা আধিয়ারের ধাবাড় খায়া গোয়ার কাপড় তুল্যা কুটি পালাবি দিশা পায় নাই।'

তমিজের কথায় সবাই হাসে। জোতদারের ন্যাংটা হওয়াটা এদের অতিরিক্ত হাসির কারণ হতে পারে; আবার সভায় শোনা ভালো ভালো কথার চাপ থেকে খালাশ পেয়েও সবাই হাসতে পারে। এতো মানুষকে হাসাবার কৃতিত্বে খুশি হয়ে তমিজ কেরামতের ওপর রাগ সবটাই ঝেড়ে ফেলে। তাকেও সে খুশি করতে চায়, 'তোমার গান আজ খুব জমিছিলো গো। জয়পুরে বর্মণী মায়ের কথা হামিও শুনিছি।' কেরামতের গানে তমিজ অভিভূত। সে বারবার তাকায় কাদেরের এক কর্মীর দিকে। ছাত্র কর্মীটি কিন্তু হাসে না, ইসমাইলের বক্তৃতার রেশ ধরে বলে, 'মারামারির কথা বলে খালি বিভেদ সৃষ্টি। মুসলমানদের মধ্যে ডিভিশন হলে লাভ হবে হিন্দুদের। তেভাগা তো পাকিস্তানে এমনিতেই হবে।'

তা তো হবে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের তাতে লাভ কী? এদের হাতে তেভাগা হলে সে কি আর ফসলের উপযুক্ত ভাগ পাবে? কয়েকদিন আগে নায়েববাবু যুধিষ্ঠিরের বাবাকে বলেছে, মুসলিম লীগের লোকদের সঙ্গে তারা ওঠাবসা করে কোন আক্কেলে? পাকিস্তান হলে মুসলমানদের এঁটোকাঁটা খেতে হবে, গোরু খাওয়া হবে বাধ্যতামূলক, মুসলমানরা দিনরাত লাথিঝাঁটা মারবে।—একি তারা জানে না? হিন্দু মেয়েদের সতিত্ব থাকবে পাকিস্তানে? জাত যদি ঠিক রাখতে হয় তো এদের সঙ্গে ওঠাবসা করা বন্ধ করো।

তবু কেবল তমিজের কথা শুনেই যুধিষ্ঠির সভায় এসেছিলো। স্বয়ং নায়েববাবুকে খান বাহাদুরের গাড়িতে উঠতে দেখে তার ভয়ও একটু কেটেছে। তেভাগার গানে তো সে রীতিমতো শিহরিত। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তেভাগা হবে মোসলমানদের জন্যে। পাকিস্তান হলে তবে তার খালি লোকসান। জাতও যাবে, তেভাগার ফসলও তার জুটবে না। তবে জগদীশ সাহা সেদিন বললো, পাকিস্তান টাকিস্তান কিছু নয়, সব ভাক্কাবাজি। মহাত্মাজী একটু শক্ত হলে মুসলমানরা কোথায় উড়ে যেতো! মুসলমানদের মধ্যে মাথা আছে নাকি? ছোটো জাত টাকা করলেই আর মন্ত্রী হলেই ভদ্দরলোক হতে পারে নাকি?

যুধিষ্ঠিরের মাথাটা বড়ো এলোমেলো ঠেকে। তমিজের সঙ্গে তার এতো খাতির কিন্তু তেভাগার আশায় তমিজ যেমন লাফাচ্ছে সে তো তেমন পারছে না। আলিম

মাস্টার তার পাশে এসে বলে, 'আ র দেশে একটা আইন হলে সোগলির জন্যেই হবি। জয়পুরে কী হচ্ছে, খবর রাখো? ফেরামতের গান ভালো কর‍্যা বোঝো। বুঝলা? ভালো কর‍্যা বোঝো।'

তা যুধিষ্ঠির হলো কর্মকারের বেটা। বাবুদের পায়ের তলায় পড়ে থাকে। শরাফত মণ্ডলের জমি বর্গা করলো, সেখানেও সুবিধা করতে পারলো না। গানের রহস্য ভেদ করা কী তার মাথায় কুলায়?

২৪

কালাম মাঝির নৌকা ও ছোটো শালাকে নিয়ে যমুনায় গিয়ে তমিজের বাপ সুবিধা করতে পারলো না। যমুনার মানুষ বিলের মাঝিদের মোটে গ্রাহ্য করে না, এমন কি আকালের সময় গিরিরডাঙা থেকে উঠে-যাওয়া মাঝিরাও যমুনার মাঝিদের সঙ্গে কুটুম্বিতা করার আশায় নিজেদের পুরোনো আত্মীয়স্বজনকে একটু এড়িয়েই চলে। সাড়ে পাঁচশো ছয়শো হাত একেকটা বেড়জালে যমুনার যতোটা পারে তারা দখল করেছে। সেখানে কালাম মাঝির ফেলে-দেওয়া ও নিজের ছেঁড়াখোঁড়া জালের টুকরা টাকরা জোড়া দিয়ে লম্বা-করা বাহাত্তর হাত জাল খাটাবার মতো পানি না জুটলে তমিজের বাপ কী আর করে, জাল গুটিয়ে নৌকা বেয়ে চলে আসে বাঙালি নদীর বৌডোবা দ'য়ের বাঁকে। ১৫/২০ হাত গভীর এই দ'য়ে নিজের চোখের জল গচ্ছিত রেখে মানাসের শুকনা খাটাল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক পর্যন্ত গিয়ে হারিয়েই গিয়েছিলো। অনেক পরে যমুনার উপচেপড়া পানি বয়ে বাঙালি নদী পুব থেকে এসে এ খাটাল ধরে কয়েক মাইল ছুটে বেরিয়ে যায় দক্ষিণের দিকে, আর তার পথভোলা রোগ একটি স্রোত পোড়াদহের মাঠ ছুঁয়ে কাশবনের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ে কাৎলাহার বিলে।

তমিজের বাপ বাঙালির কোলে মরা মানাসের বৌডোবা দ'য়ের ধার ঘেঁষে জাল খাটালো। কতোকাল আগে গোরা সেপাইদের হাতে ভবানী সন্ন্যাসী মারা পড়েছিলো এ দ'য়ের জায়গাতেই। সবাই জানে সন্ন্যাসীর শোকে মানাস শুকিয়ে গেলো, কিন্তু তার মড়া লুকিয়ে রাখতে ফেলে গেলো তার চোখের জল, দ'য়ের পানি তাই বারো মাস এমনিই থাকে। যমুনার মাছ, বাঙালির মাছ, এমন কি মানাসের সেই আমলের মাছের বংশধর তারাও এখানে এসে ভবানীকে পাহারা দিয়ে কিংবা তার খোরাক হয়ে নিজেদের মীনজীবন সার্থক করে। তমিজের বাপের কপালের ফের, সে নৌকা ভেড়ালো ওখানটাতেই। সেই সন্ধ্যায় জাল খাটাবার পর কোমর পানিতে দাঁড়িয়ে তমিজের বাপ বিড়বিড় করে কী সব শোলোক বলতে লাগলো; তার স্বর ক্রমে নিচু হয়ে আসছিলো দেখে কালাম মাঝির ভাগ্নে বুধা ভয় পায়, তমিজের বাপ কি ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? তারপর, বিশ্বাস করা মুশকিল, রাত এক পহরও যায় নি, সন্ধ্যাতারা আসমানের মাঝামাঝিও চড়ে নি, বাঘাড় মাছটা ঠিক মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়া শিশুর মতো মাথা

গুঁজে দিলো তমিজের বাপের জালের মধ্যে। এক মণ সোয়া মণ ওজনের সেই বাঘাড় নৌকায় তুলতে দুইজনের জান বেরিয়ে যাবার দশা। ছোটো নৌকা; অতো বড়ো বাঘাড়ের ঝাপটায় একবার এ কাত হয়, একবার ও কাত হয়। অতো বড়ো মাছ পেয়ে বুধা হাত নাড়ে, পা নাড়ে, কোমর দোলায়, মাথা ঝাঁকায়, তবু তার খুশির দুই আনাও সে খালাশ করতে পারে না। 'ও নানা, দুই মণ আড়াই মণের কম হবি না গো। এই মাছের বয়েস মনে হয় পাঁচশো বছর? আরো বেশি? ও নানা, এই মাছের দাম হবি কতো? এই মাছ দেখ্যা মেলার ব্যামাক মানুষ টাসকা ম্যারা যাবি? হামি কলাম, দেখো, সারা মেলার মানুষ ভ্যাঙা পড়বি তোমার উপরে।' বারবার কথা বলে এবং এতো বড়ো বাঘাড় ধরার খুশিতে এবং এতো বড়ো মাছ নৌকোয় তোলার খাটনিতে বুধার ঘুম পায়। শোলোক পড়তে পড়তে তমিজের বাপ মাছের সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিলে তার দাপাদাপি থামে, কিন্তু বড়োলোকের পা নাচাবার তালে তার লেজ নাড়ানো চলতেই থাকে, তাতে নৌকাটা দুলে দুলে ওঠে। দুলুনিতে বুধার ঘুম নামে চোখ ঝেঁপে।

সারা রাত ধরে নৌকা চলেছে, বুধা কিচ্ছু জানে না। ভোররাতে, তখনো আবছা আন্ধার, কোলাহল শুনে ঘুম ভেঙে গেলে বুধা দেখে, নাও ঠেকে রয়েছে কাৎলাহার বিলের দক্ষিণ কোণে। তীরে কাদার ভেতর উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে তমিজের বাপ। তার মাথার ওপর ঘুরে ঘুরে উড়ছে মণ্ডলবাড়ির শিমুলগাছের সাদা বকের ঝাঁক। নৌকার দিকে তাকালে বুধার চোখে পড়ে, ভেতরটা শূন্য। বাঘাড় মাছ নাই। তমিজের বাপের ধার ঘেঁষে শুকনা ডাঙায় দাঁড়িয়ে রয়েছে শরাফত মণ্ডল। তার এক হাতে লণ্ঠন, অন্য হাতে বোলওয়ালা কাঠের খড়ম। আবদুল আজিজ টর্চ দিয়ে আলো ফেলছে তমিজের বাপের মুখের ওপর, মাঝে মাঝে সেটা চক্কর দিয়ে ঘুরছে বিলের অনেকটা জায়গা জুড়ে।

তার নিয়মের বাইরে শরাফত মণ্ডল একই কথা চোদ্দবার করে বলছে। কী?—না, পোড়াদহ মেলা দেখতে-আসা তার ঝি-জামাই, ভাস্তি-ভাস্তিজামাই, ভাগ্নী-ভাগ্নীজামাই এবং তাদের ছেলেমেয়েতে বাড়ি ভরা বলে তাকে শুতে হয়েছে খানকাঘরে। বিছানা বদল হওয়ায় রাতে সে ভালো করে ঘুমাতে পারে নি। ফজরের আজানের আগেই অজু করতে ঘরের বারান্দায় এলে তার চোখ পড়ে বিলের দিকে। দেখে, এক শালা মাছচোর জাল থেকে মস্ত একটা মাছ তুললো বিল থেকে। মণ্ডল 'কোন শালা রে?' বলে জোরে হাঁক দিতেই অতো বড়ো মাছটা ফেলে দিলো বিলের পানিতে। মণ্ডল তখুনি বুঝেছে, এ শালা তমিজের বাপ ছাড়া আর কেউ নয়। লণ্ঠন নিয়ে কাছে এসে দেখে, ঠিক তাই। অনেক পয়সা খরচ করে, নায়েববাবুকে হাতে পায়ে ধরে এই বিল পত্তন নিয়েছে শরাফত; সে কি পাঁচ ভূতে মাছ মেরে নিয়ে যাবে বরল? সে আর কতো সহ্য করে?

শরাফত মণ্ডলের সাটাসাটিতে বুধার ঘুম কেটে যায় এবং ওই সাটাসাটির জন্যেই তার পক্ষে মাথা ঠিক রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার শুধু আবছা মনে পড়ে, দুইজনে মিলে ধরাধরি করে মাছটা নৌকায় তোলা হয়েছিলো, হাপসে গিয়ে সে শুয়ে পড়ে নৌকার পাটাতনের ওপর। বাঘাড় কি তার পাশে ছিলো, না নৌকার খোলের ভেতর ওটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, সেটা সে মনে করতে পারে না। এখন হঠাৎ দিশাহারা হয়ে বুধা জিগ্যেস করে, 'বাঘাড় কুটি?'

'এই শালা কুত্তার বাচ্চা, আরেক চোর। চোরের গোলাম চোর। বান্দো শালাক।' বলতে বলতে বুধার মাথায় ও ঘাড়ে শরাফত তার খড়ম-ধরা হাতটা তুলতেই কাদের

বাপকে সামলায়, 'রাখেন। বাড়ি ভরা মানুষ। আজ মেলার দিন। কী করেন?'

হাত সামলে শরাফত আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করে,—তমিজের বাপের বিলের মাছ চুরি করার কথা সে বলে আসছে অনেক দিন থেকেই। তার দুর্ভাগ্য, তার কথায় কেউ কান দেয় না। রোজ রাত করে শালা যে ঘাড়ে একটা জাল নিয়ে এখানে আসে, সে কি এমনি এমনি? পাকা চোর, এতোদিন ধরা পড়ে নি। আজ পোড়াদহের মেলা, পাকুড়গাছ থেকে মুনসি নিজের চোখজোড়া আজ মজুত রেখেছে গোটা বিলের ওপর, এই বিলের কোনো অনিষ্ট করতে গেলে সে শালা আজ ধরা না পড়ে যায় না।

একটু আলো ফুটলে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হয় বৈকুণ্ঠ। মাঝরাত থেকে মোষের দিঘির উঁচু পাড়ে তালতলায় দাঁড়িয়ে সে নজর রাখছিলো পাকুড়তলার পশ্চিমে সন্ন্যাসীর ভিটার ওপর। মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরের পর বারবেলায় ভবানী ঠাকুর এসে আসন গ্রহণ করবে পোড়াদহ মাঠের বটতলায় তার বিগ্রহের মধ্যে। তখন থেকে সন্ন্যাসীর পূজা। রাত্রি দুই প্রহর কাল পর্যন্ত সন্ন্যাসী পূজার ভোগ নেবে, তারপর কৈলাসধামে প্রত্যাবর্তন কালে মোষের দিঘির পাশ দিয়ে গিয়ে পাকুড়গাছের দিকে কয়েক পলক নজর দিয়ে ঠিক ব্রাহ্মমুহূর্তে পৌঁছে যাবে নিজের ভিটার ওপর। সূর্যঠাকুর পুব আকাশ জুড়ে সিঁদুরের ছোপ লাগানো শুরু করবে আর সন্ন্যাসীও মিলিয়ে যাবে আলোর মধ্যে আলো হয়ে। নিজের শিষ্যসঙ্গীদের বংশধর, অন্তত দশনামীদের কাউকে না দেখলে ঠাকুর কষ্ট পাবে জেনেই তো বৈকুণ্ঠ তার ঠাকুরদার সৎ ভাইদের ছেলেদের প্রতারণা মেনে নিয়ে বিঘা বিঘা জোতজমি জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাইদের ভোগ করতে দিয়ে নিজে পড়ে রয়েছে এখানে। এই রাতে কি তার ঘুমিয়ে থাকলে চলে? তা বছরের পর বছর এই রাত চলে যায়, সন্ন্যাসীর খাঁড়া-ধরা ছায়া দেখতে পায় না সে। আজ তার ভাবনা হয়, এসব কিসের লক্ষণ? তার নিজের কোনো দোষ হলো না তো?—নিজের কী দোষ ঘটতে পারে খুঁজতে খুঁজতে বৈকুণ্ঠ দেখে, বাঙালির পথহারা রোগা স্রোত ধরে একটা নৌকা উত্তর দিক থেকে ঢুকে পড়লো কাৎলাহার বিলের ভেতর। বৈকুণ্ঠের বুক দুরুদুরু কাঁপে : প্রভু কি তবে এবার নৌবিহারে ফিরে যাচ্ছেন?—কিন্তু নৌকা তো যাচ্ছে দক্ষিণে, তবে নিজের ভিটায় প্রভু উঠবেন কী করে?—বৈকুণ্ঠ ধন্দে পড়ে। তবে সে হলো গিরির সন্তান, টাসকা মেরে বসে থাকলে তার চলবে? প্রভুর প্রতি দায়িত্বপালনের তাগিদে পাকুড়তলা ঘুরে বিলের পশ্চিম তীর ধরে সে ছুটতে লাগলো দক্ষিণের দিকে। যাবার সময় হুরমতুল্লার ঘরের সামনে একটা হাঁক দিয়ে যায়।

কিন্তু মণ্ডলবাড়ির ঘাটে এসে দেখে ঘটনা তো একেবারে অন্যরকম। তমিজের বাপের মতো মানুষ কি এটা কখনো করতে পারে? তবে তজিমের বাপের আচরণের রহস্য ভেদ করা এদের মতো যে-সে জাতের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কোন ইশারায়, কার ইঙ্গিতে তমিজের বাপ এখানে এসেছে তা বলতে পারতো এক চেরাগ আলি ফকির। তা ফকিরই নাই, এখন আর কে কী বলবে?

বৈকুণ্ঠের হাঁকে হুরমতুল্লা এসেছে বটে, কিন্তু মণ্ডলের কথা সে বিশ্বাস করে কী করে? আবার মণ্ডল কি কখনো অন্যায্য কথা বলতে পারে? তমিজের বাপটাও একবারে চুপ, সে যে কী করলো না করলো তাই বা বোঝে কীভাবে? হুরমুতল্লা উসখুস করে, মেলার দিকে তার মেলা করা দরকার এখনি। মেলায় বেচবে বলে কাল তেলিহারা হাট থেকে কেশুরের বিচি আর মুলার বিচি কিনে এনেছে। নবিতন গোটা বিশেক পাটের শিকা বুনে রেখেছে, খুব নকশা করা শিকা। দাম মনে হয় ভালোই উঠবে। অন্তত

ভদ্দরলোকরা তো পছন্দ করবেই। সকাল সকাল মেলায় যেতে না পারলে জুতসই জায়গা পাওয়া মুশকিল।

নেহায়েত মেলার দিন। শরাফত মণ্ডলের বাড়িতে নাইওর ভরা। আবার মেলা দেখতে টাউন থেকে কাদেরের দলের ছেলেরা আসবে, নেতাদের কেউ কেউ থাকতে পারে। তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। এতোসব ঝামেলা না থাকলে এই শালা তমিজের বাপকে হাতপা বেঁধে গোরুর গাড়িতে চালান করে দিতো আমতলি থানায়। জেলের ঘানি টেনে শালার জীবন কাটতো।

এর মধ্যে ঝামেলায় ফেলে শরাফতের বড়ো ছেলেটা। সূর্য উঠলে টর্চের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেলে তিন ব্যাটারির দামি জিনিসটা রেখে আসতে সে একবার ঘুরে আসে বাড়ির ভেতর থেকে। এবার টর্চের বদলে তার হাতে ধরা তার ছেলের হাত। আজিজ বাপকে একটু তফাতে ডেকে এনে বলে, 'বাপজান, ওই মানুষটাক না ঘাঁটানোই ভালো। কী কী নাকি জানে।'

তমিজের বাপকে শীতে কিংবা ভয়ে কিংবা অন্য কোনো কারণে কাঁপতে দেখে এবং শরাফতের এক পায়ের খড়ম তার হাতে ওঠায় বাবর তার বাবার কোমর জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে। এতো বড়ো ছেলেকে কাঁদতে দেখে শরাফতের রাগ হয়। তার নিজের ছেলে ও নাতি কি তার ইজ্জতের দিকে একটু দেখবে না? আজিজটা পুরোপুরি বৌয়ের বশ হয়ে গেছে। টর্চলাইট রাখতে বাড়ির ভেতরে গেলে বৌয়ের কাছ থেকে সে বোধহয় হুকুম নিয়ে এসেছে এখন শরাফতকে সে তমিজের বাপের হাজাধরা পা দুটো দুধ দিয়ে ধুয়ে দিতে না বলে! হুমায়ুন মরার আগে বৌটা স্বপ্নে হাবিজাবি কীসব দেখলো, তখন থেকে তমিজের বাপের ভয়ে সবসময় কাতর। দুই বেটা এবং একমাত্র নাতির আচরণে শরাফত ক্ষোভে দুঃখে অপমানে নেতিয়ে পড়ে, তমিজের বাপের ওপর রাগটাকে সে আর শানাতে পারে না।

তমিজ তার বাপের খবর পায় পোড়াদহের মেলায়। কামালপুর, আওলাকান্দি আর আমতলি থেকে ছুতাররা গোরুর গাড়ি করে কাঠের খাট, পালং, তক্তপোষ, আলনা, বেঞ্চি আর পিঁড়ি, জলচৌকি এসব আনতে শুরু করেছে মাঝরাত্রি থেকে। তমিজ তাদের কামলা খাটবে বলে মেলায় বসে রয়েছে আরো আগে থেকে। সারাটা দিন ছুতারদের সঙ্গে থাকতে পারলে তাদের মাল নামিয়ে আর এইসব মালই খরিদ্দারদের গোরুর গাড়ি কি নৌকায় উঠিয়ে ভালো কামাই করা যায়। দিনটা কিছুতেই নষ্ট করা যায় না। এখন মেলাতেই কার মুখে বাপের কীর্তির খবর পেয়ে সে এখানে এসেছে একরকম ছুটতে ছুটতে। শরাফত তখন 'মেলার দিনটা পার হোক, পরে দেখা যাবি' বলতে বলতে চলে যাচ্ছে নিজের বাড়ির দিকে। পেছনে তার দুই ছেলে, নাতি, এ আত্মীয় সে আত্মীয়, কুটুম্ব, চাকরবাকর, কামলাপাট মেলা।

কাদায় পায়ের পাতা তখনো গাঁথা, তমিজের বাপ তাকিয়ে রয়েছে উত্তরের দিকে। তমিজ বাপের হাত ধরতেই তার নিজের এবড়োখেবড়া হাতের তালুতে বরফের ছোঁয়া পায়। মানুষের হাত এতো ঠাণ্ডা হয়? তমিজের শরীর কেঁপে ওঠে, বাপ তার বেঁচে আছে তো? সেই হিম হাত ধরে তমিজ বাপকে টেনে তোলে শুকনা ডাঙায়, তমিজের বাপের পা দুটো যেন কাদা থেকে উপড়ে তোলা হলো। ডাঙায় উঠে তমিজের বাপ তার দিকে একবার আর বৈকুণ্ঠের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে। তার ঢুলুঢুলু চোখে কাঁচা রক্ত ছলছল করে। তমিজের বাপ হাঁটতে থাকলে তমিজ বলে, 'বাজান, বাড়িত চলো।'

তমিজের বাপ কোনোদিকে তাকায় না, সে যে কাউকে দেখছে কি কারো কথা শুনছে তা মনে হয় না। বৈকুণ্ঠ তমিজের কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে করে বলে 'তমিজ, কথা কস না! যাবার দে। হামরা মেলাত যাই।' বৈকুণ্ঠের পা টলছে, তার মুখে গাঁজার গন্ধ।

তমিজের একটু তাড়াতাড়ি মেলায় যাওয়া দরকার। দেরি হলেই ছুতাররা অন্য কামলা লাগিয়ে দেবে। বৈকুণ্ঠকে নিয়ে তমিজ উঠে পড়লো কালাম মাঝির নৌকায়। নৌকার ভেতরে বাঘাড় মাছ তার বিশাল শরীরের গন্ধ দাগ ও চিহ্ন রেখে গেছে। বুধা অনেকক্ষণ তো কোনো কথাই বলতে পারে না, তার মুখ ফুটলো কাৎলাহার পার হয়ে নৌকা বাঙালির রোগা স্রোতে ওঠার পর।

দুপুর পার করে দিয়ে বাড়ি ফিরে তমিজের বাপ দরজার চৌকাঠে মাথা রেখে সটান শুয়ে পড়ে ঘরের মেঝেতে।

কুলসুম বলে, 'ইগলান কী শুনিচ্ছি গো? তুমি বলে বিলের মাছ চুরি করবার গেছিলা? মণ্ডল বলে তোমাক খড়মের বাড়ি মারিছে? মণ্ডল তোমাক বান্দিছিলো? কুটি মারলো গো? মাথাত মারিছে? গাওত বলে পান্টি দিয়া কোবান দিছে? ক্যা গো, কথা কও না? কথা কও না কিসক? ও তমিজের বাপ!'

তমিজের বাপ তবু সাড়া দেয় না। তার নাক দিয়ে শোঁ শোঁ আওয়াজ বেরোয়। কিছুক্ষণের মধ্যে ওই আওয়াজের তেজ কমে; ওই নাকডাকার মিহি ও মোটা স্বরে সারা ঘরটিকে সে টেনে তোলে নিজের ঘুমের মধ্যে। হেঁটে হেঁটে। ঘুমের মধ্যে তো সে হাঁটেই। কিন্তু এখন এমন হি হি করে কাঁপে কেন? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তমিজের বাপ হাঁটে, কথা কয়, বিড়িবিড় করে হয়তো শোলোকও বলে। কুলসুমকে জড়িয়ে ধরে সে ঘুমের মধ্যে, আবার তাকে ঠেলেও দেয় ঘুমের মধ্যেই। কিন্তু কৈ ঘুমিয়ে পড়লে তমিজের বাপ তো কখনো এমন করে কাঁপে না। সে তো এখন শুধু কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে তার সারা শরীর একেকবার কুঁকড়ে আসে, একেকবার ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তার মাথা গড়িয়ে পড়ে চৌকাঠ থেকে মাটিতে, আবার নিজে নিজেই মাথা উঠে যায় চৌকাঠের ওপর।

২৫

এখন মানুষটাকে নিয়ে কুলসুম করে কী? পাশে বসে স্বামীর কপালে হাত দিলে কুলসুমের হাতের তালুতে আগুনের ছ্যাক লাগে, জ্বরের দাপাদাপিতে তমিজের বাপের গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। মানুষের গায়ে এতো তাপ? এই তাপে কুলসুম এক হাঁড়ি ধান সেদ্ধ করে ফেলতে পারে। তবে ধানের হাঁড়ির বদলে তমিজের বাপের ওপর সে চাপাতে থাকে তমিজের পুরনো পিরান, তার লুঙি, নিজের একটা ছেঁড়া শাড়ি, ঘরের সবগুলো কাঁথা এবং এমন কি একটা ছেঁড়া জাল পর্যন্ত। তমিজের বাপের কাঁপুনি তবু যায় না। ভেতরের উঠান থেকে কুলসুম কয়েক বারে দুই হাত জড়িয়ে খড় এনে বিছিয়ে দেয় তার ওপর। স্বামীর কাঁপুনি তবু না থামলে সে নিজেই শুয়ে পড়ে ওই শরীরের ওপর। তমিজের বাপ একটা গড়ান দিয়ে তাকে ফেলে দিলে তার আর কিছুই করার থাকে না।

তবে দেখতে দেখতে কাঁপুনিটা থামে, কিন্তু জ্বর যেমন ছিলো তেমনি থাকে। মণ্ডলের হাতে মার খেয়ে তমিজের বাপ কি সারাটা সকাল—সারাটা দুপুর ঘুরে ঘুরে দুনিয়ার আগুন, আসমানের আগুন সব চুরি করে জমিয়ে নিয়ে এসেছে নিজের গতরের মধ্যে? তমিজের বাপের শরীরের নানা জায়গায় নাক লাগিয়েও কুলসুম তো কোনো গন্ধ পায় না। এই শরীরের চিরকালের বোঁটকা গন্ধ আর আঁশটে গন্ধ কি তাপে তাপে লোপ পেয়ে গেলো নাকি? এমন কি একটু ফাঁক-করা মুখে নাক লাগিয়ে জোরে নিশ্বাস টেনেও কুলসুম কোনোরকম গন্ধই তো পায় না। তার ভয় হয়, লোকটার পেট জুড়েও কি তবে আগুন জ্বলছে? নিজের নাক একটু তফাতে নিয়ে তমিজের বাপের সেই হাঁ-করা মুখ দেখতে দেখতে কুলসুমের মাথা ঝিমঝিম করে : এই মাঝারি আকারের হাঁ-য়ে কেমন পুস-করা পুস-করা ঢং। কী যেন জানার জন্যে মুখটা সে ফাঁক করে রেখেছে। হাঁ-করা মুখে এমন প্রশ্নবোধক দাগ কুলসুম আগেও অনেকবার দেখেছে। কিন্তু এরকম অবাক হয়ে কিছু জিগ্যেস করা ঠোঁটের ফাঁক সে দেখলো কবে? কোনদিন? কোটে গো?

'সিথানে পড়িয়া থাকে কার্পাসের বালিস। হায়রে—' চেরাগ আলি গানের কলিটা এখানে ছেড়ে দিলে কুলসুম ধরে, 'শিতানে পড়িয়া থাকে কার্পাশের বালিশ।' পাতলা চুলের নিচে কালো ও গোল মুখ, মুখের দাড়িও তেমন ঘন নয়, একটু এলোমেলো বটে, দাড়িগোঁফের ফাঁকে মোটা ঠোঁট হাঁ করে একটা মানুষ মাটিতে হাঁটু ভেঙে বসে গান শোনে। তার মুখ সবসময়ই চেরাগ আলির দিকে। তার হাঁ-করা মুখের ফাঁকে সে যেন ফকিরের গানের ভেতরটা খাবার জন্যে ব্যাকুল।—কতো আগেকার কথা, এতোদিন আগে উজান যেতে অনেক বল লাগে। এখন কি আর সেই বয়স কুলসুমের আছে? তবে হয়তো তমিজের বাপের গায়ের প্রচণ্ড তাপে কুলসুম শক্তি পায়; তার বাহু থেকে কে জানে হয়তো ডানাই গজায় এবং এক উড়ালে সে পৌঁছে যায় যমুনার ভাঙনের দিনগুলিতে। ছেঁড়াখোঁড়া বইটা দেখে আর মাটিতে চারকোণা চারকোণা রেখা এঁকে এঁকে চেরাগ আলির বাতানো মাদারিপাড়ার ফকিরগুষ্টির মানুষদের সব খোয়াবের ইশারা আর চেরাগ আলির নিজের মহা আত্মবিশ্বাস আর অকাট্য ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে শালার যমুনা নদী খেয়ে ফেললো গোটা গ্রামটাকেই। আকন্দদের জমিতে মাস দেড়েক মুখ গুঁজে থাকার পর তারা ঢুকে পড়লো দরগাতলার দরগাশরিফে। তা দরগা তো তখন কবজা করেছে ভিন্ন তরিকার খাদেমরা। ফকির যতোই হাম্বিতাম্বি করুক, তারই পরদাদারা যে কোম্পানির সঙ্গে লড়াই করেছে দরগাশরিফে ওরস চালাবার নিয়ত নিয়ে, সেখান তারা টিকতে তো পারলো না। নিজের মাদারি তরিকার ইজ্জত রাখতে, না-কি নতুন খাদেমদের হুকুমমাফিক শরিয়ত মোতাবেক নামাজ রোজা করার ভয়ে,—কী শোলোক বলে বেড়াকুড়া খাবার লোভেই কি-না আল্লাই জানে, নাতনিকে নিয়ে সে সোজা রওয়ানা হয় পশ্চিমে। পুব এলাকাতেই সে থাকবে না, করতোয়া পেরিয়ে চলে যাবে সোজা মহাস্থান। সেখানেই ছিলো তাদের ফকিরদের আখড়া। মজনু শাহ্ তো আসল জেহাদটা চালিয়েছিলো সেখান থেকেই। অতোদূর যাওয়া কি অতোই সোজা? বাঙালি পার হওয়ার পর কয়েকটা গ্রাম পেরোলে দুইদিকে লোকজন কমে আসতে লাগলো। ভাদ্র মাসের দুপুর, ভ্যাপসা রোদে কুলসুম পায়ে আর বল পায় না। জুতমতো গান করার জায়গা না পেয়ে ফকিরও অস্থির হয়ে উঠেছিল। রাস্তায় যে কয়েকজন মানুষ পাওয়া যায়, সবাই জমিতে হাঁটু পানিতে পাট ধোয়ায় ব্যস্ত। এদের কেউ কেউ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের

বড়ো সকড়ের ওপর বড়ো কোনো গাছের তলায় জিরিয়ে নেয়। ফকিরের হাতে দোতারা দেখে এদেরই কেউ বলে, 'ও ফকিরের বেটা, সামনে যাও, আজ গোলাবাড়ির হাট, মেলা মানুষ পাবা।' এই আশ্বাসে দুজনেই পায়ে বল পায়, রাস্তার একটা মোড় পেরুলে একটু দূরে বেশ কিছু মানুষ দেখলে চেরাগ আলি প্রায় দৌড়ুতে শুরু করে।

গোলাবাড়ি হাটের এক পাশে প্রাইমারি স্কুলের সামনে টিউবওয়েল। টিনের থালা মাটিতে রেখে টিউবওয়েলের মোটা নলে মুখ রেখে এক হাতে পাম্প করে কুলসুম অনেকক্ষণ ধরে পানি খায়। টিউবওয়েলের নিচে কাদার সোঁদা গন্ধ বর্ষার তোড়ে অনেকটা পানসে। কিন্তু পানির লোহার গন্ধ ও স্বাদে তার খিদের প্রায় সবটাই মিটে যায়। ও পানি খাচ্ছে, আর এর মধ্যে হাটের মাঝখানে বটতলার মস্ত ইঁট-গাঁথা চাতালে লোহার লাঠি, দোতারা ও ঝোলাটা রেখে জায়গাটা দখল করে চেরাগ আলিও টিউবওয়েলের কাছে আসে।

বটতলায় লোকজন খুব বেশি নাই। হাট তখন জমে উঠেছে, সবাই হাটে কেনাবেচায় ব্যস্ত। বটতলায় দাঁড়িয়ে দোতারায় টুংটাং করতে করতে চেরাগ আলি গুনগুন করে, 'হায় রে শিথানে পড়িয়া থাকে কার্পাশের বালিশ।' গানের এই কথাগুলিই সে বারবার বলে, আর মাঝে মাঝে তার সঙ্গে গলা মেলায় কুলসুম। বয়স তখন তার অল্প হলে কী হয়, তখুনি তার বুকের ওপর গামছা তুলে দিতে হয় বারবার। অল্প যে কয়েকজন মানুষ জুটেছে, চেরাগ আলির গানের সঙ্গে তাদের নজর সমানভাবে পড়ে কুলসুমের বুকের দিকে। একটিমাত্র মানুষকেই শুধু দেখা গেলো মাটিতে হাঁটু ভেঙে বসে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে চেরাগ আলির দিকে। একেকটা গানের পর চেরাগ আলি নতুন গান শুরু করার জন্যে দোতারায় টুংটাং তুললে কুলসুম তার টিনের থালাটা মেলে ধরে শ্রোতাদের সামনে। যার সামনেই থালা ধরে সে-ই অন্যমনস্ক হয় কিংবা চুপচাপ কেটে পড়ে হাটের ভেতর। কেবল এই মাটিতে বসা পাতলা চুল আর দাড়িওয়ালা লোকটি অন্যমনস্কতার ভাণ করে না, উঠে দাঁড়িয়ে সটকে পড়ে না, আবার পয়সাও সে দেয় না। সে ঠোঁট ফাঁক করে শুধু চেরাগ আলির রূপই দেখে আর গানই শোনে। কুলসুমের বয়েসি একটি ছেলে এসে লোকটির পাশে দাঁড়িয়ে বলে, 'বাজান, চলো। দেরি করলে মরিচের পুল পাওয়া যাবি না। ব্যামাক পুল খালি নেত্যা নেত্যা যাচ্ছে।' মরিচের চারা রোদে নেতিয়ে পড়লে লোকটির কিছু এসে যায় বলে মনে হয় না। সে কেবল চেরাগ আলির দিকেই তাকিয়ে থাকে। হয়তো তার নীরব প্রশ্নের জবাব দিতে, কিংবা লোকজন জমতে দেখে কিংবা আরো লোক আকর্ষণের জন্যে চেরাগ আলি তার মুখের হাঁ মস্ত ফাঁক করে, কখনো বাঁকা করে, কখনো চোখজোড়া বুঁজে কখনো হাট করে খুলে গেয়েই চলে,

পার্শ্বে বিবি নিন্দে মগন চান্দ কোলে জাগে গগন
খোয়াবে কান্দিল বেটা না রাখে হদিস।
হায়রে একেলা পড়িয়া থাকে শিথানের বালিশ॥

মুখ বাঁকাচোরা করে সে গাইছে, এমন সময় ওই ঠোঁট ফাঁক করে শুনতে-থাকা লোকটির পাশে দাঁড়ানে কালো ছোঁড়াটা খিলখিল করে হাসে, এতোই জোরে হাসে যে, লোকজন তার দিকে একবার করে তাকায়।

চেরাগ আলি ওমনি মুখভঙ্গি করেই গাইতে থাকে,

ত্যজিলো দেহের আরাম নিদ্রা তাহার হইলো হারাম
হাড্ডিতে লোহুতে ফকির পোষে দশদিশ।
ফকির বাহিরিলো পথে না থাকে উদ্দিশ॥

মাথা ঝাঁকিয়ে দোতারা বাজাতে থাকলে কুলসুম একাই বাকি চরণটি গায়

শিথানে পড়িয়া থাকে কার্পাশের বালিশ॥

সন্ন্যাসীর গৃহত্যাগের মুহূর্তে পুত্রের, যার কি-না একমাত্র সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা একশো এক ভাগ, স্বপ্নের ভেতরে কেঁদে ওঠার জরুরি খবর দেওয়ার সময় ফকিরের কাঁদো কাঁদো গলার স্বরের সঙ্গে তার বিকট মুখব্যাদানের সামঞ্জস্য না থাকলেও ওই কালো বালকটি ছাড়া আর সবাই মন খারাপ করে শোনে। এর মধ্যে বটতলারই আরেক পাশ থেকে আসে নারচিতলার ওবায়েদ সরকারের কথা। এই লোকের কথা মানেই ভাষণ; সে জানায় যে, ফজলুল হক আইন তৈরী করেছে, আইন লেখা হয়ে গেছে, এখন খালি লাট সাহেবের দস্তখত বাকি। এই আইনে জমিদারের দাপট শেষ হয়ে যাবে, জমির ওপর স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে প্রজার। তখন কে জমিদার আর কে প্রজা? আর লাট সায়েব দস্তখত না করলে হক সাহেব প্রধান মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেবে। ওবায়েদের কথায় হাটুরেদের তেজ বাড়ে। সেই তেজ তারা ব্যবহার করে ফকিরের গান শোনার কাজে। খালি পায়ে, পরিষ্কার গেঞ্জি গায়ে ও ময়লা ধুতিপরা একটা জোয়ান মানুষ কয়েকবার এদিকে আসে, একটু গান শোনে, বেসুরো গলায় গানের সঙ্গে দিব্যি একটু গলা মেলায়, তারপর ফের কোথায় যায়। আসা যাওয়ার ফাঁকে সে কালো বালকটিকে ধমক দেয়, 'ক্যা রে ছোঁড়া হাসিস কিসক? গান শোন, গান শোন।' ছোঁড়া তার হাসির কারণ ব্যাখ্যা করে হাসতে হাসতেই, 'বুড়াটা মুখ ওংকা করে কিসক?' চেরাগ আলি গাইতে থাকে,

দুয়ারে দাঁড়ায়ে ঘোড়া করিলো কুর্নিশ।
ফকির ঘোড়ায় চড়ি বাহিরিলো নাহিকো উদ্দিশ॥

গানটি শেষ হলে ময়লা ধুতি ও ফর্সা গেঞ্জিপরা লোকটি বলে, 'আগে পোড়াদহের মেলাত ইগলান গান খুব শুনিচ্ছিলাম।' গান বন্ধ হলেও মাথা একটু দোলাতে দোলাতে চেরাগ আলি বলে, 'পোড়াদহের মেলাত হামাগোরে যমুনা পারের মানুষ আগে কতো আসিছে। পোড়াদহ, বাগবাড়ি, নুনগোলা, জোড়গাছা, আবার ওদিকে ধরো চন্দনদহ, কড়িতলা, রয়াদহ, কুতুবপুর—ব্যামাক মেলার মধ্যে হামাগোরে ফকিরগুষ্টির মানুষ কতো আসিছে। গান তো করিছে তারাই। তা বাপু, নদী ভাঙার পরে কেটা কোটে ছিটকা পড়লো তার আর দিশা নাই। এখন তাই তোমরা গানও আর শোনো না।'

যুবক একটা প্রতিবাদ করে, 'কী যে কও ফকিরের বেটা? ইগলান গান এদিককার মানুষ জানে। হামাগোরে পোড়াদহ মেলার নামই হলো সন্ন্যাসীর মেলা। মেলা তো ভবানী সন্ন্যাসীর পিতিষ্টা করা। বুঝছো না?'

গানের শেষে কুলসুম ঘুরে ঘুরে থালা ধরলে টিনের থালায় ঠং ঠং করে পয়সা পড়লে তার মিষ্টি প্রতিধ্বনি ওঠে দোতারার তারে। কালো ছোঁড়াটিকে ফের এদিকে আসতে দেখে কুলসুমের ভয় হয়, এবার এসে তার বাপের মুখ না ভ্যাংচায়। না, সে তার বাপের পাশে ঝুঁকে জানায়, 'বাজান হাটোত ভাও আজ বেশি ঠেকিচ্ছে। কাল বাদে পরশু

জোড়গাছার হাট, ভাত খায়া হাঁটা দিলে মরিচের পুল লিয়া বেলা ডোবার সাথে সাথে বাড়িত আসা যাবি।'

লোকটি ঘাড় নেড়ে ছেলের প্রস্তাবে সায় দিয়েও রেহাই পায় না, কালো ছোঁড়া তাকে উঠতে তাগাদা দেয়, 'বাজান, পানি আসিচ্ছে দেখো না? ওঠো।'

ততোক্ষণে চেরাগ আলির আরেকটি গান অনেকটা এগিয়ে ফের ফিরে এসেছে প্রথম লাইনে।

আমার হইলো ভাবের ব্যারাম।
এই ব্যারামের নাইকো আরাম, গো ও ও ও!

শেষ শব্দটির রেশ টানতে চেরাগ আলির পাতলা ঠোঁটজোড়া এমনভাবে গোল হয় এবং গোটা শরীর এমনভাবে বেঁকে যায় যে এই ধ্বনির সঙ্গে তার শেষ নিশ্বাসটিও বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা যায়। কিন্তু দেখতে দেখতে তার অক্ষত শরীর ফের ফিরে আসে বহাল তবিয়তে, দোতারার টুংটাং করতে করতে সে দম নেয়। কিন্তু এই গান তার জমে না। মেঘ দেখে চেরাগ আলি তার দোতারা আর লোহার লাঠি আর ঝোলা গুছিয়ে নিতে নিতে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানায়, 'হিন্দু মোসলমান ভাইসকল, শোনেন। হিন্দু ভাই নমস্কার করি, মোসলমান ভাইদের বলি, সেলামালেকুম। বাবারা, আমরা মাদারির ফকির, খয়রাত কর‍্যাই হামাগোরে খাওয়া নাগে গো। আমরা বেড়াকুড়া খাই, হামাগোরে দুইটা পয়সা দিলে সেই পয়সা লষ্ট হয় না। আল্লার ওয়াস্তে দেন। একটা পয়সা দিলে সত্তুর পয়সার নেকি মিলবে গো ভাইসকল।' কিন্তু সত্তর গুণ পুণ্য অর্জনের দিকে শ্রোতাদের আগ্রহ তেমন নাই। কুলসুমের থালায় ঠং ঠং করে পয়সা পড়ে বটে, কিন্তু চেরাগের কান খাড়া হয়ে থাকে ঝনাৎ ঝনাৎ বোলের আশায়।

বৃষ্টির মোটা মোটা ফোঁটা পড়তে শুরু করলে চেরাগ আলি বাড়ির দিকে রওয়ানা হতে পা বাড়ায়। কিন্তু কুলসুম গোঁ ধরে, 'খিদা নাগিছে, ও দাদা খিদা নাগিছে।' আরে খিদে তো চেরাগ আলির কম লাগে নি। সে কথা চেপে নাতনিকে সে উৎসাহ দেয়, 'হাঁটো সোনা হাঁটো। দরগাত যায়া গরম শিরনি খামো। আজ দারোগার মায়ে খিচড়ি দিবি কছিলো।'

'না, জিলাপি খামো।' কুলসুমের আবদারের পুনরাবৃত্তি চলে, এমন সময় বৃষ্টি নামে ঝমঝম করে। লোকজনের ছোটোছুটি, বিক্রি হওয়া ও বিক্রি না হওয়া গোরুছাগলের ডাক, সওদাপাতি নিয়ে দোকানদারদের দৌড়াঁদৌড়ি সব মিলিয়ে তুমুল কোলাহল শুরু হয়। ওই মহা ক্যাচালের মধ্যেও কুলসুমের বায়না চলে, 'দাদা, জিলাপি, খামো।' মেয়েটির জেদ দেখে চেরাগ আলির রাগ হয়, ছুঁড়ি জিলেপির কথা ভোলে না। হাটের প্রায় সব জায়গা থেকেই জিলেপির দোকানটা চোখে পড়বেই। এতোক্ষণ ভাজা হচ্ছিলো দোকানের বাইরে, এখন চুলা ও কড়াই নিয়ে গেছে ভেতরে, তবু গন্ধ ও ধোঁয়া আসছে গলগল করে। চেরাগ আলির রাগ হয়, মেয়েটা বেশি চালাকি শিখেছে। তবে বেশি রাগ করা চেরাগের ধাতে নাই। যাদের কথা শোলোকে বলা হয় তারা অনেকেই বীরপুরুষ, ঘুমিয়ে-থাকা বিবি ও খোয়াবে কেঁদে-ওঠা বেটাকে তারা অগ্রাহ্য করে, লড়াইয়ের ময়দানে তাদের হুংকারে দুষমন টলোমলো পায়ে কাঁপে। কিন্তু হলে কী হয়, নিজের রাগ করার শক্তি চেরাগের একেবারেই উনো। রাগ তো রাগ, রাগের ছোটো বোন বিরক্তিও যদি তার একটু বেশি মাত্রায় চড়ে তো তার হাত-পা থরথর করে কাঁপে; অনেক সময়

মাটিতে সে পড়েও যায়। আবার এখন রাগ করার ইচ্ছাও চেরাগের তেমন প্রবল নয়, কারণ তার নিজেরও খুব জিলেপি খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু নিজে নিজে জিলেপি খাওয়ার বাদশাহি সিদ্ধান্ত নেওয়া কি তার পক্ষে সম্ভব? যাক, একটাই তো নাতনি তার, বাপ-মা মরা নাতনি, একটু জিলাপিই তো খাবে,—এই মনে করে দোকানের বাইরে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই সে ছয় পয়সা দিয়ে দেড় পোয়া জিলাপি কিনলো। দোকানদার তাকে ভেতরে যেতে না করে, ভেতরে খদ্দের গিজগিজ করছে। চেরাগ আলি এখন যায় কোথায়? কুলসুম বুকে দুই হাত জড়িয়ে হি হি করে কাঁপছে। এমন সময় একটু ডানদিকে উল্টোদিকের টিনের ঘর থেকে ডাক শোনা গেলো, 'ও ফকির ও ফকিরের বেটা। ফকির।' প্রবল বৃষ্টিতে এই ডাক ভিজে খুচরো পয়সার মতো ঠনঠন ধ্বনিতে কানে বাজে চেরাগ আলির, কুলসুম ব্যাকুল চোখে এদিক ওদিক তাকায়। কিন্তু বৃষ্টির তোড়ে টিনের ঘরের লোকটিকেও চেনা দায়। হঠাৎ করে কুলসুম আঁচ করে, ওই ময়লা ধুতিপরা মানুষটির গলা মনে হচ্ছে। ডাক লক্ষ করে কুলসুম ছুটতে লাগলো, পিছে পিছে ছোটে চেরাগ আলি। মাটির দুটো ধাপ বেয়ে দুজনেই উঠলো চওড়া বারান্দায়, বারান্দা পেরিয়ে ঢুকে পড়লো টিনের মস্ত ঘরে। ঢুকতে না ঢুকতেই কুলসুম অন্তত বার পনেরো হাঁচি দিলো। ঘর ভর্তি মরিচের বস্তা; জিরা, আদা আর রসুনের স্তূপের পাশে গাদা গাদা মরিচের বস্তা। এই গন্ধ তার খুবই পরিচিত। মাদারিপাড়ায় খাল পেরোলেই একটা সময় ঘরের চালে, বাড়ির উঠানে, বাড়ির খুলিতে লাল মরিচ বিছানো থাকে। যে-কোনো বাড়িতে খেতে বসলে এই গন্ধ শুঁকে শুঁকে সে এক সানকি ভাত সাবাড় করে ফেলতে পারে। অথচ কী জ্বালা, এমন একটা বিদঘুটে জায়গাতেই এসে পড়লো, এই গন্ধটিও তার সহ্য হচ্ছে না। ঠিক তখন তার এরকম মনে হয়েছিলো কি-না এখন তো তা আর মনে নেই, তবে কালাম মাঝির বাঁশঝাড়ে ছাপড়ার ভেতরে বসত করার পর উজানে ফিরে গিয়ে কুলসুম ওই বিরক্তি আরোপ করে বসেছে টিনের ঘরে মরিচের আড়তের ওপর। আসলে যা ঘটেছিলো তা হলো এই, টিনের মস্ত ঘরে নাকে এবং নাকের ভিতর দিয়া মাথায় পশিল যে মরিচের ঝাঁঝ, তাই থেকে রেহাই পেতে বাইরের দিকে মুখ করে সে দাঁড়িয়েছিলো দরজার চৌকাঠে, বৃষ্টির পানিতে তার সারা শরীর ভিজে যাচ্ছিলো, তবে বৃষ্টির ছাঁট লাগছিলো কেবল মুখে। 'জলে ভেজো কিসক? ঘরের মধ্যে আসো।' ডাক শুনে তাকিয়ে লোকটাকে এবার ভালো করে চেনা গেলো, ওই ফর্সা গেঞ্জি ও ময়লা ধুতিপরা লোকটি; তবে বৃষ্টির পানি লেগে গেঞ্জিটা অতো ফর্সা নাই, কুলসুম তাই ভরসা পেয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে একটু শীতে ও একটু ভয়ে কাঁপতে লাগলো। মস্ত টিনের ঘরের এক কোণ থেকে হুংকার শোনা যায়, 'বৈকুণ্ঠ, তুই বারে বারে কুটি পলাস রে?'

'কুটি যাই? বিষ্টির মধ্যে কুটি যাই বাবু?'

'আরে বিষ্টি তো নামলো ক্যাবল। কামের সময় তোক পাওয়া যায় না। আন্ধার ঘুটঘুট করে, বাতি জ্বালাস না?'

'ত্যাল নাই বাবু।'

'হেরকিন লিয়া ত্যাল লিয়া আয়। যা।'

বৈকুণ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, 'পয়সা নাই বাবু।'

টিমটিমে কুপির আলোয় কালো মোটা একটা লোক, বেশি মোটা বলে দৈর্ঘ অনুসারে তাকে বেঁটে মনে হয়, ঘরের কোণ থেকে দরজার কাছে এসে ফের একটুখানি ভেতরে গিয়ে একটি গদিতে বসে ক্যাশবাক্স খুলে গুনে গুনে খুচরা পয়সা বার করে।

বৈকুণ্ঠের হাতে পয়সা দেওয়ার সময় সে ফের গোনে। তারপর যে স্বরে হাঁকডাক করছিলো তা অপরিবির্তিত রেখেই বলে, 'মাঝির দোকানের আগের সাড়ে পাঁচ আনা পয়সা শোধ কর্যা বাকি পয়সার ক্যারাসিন ত্যাল আর একটা দিয়াশলাই লিয়া আয়।' চেরাগ আলির দিকে নাকমুখ কুঁচকে তাকিয়ে বিরক্ত গলায় সে বলে, 'এখন ভিক্ষা দেওয়া হয় না। যাও।' আড়চোখে দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে-থাকা চেরাগ আলি ও কুলসুমের দিকে তাকিয়ে ফের ভেতরে কার উদ্দেশ্যে আক্ষেপ করে, 'গোবিন্দবাবু জল যা হচ্ছে, বাড়িত চালের উপরে মরিচ শুকাবার দিয়া আসিছি, বুদ্ধি কর্যা না তোলে তো সব লষ্ট।'

বড়ো একটা হ্যারিকেন হাতে ঝুলিয়ে ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বৈকুণ্ঠ চেরাগ আলিকে ধমক দেয়, 'এখন দোকানেত সন্ধ্যা দেওয়া হবি, তোমার এটি থাকা চলবি না।' তার হাতের ইশারা পেয়ে বৈকুণ্ঠের পিছে পিছে বৃষ্টির মধ্যেই চেরাগ আলি চলে মুদির দোকানের দিকে, চেরাগ আলির আলখেল্লার ঝুল ধরে থাকে কুলসুম। এর মধ্যেই তার প্যাগনা শুরু হয় আবার, 'ও দাদা, জিলাপি খামু না? ও দাদা।'

মাঝারি আকারের দোকান, তবে সামনে একটু বারান্দা মতো আছে। বারান্দার এক ধারে একটা সেলায়ের মেশিন, মেশিনের পাশে মাদুর পাতা। বাঁ হাতের তর্জনিতে বৈকুণ্ঠ তাদের মাদুর দেখিয়ে দিয়ে দোকানদারকে বলে, 'ও মাঝিকাকা, এই ফকির আপনার এটি একটু বসুক। গান শুনবার পারবেন। হামাগোর আড়তেত এখন সন্ধ্যা দেওয়ার সময় বেজাতের মানুষ দেখলে বাবু কোন্দ করবি।'

ঘরের ভেতর হ্যারিকেন জ্বালাচ্ছিলো কালো ঢ্যাঙা একটা মানুষ, বৈকুণ্ঠের আবেদনে সাড়া না দিয়ে বলে, 'ত্যাল লিবু? খাড়া। ওটি থাক। বেজাতের মানষেক হামরাও ঘরোত ঢুকবার দেই না।'

বৈকুণ্ঠ তার কথা গায়ে না মেখে বলে, 'ও কাকা, আজ কয় বস্তা তুললা গো?' তথ্যটি না শুনেই চেরাগ আলিকে সে বলে, 'তোমার গলাটা খুব গমগমা গো। তোমার ওই 'সিথানে পড়িয়া থাকে' গানটা আগে পোড়াদহের মেলাত খুব শুনিচ্ছিলাম। বসো, এটি বসো। ওই গান আজ শোনমো।'

এর মধ্যে বৈকুণ্ঠের হ্যারিকেনে তেল ভরা হয়ে যায়, কেষ্টর হাত থেকে পয়সা গুনে নিয়ে দোকানদার বলে, 'কালকার সাড়ে পাঁচ আনা পয়সা আছিলো।'

'লিও। কাল লিও। বাবু কলো, মাঝিক কোস, পয়সা কয়টা আজ দিবার পারলাম না রে।'

হ্যারিকেন জ্বলে উঠলে দোকান ঘরটা ঝকঝক করে। মাঝারি দোকানটা মালপত্রে ঠাসা। একটা জলচৌকি জুড়ে কয়েকটা চালের বস্তা, ২/৩টা ডালের বস্তা, মৌমাছিতে ঢাকা গুড়ের মটকা, নুনের বারকোষ, মুড়ির টিন, চিড়ার টিন, নারকেল তেলের বড়ো বোতল এবং মেঝেতে রাখা কেরোসিন তেলের টিন। গাঢ় একটি গন্ধ ঘরে অদৃশ্য মশারির মতো ঝোলানো, ঘরের ভেতর নিশ্বাস নিলে নাকে তো বটেই, চোখেমুখে মাথায় সেই গন্ধ কুলসুমের মাথায় ঠেকে নিরেট বস্তুর মতো। কুলসুমকে এমন কি নিশ্বাসও নিতে হয় না, ঘন সেই গন্ধ তার মাথায় ঢুকে পড়ে ক্ষুধাতৃষ্ণাকে প্রথম দফায় নিকেশ করে দেয় এবং পলকের ভেতর পেটের মধ্যে তাই আবার জ্বালিয়ে তোলে দাউ দাউ করে। মাদুরে বসবে কি-না চেরাগ আলি ঠিক বুঝতে পারে না, বৈকুণ্ঠের বাবুর ক্রোধ আবার এই দোকানদারের শরীরেও ঢুকলো কি-না এই ভাবনায় বসতে তার হয়তো

বাধো বাধো ঠেকছিলো। এমন সময় কুলসুম হাত বাড়ায়, 'জিলাপি দাও।'

ঢ্যাঙা কালো দোকানদার বারান্দায় পা দিয়ে কারো দিকে না তাকিয়ে বলে, 'ধরো তো।' চেরাগ আলি তার সঙ্গে সেলাই মেশিনের একটা দিক ধরলে দুইজনে মিলে সেটাকে ঢোকায় দোকানঘরের ভেতরে; ওটার জন্যে কেরোসিনের টিন দুটো আগেই তক্তপোষের পেছনে রাখা হয়েছিলো। এখন বারান্দার খালি জায়গার দিকে দোকানদার ইশারা করতেই চেরাগ বসে পড়ে। দোকানদার ধীরে সুস্থে দাঁড়িপাল্লায় এক পোয়া চিঁড়া ওজন করে কলাপাতায় সেই চিঁড়ে জড়িয়ে কুলসুমের দিকে এগিয়ে দেয়, বলে 'খা'। ফের ঘুরে ঢুকে ওজন না করেই একটু আখের গুড় এনে চেরাগের হাতে দিয়ে বলে, 'গুড় দিয়া খাও।' তারপর ঘরে তক্তপোষে নিজের আসনে আয়েশ করে বসে জিগ্যেস করে, 'ফকিরের বেটার বাড়ি কোটে গো?'

চিঁড়া গুড় ও জিলেপির ভোজ খেতে খেতে চেরাগ আলি দোকানদারের এই নিরাসক্ত কৌতূহলের সুযোগ নেয়, ঢোঁক গিলতে গিলতে সে বলে, 'আমরা বাপু নদীভাঙা মানুষ। হামাগোরে আবার বাড়ি কিসের বাপ? এই লাতনিটা আছে, বাপ মরা, মা লিকা বসিছে যমুনার চরের মধ্যে, এখন এটাক হামার সাথে সাথে রাখি।'

লোকটা বিরক্ত হয়, 'লদী ভাঙিছে তো কী? বাড়ি আছিলো না তো লদী ভাঙলো কি? বাড়ি নাই, তোমার মাও কি তোমার জর্ম দিছে ঘাটার মধ্যে?'

চেরাগ আলি তার গ্রামের নাম বলে, সর্বনাশা নদীর করাল গ্রাসের বিস্তারিত বিবরণ দিতে শুরু করে, এমন সময় কাউকে আসতে দেখে দোকানদার কলরব করে ওঠে, 'আরে তমিজের বাপ চাচা, তুমি বাড়িত যাও নাই? শোনো শোনো কাম আছে গো আসো।'

বৃষ্টি ধরে আসছে। এতোক্ষণে আটকাপড়া লোকজন এখন কলরব করতে করতে হাট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আন্ধকারে, 'ও গেদুর বাপ', 'বাজান, বাজান', 'রইস মামু', 'কেষ্টদা, ও কেষ্টদা' 'রমেশ', 'জ্যাঠো, জ্যাঠো গো' প্রভৃতি আহ্বান পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে চেরাগ আলি ও কুলসুম হঠাৎ করে যতোটা তাড়াতাড়ি সম্ভব গপগপ করে খাওয়াটা সেরে ফেলে। তমিজের বাপ এসে ওঠে দোকানের বারান্দায়। দোকানদার তাকে দেখে বেশ খুশি, 'আরে হামি কই, তুমি বলে বাড়িত গেছো। পানি আসার আগেই তমিজেক দেখলাম ঘাটা ধরিছে। তুমি যাও নাই যে?' সে কেন যায় নি তার কারণ না শুনেই তার দিকে একটা থলে এগিয়ে দিয়ে দোকানদার বলে, 'ইস্কুলের সামনে মোষ জবো করিছিলো, একটা ভাগ লিছি, সোয়া দুই সের গোশতো, গোশতোটা হামার ঘরত দিয়া কয়ো, আজ জাল দিয়া রাখবি, কাল ব্যায়না পাক করা লাগবি। আর হামি আজ আর বাড়িত যামু না। আফসার আজ আসবার পারবি না। বাদলার রাত, দোকান খালি রাখা যাবি না।'

চটের থলে নিয়ে তমিজের বাপ বসে পড়লো মাদুরের ধার ঘেঁষে। হ্যারিকেনের আলো তার কালো মুখের ওপর যেন হালকা হলদে ধুলো মাখিয়ে দিয়েছে। হাই তুলতে তুলতে কুলসুম লোকটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তার ঘুম পাচ্ছে, সে তাকিয়েই থাকে। কিন্তু এখানে শোয়া যাবে কি-না কে জানো?—তার চোখ এখন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, সে শুধু তাকিয়েই থাকে।—তমিজের বাপের বিকালবেলা ওই ঝিমানো চোখ অমনি রয়েছে, ঠোঁটজোড়া তার একইরকম ফাঁক-করা। তার চোখ আর

তার ঠোঁটে একইরকম প্রশ্নবোধক চিহ্নের দাগ কাটা। হ্যারিকেনের আলোয় চোখের দুটো মণি থেকে আর ঠোঁটের ভেতরকার দাঁত ও জিভ থেকে সব রঙ যেন মুছে গেছে। মিনমিন করে লোকটা যখন বলে, 'আর গান হবি না?' তখন ঝিমুতে ঝিমুতে কুলসুম দারুণ চমকে ওঠে, মানুষটা কথা বলতে পারে? তার চমকানিটা ভয়ে গড়াবার আগেই দোকানদারের ধমক শোনা যায়, 'তুমি পাগলা হছো চাচা? ফকিরের বাড়িত যাওয়া লাগবি না? কতোখানি ঘাটা তা জানো? না কি তোমার বাড়িত আজ জেয়াফত দিছো?' তমিজের বাপকে এইভাবে বকার ভঙ্গিতেই ফকিরের প্রতি দোকানদারের প্রশ্রয় বোঝা যায়। চেরাগ আলি মোটা ও একটু ঘ্যাসঘেষে গলাটা যতোটা পারে তরল করে, 'বাবা, হামাগোরে বাড়িঘর কিছু নাই। গাঁয়ের কাছে দরগাশরিফ, হামাগোরে পরদাদার পরদাদারা ওই দরগাশরিফ হেফাজত করিছে, এখন ভিনো তরিকার মানুষ দখল কর‍্যা ওটি হামাগোরে থাকবার দেয় না। হামার লাতনিক দেখায়া কয়, মেয়ামানুষ যখন তখন নাপাক হয়, ওটি থাকা হবি না। হামাগোরে থাকার জায়গা নাই বাপু।' দোকানদার একটু নরম হয়েছে বুঝে সে বলেই চলে, 'এংকা ঘুরঘুটা আন্ধার, পানি পড়িচ্ছে, একটা বেটি ছেলেক লিয়া হামি ক্যাংকা কর‍্যা ঘাটা ধরি বাবা?'

হঠাৎ করে গলির ওপাশ থেকে লাফ দিয়ে এসে হাজির হয় বৈকুণ্ঠ। দোকানের চৌকাঠে পা দিয়ে হাত বাড়িয়ে গুড়ের মটকা থেকে একটু গুড় তুলে নিয়ে চেটে চেটে খায় আর বলে, 'আহারের পর মিষ্টিমুখ, ভুরিভোজের পরম সুখ। খাবার পর মিঠা না হলে চলে না।' ধুতির খুঁটে পরিপ্যাটি করে আঙুল মুছে মাদুরে বসে ফকিরের দোতারা হাতে নিয়ে সে টুংটাং করে। বড়োজোর দুই মিনিট, দোতারা বাজানো খান্ত দিয়ে বৈকুণ্ঠ হুকুম ছাড়ে, 'ফকির এটিই কাৎ হও। থাকো, কিন্তু গান শোনান লাগবি।' এরপর দোকানদারকে বলে, 'কালাম মাঝি, ও মাঝিকাকা, চিড়ামুড়ি যা হয় ফকিরের বেটাক খিলাও। লাতনিক লিয়া কি উপাস করবি নাকি?'

'তোর অতোই দরদ তো কিন্যা লিয়া খিলা না। মানা করছে কেটা?'

'তোমার এক জাতের মানুষ, তোমরা খিলালে তিরিপ্ত লিয়া খাবি? হামরা দিলে কী খাবি?'

দোকানদার কালাম মাঝির প্রতিক্রিয়ার তোয়াক্কা না করেই এবার সে চেরাগ আলিকে অনুরোধ করে, 'ফকির, ওই গানটা ধরো তো গো। ওই যে শিথানে পড়িয়া থাকে। আহা কি গান গো। আগে কতো শুনিছি।'

তমিজের বাপ কিন্তু একেবারেই চুপচাপ। একইরকম ঘুমঘুম চোখে সে তাকিয়ে থাকে চেরাগ আলির দিকে, তার চোখ দেখে কুলসুমের গা ছমছম করে, লোকটা কি চোখ খুলে ঘুমায়, সে কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দাদার মুখ দেখছে? কিন্তু ঘুমের জন্যে কুলসুমের ভয় দানা বাঁধতে পারে না, মাদুরের অন্যপ্রান্তে বসে মানুষটা কি তার চোখের ঘুম মাখিয়ে দিচ্ছে কুলসুমের চোখে? চেরাগ আলি গাইতে শুরু করলে কালাম মাঝি বলে, 'ও তমিজের বাপ, শুনলা, তুমি টোপ পাড়ো কিসক? বাড়িত যাও।' লোকটা তবু বসেই থাকে। তার স্থির চোখ চেরাগের দিকে এমনভাবে সাঁটা যে ঘুমঘুম চোখে কুলসুমের মনে হয়, লোকটা যেন তার দাদাকে স্বপ্নে দেখছে। মানুষটা কেমন মানুষ গো?—এতোগুলা মানুষের সামনে বসে থেকে দিব্যি খোয়াব দেখে?—না-কি খোয়াব

দেখছে কুলসুম নিজেই? তাই হবে।—নইলে দাদার গলায় লোহার শিকল ঝোলে কী করে? লোহার শিকল তো সে ছেড়েছে কয়েক বছর আগেই, দরগাশরিফের নতুন খাদেমদের হুকুমে। আর মাথায় কালো পাগড়ি আসে কোথেকে? কিন্তু কুলসুম স্বপ্নই যদি দেখবে তো দোকানদারের 'এই বৈকুণ্ঠ, এটি গান শুনিস? সাহা আসুক, তোক এক চোট দ্যাখাবি।'—এই কথা স্পষ্ট শোনে কী করে? বৈকুণ্ঠ পরোয়া করে না, 'বাদ দাও কাকা। বাবুর বলে মরিচ লষ্ট হচ্ছে আধ মণের উপরে। বাড়িত গেছে, এই জলের মধ্যে আর আসিচ্ছে!' তবে সব ছাপিয়ে ওঠে চেরাগ আলির গান, সেটা কি স্বপ্নের ভেতরে?

'পার্শ্বে বিবি নিন্দ পাড়ে, চান্দ জাগে বাঁশ ঝাড়ে।' আবার এর মধ্যেই নদীতে চেরাগ আলির শয়ে শয়ে বিঘা জমি খাওয়ার মিছে কথাগুলো শুনতে একঘেয়ে লাগে। কিন্তু তাতে চেরাগ আলির মাথা দোলানো ও তমিজের বাপের খোয়াব-সাঁটা চোখ দেখায় ব্যাঘাত ঘটে না। এর মধ্যে কখন যে বৈকুণ্ঠ বলে, 'ও কাকা, তুমি না তোমার বাড়িত একটা মানুষ রাখার কথা কচ্ছিলা গো। অসিমুদ্দি মাঝি বলে তোমার বাঁশঝাড় লিয়া খুব ক্যাচাল করিচ্ছে। তা ফকিরকে জায়গা দাও না। তোমার বাঁশঝাড় দেখাও হবি আবার পরান ভর‍্যা গান শুনবার পারবা।' বাঁশঝাড়ের শোঁ শোঁ ঝাপটায় বৈকুণ্ঠের কথা হারিয়ে যায়। কুলসুমের বন্ধ চোখের পাতার নিচে চোখের মণিতে তখন একটা বাঁশঝাড়। বাঁশঝাড়ের ওপর সাদা চাঁদ। বাঁশঝাড়ের সবচেয়ে উঁচা বাঁশটার ওপর বসে চাঁদ একটু নড়াচড়া করে। পার্শ্বে বিবি নিন্দ পাড়ে, চাঁদ জাগে বাঁশঝাড়ে। তারপর, বাঁশ জাগে বাঁশঝাড়ে, একটা একটা ডিম পাড়ে। ঘুমের মধ্যে কুলসুমের এতোবার শোনা আর এতোবার গাওয়া গান এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। টিনের থালে পয়সা গুনে না মিললে মাথায় যে অস্থির চুলকানি শুরু হয়, প্রায় এই অস্বস্তিতে কুলসুম 'আঁ আঁ' আওয়াজ করে। গান করতে করতে চেরাগ আলি ফকির তার মাথায় আস্তে করে হাত রাখলে সে নিরাপদ ঘুমের মধ্যে ঢলে পড়ে। কিন্তু ফের দেখে, হয়তো গান শুনতে শুনতেই দেখে, বাঁশঝাড়ে ডিম-পাড়া চাঁদের তলে ডিমের ভাঙা কুসুমে হলুদবরণ মাটিতে বুক চিতিয়ে হেঁটে চলেছে কালো পাগড়ি মাথায় এক দাড়িওয়ালা মানুষ, তার হাতে লোহার লাঠি, গলায় শিকল। বাঁশঝাড় পেরোলে মানুষটার সামনে ধূ ধূ বালির চর। সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে উঁচালম্বা সাদা ধবধবে একটা ঘোড়া। ঘোড়ার সারাটা গা জুড়ে খালি তীর বেঁধানো। তীরের মুখে মুখে ঘামের বড়ো বড়ো ফোঁটার মতো রক্তের বিন্দু। লোকটা ঘোড়ার ওপর চড়ে বসতেই ঘোড়া ওই লোকটাকে নিয়ে তার গা ভরা তীর নিয়ে ছুটতে লাগলো। কুলসুম ফের গোঁ গোঁ করে। হায়, হায়, সামনেই যমুনা। যমুনার ভাঙনের আওয়াজ পাওয়া যায়। চেরাগ আলির দোতারায় সেই আওয়াজ থরথর করে কাঁপে। এই তীরবেঁধা ঘোড়া মানুষটাকে নিয়ে এক্ষুনি পানিতে পড়ে কোথায় তলিয়ে যাবে, তার কোনো দিশা পাওয়া যাবে না। চেরাগ আলি ফের তার মাথায় ভালো করে হাত বুলিয়ে দিলে কুলসুম ডুবে যায় ঘুমের গভীর কাদার ভেতরে। কিন্তু এখন? তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়াবে কে? কুলসুমের খোয়াব এখন টাঙানো হয়ে গেছে তমিজের বাপের মুখের সুড়ঙের ভেতরে। বাঁশঝাড়ের চিহ্ন পর্যন্ত নাই, অথচ তমিজের বাপের নাক ডাকায় শোনা যায় যমুনার ভাঙনের আওয়াজ। কুলসুমের শরীর কেমন শিরশির করে, তমিজের বাপের ঠোঁটের ফাঁক থেকে নজর সরিয়ে সে উঠে বসে এবং তার ডান হাতটি রাখে তমিজের বাপের কপালে। এখনো অনেক জ্বর। এদিকে কুলসুমের শরীরের

রক্তস্রোত শিরা উপশিরায় বইতে বইতে তার হাতের তালু পেরোবার সময় সুড়সুড়ি দেয় তমিজের বাপের কপালে। তপ্ত কপালে সে তখন শোলোকের স্পন্দন ঠাহর করে। ঘোরের ভেতর তমিজের বাপ শোনে,

মজনু হুঙ্কারে যতো মাদারি ফকির।
আন্ধার পাগড়িতে ঢাকো নিজ নিজ শির॥
সিনা টান রাখো আর আঁখির ভিতর।
সুরমা করিয়া মাখো সুরুজের কর॥

২৬

কুলসুমের হাতের তালুর স্পন্দনে চেরাগ আলির গলায় মুনসির শোলোকের ডাকে তমিজের বাপ চোখ মেলে। চোখ মেলতেই তার চোখ ফের বুঁজে যায়। নয়নের মাঝখানে সে দেখে, বাঙালি নদীর রোগা স্রোত ধরে তার নৌকা চলেছে পোড়াদহের দিকে। স্রোত রোগা হলে কী হয়, দেড় মণ ওজনের বাঘাড় মাছ আর দুই-দুইজন পুরুষমানুষশুদ্ধ নৌকাটিকে নিজের শরীরের ওপর নাচায় শালী নটিমাগীর মতো। স্রোতের দুলুনিতে ঘুম আরো গাঢ় হয়। নৌকায় একা জাগে তমিজের বাপ, আর জাগে বৌডোবা দয়ের বাঘাড়। কী মস্ত বড়ো বাঘাড় গো! দুই মণের কম নয়। তমিজের বাপের দাদা বাঘাড় মাঝি নাকি তিন মণ বাঘাড় ধরেছিলো? তা হোক, দাদা তার একটু ওপরেই থাক। এই বাঘাড় কি দাদার মাছের নাতি? না-কি তারও বেটা? তা সেদিক থেকে বাঘাড় মাছটার সঙ্গে তমিজের বাপের একটা আত্মীয়তা তো আছেই। তমিজের বাপ ভালো করে মাছটার শরীর দেখে। তারার আলোয় তার গায়ের চখরাবখরা দাগ ঝাপসা হলদেটে দেখায়। বয়সের ছোপলাগা ছাই রঙের বাঘাড় মাছটার একটা চোখ স্থির হয়ে ছিলো তারার দিকে। তা বয়সের চাপেই হোক আর আত্মীয়তা থেকেই হোক, তমিজের বাপের কর্তৃত্ব সে মেনে নিয়েছিলো। কী জানি, বাঘাড় কেন এমন চুপচাপ হয়ে গেলো কে জানে? নৌকা বাওয়াই কি আর তমিজের বাপের নিজের কবজায় ছিলো? মনে হয় না।—পোড়াদহ মাঠের বটগাছের পাশ দিয়ে নৌকা যে কখন পার হয়ে গেলো সে বুঝতে পারলো না। পোড়াদহ মেলার বটতলায় তো তখন ঠাকুরের পূজা চলছে ধুমসে। সন্ন্যাসী ঠাকুরের পায়ের নিচে মানতের জোড়া জোড়া পায়রা বাঁধা অবস্থায় পড়তে শুরু করেছে, কতো দূর থেকে জটামাথা সন্ন্যাসীরা দলে দলে এসে বসে গেছে গাঁজার কলকে হাতে। এসব কিছুই তার চোখে পড়লো না? কেন? নৌকার পাটাতনের এক কোণে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমায় বুধা আর গোটা পাটাতন জুড়ে শুয়ে শুয়ে বাঘাড় কী ফন্দিই আঁটে যে, পোড়াদহ মেলার ঘাট তমিজের বাপের নজরেই পড়লো না? ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা প্রায় পোয়া ক্রোশ গেছে এই স্রোতের পাশে। সেই রাস্তা ধরে যমুনার পাঙাস, রুই,

কাতল, আড় আর ছোটো বাঘাড়ের গোরুর গাড়ি রাতভর চলেছে ক্যাঁচক্যাঁচ করে; তমিজের বাপ দিশা পায় নি। গোরুর গাড়ির ক্যাঁচক্যাঁচ কাতরানি সুরে সুরে বাজিয়ে তুলছিলো ফকিরেরই কোনো শোলোক এবং তমিজের বাপ, বলা তো যায় না, বেসুরো ও হেঁড়ে গলায় নিজেও গলা ধরেছিলো তার সঙ্গে। বুধা শুনতে পেরেছিলো কি-না কে জানে, কিন্তু বাঘাড় মাছ নিশ্চয়ই সাড়া দিয়েছিলো। নইলে তার লেজ নাড়ানো পর্যন্ত থেমে গেলো কেন? আবার এমনো তো হতে পারে, বাঘাড়টাই তার ঠাণ্ডা রক্তের হিম ছুঁয়ে দিয়েছিলো তমিজের বাপের শরীরে আর তাইতে সে সব ভুলে এক নাগাড়ে খালি নৌকা বেয়েই গেলো, দুই পাশের কিছুই তার নজরে পড়লো না।

পোড়াদহ মেলার মাঠ বাঁয়ে ফেলে শঙ্করের ঘাট পেরিয়ে তমিজের বাপের নৌকা ঢুকে যায় কাৎলাহার বিলে। বিলে তো বাঙালি পানি ঢালে বিলের উত্তর সিথান দিয়েই। তমিজের বাপ নৌকা নিয়ে ঢুকলো সেদিক দিয়েই, অথচ পাকুড়গাছ তার চোখেই পড়লো না। এটা অবশ্য মুনসিরই কারসাজি। গিরিরডাঙার মানুষ সবাই তো তার ওয়ারিশ। দিন নাই, রাত নাই, বর্ষা বাদল খরা শীত নাই, কত্তো বচ্ছর থেকে পাকুড়গাছে বসে সে পাহারা দিয়ে আসছে তার ওয়ারিশদের। তারই খাটানো গায়েবি জালের ভেতর দিয়ে নৌকা চলে এবং তমিজের বাপ দেখতে পায় যে, ছাই রঙের ভেড়ার পাল সাঁতার কেটে চলেছে তার পাশাপাশি একই তালে ও একই গতিতে। বিলের ওপর নৌকা চলে তরতর করে, ফকিরের ঘাটে এসে পৌঁছুতে ভেড়াগুলো মাথা ঘুরিয়ে ফিরে চলে উল্টো স্রোতে। ওদের আর দেখা যায় না, তবে পানির ঢেউ থেকে বোঝা যায়, গজার মাছের চেহারা ফিরে পেয়ে ডুবসাঁতার দিয়ে তারা চলে যাবে পাকুড়তলার দিকে। বিলের দক্ষিণে নৌকা পৌঁছুতে পৌঁছুতে পানির ওপরকার কুয়াশায় লাগে গোলাপি আভা এবং গোটা বিল তিরতির করে কাঁপে। তার মানে মুনসি এখন শুরু করেছে তার গায়েবি জাল গোটানো। এখন ঠিক সুবেহ সাদেক। মুনসির জাল গোটানোর সময় বিলের মাছ যে যেখানে যেমন আছে ঠিক তেমনি স্থির হয়ে থমকে থাকবে। বিলের দুই পাশের গোরুবাছুর বলো, হাঁসমুরগি বলো, মানুষজন বলো, ঘাস লতা গাছপালা কেউ এক তিল নড়বে না। তমিজের বাপ ধন্দে পড়ে, একটু দেরিই হয়ে গেলো। এখন মুনসিকে এই মাছ না দেখিয়ে সে পোড়াদহ মেলার দিকে নৌকা ফেরায় কীভাবে?

এমন সময় ফজরের আজান শুনে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। মুনসি জালের দড়ি ধরে সোজা উড়াল দেবে দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে। এখনই সময়। মুনসিকে একবার দেখাবার জন্যে বাঘাড় মাছটাকে সে দুই হাতে ধরে তার মস্ত বড়ো মাথাটাকে রেখে দিলো নৌকার গলুইয়ের ওপর। আজান শেষ হতেই তমিজের বাপ আবছা আলোয় আর আবছা আন্ধারে দেখলো, মুনসি, হ্যাঁ মুনসি ছাড়া আর কে হবে?—এসে দাঁড়িয়েছে মণ্ডলবাড়ির শিমুলগাছের কাছে, বিলের ধার ঘেঁষে। মুনসি তার ফুটো গলায় জিগ্যেস করে, 'মাছ নিস?'

তমিজের বাপ তখন গোলাপি রঙলাগা কুয়াশায় চোখ ভরে দেখে নেয় মুনসিকে। আগুনে তৈরি তার সাদা দাড়ি মিশে গেছে কুয়াশায়, মুনসির ভাঙা গালের দুই পাশে ও চিবুকের নিচের গোলাপি কুয়াশা তার দাড়িরই আস্ফালন ছাড়া আর কী? তার মাথার কালো পাগড়ির দাপটে ওপরের কুয়াশা একটু ময়লা। বুকের শেকলে লোহার ঝনঝন আওয়াজ তুলে মুনসি হাঁকে, 'বিলের মাছ লেয় কেটা রে? কেটা?' শুনে তমিজের বাপের বুক কাঁপে। কিন্তু ভয়ে নয়। তা হলে?—মুনসিকে দেখে?—না, তাও নয়। তমিজের বাপ

তো জানে, ঠিক সময়ে ঠিক জায়গা থেকে সাফ দিলে সাফ নজরে তাকাতে পারলে গিরিরডাঙার মাঝিপাড়ার বাসিন্দা মুনসির দেখা পাবেই। আসলে তার গতর কাঁপে মুনসির বেড়জালের টানে। গোটা কাৎলাহারের বিল তো তারই জালে ধরা পড়ে, আবার ছাড়া পায় এই জাল থেকেই। তা সেই মুনসির এখন রাগ হবে না কেন?—বিলের মাছ, বিলের পানি, বিলের বাসিন্দা মাঝিপাড়ার মানুষ সবই তো তারই ওয়ারিশ। আর এখন বিল দখল করে কোথাকার কোন শরাফত মণ্ডল তো মুনসির রাগ হবে না? এই তো কাল যমুনার মাঝিরা মুনসিকে খাজনা দিয়ে বিলের মাছ সব ছেঁকে নিয়ে গেলো, আজ মেলায় তারা সেই মাছ বেচবে। গিরিরডাঙার মাঝিদের বেটাবেটিরা একটা পুঁটি কি খলসে পর্যন্ত পাতে দেখতে পারলো না। তো মুনসি রাগ করবে না তো কি খুশিতে নাচবে? —পানির মাছ তো সব মুনসিরই সম্পত্তি। কাৎলাহারের মাছ তো বটেই, যমুনার মাছ বলো, বাঙালির মাছ বলো, মরা মানাসের দ'য়ের মাছ, এমন কি মুনসির সেই আমলে শাহ সুলতানের দরগায় কোম্পানি খাজনা ধরলে দুঃখে লজ্জায় শুকিয়ে যাওয়া করতোয়ার মাছ পর্যন্ত সবই মুনসির পোষা জীব, সবাই মুনসির বশে। চেরাগ আলি বলতো, মুনসির লোহার পান্টিতে মাছের নকশা। —তা হলে? তা হলে এই বড়ো বাঘাড় মাছটাও তো তারই পাওনা। এতো বড়ো মাছটা ধরতে পারলেও মেলায় আর নেওয়া গেলো না, তমিজের বাপ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে : মুনসি কোনোদিন তার দিকে ফিরে তাকালো না, তার দিকে মুনসির খালি নিনজর। না বাপু, যাই কও, মুনসির লালচটা একটু বেশি। চেরাগ আলি ফকিরকে মুনসি এতো দয়া করেছে, তার ওপর তার রহমতের আর শেষ ছিলো না, এর রহস্যটিও তমিজের বাপ বোঝে। কী?—না, হাটে হাটে, পথে পথে, চাষের জমিতে, রেলগাড়িতে দোতারায় সুর তুলে মুনসির শোলোক মানুষকে শুনিয়ে ফকির আসলে তোয়াজ করেছে মুনসিকে। মুনসি বড়ো তোয়াজের কাঙাল গো! তমিজের বাপের তো শোলোক বলার ক্ষমতা নাই, সে আর তোয়াজ করে কী করে? আবার এতোদিন তো সে বিলের ধারে ধারে ঘুরে বেড়িয়েছে খালি হাতে, তাকে তাই মুনসি দেখাও দেয় নি। আজ আর তার হাতে এতো বড়ো বাঘাড় মাছ, মুনসি নিজেই উঠে এসেছে একেবারে দক্ষিণ মাথায়।—তা যার যা পাওনা তা তাকেই দেওয়া লাগে। দীর্ঘশ্বাসটি সম্পূর্ণ ফেলার আগেই তমিজের বাপ মুনসির পাওনা মুনসিকেই ফিরিয়ে দেয়। তার হাতের ধাক্কায় বাঘাড় মাছ একটু সরে যায়, তারপর ঝপাত করে আওয়াজ হলে বিলের পানিতে তোলপাড় ওঠে, গোলাপি কুয়াশায় লাগে সাদা রঙ এবং মস্ত বাঘাড় তার শ্যাওলা কালো চখরাবখরা দাগ নিয়ে ডুব দেয় কাৎলাহার বিলের ভেতরে। চোখের পলকে সে নেমে যায় অনেক নিচে এবং উত্তরে পাকুড়তলায় যাবার জন্যে লম্বা ডুবসাঁতার দেয়। হয়তো এই মাছ ধরার জন্যেই আলোর সোয়ার হয়ে মুনসি তার আগেই পৌঁছে যাবে বিলের উত্তর সিথানে; পাকুড়গাছে নিজের আস্তানায় বসে শকুনের চোখের মণি হয়ে সারাটা দিন সে ফালাফালা করে দেখবে সূর্যের যাওয়া আর আসা অথবা রোদ হয়ে সে মিশে থাকবে রোদের সঙ্গে। আর হাপসে গেলে পাকুড়গাছের ঘন পাতায় হরিয়াল পাখির বুকের ছোটো লোমের মধ্যে লোমশিশু হয়ে হরিয়াল পাখির মাংসের ওমে টানা ঘুম দেবে সারাটা দিন।

তবে মুনসি তখনো উড়াল দেয় নি। বিলের পাড় থেকে হাঁক ছাড়ে 'এই শালা মাঝির বাচ্চা, খানকির পয়দা, এটি আয়, লাও এই ঘাটোত ভেড়া।'

মুনসির ধারাই অন্যরকম, সে গালি দিয়ে কাছে ডাকে। ব্যাকুল হয়ে নৌকা ঘাটে

ভিড়িয়ে তমিজের বাপ কাদায় নামতেই তার মাথায় পড়ে মাছের নকশা আঁকা লোহার পান্টির এক বাড়ি। বাড়ি মারতে মারতে ফুটো গলায় মুনসি হাঁক দেয়, 'এই শালা ডাইঙার বাচ্চা, শালা বারোভাতারির পয়দা, জাউরা শালা, মাছ চুরি করবার আসিস? লিত্যি তুই বিলের ধারত ঘুরিস, হামি জানি না, না? ট্যাকা পয়সা খরচ কর্‌যা লায়েবের হাতোত পায়োত ধর্‌যা হামি বিল পত্তন লিলাম, শালা তোক মাছ খিলাবার জন্যে?'

লোহার পান্টির বাড়িতে তমিজের বাপের মাথা ঘুরে যায়, মুনসির বেশিরভাগ কথা সে বুঝতেই পারে না। তবে ঝাপসা চোখে তার নজরে পড়ে, মুনসির পাগড়ি খসে পড়েছে, তার মাথায় কিসতি টুপি; তার বুকের শেকল চাপা পড়েছে গরম চাদরের নিচে, তার গলার ফুটো মাফলার দিয়ে ঢাকা। এমন কি হাতের লোহার পান্টিটাও বোলওয়ালা খড়মের আদল নিয়েছে। তমিজের বাপের সামনে থেকে মুনসি হাওয়া হয়ে সেখানে রেখে যায় শরাফত মণ্ডলকে। তাইতো, শিমুলগাছের সাদা বকেরা ওপরে ওড়ে, বিলের ধারে শরাফত মণ্ডলকে পিতিষ্ঠা করে মুনসি উড়াল দিয়েছে পাকুড়তলার দিকে। শরাফতের পেছনে টর্চলাইট হাতে তার বড়ো বেটা আবদুল আজিজ। আবদুল কাদের হঠাৎ করে ধরে ফেলে বাপের খড়ম ধরা হাত। আরো কেউ কেউ বোধহয় ছিলো। হুরমতুল্লাহ এলো কোত্থেকে? বৈকুণ্ঠের মতো কাকে যেন দেখা গেলো। তার পাশে ওটা কি তমিজ?

এগুলো সবই তমিজের বাপের সামনে বড়ো এলোমেলো ঠেকে। মুনসি একেবারে এখানে এসে তাকে দেখা দিয়ে গেলো, তার লোহার পান্টির বাড়িতে মাথা তার টনটন করে। তারপর সে কি পাকুড়তলায় গেলো? কিছুই মনে নাই। এতোসব কাণ্ড দেখতে সে কেবলি হাপসে যায়। তার গতরটা বড়ো কাঁপে। জ্বরের পুরু কম্বলের নিচেও সে ওম পায় না। আরে সে তো সে, উত্তরে পাকুড়তলা থেকে দক্ষিণে সাদা বকে ছাওয়া শিমুলগাছ পর্যন্ত কেবলি কাঁপে। বিল বলো, ডাঙা বলো, কিছুই থিতু হতে পারে না।

২৭

পোড়াদহের মেলা থেকে তমিজ বাড়ি ফেরে অনেক রাত করে। অতো রাতে মেলা-ফেরতা মানুষের কলরবে মাঝিপাড়া গমগম করে ওঠে, ঘুমিয়ে-পড়া বৌঝিরা জেগে উঠে পুরুষদের হাত থেকে ঝোলা তুলে নেয়, ছেলেমেয়েরা জিলেপির আর তেলে-ভাজার গন্ধে ঘুমের মধ্যেই গড়িয়ে পড়ে নতুন কোনো স্বপ্নে। আর তমিজের ঘরে তার সঙ্গে ঢোকে শুধু কালাম মাঝি। তমিজের বাপের ঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে বলে, 'ও চাচা, ও তমিজের বাপ, কাল জুম্মাঘরত একবার আসো তো বাপু। মণ্ডল তোমার গাওত হাত দিছে, হামরাই সালিশ করমু। শুনিছো তো, হামার তহসেন হাবিলদার হবি, এই মাসেই প্রমোশন হওয়ার কথা, তাই এবার মেলাত আসবার পারে নাই। তহসেন একটা চিঠি লেখলে আমতলি থ্যাকা দারোগা লিজে অ্যাসা মণ্ডলকে ব্যান্দা লিয়া যাবি। কাল

তুমি একবার আসো।'

কালাম মাঝি চলে গেলে ঘরটা ঝপ করে নীরব হয়ে যায়। কুলসুম তমিজের দিকে তাকায় না পর্যন্ত। তমিজের বাপের জ্বরো শরীরটা নিয়ে তামামটা দিন যে কীভাবে কাটলো তা এক আল্লা ছাড়া আর কেউ জানে না। জানার দরকারও নাই। আর তমিজ মেলায় ফুর্তি করে ফিরলো এতো রাতে। আর তার আদরের বাহার কতো! —শালপাতার ঠোঙা করে জিলেপি এনেছে, কদমা এনেছে, বেগুনি পেঁয়াজি, কতোরকমের তেলে-ভাজা। খলুইতে বড়ো মাছের ভাগা, মাছে পচনের গন্ধ। আনুক! কুলসুমের কী?

তবে ছোঁড়ার গায়ের জোর বটে। বাপের অতো বড়ো গতরটা সে একাই তুলে ফেললো মাচার ওপর। কুলসুম আড়চোখে তার হাতের ক্ষমতা দেখে। তাও তো কাল থেকে বাড়ির বাইরে, সারাটা দিন মুখে তার কিছু পড়েছে কি-না কে জানে? এই খালি পেটে মানুষটা সারা দিন কী খাটনিটাই না খেটেছে।

ডোবা থেকে তমিজ কলসি ভরে পানি আনে। মেঝেতে বড়ো একটা মালসা রেখে বাপের মাথায় পানি ঢালে, গজর গজর করে, 'গাও বলে পুড়্যা যায়, এক বদনা পানিও ঢালা হয় নাই।' রাগ করে কুলসুম জবার দেবে কী, তমিজের বাপের বিছানায় পানি গড়িয়ে পড়তে দেখে তাকে এগিয়ে আসতে হয় তমিজের হাত থেকে বদনা নিতে। বেটাছেলে কি আর এসব কাম কুলাতে পারে গো? অনেকক্ষণ ধরে পানি ঢালার পর কুলসুম স্বামীর মাথা মুছে ভেতরের উঠানের দিকে পা বাড়ালে তমিজ তার হাতে তুলে দেয় তেলে-ভাজার ঠোঙা। এই মাঝরাতে এসব খেতে বয়ে গেছে কুলসুমের। ঠোঙাগুলো মাচার এক কোণে ফেলে রেখে সে তুলে নেয় মাছের খলুই। উঠানে বসে সে মাছ ধোয়, মাছ কোটে আর বাপের পাঁজরার কাছে বসে তমিজ একটার পর একটা জিলেপি খায়।

তমিজের ঘাড়ে চিনচিন করে ব্যথা, ব্যথাটা খুব একটা কষ্ট দেয় না, বরং একটু মিষ্টি মিষ্টিই লাগে। এই ঘাড়ে আজ কাঠের জিনিস বওয়া হলো মেলা। আম কাঠের, কাঁঠাল কাঠের খাট, তক্তপোষ, আলনা, বেঞ্চি, টুল, চেয়ার, পিঁড়ি—একেকটা ভারি কী। কামলা তো আরো মেলা ছিলো, তমিজের মতো এতো বইতে পারলো না আর কেউ। মেলা পয়সা কামালো সে। এই টাকাটা রেখে দেবে একদম আলাদা করে। আজ মেলায় কামলা খাটার বুদ্ধিটা পাওয়া গেলো;—সামনের দুই মাসে ওদিকে বাগবাড়ি নিশানের মেলা, দক্ষিণে এলাঙ্গির মেলা, তারপর ধরো রয়াদহের ফকিরের মেলা। আর করতোয়ার পশ্চিমে চৈত্র পর্যন্ত তো সপ্তাহে সপ্তাহে কোথাও না কোথাও মেলা একটা লেগেই থাকে। কয়েকটা মেলায় গতর খাটাতে পারলে তার রোজগার খায় কোন শালা? ঐ রোজগারের একটা পয়সাও সে সংসারে ঢালবে না। জোড়া গোরু কিনবে দশটিকার হাট থেকে। একেকটা গোরু মোষের সমান, দশরথের হাঁপর থেকে ফলা গড়িয়ে নিয়ে লাঙলের সঙ্গে গোরু জুতে দিলে এক চাষে মাটি উপড়ে আসবে দেড় হাত নিচে থেকে। এক বিঘা জমিতে আমন তো আমন, আউশও সে যা তুলবে, এই তামাম এলাকার কোনো চাষার বেটা স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবে নি। নিজেদের ভিটার জমিটা সে খাইখালাসি নেবে শরাফতের কাছ থেকে, সেই জমির মাটি কী! মাখনের মতো মাটি, দুটো চাষ দিলেই ধান বাড়ে দুব্বার মতো। কিছু টাকা জমালেই সে জমিটা পায়। টাকা সে জমাতে পারবে না কেন? তার তো আর চাষাদের মতো আলগা ফুটানি নাই, ফুর্তি করে পয়সা ওড়াবার

বান্দা সে নয়। এই যে শালা কেরামত আলি, পুবের চরুয়া চাষা, এখন গান করে করে খুব নাকি পয়সা কামায়। কিসের কামাই? তার কামাইয়ের বরকত কোথায়? আজই তো কতো টাকা ঢেলে এলো নটির ঘরে। এভাবে ওড়ালে পয়সা কামাই করে লাভ কী?

বটতলার ঘাট থেকে মাছহাটির ভেতর দিয়ে তমিজ ঘাড়ে করে কাঠের আলনা নিয়ে যাচ্ছে কাঠপট্টির দিকে, তো হুরমতুল্লার সঙ্গে দেখা। 'ক্যা রে, তমিজ, হামার জাময়েক দেখছিলু?'

'তোমার জামাই? কেটা? ও কেরামত? উঁই তো তামাম দিন মেলার মদ্যেই।'

'কেরামতেক মাছ কিনবার দেখিছু?'

'না তো।' মাছহাটির দিকে কেরামতকে তমিজ কৈ একবারো তো দেখে নি। অথচ, হুরমতুল্লা জানায়, মেলা দেখতে হুরমতুল্লা তাকে পুরো চারটা টাকা দিয়েছে। তার আশা, জামাই ভালো দেখে যমুনার একটা রুই কি কাৎলাহার বিলের এক কুড়ি পাবদা কিনবে। তা হলে হুরমতুল্লাকে খালি খালি মাছ কিনতে পয়সা নষ্ট করতে হয় না। তা সেদিকে কি আর তার গুণধর জামাইয়ের কোনো খেয়াল আছে? যুধিষ্ঠিরের কাছে তমিজ কয়েকবার শুনলো, কেরামত খালি ঘোরাফেরা করছে সার্কাসের আশেপাশে আর সার্কাসের তাঁবুর পেছনে মেলার মাঠের একেবারে উত্তরে চাটাইয়ের বেড়ার ওধারে। আলনা কাঁধে দাঁড়াতে একটু কষ্ট হলেও তমিজ ইচ্ছা করেই বলে, 'তোমার জামাই শুনলাম ঐদিকে আছে। দেখো, ঐ বেড়ার দিকে উটকাও?' তা সেদিকে আর হুরমতুল্লা যায় কী করে? হুরমতুল্লার অন্ধকার মুখ দেখে তমিজ খুশি হয়ে ফের বলে, 'ঐ তো তাম্বুর ওটি না হয়—।'

হুরমতুল্লা আর দাঁড়ায় না। সে ঘুরছিলো দশরথের সঙ্গে। দশরথ কর্মকারও নিজের জামাইয়ের ওপর একটুও প্রসন্ন নয়। সারা বছর কোনো যোগাযোগ রাখে না, যুধিষ্ঠিরের মা মরার আগে মেয়েকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলো, চণ্ডাল জামাই শাশুড়ির মরার খবর না পাওয়া পর্যন্ত বৌটাকে আসতেই দিলো না। আবার দেখো, সন্ন্যাসীর মেলা লাগার তিন দিন আগে এসে হাজির একেবারে গুষ্টিশুদ্ধ। বোন বোনাইকে পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। জামাইকে ধুতি দাও, তার বোনাইকে ধুতি দাও, মেয়েদের শাড়ি দাও। হ্যান দাও ত্যান দাও। দুই সন্ধ্যা মাছ দিয়ে ভাত খাওয়াও, পিঠা বানাও, পায়েস করো। আবার মেলার দিন জামাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে নগদ সাতটা টাকা। যুধিষ্ঠির দেখে এসেছে, জামাইবাবু তার বসে গেছে জুয়ার আসরে। মাছ কি দৈ কিছুই কেনে নি, কেনার কোনো আশাও নাই।

দশরথ ও হুরমতুল্লা নিজের নিজের জামাইয়ের কীর্তি সবটাই পরস্পরকে না বললেও নিজেদের কপালের দোষ দেয়। দুজনে একসঙ্গে জিলেপির দোকানে ঢোকে এবং একই আক্ষেপে একেকজন অন্তত আধ সের করে জিলেপি খায়।

সার্কাসের তাঁবুর ওপারে বাঁশের নতুন বেড়া চোখে পড়ে আর তমিজের মেজাজটাও খিঁচড়ে আসে, সে কি অন্তত একবার ঐ জায়গাটা ঘুরে আসতে পারে না? এতো খাটনি যাচ্ছে, একটু ফুর্তি করবে না?

তা সন্ধেবেলা কাঠ বইবার সুযোগ কম, এদিক ওদিক তাকিয়ে তমিজ সেখানে একবার গিয়েছিলো বৈ কি। নতুন বাঁশের দরজা ভেজানো, ঝোঁকের মাথায় তমিজ একটু ঠেলতেই খুলে গেলো। ভেতরে জনাচারেক মানুষ। গলা শোনা যায় কেরামত আলির। সুর করে সে গাইছে,

লাল ডুগাডুগ কুসুমলটি নাকে তাহার তিনটি খুঁটি গাড়া।
সেই পুরুষের সবই বির্থা যে দিলো না তার দুয়ারে পাড়া॥

কেরামত আলি আসর জমিয়ে রেখেছে দেখে তমিজের বুকে ছোটো একটি কাঁটা বেঁধে : শালা এই মানুষটা যেখানেই যায়, কেবল শোলোক বেঁধে বেঁধেই সবাইকে মাত করে রাখে। তবে তমিজের বুকের কাঁটাটা ছিলো একটি কাঁটার কুঁড়ি, ফোটার আগেই বিনাশ ঘটে অঙ্কুরেই। হাজার হলেও মানুষটা কেরামত আলি, আবদুল কাদেরের সভায় এর গান শুনে সেদিন তমিজ কেমন চাঙা হয়ে উঠেছিলো। তাকে দেখে কেরামত চিৎকার করে ওঠে, 'আরে তুমি? আসো আসো। ও কুসুম, কুসুমরানী, কুটুম্ব আসিছে ঘরত। বসবার দাও গো, পান দাও, তামুক সাজো।'

মেঝেতে সতরঞ্চির ওপর চাদর পেতে বসা সবারই পরনে ফর্সা ধুতি, গায়ে জড়ানো শাল। একজনের গায়ে কালো কোট, তবে নিচে ধুতি। কেরামতও ধুতি পরে এসেছে, তাকে রীতিমতো ভদ্দরলোকের মতো দেখায়। লাঠিডাঙা কাচারির এক কর্মচারীর পাশে বসে থাকা রোগাপটকা মেয়েটির মস্ত উঁচু বুক দেখে তমিজ থতমত খায়, আবার তাকে তো কেউ বসতেও বলে না। আর বললেই বা সে বসে কী করে? দাঁড়িয়ে থাকতেও তার পা কাঁপে। এখন ভরসা কেরামত আলি। কেরামত আলির 'চোখ দুটি তার নয়নতারা, রসিক নাগর পাগলপারা' কথাগুলি তার সারা গায়ে বিলি কেটে দেয়, তার মাথায় সে পায় কাঁচা শুপারি খাবার আমেজ। কেরামত আলি যখন আছে, সেই যখন এখানকার গায়ক, তখন বোধহয় ফরাসে না হলেও অন্তত মাটিতে বসা যায়, তমিজ এরকম ভাবছে এমন সময় কেরামত গেয়ে ওঠে, 'সে আমারে ডেকে নিলো, তিতা মিঠা পান খাওয়ালো, পান খাওয়ালো, তিতা মিঠা পান খাওয়ালো।' কাছারির কর্মচারী হেসে উঠলে সবাই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে এবং একজন হাসতে হাসতেই বলে, 'পানও বলে তিতা হয়? কবি হামাগোরে কতো কথাই কবার পারে গো!' সবার হাসি ও একজনের তারিফের কথায় সায় দিয়ে তমিজ হাসতে চেষ্টা করে, কিন্তু সাহস পায় না। তবে আরেকটু এগিয়ে দাঁড়ায়। সবার হাসি ও তারিফে কেরামত একটু মাথা নুয়ে হেসে দ্বিগুণ বেগে গান চড়ায়,

নাগর হলো মাঝির বেটা তারে এখন বোঝায় কেটা
কুসুমরানীর আধমণি বুক ধরা তো নয় মাছটি মারা।
বিশসেরি বুক ধরা তো নয় বেড়জালে বাঘাড়টি ধরা॥

লোকজনের প্রবল হাসিতে তমিজের শরীর থেকে বিলি কাটা গান সম্পূর্ণ ঝরে পড়ে এবং ঐ গানই সমবেত হাসির দমক হয়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে বার করে দেয় ঘর থেকে। বাঁশের দুয়ার ঠেলে বেরিয়ে আসতে আসতে তমিজ শোনে সবার প্রবল হাসি ছাপিয়ে উঠছে কেরামতের গানের পরের কলিটি, 'লটির পাওনা ফাঁকি দিলো মাঝির বেটার কেমন ধারা?'

তখন থেকে তমিজের মাথাটা গরম এবং শরীরটা ঠাণ্ডা। এক নটিমাগীর সামনে, বেশ্যার সামনে কেরামত আলি তাকে এমন হেনস্থা করলো? তার ইচ্ছা করছিলো, মেলা থেকে সোজা চলে যায় নিজগিরিরডাঙায় এবং ঐ শালা কেরামতের বৌকে ডেকে নিয়ে শুয়ে পড়ে মোষের দিঘির পুবের ঢালে। কিন্তু শরীর থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

শরীরের তাড়ায় নয়, মাথার গরমেই অতিষ্ঠ হয়ে তমিজ একবার মেলা থেকে বলতে গেলে রওয়ানা হয়েই গিয়েছিলো, কিন্তু তখন কাঠপট্টির বড়ো বড়ো খদ্দেরের নৌকায় খাট আর আলনা বেঞ্চি তোলা হচ্ছে, ফুর্তি টুর্তি শেষ, এখন তারা বাড়ি রওয়ানা হবে। তমিজকে তাই মেলাতেই থাকতে হলো। তা শেষ পর্যন্ত ছিলো বলেই তিন আনা কম তিন টাকা রোজগার তো হলো।

এতো রোজগারেও জান ভরে সুখ তার হয় না : এক বেশ্যামাগীর সামনে কেরামত তাকে এমন অপমান করলো। কুসুমনটির ধামার মতো বুক তাকে এতোটুকু উত্তাপ দেয় না; তার হাতপা জাড়ে কাঁপে। কেন?—মেলার শেষে নৌকায় একটা মস্ত খাট তুলে দিতে দিতে সে ঐ খাটের খরিদ্দারের চাপা গালি শোনে, 'শালা বেন্যার বাচ্চা, আজ তুই কার ঘরোত ঢুকিছিলু জানিস? কেরামতকে লিয়া গেছি গান শোনার জন্যে; তাই তুইও যাবু? কুসুম নটির ঘরত যায়া জান লিয়া বারায়া আসবার পারলু, তোর বাপের বরাত।' কুসুমনটির ঘরে তমিজ ঠিক ঠাহর করতে পারে নি, এখন বোঝে, ঐ লোকটা হলো জোড়গাছার মফিজ সরকার। নৌকায় ওঠার সময় সরকারের সঙ্গে ছেলে ছিলো বলে লোকটা তমিজকে আর ঘাঁটালো না। নইলে নিজের হাতেই আচ্ছাসে শিক্ষা দিয়ে দিতো।

তমিজের বাপের গায়ের শীত হঠাৎ করে দারুণ বাড়ে এবং তার প্রবল কাঁপুনি জ্বর ও ঘুম ফুঁড়ে তাকে খোঁচা দেয় এবং তাইতেই কি-না কে জানে ছটফট করতে করতে সে পাশ ফিরে শোয় এবং মুখ দিয়ে আঁ আঁ আওয়াজ করতে থাকে। তমিজ তখন হাত দেয় বাপের কপালে, তার খসখসে দাড়িওয়ালা গালে এবং জানতে চায়, 'বাজান। তোমার ক্যাংকা ঠেকিচ্ছে গো? ও বাজান!'

এরকম করে বাপকে সে কখনো ডেকেছে কি-না তার নিজের অন্তত জানা নাই। তমিজের বাপকে জিগ্যেস করলেও বেটার এরকম হামলে ডাকার কোনো নজির সে মনে করতে পারবে কি-না সন্দেহ। বেটার এমন অপরিচিত ডাকে সে সাড়া দেয় না। অথবা জ্বর চড়তে থাকায় সে ডুবে গিয়েছিলো অতল ঘুমের মধ্যে। বাপের কপাল আর দাড়িওয়ালা মুখ থেকে তমিজ নিজের হাত নিয়ে যায় কাঁথার ভেতরে এবং বাপের তপ্ত শরীরে ঐ হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বেশ ওম পায়। বাপের গতরের গা-পোড়ানো তাপ তার একটু আগে পানি-ঘাঁটা হাত আর মফিজ সরকারের মুখে কলজে-ফুটো-হওয়া বুক থেকে বইতে থাকে সারা শরীর জুড়ে। হয়তো এই তাপেই মুছে যায় কেরামতশুদ্ধ কুসুমনটির ঘর। তমিজ শুয়ে পড়ে বাপের পাশে, তার কাঁথার অনেকটাই তুলে নেয় নিজের শরীরে এবং বাপকে জড়িয়ে ধরে তার জ্বরের আঁচে গা পোহায়।

বাপের তাপের ওমে তমিজ ঘুমিয়েই পড়েছিলো হয়তো। উঠান থেকে ডাকলো কুলসুম, 'ভাত হছে।'

কয়েকবার ডেকেও সাড়া না পেয়ে কুলসুম গজরাতে গজরাতে ঘরে আসে এবং বাপবেটাকে এমন জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকতে দেখে কিছুক্ষণ সেদিকেই তাকিয়ে থাকে। কাঁথার কাছে মুখ নিয়ে কুলসুম জোরে জোরে নিশ্বাস নিয়ে কী ঠাহর করার চেষ্টা করে। কিসের গন্ধ সে পায় সে-ই জানে, তমিজের বাপের গায়ের তাপে তার নাক জ্বলছিলো কি-না তাই বা বলবে কে? তবে তার গন্ধ নেওয়ার তীব্র টানে ঘুম থেকে তন্দ্রায় উঠে আসে তমিজ। তন্দ্রার ঘোরেই তমিজ শোনে, কুলসুম আপন মনে গজর গজর করছে, 'এই মানুষটাক বলে ওংকা কর্যা মারে? এই সাদাসিদা আবোর মানুষটাকও বলে খড়ম দিয়া মারে? বুড়া শকুন, মণ্ডলের হাতপাও খস্যা খস্যা পড়বি, বুড়া শকুন কুষ্ঠ

হয়া মরবি, তামাম গাওত তার কুঠ হবি।' শরাফত মণ্ডলের হাতপা জুড়ে কুষ্ঠ ছড়িয়ে ফেলার জন্যে অনির্দিষ্ট ও অপরিচিত কর্তৃপক্ষের কাছে সে বেশ কয়েকবার আবেদন জানায়। শেষে কুষ্ঠের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগ মণ্ডলের শাস্তির জন্যে যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায় কোনো অপঘাতে সে তার আশু মরণ দাবি করে, 'তেরাত্তির যাবি না, তোমরা শোনো, এক রাতও লাগবি না, বুড়া আজই মরবি। তার কিসের জোতজমি, তার কিসের বিল, বুড়ার মাথাত ঠাঠা পড়বি। ঠাঠা পড়বি!'

পাতলা তন্দ্রার ঘোর কাটতে থাকে তমিজের। কুলসুমের শাপমণ্যি তার কানে বাজে শোলোকের মতো। কুলসুমের অভিশাপে কেরামতের গানের তেজ, কেরামতের গানের ধার। চেরাগ আলির নাতনি, কিন্তু তার কথা তো চেরাগ আলির শোলোকের মতো নয়। তা আর হবে কী করে? ফকির চেরাগ আলির গান তো তার নিজের বাঁধা শোলোক নয়। সেগুলো কে কবে বেঁধেছিলো, কোন দেও না দানব, কোন ফকির না সন্ন্যাসী, কোন জিন না ফেরেশতা, সেগুলো নাজেল হলো কোত্থেকে—সে খবর অন্যে পরে কা বাত, চেরাগ আলি নিজেও তো জানতো না। আর কেরামত গান বাঁধে নিজে। তার তেজ বলো আর রস বলো, হিংসা বলো আর দরদ বলো, হেলা করা বলো আর ইজ্জত করা বলো, সুখ বলো আর কষ্ট বলো,—শোলোকের সবই তো তার নিজের কথা। মণ্ডলের জুলুমের বিত্তান্ত কি কেরামতের কানে যায় না?

২৮

'তমিজের বাপ, কথা কও না? হাজেরানে মজলিশ পুস করে, জবাব দাও।'

হাজেরান মজলিশ নামে কাউকে সনাক্ত করতে না পেরে বিচলিত হয়ে কিংবা অপরিচিত এই ব্যক্তির প্রশ্নের জবাব খুঁজতে কিংবা প্রশ্নটিকে ভালো করে বুঝতে কিংবা মাথা থেকে ঘুমের ময়লা কাটাতে চোখজোড়া বড়ো বড়ো করে তমিজের বাপ তাকিয়ে থাকে মাঝিপাড়ার জুম্মাঘরের সিলিংবিহীন চালের জংধরা টিনের দিকে।

শরাফত মণ্ডলের হাতে তমিজের বাপের মার খাওয়ার কথা বেশ তারিয়ে তারিয়ে বলে একটু-আগে-পড়া নামাজের টানটান ভক্তি থেকে খালাস পাওয়ায় কালাম মাঝির মাথাটা এখন বেশ হালকা; তমিজের বাপের নীরবতায় তাই সে রাগ করে না। পোড়াদহ মেলার একদিন বাদে শুক্রবার, পরের শুক্রবার আসতে আরো একটি সপ্তাহ। মোট আটটা দিনের অষ্টপ্রহর দোকানদারি আফসারের ওপর ছেড়ে দিয়ে বিক্রিবাটা সব লাটে তুলে কালাম মাঝি কেবল ঘোরাঘুরিই করলো মাঝিপাড়ার ঘরে ঘরে। কুদ্দুস মৌলবিকে লাগিয়ে দিয়েছিলো ভালো করে। কালাম মাঝির পয়সাও বেরিয়ে গেলো মেলা। নইলে জুম্মায় এতোগুলো মানুষ কি আর এমনি এমনি জোটে? মাঝির জাতের মানুষ আবার আল্লারসুলের নাম করে নাকি? তা যেভাবে হোক, মানুষ যখন জোটানো হলো, তখন তমিজের বাপ অতো চুপচাপ থাকলে চলবে কেন? কালাম মাঝি তাগাদা দেয়, 'ক্যা গো, কথা কও। শরাফত মণ্ডল খড়ম দিয়া তোমার মাথাত বাড়ি মারিছিলো? না কি তামাম শরীলেতই কোবান দিছে, মনে আছে?'

তমিজ কিন্তু অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে, 'বাজান, তুমি মুখ খোলো না কিসক গো? তোমার ভয় কী? অতো ভয়পাদুরা হলে ক্যাংকা কর‍্যা হবি?'

তমিজের তেজ গলায় তুলে নেয় কুদ্দুস মৌলবি, 'আল্লার বিচার আল্লাই করবি। কালাম মিয়া তোমাক ভরসা দেয়, তোমার ভয় কিসের? কালাম মিয়া আল্লার নেকি বান্দা, এই জুম্মাঘর পাকা করার ওয়াদা করিছে। এমন একজন নেকি পরহেজগার মানুষ সাথে থাকলে—।'

কালাম মাঝি উসখুস করে, জুম্মাঘর পাকা করার কথা সে একদিন এমনি বলেছিলো, সেটা ঠিক ওয়াদা করা নয়। 'জুম্মাঘরের টিনের চাল দিয়া পানি পড়ে, লতুন দেড় বান টিন হামি দিবার নিয়ত করিছি। আল্লা তৌফিক দিলে হামি না হয় টিন কিন্যা দেমো। তা সে কথা এখন তোলার দরকার কী?'

কালাম মাঝির বিবৃতিকে বিনয় বিবেচনা করে কুদ্দুস মৌলবি আরো উৎসাহ পায়, 'আল্লার ঘর মজবুত করার নিয়ত করলেন, বেহেশতে আপনার জায়গা ঠিক হয়া থাকলো। এখন আপনের ওয়াদার কথা এলান করলে আর দশজনে আল্লার কামে আগায়া আসবি। না কী কন?'

কেরামত আলি তাকে আমল না দিয়ে আরেকটু ঝুঁকে পড়ে তমিজের বাপের দিকে, 'চাচামিয়া, তুমি তো সাদাসিধা সৎ মানুষ। প্যাঁচঘোচের মধ্যে নাই। মিছা কথা কও না। মন খুল্যা কও তো কী হছিলো।'

খয়েরি টিনের চালে বাঙালি নদীর স্রোত কিংবা ভবানীর জন্যে চোখের জল গচ্ছিত রাখা মরা মানাসের দ' কিংবা কাৎলাহার বিলের ধীর ঢেউয়ের ছবি কিংবা আওয়াজ বুঝতে বুঝতে তমিজের বাপ নিচু গলায় বলে, 'উদিনকা বাঘাড় একটা ধরিছিলাম। তা বাপু দেড় মণ তো হবিই, বেশিও হবার পারে। লাওয়েত তুলিছি তো তার দাপটে—'

'আসল কথা কও। মণ্ডল তোমাক কী করলো?' তমিজের ধমকে তার বাপ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, দমে না গিয়ে ধমক-দেওয়া মুখে সে বরং দেখতে পায় অন্য কোনো চেহারা। কেরামতের কোমল তাগাদায় সে শুরু করে, 'বাঘাড় মাছ ধরিছিলো হামার দাদা। উদিনকার বাঘাড়টা মনে হয় দাদাই খপ কর‍্যা ধর‍্যা দিলো। মাছ তো ব্যামাকই মুনসির সম্পত্তি; বাঘাড় কও, রুই কাৎলা মিরকা, পাবদা ট্যাংরা, মাগুর শিঙি,—ব্যামাকই মুনসির মাছ। বিলের মধ্যে তখন আন্ধার ঘুটঘুট করে, ওরই মধ্যে দেখনু ভেড়াগুলান সাঁতার ক্যাটা যাচ্ছে উত্তরমুখে।'

'উত্তরের কথা হামরা পরে শুনমু।' কালাম মাঝি তার বিবরণ সম্পাদনার উদ্যোগ নেয়, 'দখিনমুখে কী হলো আগে সেই বিত্তান্ত কও।'

তমিজের বাপ এবার বসে সোজা হয়ে, মুসল্লিদের দিকে তাকায় এবং বলে 'বিলের দখিনমুখে ডাঙার উপরে শিমুলগাছ, শিমুলগাছ থ্যাকা কয় হাত তফাত বিলের ধারত খাড়া হয়া আছে, তার হাতোত নোয়ার পান্টি, পান্টির আগাত কাতল মাছের নকশা। নোয়ার হলে কী হয়, মাছখান খালি দাপাচ্ছে।' গলা তার নিচু হতে হতে এতোই ঝাপসা হয়ে আসে যে শ্রোতাদের ধৈর্য থাকে না, কে একজন চেঁচিয়ে বলে, 'গলা ছ্যাড়া কথা কও গো। চিপা চিপা আও করো, কানোত সান্ধায় না।'

তমিজের বাপের গলা আগের মতোই নিচু, সে বিড়বিড় করে, 'আগে তো দেখি নাই। পাকুড়গাছ থ্যাকা তো নামে নাই কোনোদিন। আর সেই মুনসি উদিনকা খাড়া হয়া আছে শিমুলগাছের কাছে। কী নম্বা গো!' একটু থেমে সে ফের বলে, 'ধলা ফকফকা

দাড়ি, দাড়ি খালি ওড়ে, মনে হয় দাড়ি দিয়া মুনসি আসমানোক সাট মারে। দাড়ি তার আগুনের শীষ, আগুনা দাড়ি দিয়া কুয়াশা পুড়ায়া আসমান সাফ করে। শিমুলগাছেতও বুঝি আগুন ধরিছিলো। হামার লাওয়েত বাগাড় মাছ দেখ্যা তার খুব কোদ্দ হলো। সাট দিয়া কয়, 'মাছ লিস? হামার বিলের মাছ লিস?'

কেবল শেষ ছয়টি শব্দ ছাড়া তার আর কোনো কথাই স্পষ্ট নয়। কেরামত আলি উঁচু গলায় তার বিবৃতির ভাষ্য ছাড়ে, 'শোনেন, মণ্ডল খাড়া হয়া আছিলো বিলের ধারে। তমিজের বাপোক দেখ্যা ধমক মারলো', 'তুই মাছ নিস কেন রে? শালা, এই বিল কি তোর বাপের?'

জুম্মাঘরের শ্রোতাদের মনোযোগী মুখগুলো দেখে তমিজের বাপ চোখ ফেরায় নিচের দিকে। ছেঁড়া মাদুরের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে কালো মাটির মতো পোড়া কুয়াশা। মুনসির দাড়ির আগুনে পোড়া আকাশের আঁচে তমিজের বাপের গলা শুকিয়ে আসে, শুকনা গলায় সে আওয়াজ করে, 'হামাক কয়, "তুই হামার মাছ লিস?" কয়া তার হাতের নোয়ার পান্টিখান দিয়া বাড়ি মারলো হামার ঘাড়োত, হামি আগে বাঘাড়টাকে ঠেল্যা বিলের মধ্যে ফ্যালা দিছি। হামাক পান্টির বাড়ি মারলো তো দেখি, পান্টির মাথাত ঐ বাঘাড়ের লকশা ফুট্যা উঠিছে। তার গলার শিকল ঝনঝন কর্যা বাজে।' বলতে বলতে তমিজের বাপ হঠাৎ চুপ করে, তার কানে তখন বাজছে ফকির চেরাগ আলির গলা, 'হাতেতে লোহার পান্টি গলাতে শেকল।'

চেরাগ আলির গান আর কেউ শুনতে পায় কি-না সন্দেহ কারণ তমিজের বাপের কথা কেরামত বয়ান করে অনেক চড়া গলায়, 'তমিজের বাপ বিলের ধারে নামলো। পাও দুইখান কেবল কাদোর মধ্যে রাখিছে আর মণ্ডলও অ্যাসা তমিজের বাপের মাথাত মারলো খড়মের এক বাড়ি। কলো, "শালা, মাঝির বাচ্চা, ডাইঙা শালা, ছোটোলোকের জাত, মাছ চুরি না করলে প্যাটের ভাত হজম হয় না।"

'কী কলো? ক্যা গো তমিজের বাপ, মণ্ডল তোমাক কী কলো?' বলতে বলতে লাফিয়ে ওঠে আধ বয়েসি এক মাঝি। তার উত্তেজিত মাথার তাপে ঝরে পড়ে তার কালচে সাদা কিস্তি টুপি। প্রায় সঙ্গেসঙ্গে উঠে দাঁড়ায় আরো কয়েকজন। তাদের শরীরও কাঁপে, অনেকের টুপি না থাকায় মাথায় জড়ানো গামছাগুলোই থরথর করে কাঁপে, কেউ কেউ মাথা থেকে গামছা খুলে কোমরে পেঁচায়। আপাতত তাদের উত্তেজনার সবটাই তারা নিয়োগ করে নানা ধরনের বাক্য গঠনে, যেমন, 'শালা হালুয়া চাষার বেটা, আজ ট্যাকা হয়া দুনিয়াত লয়া অণ্ড দেখিছে।'

'শালার বাপ তো নেংটি পিন্দা থাকিচ্ছিলো। মাঘ মাসের জাড়োত গায়ের ওপরে পিরান ওঠে নাই।'

'আরে শালারা সারা জেবন খাছে খালি শুধা ভাত। মাঝিরা মাছ মাগনা না দিলে মাছ মুখোত তুলিছে কোনোদিন?'

'শালারা ভাত খায়া হাত ধোয় নাই, খায়া হাত মুছিছে নেংটির সাথে।'

শরাফত মণ্ডলের পূর্বপুরুষের দারিদ্র, নিম্নমানের জীবনযাপন ও নীচু রুচির কথা ঘোষিত হতে থাকলে সবাই স্বস্তি পায় এবং অনেকেই ফের বসে পড়ে। তখন মুখ খোলে আবিতনের বাপ, 'আরে চুপ করো। তোমরা উদিনকার চ্যাংড়া তোমরা কী দেখিছো?' সবার অর্বাচীন মূর্খতা সম্বন্ধে তাদের নিঃসন্দেহ করে এবং এই ব্যাপারে নিজে দ্বিগুণ নিশ্চিত হঁয়ে আবিতনের বাপ জানায়, চাষাদের পেটে ভাত জুটেছে খালি পৌষ মাঘ এই

দুটি মাসে। ঐ সময় তারা চিড়ামুড়ি খেয়েছে, পিঠেপুলিও খেয়েছে। আর কী করেছে?—'ঐ সময় হামাগোরে বাপদাদাক বাড়িত লিয়া ত্যালপিঠা আর চিতই পিঠা খিলায়া জমি লেখ্যা লিছে লিজেগোরে নামে। না হলে কাৎলাহারের দুই পাড়ের জমিজমা গাছপালা ব্যামাক তো হামাগোরে দখলেতই আছিলো।'

'আবার এখন লায়েবেক ঘুঁষ দিয়া বিলটাও দখল করিছে, দেখলা তো?' কালাম মাঝি এই কোলাহলটির উপসংহার ঘটবার উদ্যোগ নেয়, 'ঠিক আছে। জমিদারে পত্তন দিবি তো পত্তন লেওয়ার হক আছে কার? মাঝিগোরে বিল পত্তন লিবি মাঝি। না কী কও?'

কালাম মাঝির সঙ্গে সবাই একমত, কিন্তু কাৎলাহার বিলের পত্তন কাকে দেওয়া উচিত এ নিয়ে কারো তেমন মাথাব্যথা নাই। বিল মাঝিদের, মাঝিরাই মাছ ধরবে, তাদের কথা হলো পত্তন টত্তন আবার কী?

তারা সবাই কথা বলে এবং পরস্পরের কথায় কিছুমাত্র কান না দিলেও সবার কলরব থেকে যে সিদ্ধান্তটি বেরিয়ে আসে তা হলো এই : চলো শালা মণ্ডলের বাড়িত চলো। পাটের গোছের মাথাত আগুন লিয়া চলো। শালার বাড়িত আজ আগুন দেওয়া হোক। মণ্ডলের বেটা শালা বাড়িত দালান তোলার হাউস করিছে গো, কাল গোরুর গাড়িত কর‍্যা ইঁট লিয়া আসিচ্ছিলো দেখলাম। শালার দালান তোলার হাউস হামরা মিটায়া দেই চলো।'

মাঝিদের উত্তেজনায় গা গরম হলেও এদের সংকল্পে কালাম মাঝির ভয় হয়, তার গা শিরশির করে। মাঝির জাত, তার নিজের জাত, একই রক্ত, কালাম এদের হাড়ে হাড়ে চেনে। বড়ো মাথাগরম জাত। জীব হত্যা করে পেট চালায়, তাও আবার পানির নিরীহ প্রাণী। এরা কখন যে কী করে বসে কেউ জানে না। কালাম মাঝির প্রথম পক্ষের ছেলে পুলিসের চাকরি পেয়েছে, বর্ধমান জেলার কালনায় পোস্টিং। চাকরি পাবার পর ছেলে একবার বাড়ি এসেছিলো। বিলের অন্যায় পত্তন সম্বন্ধে কালাম তাকে ওয়াকিবহালও করেছে। তা ছেলে বলে গেছে, সরকারি আইনে এদিক ওদিক করার জো নাই। বৃটিশের শাসনে হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। তবে আইনের ফাঁক আছে, আইনের ফাঁকফোকর জানলে আইন না মানাটা পানির মতো সোজা। এই মাঝির বাচ্চারা আইনই বা জানে কী, তার ফাঁকই বা দেখবে কোত্থেকে? মণ্ডলের বাড়িতে চড়াও হয়ে আগুন ধরালে শরাফত মণ্ডল যে কোন ধারায় ঠুকে দেয়, তখন সামলাবে কে? আবার আবদুল কাদেরের যা দাপট, টাউনের নেতাদের ধরে সে কি না করতে পারে? চড়া গলা নামিয়ে কালাম মাঝি মিনতি করে, 'তোমরা দুইটা দিন সবুর করো। তহসেনেক একটা টেলিগ্রাম কর‍্যা দেই তো তিন দিনের মাথাত হাজির হবি। পুলিসের লোক, ওর শলাপরামর্শ শুন্যা কাম করলে বিপদের কিছু থাকে না।'

'ভাইজান দরকার হলে ফোর্স লিয়া হাজির হবি।' আফসারের এমন তেজি ভরসায় কালাম মাঝি সায় দেয় না। একজন কনস্টেবল কি আর ইচ্ছা করলেই ফোর্স নিয়ে আসতে পারে? এখন এদের ঠেকাবে কী করে সেই ভাবনায় কালাম মাঝি কাতর।

এই সময়ে উঠে দাঁড়ায় কেরামত আলি। তার ঠোঁট একটু একটু কাঁপে। গত আটদিন ধরে কালাম মাঝির মুখে মাঝিদের ওপর মণ্ডলের জুলুমের কথা শুনে শুনে সে একটা পদ্য লিখে ফেলেছে। কাগজটা তার পকেটেই, কিন্তু কাগজ না দেখে পড়তে পারলে ভালো হতো। পদ্যের কোনো চরণই তার মনে আসছে না। তাই তাকে বয়ান করতে হয় তার প্রেরণার গদ্যরূপ, 'শোনেন, একটা কথা কই।' সবার কথাবার্তা একটু

কমলে সে বলে, ' শোনেন। আধিয়াররা তো চাষ করে জোতদারের জমি। কী কন? তারা জান দিয়া খাটে, ফসল পায় আধাআধি। এখন তারা তিন ভাগের দুই ভাগ ফসল চায়া জোতদারের সাথে লড়াই করে। আধিয়ার ভয় পায় না। পশ্চিমের খিয়ার এলাকায়—।

'উগল্যান কথা হামরা জানি। তোমার কেচ্ছা থামাও।' আফসার তাকে থামিয়ে দিতে উঠে দাঁড়ালে কালাম মাঝি রাগ করে ভাস্তের ওপর, 'আঃ। কেরামতের কথাটা শোনো না বাপু।' তারপর কেরামতের পিঠে হালকা চাপ দিয়ে সে তাকে অভয় দেয় এবং নিজেও ভয় কাটাবার পথ খোঁজে, 'কও বাপু। তোমার মাথা ঠাণ্ডা। বুঝায়া কও, মানষের বাড়িত আগুন দেওয়া বড়ো গুনার কাম। বুঝায়া কও।'

কালাম মাঝির পৃষ্ঠপোষকতায় কেরামত আলি পিঠে তো বটেই বুকেও বেশ বল পায়। তার এলোমেলো মাথায় মাঝিদের নিয়ে লেখা পদ্যটা দানা বাঁধে। কিন্তু অন্ত্যানুপ্রাসগুলো মনে না পড়ায়, কিংবা বিনয়ে বা দ্বিধাতেও হতে পারে, তাকে সেঁটে থাকতে হয় সাদামাটা গদ্যের সঙ্গেই, 'আপনারা জানেন তো সবই। কিন্তু শেখেন না কিছুই। না শিখলে জানার ফল কী? সেই জানার ফায়দা কী? জয়পুরে দেখিছি, বর্মণী মা পুলিসের গুলি খায়াও হিরদয়ে বল রাখে। তার হুকুমে চাষারা তীর চালায়। আর এটি, এই গিরিরডাঙা গাঁয়ে দেখি, মাঝিদের চোদ্দপুরুষের বিল দখল করে ভিন্ন জাতের মানুষ আর মাঝিরা বস্যা বস্যা খালি বাল ছেঁড়ে।'

কেরামত আলি কথা বলেই চলে, আর জুম্মাঘরের মাঝিরা সব দাঁড়ায় সোজা হয়ে। তমিজের বাপ পর্যন্ত উঠে দাঁড়িয়ে দরজার বাইরে চোখ রেখে খুঁজতে থাকে কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথান। জুম্মাঘরের জংধরা টিনের চাল হাতখানেক ওপরে ওঠে, সেখানে ঢংঢং ঘণ্টা বাজে। কিন্তু এই বিকট ঘণ্টাধ্বনি চাপা পড়ে তমিজের চিৎকারের নিচে, 'কিসক? হামরা বাল ছিড়মু কিসক? চলো! সোগলি চলো গো! সোগলি বাড়িত যায়া জাল পলো যা আছে লিয়া আসো। আজ কাৎলাহার মুখে চলো।'

২৯

কাৎলাহার বিলের পশ্চিমপাড়ে গিরিরডাঙার মাঝিরা এলোমেলো সারিতে দাঁড়িয়ে বিলে ঝপঝপ করে জাল ফেললে কালাম মাঝির বাড়ির কাছে ফকিরের ঘাট থেকে দক্ষিণে বুলু মাঝির বাড়ির ঘাট পর্যন্ত তোলপাড় ওঠে। বেশিরভাগ জেলেই নিয়ে এসেছে প্যালা জাল; ভালকা বাঁশের ত্রিভুজের মাঝখানে এই জাল দিয়ে ধরা যায় বড়ো জোর ছোটো মাছ। কিন্তু এমনভাবে সবাই জাল ফেলে যে মনে হয় রুই কাতল মৃগেল ছাড়া অন্য মাছ ধরায় তাদের রুচি নাই। আর তৌড়া জালওয়ালাদের ভাব দেখে মনে হয়, বিলের মধ্যে কুমির থাকলে তাও আজ রেহাই পাবে না। এমন কি দুইজন নিয়ে এসেছে বেড় জালের দুটো তিনটে করে টুকরা; এই জাল খাটাতে না পারলে কী হয়, এর চিকন ফাঁক দিয়ে

মাছ পালাতে পারবে না এই ভরসায় তারা টুকরাগুলিকে জোড়া দেয় তাড়াতাড়ি করে। কেউ কেউ এনেছে পলো। ছোটো ছেলেদের হাতে হাতে বড়শি। মাছের চার না দিয়েই পানিতে ফাৎনা ফেলে তারা দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু এতো হৈচৈয়ের মধ্যে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে তারা এদিক ছোটে ওদিক ছোটে। তাদের বড়শিতে মাছ পড়ার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ লোপ পায়।

এতো হট্টগোলে শীতের শেষ দুপুর আটকে থাকে বিলের দুই পাড়ের গাছে গাছে। তমিজের নিয়ে-আসা কৈ জাল ঘাড়ে ফেলে তমিজের বাপ আস্তে আস্তে চলতে থাকে উত্তরের দিকে। এই শীতে কৈ জাল দিয়ে হবেটা কী? তমিজটা একেবারে চাষাই হয়ে গেলো, কখন কোন জাল ফেলতে হয় তাও ভুলে গেছে। কার কাছ থেকে এটা নিয়ে এসে ফেলে দিলো বাপের ঘাড়ে!

বিলের মাঝামাঝি থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত পানি তবু কিছু আছে। কিন্তু এক বাঙালির রোগা স্রোত ছাড়া উত্তরে পানি বেশ কম। ডাঙা উঠতে শুরু করেছে এই দিকটাতেই। কোনো কোনো জায়গায় মণ্ডলের কামলারা একটা চাষ দিয়ে কাউন ছিটিয়ে গেছে।

তা নিচের দিকে তমিজের বাপের নজর নাই, চোখের ওপর হাত রেখে সে তাকিয়ে থাকে উত্তর সিথানে পাকুড়গাছের মগডালের খোঁজে। গাছটা এখান থেকে নজরে না পড়লেও তার একমাত্র বাসিন্দার গলায় ঝোলানো শিকলের আওয়াজ বাজে হালকা বোলে, এতে দানা বাঁধে চেরাগ আলির গলা :

> মুনসির আওয়াজ যেন আতসের শ্বাস।
> দিল কাঁপে যাহাদের দুনিয়াতে বাস॥

আগুনের নিশ্বাসে গায়ে আঁচ লাগে, তমিজের বাপ তবু আরো এগোয়। তার দেখাদেখি ও তার পিছে পিছে না হলেও উত্তরে এগুতে থাকে মাঝির দল। বিলের উত্তরে মানুষের আনাগোনা হয়ই না, সেদিকে মাছ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

তবে কুদ্দুস মৌলবি দাঁড়িয়ে রয়েছে দক্ষিণের কাছে, বুলুর ঘাটে। মাঝিপাড়ার জুম্মাঘরে আজান পড়তে তাই দেরি হয়। বিকালবেলা আসতে আসতে বেশি বিকাল হয়ে যাচ্ছে। গোলাপি রঙের রোদে কুদ্দুস মৌলবির সাদাকালো দাড়ি ছুঁচলো হয়ে উঠছিলো, কিন্তু আসরের আজান দেওয়ার ওকত যাই যাই করছে বলে সে একটু কাবু হয় এবং কাছাকাছি কেরামতকে দেখে বলে, 'তোমার কথা শুন্যা মাঝিরা তো ঝাঁপ দিয়া পড়লো, এখন মণ্ডল সবগুলার কোমরেত দড়ি না বান্দে। রফাদানি জামাতের মানুষ, এই একটা সুযোগ পাবি।'

বিলের ওপর মণ্ডলবাড়ির শিমুলগাছের বকেদের মন্থর ডানা ওড়ে, ডানা থেকে ঝরতে থাকে পাতলা ছায়া। ছায়ায় ছায়ায় তারা বিকাল নামায় বিলের পানিতে। বড়ো বড়ো চোখজোড়া খোলা পেয়ে শীতের বিকালের ছায়া এক ফাঁকে ঢুকে পড়ে কেরামতের মাথার ভেতরে; বকের ডানার ঝাপ্টায় ঝাপ্টায় তার মাথার অন্ধকারেও ঢেউ খেলে এবং ফলে খাড়া হয়ে ওঠে তার কুচকুচে কালো ঝাঁকড়া চুল।—তার কথাতেই কি মাঝিরা ঝাঁপ দিলো বিলে মাছ ধরতে? এদের কোমরে দড়ি পড়লে সে-ই কি আর বাদ পড়বে? তাকেই তো আগে ধরবে। পুলিসের খাতায় তার নাম তো আছেই, গোলমেলে জয়পুর আর পাঁচবিবি আর আক্কেলপুর থেকে সরে এসেছে বলে পুলিস হয়তো তাকে ঘাঁটাচ্ছে না, আবার মাঝিদের এই হাঙ্গামার অছিলায় নতুন করে উৎপাত শুরু না করে।

তা হলে?—তা হলে সে কি পায়ে পায়ে দক্ষিণদিক দিয়ে ঘুরে নিজগিরিরডাঙায় শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে নাকি?—কিন্তু উত্তরদিকের মাঝিদের কোলাহল তার পা ঘুরিয়ে নেয় সেদিকেই। তাদের কলরবেই তার গতরে তাপ লাগে : তার সাদামাটা কথাতেই মাঝিরা ছুটে এসেছে বিলের পানিতে! কিন্তু এখন তা হলে মাঝিরা তার দিকে মোটে খেয়াল করছে না কেন? তার চারপাশে এখন তো কেউ নাই। এমন কি কুদ্দুস মৌলবিও চলে গেলো আজান দিতে। তমিজের বাপই কি এদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে উত্তরের দিকে? তাকেই কি এরা সর্দার বলে মানে? এক ফকিরের সঙ্গে কিছুদিন থেকে আর তার নাতনিকে বিয়ে করেই সে কি এলাকার নেতা হয়ে গেলো নাকি? না-কি মণ্ডলের কাঠের বোলওয়ালা খড়মের বাড়িই তমিজের বাপের মাথার মুকুট? মাছের নকশা-আঁকা লোহার লাঠির কথা সে যে বলে, তাই কি খড়মের বাড়ি হয়ে পড়েছিলো তার মাথায়? না-কি খড়মই তার মাথায় পড়ে লোহার পান্টির আদল নিলো?—তমিজের বাপের মাথার আঘাতের সঙ্গে মুকুটের উপমা জুটে গেলেও কেরামত আলি এটাকে তার পদ্যের কোথাও জুত করে বসাতে পারে না। কিছুক্ষণ একটু একা থাকায় মাঝিদের নিয়ে লেখা তার পদ্যের সবটাই এখন মনে পড়ছে, কিন্তু মানুষের মাথায় খড়মের বাড়িকে মুকুটের উপমা দিয়ে কোথাও বসিয়ে দেওয়াটা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে মাঝির দঙ্গল ক্রমেই দূরে-সরে যাচ্ছে, পাতলা অন্ধকার ও হালকা কুয়াশায় তাদের ঝাপসা দেখায়। কেরামতের বুক ছমছম করে, সে তাড়াতাড়ি হাঁটা দেয় উত্তরের দিকে।

'সাটি মাছে পাড় দেয়, বেলে মাছ এলে দেয়; হায়রে, সাটি মাছে পাড় দেয়, বেলে মাছ এলে দেয়।'—ধরা পড়ে শুধু ছোটো মাছ। সাটি মাছ আর বেলে মাছের কৌলিন্য নাই, সুতরাং এইসব মাছ যাদের জালে ধরা পড়ে তাদের শুনতে হয় বালকদের এই প্রচলিত কৌতুকটা। মেলার আগের দিন মণ্ডলকে খাজনা দিয়ে বিল ছেঁকে মাছ ধরে নিয়ে গেলো যমুনার মাঝিরা। এদিকে পানিও কমে গেছে, বিলের ঠিক মাঝখানেও গলা পানির বেশি নাই। সাটি আর বেলে, পুঁটি আর মৌরলা, ছোটো ছোটো চাঁদা আর বাঁশপাতা মাছই কেবল পাওয়া যাচ্ছে। মাঝিদের দাপাদাপিতে বিলের পানি কাদাকাদা হয়ে ওঠে, কাদা আরো কাদাটে হয় বকের ডানা থেকে ঝড়ে-পড়া ছায়ায়। এই ছায়ার ইশারাতেই কি-না কে জানে সন্ধ্যা নামে কুয়াশায় ভর করে। এর ওপর কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ভূতুড়ে আলোয় গোটা বিল অচেনা ঠেকলেও কিংবা হয়তো অচেনা ঠেকে বলেই মাঝিদের মাছ ধরার তাগিদ বেড়ে যায় শতগুণ। মাছের ঝাঁক ঠাউরে মাঝিরা পলো দিয়ে চেপে চেপে ধরে বকের ডানার ছায়া। ছায়ায় এরকম চাপ পড়লে বকেদের ডানায় সুড়সুড়ি লাগে এবং তারা সরে সরে যায়। রুই কাৎলা কি পাঙাস কি বাঘাড় পালিয়ে গেলো সাব্যস্ত করে মাঝিরা বকাবকি করে, 'চুদির ভায়েরা, খানকির বাচ্চারা, তোরা হামাগোরে হাতোত আসবু না? শালারা মণ্ডলের কোলের মদ্যে বস্যা গোয়া মারা দিবার পারিস, আর হামাগোরে সাথে আসবার চাস না, না?' এরকম বকা খেয়ে কাৎলাহারের মাছেরা গিরিরডাঙার মাঝিদের সঙ্গে তাদের পুরনো কুটুম্বিতা ফিরে পায় এবং ছোটোখাটো কিছু রুই কাৎলা মৃগেলের বাচ্চা ঝাঁপ দিয়ে উঠে পড়ে কারো কারো জালের আঁচলে।

মগরেবের আজান দিয়ে মাত্র তিন চারজন বুড়া মুসল্লির নামাজের ইমামতি করে ফিরে এসেছে কুদ্দুস মৌলবি। কেরামতের পাশে হাঁটতে হাঁটতে মাঝিদের দিকে তাকিয়ে সে জানায়, 'মণ্ডল আর তার বেটা বলে মানুষ লিয়া আসিচ্ছে। তোমরা এখন ওঠো তো। মাছ যা উঠিছে লিয়া বাড়িমুখে ঘাটা ধরো।'

বিল থেকে ওঠা দূরের কথা, মৌলবির দিকে তাকিয়ে কে চিৎকার করে জবাব দেয়, 'আপনে দোয়া করেন হুজুর, দোয়া পড়েন। মণ্ডলের বাপ আসুক। বিল কি মণ্ডলের? না শালার বাপের!' এই বীরত্বে তেজি হয়ে আরেকজন সংকল্প করে, 'শালারা আসুক। ব্যামাক কয়টা পলো আমান ঢুকায়া দিমু শালাগোরে গোয়ার মধ্যে।'

উত্তরে সরতে সরতে তমিজের বাপের একটু কাছাকাছিই এসে পড়ছিলো সবাই। উত্তর দিক থেকে কোনো ইশারা পেয়েই কি-না কে জানে, ভাঙা গলায় তমিজের বাপ সবাইকে ডাকে, 'আরো এ্যানা আসো গো তোমরা।'

তার কথা কারো কানে যায় না, তবে বুধা মাঝি চিৎকার করে তাকে জানায়, 'ও নানা, উদিনকার বাঘাড় মনে হয় এটিই আছে গো, এটি এখনো মেলা পানি ঠাহর করিচ্ছি।' এতে তমিজের বাপ সাড়া না দিলেও তমিজ কিন্তু বেড় জালটা খাটাবার আয়োজন করে এবং সবাইকে আশ্বাস দেয়, 'মণ্ডল ঘরের মধ্যে সান্ধাছে গো, আজ আত্রে আর বার হবি না।'

এইসব কলরব কিন্তু তমিজের বাপের কানে কিছুই ঢোকে না, পাকুড়গাছ থেকে তখন গুলিতে-ফুটো গলার ভেতর থেকে আসতে শুরু করেছে মুনসির নিজের স্বর :

মজনু হাঁকিয়া কয় ওহে সাগরেদ।
দরগাশরিফে ওরস করিল নিষেধ॥
নাসারা কোম্পানি বেয়াদব বেতমিজ।
মাজারে খাজনা ধরে বেদিনি ইবলিস॥

মুনসির গান নিশ্চয়ই আর কারো কানে যায় নি, তাই আবিতনের বাপ কেরামতকে বলে, 'ক্যা, গো, মণ্ডলের বেটা কাদেরের হুকুমে তুমি সেদিন গোলাবাড়ি হাটোত সভার মধ্যে গান করলা, আর এটি একটা শোলোকও কবার পারো না?'

কেরামত তখন দেখছিলো তমিজের বাপের মুখ, ঝাপসা চাঁদের ভূতুড়ে আলোয় তার মুখের রেখা কেমন উল্টেপাল্টে যাচ্ছে। বুড়া আবার মুনসির ঐসব গায়েবি গান শুরু না করে, এই ভাবনায় কেরামত তার দুদিন আগে বাঁধা গানটি গাইতে শুরু করে উঁচা গলায়,

'মণ্ডলে করিল কবজা মাঝির কাৎলাহার।
কাঙাল মাঝিপাড়ায় ওঠে করুণ হাহাকার॥

চিৎকার করে ওঠে মাঝিরা, 'হামরা কবিয়াল পায়া গেছি গো! করো গো, গান করো।' তবে তার শোলোকের সব কথা অনুমোদন করে না তমিজ, 'কাঙাল কারা গো? মণ্ডলেক হামরা কাঙাল কর‍্যা ছাড়মু।'

খাতা না দেখেও শোলোকের সব চরণের মিল তখন কেরামতের মনে পড়ে গেছে, মাঝিদের জালের আওয়াজ আর হর্ষধ্বনি আর তমিজের প্রতিবাদে তেজ বাড়ে তার ঠোঁটজোড়ায় :

মণ্ডলে খড়ম মারে বির্ধ মাঝির মাথে।
দুঃখে শশধর অস্ত যান সাথে সাথে॥
গিরিরডাঙা গ্রামে সূর্য না হন উদয়।
বিলে পদ্ম না ফুটিয়া কুঁড়িমাঝে রয়॥

মুনসির গানের এই অন্যরকম প্রতিধ্বনি শুনে তমিজের বাপ একটু অবাক হয় : কেরামতের মতো এক ফাতরা কিসিমের কবিয়ালের গলায় মুনসির প্রতিধ্বনি ওঠে কীভাবে? কেরামতের শোলোক শেষ হতে না হতে পাকুড়গাছ থেকে ফের জানানো হয়,

মহাস্থানে শায়িত শাহ সুলতান হুজুর।
মাহি সওয়ার নামে তিনি দুনিয়ায় মশহুর॥
তানারে বেইজ্জত করে নাসারা কোম্পানি।
লাজে দুক্ষে শুকাইল করতোয়ার পানি॥

কেরামতের ঠোঁটে আসতে আসতে মুনসির গলা একটু খাদে নামে বলে তমিজের বাপ মুনসির সন্তোষ কিংবা রাগ সম্বন্ধে কিছু বুঝতে পারে না, কোনো যন্ত্র ছাড়াই কেরামত গায় :

মাঝি বিনা বিল আর জল বিনা মাছ।
পুত্রহীন মাতৃকোল পুষ্প বিনা গাছ॥
আওরতে না পায় যদি মরদের চুম।
যতো জেওর দাও তারে রাতে নাহি ঘুম॥

মাঝিরা উল্লাসে চিৎকার করে, 'কী শোলোক কল্যা গো, আহা!' কেউ কেউ তার শেষ দুটি চরণ ভুলভাল আওড়ায়। তমিজ চেঁচিয়ে বলে, 'ও বাজান, এটি আসো গো, বেড় জালটা খাটাই। তোমার বাঘাড় হামরা তোমার হাতোত তুল্যা দিমু।' বাঘাড় তো ফিরিয়ে নিয়েছে মুনসি নিজে, সেই মাছ নিয়ে তমিজের এরকম লালচ তমিজের বাপের পছন্দ হয় না। বরং ছেলের সংকল্পকে স্পর্ধা বিবেচনা করে সে একটু ভয়ই পায়।

মাঝিদের সঙ্গে পুরনো কুটুম্বিতার সূত্রে তো বটেই, কেরামতের গানের টানে, এমন কি তমিজের বাপের কান দিয়ে মুনসির শোলোকের আঁচেও হতে পারে, ছোটো রুই, মেজো শোল, সেজো মাগুর পানিতে লাফায় এবং পানি থেকে জাল থেকে ডাঙায় লাফিয়ে লাফিয়ে একই সঙ্গে লুকোচুরি ও গোল্লাছুট খেলায় মেতে ওঠে। মাছের বাচ্চারা ডাঙায় পড়তেই মাঝিদের বাচ্চারা ছুটতে থাকে তাদের পেছনে। এইসব দেখতে দেখতে তমিজের বাপ শোনে মুনসির শোলোক,

মাদারি নামিল জঙ্গে হস্তে তলোয়ার।
কোম্পানি সিপাহি মরে কাতারে কাতার॥
গোরা টেলর হস্তে ধরে কামান বন্দুক।
মাদারিরে দেখি তার সিনা ধুকধুক॥

মুনসির গানের প্রতিধ্বনি বাজে কেরামতের গলায়। তমিজের বাপ শোনে আর ভাবে, হায়রে, কোনকালের সব পাওনা-গান, গড়াতে গড়াতে এই ফাতরা মানুষটার পাল্লায় পড়ে সেটার কী চেহারা হয়েছে :

বিলে না পরশ যদি পায় মাঝি অঙ্গ।
জল শুকাইয়া যায়, না থাকে তরঙ্গ॥
কেরামতে বলে শুন শুন দিয়া মন।
কাৎলাহারে জল কান্দে আয় মাঝিগণ॥

হঠাৎ করে তমিজের বাপ মাঝির বাচ্চাদের দিকে চিৎকার করে ওঠে, 'ওটি যাস না, ওটি যাস না!' তার নিচু স্বরের কথা শোনে কে? ব্যাপারটা কী?—কারো একটা জাল থেকে ছিটকে পড়েছে একটি কিশোর কাৎলা, সের খানেকের কম হবে না। বিলের এই বাঁকে বিলের ভেতরেই গলা বাড়ানো নতুন-জাগা ডাঙার ওপর দুষ্টু মাছ মুখ গুঁজে দিয়েছে বালির ভেতর। বালকেরা ছুটছে সেদিকে, কুদ্দুস মৌলবি তার পেছনে ছুটতে ছুটতে বলে, 'আরে এই ছোঁড়া, ওটি যাস না। দলদলার মধ্যে পড়বু।' তা কে শোনে কার কথা? মৌলবিকে অগ্রাহ্য করে আবিতনের বাপের নাতি, মানে বুলুর বেটা, এদের মধ্যে সে-ই একটু ডাঙর, সবাইকে গায়ের ধাক্কায় সরিয়ে লাফিয়ে পড়ে ধরে ফেললো কাৎলার লেজটা। কিন্তু মাছের বাচ্চা নিজের লেজ তো লেজ, বুলুর বেটার হাতটাও টেনে নেয় বালির ভেতর। আসলে কিন্তু হাত ডোবার আগেই হাঁটু ভেঙে বসা পা দুটো তার কোমর পর্যন্ত ডুবে গেলেও হাতটা সে বালি থেকে বার করে নি! কুদ্দুস মৌলবি চ্যাচায়, 'আরে চ্যাঙড়াটা মরে, তোমরা কেউ দেখো না?' বলতে বলতে ছুটতে থাকে কাদার ভেতর দিয়ে। আবার এই দেখতে দেখতেই তমিজের বাপ শোনে পাকুড়গাছের শোলোক :

> মজনু হাঁকিয়া কয় ভবানী সন্ন্যাসী।
> গোরাগণে ধরো আর দাও সবে ফাঁসি॥
> গিরিবৃন্দ অসি ধরে ভবানী হুংকারে।
> গোরাগণে পাঠাইয়া দেয় যমদ্বারে॥

বুলুর বেটাকে সামলাবার জন্যে উঁচু পাড় থেকে নামতে গিয়েও মুনসির শোলোকের খেই হারাবার ভয়ে তমিজের বাপ থমকে দাঁড়িয়েছিলো। তাকে ফের থামতে হয় কেরামতের মুখে মুনসির নষ্ট প্রতিধ্বনি শুনতে :

> কেরামতে ডাকে মাঝি জলে ফেলো জাল।
> মাছ ধরো মণ্ডলেরে করো হে নাকাল॥

এবার কেরামতের দিকে কারো খেয়াল নাই, সবাই ছুটছে বিলের ভেতর জেগে ওঠা চোরাবালির ডাঙায়। বালির ভেতর ডুবন্ত বুলুর বেটার মাথা সই করে কে একজন ছুঁড়ে দেয় কৈ জাল। তমিজের বাপের ঘাড় থেকেই সেটা নেওয়া হয়েছে। তার মাথাটা আটকে যায় জালের ভেতর। সবাই তাকে ডাকে 'আফাজ, ভয় করিস না বাপ। বালুর মদ্যে সাঁতার কাট, সাঁতার কাট। নাক উপরের দিকে তুল্যা রাখ।' কিন্তু টান দিলে জালটা আর ফেরত আসে না, বালির টানে কিংবা বালির ভেতরে ওঁৎ পেতে থাকা গজারের দাঁতে জালের সুতা ছিঁড়ে যায় পটপট করে। 'থামো, জাল আর টানো না' বলতে বলতে তৌড়া জালের হাতে রাখার দড়ির মাথায় বড়ো একটা গোল মালা তৈরি করে জালের দিকটা ধরে ছুঁড়ে দেয় তমিজ। এতে আটকে পড়ে আফাজের মাথা। হয়তো আফাজ আগেই মারা গেছে বালির ভেতরে, কিংবা এই দড়ির গোরোতেও তার মরণ হতে পারে, প্রাণপণ টানে তাকে তুলে আনা হয় ডাঙার ওপর।

আবিতনের বাপের বিলাপে কাৎলাহার বিলের আর আর আওয়াজ সব স্থগিত থাকে, দুই পাড় নিয়ে সমস্ত বিল জবুথবু হয়ে জড়ো হয় আফাজের লাশ ঘিরে।

গফুর কলুর সঙ্গে নিকা বসার পর আবিতন তো বাপের বাড়ির ছায়া মাড়াতে পারে না, আবার মাঝিরাও ঐ বাড়ি থেকে একটু সরে সরেই থাকে। প্রথম স্বামীর বেটার সঙ্গে

আবিতনও দেখা করার সুযোগ পায় না। অনুমতি দেয় না মাঝিপাড়া, আর গফুর কলু ছেলেটিকে সহ্যই করতে পারে না আফাজের কাজ জুটলো মণ্ডলের বাড়ি, দিনরাত তাই তাকে থাকতে হয়েছে সেখানেই। আবিতনের মা কখনো কখনো ভালো মাছটা তরকারিটা পিঠাটা হলে মাঠ থেকে কী বিলের ধার থেকে আফাজকে ডেকে খাওয়ায়, আবিতনের সঙ্গে চুপচাপ কোথাও তাকে দেখা করিয়ে দেওয়ার সুযোগও খোঁজে। তা আজ তার এমনি কপাল, আফাজ নিজেই গিয়েছিলো নানীর কাছে। মনে হয় ভাত খেতেই গিয়েছিল। তা মাঝিপাড়ার এইসব হৈ চৈয়ের মধ্যে নানীর দেওয়া ভাত আর খেতে পারে নি। এমন কি মণ্ডলবাড়িতে কামে না গিয়ে নানার পিছে পিছে সে চলে আসে কাৎলাহার বিলে। নানার তৌড়া জালটাও নিয়ে এসেছে ঘাড়ে করে।—খুব এলোমেলোভাবে এই বৃত্তান্ত বলতে বলতে আবিতনের বাপ গপ্পের খেই হারিয়ে ফেলে আর কাঁদে।

বিলের ধারে চোরাবালি থেকে কয়েক হাত দক্ষিণে নিজের নিজের খলুইতে মাছ গুছিয়ে নিতে নিতে সবাই বসে লাশ ঘিরে। কুদ্দুস মৌলবি মসজিদে একজনকে খাটিয়া আনতে পাঠিয়ে আয়াৎ পড়তে আরম্ভ করলে আফাজের মৃত্যু প্রকট হয়ে ওঠে, কেউ কেউ ফোঁপাতে শুরু করে, আবিতনের বাপ হামলে কেঁদে ওঠে। কোরানের আয়াত, ফোঁপানো ও হামলানো কান্নার এলোমেলো বিন্যাস ভেঙে পড়ে একটি মোটা ও খসখসে স্বরের হুঙ্কারে, 'মাছ চুরি করিস? শালা ডাইঙার বাচ্চারা আসিছিস মাছ মারবার?'

তমিজের বাপ তাকায় বিলের উত্তর সিথানে। মুনসিই না শোলোক দিয়ে, শোলোকের তোৎলা প্রতিধ্বনি দিয়ে সবাইকে লাগিয়ে দিলো বিলের দখল নিতে, আবার সে-ই কিনা এখন এসেছে তাদের শাস্তি দিতে।—মুনসির এ কী ব্যবহার?—এই সময় কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ তার গতর থেকে ঘোলা আলো চেঁছে ফেলে মোটা সাদা রেখায় ফোকাস ফেলে মাঝিদের ওপর। সেই আলোয় ভর করে দক্ষিণ থেকে আসে উত্তরের প্রতিধ্বনি, 'জাউরারা সব তোরা মাছ ধরবার আসিস কার হুকুমে রে?' তমিজের বাপ তার মাথাটা দোলায় একবার বিলের দিকে, একবার ডাঙার দিকে। মাথায় তার কামকাতর কুমারীর শিহরণ : মুনসির মাছের নকশা আঁকা লোহার পান্টির ঘা খাওয়ার লোভে ও ঘা খাওয়ার ভয়ে তার গোটা শরীর থরথর করে কাঁপে।

তিন ব্যাটারির টর্চের আলো প্রথমেই সরাসরি পড়ে তমিজের মুখে এবং আবদুল কাদের যতোটা পারে অবাক হয়ে বলে, 'তমিজ? তমিজ, তুই?'

'শালা নিমকহারাম, জাউরা শালা নিমকহারামের একশেষ। ওর নিমকহারাম বাপটাকও তো দেখিছি। ঐ বুড়া না ফকিরান্তি ধরিছিলো? কিসের ফকিরান্তি! শালা জাউরাটা মাছ চুরি করিছে অনেক দিন থ্যাকা। বুধে বুধে সাত, বিস্যুদ আর শুক্কুরবার, নয়দিনও হয় নাই, শুওরের বাচ্চা একটা বাঘাড় চুরি করবার যায়া ধরা পড়লো। আবার আজ আসিছে ব্যামাক মাঝিগোরে লিয়া।' শরাফত মণ্ডল তমিজের বাপকে ছেড়ে এবার ধরে তমিজকে, 'কুত্তার বাচ্চা, এই জন্যে তোক জমি বর্গা দিছিলাম? জমির ধান তো চুরি করলুই, প্যাট তোর তাও ভরে না, না? এখন হামার জমির ধানের ভাত খাবার সখ হছে হামার বিলের মাছ দিয়া?'

আবদুল আজিজ এসে পড়ে এবং আফাজের মৃত্যুই তার প্রধান মনোযোগ পায়। যারা মসজিদে গিয়েছিলো খাটিয়া আনতে, পথে আজিজকে তারা সব জানিয়েছে। আজিজ এসে নতুন করে সব জেনে নেয় এবং গম্ভীর হয়ে রায় দেয়, 'মার্ডার কেস।'

স্ত্রীর প্রথম স্বামীর ছেলের ওপর গফুর কলু কখনোই সন্তুষ্ট নয়, এখন শ্বশুরকে

সামনে দেখে সেই ছেলের জন্যে তার ভালোবাসা উথলে ওঠে, 'এই ছোলটাকে তোমরা কতো কষ্ট দিলা, মায়ের সাথে বেটাক দেখাও করবার দাও নাই। এখন বেটির ওপরে কোন্দ করয়া তার বেটাক তোমরা চুবায়া মারো দলদলার বালুর মধ্যে। তোমরা কী মানুষের পয়দা গো? এখন ফাঁসিত উঠ্যা বোঝো, নিশ্বাস বন্ধ হয়া মরা কতো সুখের!'

বিল চুরির ব্যাপারটা গৌণ হয়ে যাচ্ছে দেখে শরাফত বিরক্ত হয়। এবার সে হুকুম করে তার সঙ্গের লোকদের, 'হুরমতুল্লা, কালুর বাপ, গফুর, তোমরা ইগলানেক বান্দো। কাল বেনবেলাত থানাত চালান দেওয়া হবি।'

থানার কথায় মাঝিরা কিন্তু তেমন ভয় পায় না, কালাম মাঝির ছেলেই তো পুলিসের লোক। থানা তাদের কী বাল ছিঁড়বে? সবাই এদিক ওদিক তাকায়, কিন্তু কালাম মাঝি কোথাও নাই। কে যেন বুধাকে জিগ্যেস করে, 'ক্যা রে তোর মামুক দেখিচ্ছি না।'

'মামু তো আসে নাই। আফসারের সাথে কুটি ব্যান গেলো।' বুধার জবাবে কেউ কেউ আশ্বস্ত হয়, কালাম ওর ছেলেকে টেলিগ্রাম করতে গেছে, ভোরবেলার আগেই তহসেন চলে আসবে পুলিস ফোর্স নিয়ে। কিন্তু কুদ্দুস মৌলবি জানায়, 'কালাম মিয়া তার ভাইসতাক লিয়া গেছে সাবগ্রাম। আজ সাবগ্রামের হাট লয়?' তখন সবার মনে পড়ে, জুম্মাঘর থেকে বেরিয়ে কালাম মাঝি কি তার ভাস্তে ওদের সঙ্গে আর আসে নি।

তমিজ কোনোদিকে না তাকিয়ে বলে, 'অতো সাটাসাটি কিসক? কাৎলাহারের বিল তো মাঝিগোরে বিল। মাঝিরা মাছ ধরবি না?'

মণ্ডল এতোটাই রেগে যায় যে, তার হুকুম বেরোয় বাঁকাচোরা হয়ে, 'হুরমতুল্লা। কী কলাম? বান্দো, শালাক বান্দো।'

শরাফতের আদেশ পালন করতে এগিয়ে হুরমতুল্লা কাঁপে, এতোটাই কাঁপে যে নিজের পা দুটোকে মাটির ওপর ঠেকিয়ে রাখাটাই তার মুশকিল হয়ে পড়ে। তার অবস্থা দেখে হামিদ সাকিদার কোনো দড়ি ছাড়াই ধরতে আসে তমিজকে। আবদুল কাদের বাধা দেয়, 'থাক', তারপর গলা নামিয়ে তমিজকে বলে, 'তুই এটা করলি কী? মাঝিপাড়ার কেনো নালিশ থাকলে গোলাবাড়ি লীগ অফিসে কলেই তো একটা মিটমাট হবার পারে। তুই এখন বিল ডাকাতির আসামী, আবার খুনের মোকর্দমাও হবি তোর নামে। ভোটের আগে কি ঝামেলা শুরু করলি?'

এসব যাত্রার ডায়ালগ শুনে শরাফত ধৈর্য হারায়, 'প্যাচাল পাড়ো না কাদের। মাঝির বাচ্চা মরিছে মাঝির দোষে। পাপ বাপোকও ছাড়ে না। এখন সোয়াগের কথা থোও তো। হামার বিলের মাছ ডাকাতি করিছে, কী করা লাগে না লাগে হামিই বুঝমু। এখন সব কয়টাক বান্দো, কাল থানাত চালান দেওয়া হবি।'

কাদের তমিজের সঙ্গে নিচু স্বরে কথা বলা অব্যাহত রাখলে আজিজও বিরক্ত হয়। গতকাল গোরুর গাড়ি করে ইঁট নিয়ে আসার সময় মাঝিদের এসব শয়তানি সে আঁচ করেছিলো। আজ ছেলের কবর বাঁধানো নিয়ে ব্যস্ত ছিলো মিস্ত্রি খাটাতে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করালো বলে ইঁটসিমেন্ট বেঁচে গেছে মেলা। সেগুলো সিজিলমিছিল করে আসতে তার একটু দেরি হলো। সরকারি চাকরি করে, আঁটঘাট না বেঁধে, আইনকানুন হিসাব না করে সহজে মুখ খোলার বান্দা সে নয়। এখন সরেজমিন দেখে সিদ্ধান্তে আসে, 'শয়তানের গোড়া এই শালা তমিজ। এর নামে কয়েকটা কেস দেওয়া যায়। এক খুনের দায়েই তো ফাঁসিতে ঝুলবে। যাক, আইন হাতে নেওয়ার দরকার নাই। আপাতত

তমিজ শালা যেন পালাবার না পারে।'

কেরামত আলিকে দেখে আবদুল কাদের নতুন করে অবাক হয়, 'তুমি তো আচ্ছা নিমকহারাম গো! সেদিন অতো বড়ো মিটিঙে অতোগুলা নেতার সামনে তোমার গান করার সুযোগ করে দিলাম। এখন তুমি মাঝিদের উস্কানি দিয়ে বেড়াও! কাজিয়া ফ্যাসাদ বাধানো কী তোমার পেশা নাকি?'

কুদ্দুস মৌলবি ভয়ে ভয়ে তাগাদা দেয়, 'লাশ লিয়া চলো। লাশ ওঠাও।'

স্ত্রীর পক্ষ থেকে গফুর কলু আফাজের মৃত্যুর একটা বিহিত করতে চায়, 'তমিজের বাপ, তমিজ, বুধা, আবিতনের বাপ, কালাম মাঝি সোগলির নামেই থানায় ডাইরি করা লাগে। মাঝিপাড়ার ব্যামাক মানুষই আসামী হবি।'

থানার ব্যাপারটা আবদুল কাদের এখন স্থগিত রাখতে চায়।—মাঝিপাড়ায় ভোট একেবারে কম নয়। 'গফুর এখন লাশ লিয়া তোর বাড়িত যা। তোর বৌ তার বেটাক একটা নজর দেখবি না?'

কিন্তু কলুর ঘরে আফাজের লাশ নিয়ে গেলে মাঝিরা ফ্যাসাদ বাধাতে পারে। শরাফত মণ্ডল তাই হুকুম দেয়, 'না লাশ আবিতনের বাপই লিয়া যাক।' এতোক্ষণে সে শোক প্রকাশ করে মৃত বালকটির জন্যে, 'আহা! ছোঁড়াটা সবসময় চোখের সামনে সামনে থাকতো। কাল সকালে আর তাকে গোরুর পেট তোলার জন্যে বকাঝকা করা যাবে না। চাদরের খুঁটে শরাফত চোখের কোণ মোছে, নোনতা গলায় সে আক্ষেপ করে, 'মাসুম বাচ্চাটার উপরে দিয়া তোরা আল্লার কাছে গুনাগারি দিলু। তোদের গুনার তো আর শ্যাষ নাই। আল্লার গজব পড়লো তো সাথে সাথেই, দেখলুই তো। আল্লার বিচার আল্লা করিছে, এখন হবি হাকিমের বিচার।'

আবদুল কাদের কেরামতকে আড়ালে নিয়ে গেলো, 'তোমার নামে পুলিসের ওয়ারেন্ট আছে না? সবই তো জানি। পাকিস্তান নিয়া গান লিখতে বললাম, লেখলা না। এখন জেলের ভাত খাও।' কেরামত তবু গম্ভীর হয়ে থাকলে কাদের আরেকটু নরম হয়, 'কাল একবার আসো। দেখি, ইসমাইল ভাই কী কয়।'

জলকাদামাখা আফাজের লাশ নিয়ে মাঝিরা রওয়ানা হলে কুদ্দুস মৌলবির মুখে কলেমা শাহাদতের ক্রমাগত আবৃত্তি অপঘাতে মৃত্যুটি ছাড়া চারপাশের সব কিছুকে মুছে ফেলে।

বিলের পানি ওদিকে থিতু হয়, এই সুযোগে কুয়াশা নিবিড় আলিঙ্গনে শুয়ে পড়ে বিলের ওপর। পাকুড়তলার ওপাশে ঝোপঝাড় থেকে মুনসির পোষা শেয়ালের পাল মুনসির পক্ষ থেকে, বিলের পক্ষ থেকে এবং নিজেদের পক্ষ থেকেও হুক্কা হুয়া ডাক ছেড়ে মাঝিদের বিদায় জানালে এই আওয়াজ ধাক্কা মারে তাদের পাছায় পাছায়। এতোক্ষণে তাদের ভারী শীত করে। তাদের ঘাড়ের জাল ভিজে, পরনের তবন ভিজে, গায়ের পিরান ভিজে এবং খাটিয়ার লাশও ভিজে জবজবে। শবযাত্রা এগোয়, শেয়ালদের বিদায় ধ্বনির আঁটো বাঁধনও ঢিলে হতে থাকে। বিলের সঙ্গে মিলনে,—ধর্ষণেই বলা যায়,—নিয়োজিত কুয়াশায় ভিজে, মাঝিদের গায়ের হিমে জমে ও তাদের চোখের পানিতে গলে গিয়ে শেয়ালের ডাক গড়িয়ে পড়ে একটানা বিলাপে। এতে মেঘের মতো ঘুম নামে তমিজের বাপের চোখ জুড়ে। মাঝিপাড়ার কুপির কালচে লাল আলোগুলো ঝাপসা হয়ে একাকার হয়ে যায় কোনো কোনো রান্নাঘর কি উঠানের বিচালির ধোঁয়ার আড়ালে। শেয়ালের টানা ডাক কিন্তু হারিয়ে যায় না, বরং মিশে যায় আবিতনের মায়ের

ঘর থেকে আসা বিলাপের ভেতর। একটানা আওয়াজ ও একাকার আলোতে তমিজের বাপের ঘুম গাঢ় হয়। ঘুমের মধ্যে সে হাঁটে কখনো লাশের পেছনে, কখনো সামনে। তার টলোমলো পায়ের দিকে কারো কোনো খেয়াল নাই। কাৎলাহারের জীবদের খাদে-নামা বিদায় ধ্বনি হঠাৎ ফেটে পড়ে আবিতনের মায়ের হামলানো কান্নায়। এতেও তমিজের বাপের ঘুমে চিড় ধরে না। বরং ডাঙায় লাফিয়ে-পড়া মাছ ধরতে না গিয়েও সে ডুবে যেতে থাকে চোরাবালির ভেতর। তবে তার পা নিচে না ঢুকে পড়তে থাকে সামনের দিকে। তমিজের বাপের কদমে কোনো প্রশ্ন নাই, নালিশ নাই। তার নীরব পদধ্বনিতে বাজে অস্পষ্ট অভিমান : তাদের ডেকে নিয়ে, উস্কানি দিয়ে নিজের কাছে টেনে মাঝিদের দুধের বাচ্চাটিকে মুনসি কেড়ে নিলো কোন বিবেচনায়? কোন আক্কেলে? কী পাষাণ হিয়া গো মুনসির!—অভিমানে চোখে তার পানি জমে চুঁয়ে চুঁয়ে, চোখ ভরে যায় নোনা পানিতে। কিন্তু চোখ দুটোই বন্ধ থাকায় পানি নিচে গড়ায় না। চোখের বন্ধ পাতার তাপে সেই নোনতা পানি ঘন হতে থাকে পাতলা শ্লেষ্মায়। এই শ্লেষ্মাই জমে জমে সকালবেলা ফুটে উঠবে পিঁচুটি হয়ে।

৩০

'ক্যা গো, লাল পাগড়িওয়ালারা তোমাক তো ধরলো না? মাঝিপাড়ার জুম্মাঘরত তুমি কি শোলোক না শাস্তর কছো আর ডাইঙার পয়দাগুলা জাল লিয়া দৌড় মারলো কাৎলাহার মুখে। মাঝিপাড়ার জুম্মাঘরেত তুমি নামাজও পড়িছো, ছি! ছিক্কো!' গিরিরডাঙায় মাঝিদের জামাতে জুম্মার নামাজ পড়ে কেরামত আলি তার শ্বশুরের তো বটেই, শ্বশুরের বেটিরও ইজ্জতে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। একদিকে এই বেইজ্জতি এবং একই সঙ্গে কেরামত আলির উস্কানিতেই মাঝিরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে কাৎলাহার বিল দখলে,–স্বামীর এই অপরাধে ফুলজান বড়ই বিচলিত। কেরামত আলির কথায় মেতে উঠে তমিজ এখন জেলের ভাত খাচ্ছে বলে স্বামীর দিকে আড় চোখে হলেও সে তাকায় কটমট করে, আবার মাঝিদের জামাতে নামাজ পড়েছে বলেও তার দিকে যে দৃষ্টি সে বর্ষণ করে সে দুটোর মধ্যে ফারাক করা কঠিন।

ফুলজানের বেটা ঘরের ভেতর বিছানায় হঠাৎ করে কেঁদে ওঠায় ফুলজানের দমবন্ধ-করা কটমটে ভাবটা গলে এবং সেটাকে আরো তরল করতে ছেলেকে কোলে নিয়ে তার দুই গালে দুটো চড় মারে ঠাস ঠাস করে। রোগে রোগে কাবু শিশুটি চেঁচিয়ে কাঁদতে গিয়ে হাঁপায়, কান্না তার হঠাৎ খাদে নেমে গেলে হেঁচকি তুলতে শুরু করে।

'মারিস কিসক? হামার বেটাক তুই মারিস কোন সাহসে রে মাগী', কয়েকদিনের নিশ্চলতার অবসান ঘটিয়ে কেরামত আলি তার বৌয়ের চুল ধরে টান দেয় এবং তার পিঠে দুটো কিল লাগিয়ে দেয় দুমদাম করে। মায়ের কোলে দোলা লাগায় ছেলেটা ফের

কাঁদার শক্তি পায় এবং ওদিকে নবিতন চেঁচিয়ে ওঠে রান্নাঘর থেকে 'ও মা, বুবুক মারিছে গো! ও মা'!

নবিতনের ডাকে কেউ আসে না। তার ছোটোবোন গোয়ালঘরের পেছনে মাচা থেকে লাউশাক ছিঁড়ছে আর মা ব্যস্ত ঐ মেয়েকে নির্দেশ দেওয়ার কাজে। আর হুরমতুল্লা তো জমিতে চলে গেছে ভোর না হতেই।

বেটাকে বুকে চেপে ধরে ফুলজান কাঁদে আর বলে, 'ইস! বেটার জন্যে সোয়াগ উথলাচ্ছে? দুনিয়া চষ্যা বেড়াও, ব্যারামি বেটাটার কথা কুনোদিন মনে করিছো? এক দানা ওষুধ লিয়া আসিছো? এক ঢোক পানিপড়া দিছো? হামার বেটাক ডাক্তোরের কাছে লিয়া যাবার চাইছিলো মাঝি, তাক তুমি ফুসল্যা ফুসল্যা তুল্যা দিলা পুলিসের হাতোত। তাঁই এখন জেল খাটে আর তুমি এটি ঠ্যাঙের উপরে ঠ্যাঙ তুল্যা তিন সন্ধ্যা সানকি সানকি ভাত গেলো। তোমার শরম করে না? এংকা মরদের মুখোত আগুন।'

লাল পাগড়িওয়ালা এসে তমিজকে ধরে নিয়ে যাবার পর থেকে মাঝির বেটা বিলের এপার ওপার জুড়ে মানুষের কাছে একটা বাপের বেটা হয়ে যাওয়ায় কেরামতের বুকে যে কাঁটা বিঁধেছে, ফুলজানের কথায় তাই এখন খোঁচাতে থাকে তার সর্বাঙ্গে। তবে ফুলজানকে ঘায়েল করার সুযোগও একটা সে পায়, 'আরে ঐ মাঝিই তো তোর লাঙ রে মাগী। মাঝির গায়ের আঁশটা গন্ধ না পালে তোর ঘ্যাগখান খালি চুলকায়। মাঝির জামাতে নামাজ পড়লে হামার বলে জাত যায়, আর মাঝির চ্যাটটা ঘ্যাগর মধ্যে সান্দায়া লিয়া নিন্দ পাড়লে দোষ হয় না, না? জাউরা মাগী, হামি খবর রাখি না, না?'

হঠাৎ চুপসে যেতে যেতে ফুলজানের ঘ্যাগটা ফের ফুলে ওঠে, এতোটাই ফোলে যে, সেটা ঠেকে তার বেটার বেঢপ মাথার সঙ্গে। বেটার জ্বরের তাপে তার ঘ্যাগ একটু একটু কাঁপে : প্রশান্ত কম্পাউনডারের কাছে ছোলটাক বুঝি আর লেওয়া হলো না। নবিতন এসে বেটাকে তার কোল থেকে জোর করে নিয়ে গেলে ফুলজানের কান্নার বেগ দ্বিগুণ হয়। না বুঝেও কিংবা না বুঝেই তমিজের জন্যে কষ্ট প্রকাশের সুযোগটির সে চমৎকার সদ্ব্যবহার করে। উঠানে ফুলজানের মা ও দুই বোনের নীরবতা, ফুলজানের হাউমাউ কান্না ও তার বেটার হাঁপানো ফোঁপানিতে তাকে নিয়ে চক্রান্তের আয়োজন দেখতে পেয়ে কেরামত হাঁসফাঁস করে। এই ঢঙের ব্যারাম তো তার আগে কখনো ছিলো না। তেভাগার চাষাদের মধ্যে গান করে বেড়াবার সময় কি চাঙাটই না ছিলো। সেখান থেকে খামাখা চলে এলো। তা এখানে এসেও তো সে ভালোই ছিলো। মাঝিদের নিয়ে মেতে উঠলো, তখনো তো এমন গা ম্যাজম্যাজ ছিলো না তার। মুশকিল হলো এই শ্বশুরবাড়িতে আসার পর থেকে। হুরমতুল্লার কারুবারু আর কাদেরের দয়ায় শরাফত তাকে পুলিসের হাত থেকে না বাঁচালেই প্যারতো। মাঝিদের বীরত্ব নিয়ে একটা পদ্য তার মাথায় আসি আসি করছিলো, অনেকটা এসেও গিয়েছিলো। কিন্তু ফুলজানের মুখে মাঝির বেটার বেয়াড়াপনা আর বেয়াদবির কথা শুনতে শুনতে পদ্যটার কুঁড়ি বার হতে না হতে ছিঁড়ে গেলো। এই বাড়িতে তার থাকার দরকারটা কী?

'ও ফকির।' পেছন থেকে বৈকুণ্ঠ কেরামতকে ডেকেই আবার নিজের ভুল সংশোধন করে, 'আরে দূর! আবার ফকির কলাম! তা তোমার খবরবার্তা নাই। আলিম মাস্টার উদিনকা কলো, তুমি বলে তমিজেক লিয়া গান বান্দিচ্ছো? বান্দা হছে?'

গান বাঁধার তো বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে এরাই, এদের মুখে তমিজ ছাড়া আর কথা নাই। আরো কিছুক্ষণ হাঁটলে সঙ্গে জোটে যুধিষ্ঠির। সে শালাও কম নয়, সে-ও

এক খবর ছাড়ে। কী?—না, কামারপাড়ার মানুষ শরাফত মণ্ডলের ওপর মহা খেপে আছে। তমিজের মতো মানুষকে জেল খাটায়, তার ভালো হতে পারে না। শরাফতের জমি বর্গা করে তমিজ তো ঠকলোই, মণ্ডল যুধিষ্ঠিরকেও ফসল দিলো কতো কম। পশ্চিমে চাষারা ফসল চায় তিন ভাগের দুই ভাগ, এখানে মণ্ডল অর্ধেক ফসলও দিলো না। এ-বাহানা সে-সাহানা করে কতো ধানই যে বুড়া রেখে দিলো। খিয়ারের মতো এদিকে সবাই একত্তর হলে সে কি এসব করতে পারে?

কেরামত কপাল কোঁচকায়, 'ওদিককার কথা আলাদা। ওদিকে চাষারা একজোট হয়া কোমর বান্দে। তাদের সাথে শিক্ষিত মানুষ আছে। আর তোমাগোরে এটি মাঝিরা যায় মাছ চুরি করবার। চুরি করলে পুলিস ধরবি না তো কি সোয়াগ করবি?'

কেরামতের এই কথায় তো এদের থ' মেরে যাবার কথা। কিন্তু সে যে এমন ভাবতেও পারে তাই এদের মাথায় ঢোকে না বলেই হোক কিংবা বৈকুণ্ঠের কথার তোড়ে হোক, ঐ মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া হয় না। বৈকুণ্ঠ বলে, 'তমিজের বাপ ফকির মানুষ। তার হিরদয়ে আঘাত দিলো। চেরাগ আলি ফকির থাকলে তার একোটা শোলোকে মণ্ডলের গুষ্টির হাগা আরম্ভ হলোনি। ফকিরের গানের ক্ষমতা আছিলো গো। এখনো নাই তা কবার পারি না। তার গানের তেজ এখনো সমান।'

গানের ফল আবার হাতে হাতে পাওয়া মানে কী? কেরামত বলে, 'তোমরা চেরাগ আলির কথা কও। ভালো, মানুষটা ভালো মানুষ আছিলো, কও। কিন্তু তার শোলোকের মধ্যে তোমরা মাঝির কথা সান্দায়া দিবার পারো? খিয়ারের চাষার কথা ফকির পাবি কুটি? তার গান তো লিজের বান্দা লয়, না-কি?'

কেরামত হনহন করে হেঁটে চলে যায় ওদের পিছে রেখে। চেরাগ আলির পাওনা-গানের কথা শুনতে শুনতে সে অতিষ্ঠ। আরে, জোতদারের পক্ষে পুলিসের হামলা হলে চাষারা কি আর চেরাগ আলির ঐসব আসমানি শোলোকে কান দিয়েছে কখনো? পুলিসের গুলি খেয়েও বর্মণী মা তো পাগল হয়ে উঠিছিলো কেরামতের গান শুনতেই। চাষাভুষা থেকে শুরু করে নাসির মণ্ডল বলো আর চিত্তবাবু বলো আর পূর্ণ বোস আর সুনীলদা—সবাই শুনতো কেরামতের গান। এমন কি এতো বড়ো মানুষ হাজি দানেশ তিনি পর্যন্ত চিত্তবাবুকে নাকি বলেছেন, ঐ কেরামত ছোঁড়াটাকে হাতছাড়া করো না, ওকে আমাদের চাই। পুলিসের ধরপাকড় শুরু হলে চিত্তবাবু খবর পাঠালো, কেরামত যেন এখন সরে সরে থাকে। পুবের দিকে গিয়ে এসব গান করুক; সেখানে কাজে লাগবে। তা এই এলাকার মানুষ তো সব মজনু না মুনসি না কি কোনো জিনই হবে আর ভবানী সন্ন্যাসী না-কি তার ভূত—তাদের গান নিয়েই মত্ত। চেরাগ আলি ফকির কী সব গায়েবি শোলোক পেয়েছে কোত্থেকে,—সেসব ছাড়া আর কিছু এদের মাথায় ঢোকে না।—কেরামত আলি এদের কী গান শোনাবে?

হাটবার নয়, খড়ের ছোটো ছোটো চালে ঢাকা মাটির একটু-উঁচু জায়গাগুলো শূন্য পড়ে আছে। তবে মুকুন্দ সাহা আর কালাম মাঝির দোকান খোলা। আর কাদেরের দোকান তো এখন আর দোকান নয়, পুরোপুরি ভোটের অফিস। টিনের বেড়ায় পোস্টার আড়াআড়িভাবে, বড়ো কড়ো করে লেখা ইসমাইল হোসেনের নাম। দোকানের দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকজন ছাত্র কর্মী, তারা চোঙা, পোস্টার, বিড়ি গুছিয়ে নিচ্ছে, কাদের কথা বলছে তাদের সঙ্গে। কেরামতকে দেখে সে তাড়াতাড়ি তার কাছে এগিয়ে আসে। তাকে একটু তফাতে নিয়ে বলে, 'তোমাক না কয়টা দিন বাড়ি থ্যাকা বারাবার

মানা করিছি।' তার চাপা উত্তেজনায় উদ্বেগ বা সুখ সনাক্ত করা কঠিন, 'বিল ডাকাতির মামলায় তো নায়েব তোমার নামও ঢুকায়া দিছে। বাপজান যে কী করে না করে কিছু বুঝি না। ইসমাইল ভাইকে দিয়া পুলিসকে কয়া তোমার নাম কাটাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তা তুমি এখন কয়টা দিন শ্বশুরবাড়িতেই থাকো না!' কেরামত চুপ করে থাকলে কাদের ফের বলে, 'তোমার মনে হয় জেলের ভাত খাবার সখ আছে, না?'

জেলে যাবার সখ কেরামতের এখন হয় বৈ কী? জয়পুর থেকে তখন সরে না পড়লে সে হয়তো ধরা পড়তো। পুলিস ধরে নিয়ে গিয়ে ভদ্দরলোক নেতাদের পর্যন্ত যে মারটা দিয়েছে, মেয়েদের পর্যন্ত রেয়াত দেয় নি। সেই মারের খবরেই তো কেরামত নুয়ে পড়লো। বুকে আর বল পায় না। বুকে বল না থাকলে তার মাথাও ঘোরে বনবন করে। মাথা ঘুরলে তার হাতে শোলোক আর আসে না। এ কি চেরাগ আলির গান যে টুংটাং করলো আর দোতারার তার বেয়ে কথা চলে এলো আসমান থেকে? না, না। জেলে গেলে তার পদ্য লেখা বন্ধ হয়ে যাবে চিরকালের জন্যে।

'আসিছো যখন একটু বসেই যাও।' কী ভেবে কাদের তাকে নিয়ে ঘরে ঢোকে, ' এরা সব লীগের ওয়ার্কার। কেরামতকে আস্তে করে জিগ্যেস করে, 'পাকিস্তানের গান লেখা হছে?'

একটি ছেলে বলে, 'মাঝিপাড়ায় তো আমরা ঢুকতেই পাচ্ছি না। তাদের নামে আপনারা বিল ডাকাতির কেস দিয়ে রেখেছেন,—'

'এই তো মুশকিল।' আবদুল কাদের বক্তার ভঙ্গিতে কথা বলার সময় ভাষাটা ঠিক করে নেয়, 'বিল তো আমাদের পত্তন নেওয়া। সেখানে আমার বাবার অনুমতি ছাড়া কেউ মাছ ধরতে গেলে বাবা তো বাধা দেবেনই। কিন্তু মাঝিদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বহুদিনের, তাদের মেলা লোক আমাদের জমিতে বর্গা খাটে। তাদের বিরুদ্ধে আমরা মামলা করার কথা ভাবতেই পারি না। মামলা করালো নায়েব, বাবাকে ধরে, ভয় দেখিয়ে মামলা ঠুকে দিয়েছে। আরে, বাবা, এ তো ওদের পুরনো ফন্দি, মুসলমানে মুসলমানে ভেদ সৃষ্টি করেই তো ওরা দাপটটা টিকিয়ে রাখে।' সে এবার হাজির করে কেরামতের দৃষ্টান্ত, 'এই যে কেরামত, কবি কেরামত আলি, মাঝি না হলেও মাঝিপাড়ার মানুষ একে খুব মানে। সেদিন বিল ডাকাতির সময়—' বলতে বলতে কাদের থামে, একটু ঢোক গিলে বলে, 'এ তো আছে আমাদেরই শেলটারে। গুণী মানুষ, গান লেখে, গরিবের ঘরের মুসলমান ছেলে, ইসমাইল ভাই বলেন, একে যে করে হোক বাঁচাতেই হবে।' তারপর সে তাকে তুলে দেয় তাদের হাতে, 'তোমরা না হয় একে নিয়ে যাও কালাম মিয়ার কাছে। আরে যাও না একবার!'

কেরামত অবশ্য থাকে সবার পেছনে। কালাম মাঝি লীগের কর্মীদের সঙ্গে ভালো করে কথাও বলে না। তার দোকানে কৃষক প্রজা পার্টির ভোটের অফিস। টিনের বেড়ায় ঐ দলের পোস্টার। লোকজন তেমন না থাকলেও যারা আছে বেশিরভাগই পাকা চুলওয়ালা, প্রায় সবারই দাড়িও পাকা, মাথায় টুপি। দুজন কি তিনজন যুবকের হাতে চোঙা। আর আর ছেলেছোকরা যে কয়েকজন আছে সবই গিরিরডাঙার মাঝিপাড়ার।

টাউন থেকে আসা লীগের এক তরুণ কর্মী বলে, 'আসসালামোআলায়কুম। মুসলিম লীগের খাদেম হিসাবে আমরা আপনাদের কাছে এসেছি। ইনডিয়ার মুসলমানদের দল বলেন, জামাত বলেন এখন একটাই, অল ইনডিয়া মুসলিম লীগ। এই যে ভোট আসছে, এই ভোট হলো মুসলমানদের—'

'মুসলমান তো হামরাও বাপু।' কালাম মাঝি তাকে থামিয়ে বলে, 'তা হামরা' হলাম মাঝি আর আপনেরা সব ভদ্দনোক। হামাগোরে ছোলপোলেক ধর‍্যা আপনেরা পুলিসের হাতোত দেন, হামাগোরে ডাকাত বানান।'

তরুণ কর্মী মামলার ব্যাপারটি এড়িয়ে যায়, 'গোটা ইন্ডিয়ার মুসলমান আজ কায়েদে আজমের লিডারশিপে এক হয়ে গেছে। এখন আপনারা যদি মাঝি আর চাষী, ভদ্দরলোক আর গরিবের ফারাক করেন তো ফায়দা লুটবে কারা? ওদিকে তেভাগা মুভমেন্টের চাষীরা পর্যন্ত সংঘর্ষের রাস্তা ছেড়ে আজ লীগের পতাকার নিচে জমায়েত হয়েছে, আর—'

কেরামত একটু ধন্দে পড়ে। ওদিককার খবর সে অনেকদিন পায় না। কিন্তু চাষীরা কি ইচ্ছা করলেই সংঘর্ষ এড়াতে পারে? তাদের ওপর যে জুলুমটা চলছিলো, তাতে তাদের সরে পড়ার কোনো পথই আর খোলা নাই। তা হলে?—কিন্তু ছেলেটি বেশ জোর দিয়েই বলে, 'নবাব নাইটদের মুসলিম লীগ আর নেই। চাষী আর জেলে আর মজুরের হক আদায় হবে পাকিস্তানে।' কেরামত ভাবে, তা হলে আর খুনাখুনি করার দরকার কী?

ছেলেটি এরপর বলে চাকরির কথা। পাকিস্তানে মুসলমানের চাকরির কোনো অসুবিধাই হবে না। কেবল মুসলমান হওয়ার অপরাধে সরকারি চাকরি থেকে তাদের বঞ্চিত হতে হবে না। 'তারপর হিন্দু শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা মুসলমানদের ধর্ম নিয়ে, তাদের তাহজির তমদ্দুন নিয়ে ব্যঙ্গ করে, বিদ্রূপ করে, তাদের বইপুস্তকে মুসলমানদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। তাদের সঙ্গে আমরা থাকতে পারি না। পাকিস্তানে শাসন চলবে কোরান আর সুন্না অনুসারে, শাসকদের জীবনযাপন হবে ইসলামের খলিফাদের মতো। তারা টুপি সেলাই করে আর কোরান নকল করে যা রোজগার করবে, তাতেই তাদের খাওয়াদাওয়া চালাতে হবে।'

শুনতে শুনতে কেরামত অভিভূত, অভিভূত এমন কি মাঝিপাড়ার ছেলেরাও। কিন্তু শিমুলতলার তালুকদারদের খাদেম মিয়া বারবার কপাল কোঁচকায়, লোকটা ছেলেটাকে থামাতে চেষ্টা করে, 'চ্যাংড়াপ্যাংড়া কারো কোনো কথা শোনে না। খালি নিজেরাই প্যাচাল পাড়ে।'

লীগের অনুপ্রাণিত কর্মী চোখ ছোটো করে হাসে, 'আপনি মুরুব্বি মানুষ, আপনার লেবাস ইসলামী। কিন্তু আপনি করেন হিন্দুর পায়রাবি। আপনার কথা আর কী শুনবো? হক সাহেব মুসলমানদের সঙ্গে, ইসলামের সঙ্গে মীরজাফরি করে—'

বুড়ো তালুকদার তার রামপুরি টুপি খুলে ফের মাথায় চড়িয়ে বলে, 'তোমরা ইসলামের সোল এজেনসি নিয়েছো? ইসলামের তোমরা বোঝো কী? তোমাদের জিন্না নামাজের নিয়ত বাঁধতে জানে? জিন্না কও আর লিয়াকত আলি কও আর সোহরোওয়ার্দি কও, এরা পশ্চিমদিকে, আল্লার ঘরের দিকে কখনো আছাড় খেয়েও পড়েছে কোনোদিন? আর এরাই আজ ইসলামের জিম্মাদার।'

তালুকদারের প্রৌঢ় সঙ্গী সায় দেয়, 'আরে, চাচা, এরা থাকে বোতল আর গেলাস লিয়া, নামাজ বন্দেগির টাইম কোথায় এদের?'

লীগের কর্মীদের চোখমুখ লাল হতে থাকে, কেবল ঐ ছেলেটি একই স্বরে বলে, 'শোনেন, মোল্লাদের ইসলাম আর কায়েদে আজমের ইসলাম এক নয়। মোল্লারা ইসলামের নামে মুসলমানদের ব্যাকওয়ার্ড করে রাখতে চায়, তাদের গোঁড়ামির জন্যেই মুসলমানদের আজ এই অবস্থা—।'

'তা হলে বাপু খালি হিন্দুদের দোষ দাও কেন?'

'অনেক মওলানাও তো হিন্দুদের পায়রাবিই করে যাচ্ছে। মওলানা আজাদ, শো বয় অফ কংগ্রেস, এইসব মোল্লা মওলানাদের হাত থেকে ইসলামকে, মুসলমানকে বাঁচাতেই আমরা পাকিস্তান চাই।'

তার বক্তব্য শেষ করার আগেই 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' 'কায়েদে আজম জিন্দাবাদ' 'ইসমাইল হোসেনকে ভোট দিন' স্লোগানের সঙ্গে বেজে ওঠে মোটরগাড়ির আওয়াজ, ছেলেরা দৌড় দেয় ঐ গাড়ির দিকে। ক্যানভাসের ছাদওয়ালা গাড়ি করেই ভোটের ক্যানভাস চলছে। ঐ জিপগাড়ি থেকে নেমে ইসমাইল হোসেন হাসি হাসি মুখে সবাইকে হাত তুলে সালাম করতে করতে এগিয়ে যায় কাদেরের দোকানের দিকে। দোকানের বাইরে থেকেই সে ডাকে, 'কাদের, চলো তো একবার মাঝিপাড়ায় চলো।'

আবদুল কাদের তাকে দেখে অবাক। ইসমাইলের তো আরো তিনটে দিন থাকার কথা পুবে, যমুনার চরে চরে। এখানে আসার প্রোগ্রাম ভোটের একদিন আগে, সোহরোওয়ার্দি সাহেবও সেদিন আসবে মিটিং করতে। তা হলে যমুনার ওদিকে কি ক্যানভাস তার শেষ হয়ে গেলো?

কাদেরের দোকানে ঢুকে ইসমাইল বলে, 'তোমরা কি সবসময় এই হাটের মধ্যেই পড়ে থাকো? তোমার গ্রাম গিরিরডাঙার খবর রাখো? শুনি তো, মাঝিপাড়ার পজিশনটা কী? কালাম মাঝিকে ডাকো, তার মুখেই শুনবো।'

কাদের আমতা আমতা করে, 'কালাম মাঝির দোকানে তো দেখতেই পাচ্ছেন মালেক তালুকদারের ভোটের ক্যাম্প। তাকে ডাকলে কি আর আসবে?'

'আঃ। যা বলি শোনো। ডাকো, আমার কথা শুনলেই আসবে।'

কিন্তু গফুর কলু ফিরে এসে বলে, এক মিনিট আগে সে চলে গেছে। কাদের বোঝে, লোকটা কেটে পড়েছে ইসমাইল হোসেনকে এড়াতেই। ইসমাইল তখন কাদেরের কানের কাছে মুখ নেয়, 'কাদের, তোমরা এটা করেছো কী? মাঝিদের নামে মামলা করার আর সময় পেলে না?' কাদের কিছু বলবে বলবে করলেও ইসমাইল হোসেন তাকে সুযোগ দেয় না, 'আরে ঐ যে কী নাম?—হ্যাঁ হ্যাঁ, তমিজ। তমিজ কি তমিজের বাপের ভোট না থাকলেও ছয় আনা ট্যাকস দেওয়ার লোক মাঝিপাড়ায় কম নেই। এটা বড়ো কথা নয়। মাঝিপাড়ার ভোট মালেক সাহেবের বাকসে পড়লে তার এফেক্ট পড়বে এই এন্টায়ার এরিয়ার। ওদিকে যমুনার মাঝিরা তো মহা খাপ্পা, তাদের নাকি ডাকাত বলে থানায় চালান দিয়েছি আমরা মুসলিম লীগের লোকেরা। চর এলাকায় কৃষক প্রজার ওয়ার্কার তো ছিলোই না। এখন তমিজকে ধরে পুলিসে দেওয়ার কথা শুনে মালেক সাহেবের লোকজন ধুমসে প্রোপাগান্ডা করে বেড়াচ্ছে। ঐ নিরীহ লোকগুলোকে তোমরা ডাকাত বানিয়ে ছাড়লে?'

'মামলাটা ঠিক এভাবে দেওয়ার ইচ্ছা ছিলো না। বাপজানকে নায়েব কী করে কী বোঝালো—।'

'আরে বাবা, আমি তো সব শুনলাম। চলো, গিরিরডাঙা চলো। মাঝিদের সঙ্গে বসি গিয়ে।'

'কিন্তু মাঝিপাড়ায় তো মালেক সাহেবের ওয়ার্কাররা এখন ক্যানভাস চালাচ্ছে। এখন গেলে কী—'।

কাদেরের কথা শেষ হতে না হতে তাকে সমর্থন করে গফুর কলু, 'মাঝিগোরে কথা

বাদ দেন। বড়ো লটখট্যা জাত। আর সোগলি একদিকে গেলে অরা হেলবি উল্টামুখে। জামাতও তো ভিন্ন।'

'আলাদা জামাত মানে?' ইসমাইল হোসেন গম্ভীর হয়ে জানতে চাইলে জবাব দেয় কাদের, 'এই কয়েক গাঁয়ের মধ্যে মোহাম্মদি হলো চোদ্দ আনা। আর মাঝিরা সব হানাফি জামাতের মধ্যে। ইউনিয়নের মধ্যে এক গিরিরডাঙার মাঝিপাড়াতেই হানাফি মসজিদ।'

ব্যাখ্যা শুনে ইসমাইল হোসেনের রাগ চড়ে যায় কয়েক গুণ, 'ইস। এই করেই তো মুসলমান গেলো। এখনো তোমরা হানাফি আর মোহাম্মদি নিয়ে বাহাস করো। এসব ভুলে যাও কাদের, ভুলে যাও। ভোটের সময়টা অন্তত এসব কথা মুখেও এনো না। আজ আমি ঐ হানাফি মাঝিদের মসজিদে নামাজ পড়বো। মুসলমানের আবার এসব কী? কায়েদে আজম তো সুন্নি মুসলমানও নন, শিয়াদের মধ্যেও তাঁরা আলাদা খোজা কমিউনিটির লোক। জেলা স্কুলের হেড মাস্টার তবরাক আলি সাহেব আমাদের কী সার্ভিসটাই না দিচ্ছেন! তিনি তো কাদিয়ানি, তাঁকে কি আমরা বাদ দেবো?'

শুনে কাদেরের ভয় আরো বাড়ে। কায়েদে আজম সম্বন্ধে এসব কথা গাঁয়ের মানুষ জানলে তো মুশকিল। ইসমাইল হোসেনের কাণ্ডজ্ঞান মাঝে মাঝে লোপ পায়, কোথায় যে কী বলে বসে ঠিক নাই। নিজে তো নামাজ পড়েই না, মৌলবি মুনসি নিয়ে সুযোগ পেলেই ঠাট্টা ইয়ার্কি করে। বাড়িতে তার সবার মেলামেশা হিন্দু ভদ্রলোকদের সঙ্গে। পাকিস্তান হলে কাদেরও হয়তো বামুনকায়েতের সঙ্গে সমানে সমানে মেশার সুযোগ পাবে। তা হিন্দুদের সঙ্গে ওঠাবসা করা আর খাতির রাখা এক কথা আর মাঝিদের জামাতে নামাজ পড়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। ইসমাইল হোসেন নামাজই পড়ে না, আর আজ মাঝিদের মসজিদে নামাজ পড়তে পাগলা হয়ে উঠেছে।

গাড়ি থাকে গোলাবড়ি হাটে। পায়ে হেঁটে হেঁটে ইসমাইল গোটা গিরিরডাঙা ঘোরে আর কাদেরের ওপর তার রাগ বাড়ে। তমিজের গ্রেফতারে মাঝিরা ক্ষুব্ধ, এদের ভোট নিশ্চিত পড়বে মালেক সাহেবের বাকসে। কালাম মাঝির বাড়ির সামনে এসে ইসমাইল হাঁক দেয়, 'কালাম মিয়া, আপনার বাড়ির বাইরে থেকেই কি আমরা ফিরে যাবো?'

কালাম মাঝি বাড়ি থেকে বেরোবার তালে ছিলো, কিন্তু ইসমাইল একবারে বাড়িতে এসে পড়ায় তার আর উপায় থাকে না। বাড়ির একমাত্র হাতলওয়ালা চেয়ারটা খুব ভারি, সেটা দুই হাতে তুলে সে এনে রাখে ইসমাইলের সামনে। তার ইশারায় বুধা একটা পাখা নিয়ে ইসমাইলকে শোঁ শোঁ করে হাওয়া করতে থাকে। ইসমাইল আবদার করে, 'কালাম মিয়ার বাড়িতে আজ আমাদের দাওয়াৎ। আপনে তো করলেন না, আমরা নিজেরাই জেয়াফত নিলাম।'

এতে কাজ হয়। জোহরের আজান দেওয়া একটু স্থগিত রেখে কুদ্দুস মৌলবিকে জবাই করতে হয় বড়ো দুটো খাসি মোরগ। বাড়ির ভেতর থেকে রান্নাবান্নার আয়োজনের আওয়াজ ও খসবু আসে।

আবদুল কাদের এতোক্ষণ সবই মেনে নিয়েছে। মাঝিদের বাড়ি বাড়ি গেলো, তাকে দেখে সবাই ভয়ই পায়, তাতে তার রাগ চড়ে যায় বাবার ওপর। আবার আবিতনের বাপের মতো কেউ কেউ বাঁকাচোরা কথাও শোনায়, তখন সে বাপের পক্ষে নানা অজুহাত তোলে, দোষ চাপায় নায়েবের ওপর। এখানে ভোটের অবস্থা তাদের ভালো নয়। ছোটোলোকগুলি সুযোগ একটা পেয়েছে, এখন তাদের তোয়াজ না করে উপায়

কী? তা ভোটের জন্যে সবই না হয় করা গেলো, কিন্তু গিরিরডাঙা গ্রামে এসে তার বাড়ি বাদ দিয়ে ইসমাইল ভাত খাবে মাঝিদের বাড়িতে,—এটা কি হতে পারে? গোলাবাড়ি থেকে রওয়ানা দেওয়ার আগেই কাদের বাড়িতে খবর দিয়েছে, সেখানে খাসি জবাই করা, বড়ো মাছ জোগাড় করা সব কমপ্লিট। এখন তো তার ইজ্জতের বারোটা বাজলো। এর ওপর তাকেও যদি আজ মাঝিবাড়িতে ভাত খেতে হয় তো নিজের বাড়িতে ঢোকার মুখ থাকবে? অসহায় চেহারা করে সে ইসমাইল হোসেনের দিকে তাকায়, 'ভাই, বাড়িতে যে সংবাদ পাঠালাম। খাওয়া দাওয়া সব রেডি।'

'রাত্রে খাবো তোমার বাড়িতে। এখানে খেয়ে কালাম মিয়ার সঙ্গে গ্রামটা ঘুরবো। তারপর তোমার বাবাকে নিয়ে যাবো বিলের ওপারে। তোমার বাড়িতে ফিরে রাত্রে খাবো, ওয়ার্কারদের সঙ্গে বুধবারের প্রোগ্রামটা ফাইনাল করবে, সোহরোওয়ার্দি সাহেবের মিটিং করতে হবে এই এরিয়ায় অন্তত তিনটে।'

হাল ছেড়ে কাদের মাঝিদের কোলাহল দেখে। তাকে কেউ তেমন আমল দিচ্ছে না, তাকে ডিঙিয়ে কথা বলে ইসমাইল হোসেনের সঙ্গে। গফুরটা তো আসেই নি, মাঝিপাড়ায় আসাটা তার জন্যে বিপজ্জনকও বটে। কেরামত আলি পর্যন্ত গুজরগাজুর করে, একবার ইসমাইলের সঙ্গে, কখনো তমিজের বাপের পাশে দাঁড়িয়ে। শালা কাকে যে কী শোলোক ফুঁ দিয়ে দিচ্ছে আল্লা মালুম।

এর মধ্যে এই ভর দুপুরবেলা গামলাভরা পায়েস, এলোকেশি পিঠা আর ধামাভরা তেল পিঠা চলে এলে কাদের আর না বলে পারলো না, 'ভাই, আমি একটু বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। আপনারা নাশতা খেয়ে পরে ভাত খাওয়া সারেন, আমি চারটে খেয়ে আসি।'

ইসমাইল বলে, 'তুমি নাশতা খেয়ে যাও। কেবল নাশতা এলো, খেতে দিতে এদের এখনো ঢের দেরি। তুমি ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে খাবে।'

'না ভাইজান, এই অবেলায় নাশতা আর খাবো না, খিদা নষ্ট হবে। বাড়ি থেকে আমি বরং ভাত খেয়েই আসি।'

স্বাস্থ্যরক্ষার শহুরে নিয়ম পালনে কাদেরের উৎকণ্ঠা দেখে বুধা মাঝি চোখ টেপে আফসারের দিকে। আফসার বলে, 'কাদের ভাই কি আর হামাগোরে বাড়িত খাবি?'

বিপদে ফেলে কালাম মাঝি। ইসমাইলকে আপ্যায়ন করার সুযোগ পেয়ে বিগলিত হয়ে সে চেপে ধরে কাদেরের হাত, 'খায়া যান গো। হামরা আপনাগোরে বাড়িত কতো খাছি। হামার ঘরত খালেই কি আপনের জাত য্যাবি?'

'আর জাত?' আবদুল কাদের দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, 'জাত কি আর আছে গো?' বেচারা সইতেও পারে না, কইতেও পারে না। মাঝিরা তো তাদের খেয়েই মানুষ। তাই বলে কি তাকেও মাঝিদের বাড়িতে খেতে হবে? তা পিঠা না হয় একটু চেখে দেখা যায়। তাই বলে ভাত খাবে? ইসমাইলের পাল্লায় পড়ে আজ কি তাকে সমাজ, জাত সব নষ্ট করতে হবে? আবার ইসমাইলের দিকে আড়চোখে তাকিয়েই তাদের ব্যাপারে তার মন্তব্যটি একটু সংশোধন করে, 'আরে মোসলমানের আবার জাত কী? ইসলাম হলো সাম্যের ধর্ম।'

ঠিক তার প্রতি করুণায় নয়, অন্য কোনো বিবেচনায় ইসমাইল তাকে রেহাই দেয়, 'ঠিক আছে, তুমি বরং বাড়ি গিয়ে খেয়ে এসো, তোমার বাবাকে আমার সালাম দিয়ে বলো, বিকালে, না সন্ধ্যার পর আমাদের সঙ্গে বিলের ওপারে একটু কষ্ট করে যেতে হবে।'

আবদুল কাদের যেতেই মাঝিপাড়ার মানুষে ভরে গেলো কালাম মাঝির বাইরের উঠান। ইসমাইল হোসেন বসেছিলো ঘরের ভেতরে, বাইরের বারান্দায় বসে কর্মীরা

এলোকেশি পিঠা খায়, তেলপিঠা, মুড়ি দিয়ে পায়েস খায়; মাঝিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। নাশতা সেরে বারান্দায় সেই হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে ইসমাইল হোসেন মাঝিদের সঙ্গে এটা সেটা গল্প করে। মুসলমানদের মধ্যে সে সকল ভেদাভেদ দূর করার আহ্বান জানায়। নায়েববাবুর চক্রান্তেই তমিজের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সে নিশ্চিত, কাৎলাহার বিল মাঝিদের হাতছাড়া হয়েছে হিন্দু জমিদারের লোভে এবং চক্রান্তে। ইসমাইল ভোটে জিতলে এই বিলের ইজারা পাবে মাঝিরা, এটা হবে তার এক নম্বর কাজ। পাকিস্তানে তো আর জঘন্য ও বর্বর বর্ণপ্রথা থাকবে না, যার যা হক তাকে তাই দেওয়া হবে।

মাঝিরা হাঁ করে তার কথা শোনে। এদের মধ্যে তমিজেরও বাপও একজন। বুধা মাঝি তাকে ঠেলে দেয় ইসমাইলের সামনে, বলে, 'তমিজের বাপ।'

ইসমাইল চেয়ার থেকে উঠে হাত রাখে তার পিঠে, 'চেনাতে হবে না। তমিজ বিল ডাকাতির মোকদ্দমায় ফেঁসে গেলো। কঠিন মামলা। আমরা উকিল দেবো, আমাদের সাদেক সাহেব এখন ফৌজদারির সবচেয়ে ভালো উকিল। তমিজকে বের করে আনবো ইনশাল্লাহ।' তারপর সবাইকে লক্ষ করে জানায়, 'বিল আপনারা ফেরত পাবেন। আইনের কিছু ফ্যাঁকড়া আছে, জমিদারের হাতে এখন সম্পত্তি। আমরা জমিদারিই উচ্ছেদ করবো। তখন এই বিল আপনারা ছাড়া আর ভোগ করবে কে?'

ইসমাইল হোসেনের কথায় মাঝিপাড়ায় এমনি সাড়া জাগে যে, তমিজের মুক্তির সম্ভাবনার খুশিও চাপা পড়ে তার নিচে। বিকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের বেড়ায় বেড়ায়, গাছে গাছে সাঁটা হয়ে যায় মুসলিম লীগের পোস্টার। ভাত খেয়েই কয়েকজন তরুণ মাঝি ছোটে গোলাবাড়ির দিকে। অফিস থেকে মুসলিম লীগের পোস্টার নিয়ে লাগাতে হবে কালাম মাঝির দোকানে।

৩১

চারদিকে আগুনের শিখার ভেতরে কী করে ঢুকে পড়ে কেরামত আলি আর বেরুতে পারে না। আগুনের আভায় একটা মুখ চেনা চেনা ঠেকে; বলতে কি সেদিকে তাকিয়েছিলো বলেই সে আগুনের মধ্যে আটকে পড়ে; নইলে পালাবার সুযোগ হয়তো ঠিকই পাওয়া যেতো। মুখটা কার গো? লম্বাটে কালো মুখে আগুনের আঁচ, তার চোখে আগুনের শিখা দাউদাউ করে। আগুন লাগলো কি ওই চোখ থেকেই? মুখটাকে ঠাহর করার আগেই কেরামতের ঘুম ভাঙে আলিম মাস্টারের ডাকে, 'গফুর তোমাক সকাল সকাল যাবার কয়া গেলো। আজ বলে পারানিপাড়ার ইস্কুলের ফিল্ডে সভা।'

সভার কথায় কেরামত ভাবনায় পড়ে। সেখানে তার পাকিস্তানের গান গাইবার কথা। কিন্তু কোনো শোলোকই তো মাথায় আসে না। সারাটা দিন তার কাটে

ইসমাইলের ভোটের লোকজনের সঙ্গে, রাত হলে শুয়ে থাকে আলিম মাস্টারের পাশে। ভোটের হৈ চৈ তার মন্দ লাগে না, অনেক রাত্রি পর্যন্ত গোলাবাড়ি হাটে হট্টগোল, তার মধ্যেও বুঁদ হয়ে থাকা যায়। কিন্তু আলিম মাস্টারের পাশে শুতেই তার ঘুম পায়, ঘুমালেই আজকাল খালি দেখে আগুন লাগার খোয়াব। আগুনছিটানো চোখজোড়া প্রথমে মনে হয়েছিলো ফুলজানের, ঐ ঘেগি মাগী ছাড়া তাকে ওভাবে পোড়াতে আসবে আর কে? কিন্তু তার মুখ কি অমন লম্বাটে? না-কি তার ওই মুখ থেকে চোখ ফেরানো যায় না কিছুতেই? রাত্রে শোবার আগে আলিম মাস্টার পর্যন্ত বলে, 'কেরামত পাকিস্তানের গান তোমার লেখাই লাগবি। ইসমাইল সাহেবের তদবিরেই তুমি পুলিসের হাত থ্যাকা বাঁচিছো। হয় তার ফরমায়েশ মতো গান বান্দো, না হলে জয়পুর পাঁচবিবির ঘাটা ধরো। তেভাগার গান তো তোমার মেলা লেখা আছে। লীগের ছোঁড়াগুলান যাই বলুক, আধিয়াররা ব্যামাক পিঠটান দিছে, এটা বিশ্বাস হয় না বাপু।'

কিন্তু শোলোক বাঁধতে গেলেই লম্বাটে একটা মুখ থেকে আগুনের আঁচ এসে লাগে তার মাথায়, হয়তো সেই মুখটা ভালো করে দেখার আশাতেই ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসে, সে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। আলিম মাস্টারের ডাকে বিছানা থেকে উঠে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলে মাথায় আসে পয়ারের দুটি লাইন,

'ভারতবর্ষে কায়েম করো আজাদ পাকিস্তান।
মোসলমানের সকল দুঃখের হইবে অবসান।'

কিন্তু জুতের গান হয় না। এর পরের লাইনগুলোর মিল পাওয়া যায় তো কথা পুরুষ্টু হয় না, কথা যদি মনমতো হয় তো মিল খুঁজে পাওয়া দায়। তা হলে কি তাকে চেরাগ আলি ফকিরের মতো ভরসা করতে হবে পাওনা-গানের ওপর? আরে দূর! ফকিরালি গান দিয়ে কি আর মিটিং জমানো যায়? তবে তার সাগরেদি মেনে নিলে হয়তো কেরামতের গলায় গান চলে আসতো আপনাআপনি। না, তাই বা হয় কী করে? তমিজের বাপ তো তার খাস মানুষ। সে যে কী জানে আর না জানে তার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। এই যে মাঝিদের জুম্মাঘরে আবোর মানুষটা মিনমিন করে যে কী বললো, শরাফত মণ্ডল তাকে মারধোর করেছে কি-না, কীভাবে অপমান করলো, শরাফতের খড়মের মধ্যে সে লোহার পান্টি দেখে কীভাবে, কিছু বোঝা গেলো? তমিজের বাপের সেইসব মারফতি না আজগুবি বুলি কেরামত নিজের ইচ্ছামতো বাঁকাচোরা করে পেশ করলো বলেই না মাঝিরা এমন চেতে উঠলো! ঘুমের মধ্যে হোঁচট না খেয়েও হাঁটা ছাড়া চেরাগ আলি আর কোন বিদ্যাটা তাকে দিয়ে গেছে? মাঝিপাড়ার মানুষ কি শুধু এ জন্যেই তমিজের বাপকে এতো মান্যিগন্যি করে? চেরাগ আলি তার ছেঁড়াখোঁড়া বইটা রেখে গেছে তমিজের বাপের হেফাজতে, তবে কি লোকটা তার সব তেজ পায় ঐ বই থেকে? জয়পুরে তো চেরাগ আলি বারবার বলেছে, লেখাপড়া করার সুযোগ তার কখনো ঘটে নি। এমনি বিনয়ে তার মাথাটা সবসময় নুয়ে থাকলে কী হয়, লেখাপড়া না জানার দাপটে বুড়া অহঙ্কারে টইটুম্বর হয়ে থাকতো, তার মূর্খতা ঘোষণা করতে সে একেবারে পটু, 'তোমরা বাপু নেকাপড়া জানা মানুষ, নিজেরা গান লেখো, গানের বই ছাপো। হামার তো বাপু সেই মুরাদ আল্লা দেয় নাই। হামার ইগলান পাওনা-গান, দাদা পরদাদার দোয়ায় আর ওস্তাদের দয়ায় বুকের মধ্যে কাঁপে, হামি দোতারাত হাত দিলেই গলা দিয়া বারায়া আসে। ক্যাংকা কর‍্যা আসে সিটা কবার পারি না বাপু।' ফকির কতো কায়দাই

জানতো, অনেক লোকের সামনে গান করতে করতে হঠাৎ থেমে একটু দম নিয়ে বলতো, 'পরের কথাগুলো বানাও তো বাপু।' কেরামত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে থাকলে ফকির বলতো, 'পারবা না। হামিও কি পারি?' কেরামত এখন নিশ্চিত তার সব রহস্য গোপন করা আছে ঐ বইয়ের মধ্যে। লেখাপড়া না জানার জন্যে এতো যে দাপট মারতো, তবে ঐ বইটা কি তার বাল ছেঁড়ার জন্যে?

ভর দুপুরবেলা তমিজের বাড়ির সামনে গিয়ে কেরামত আস্তে করে ডাকে, 'তমিজের বাপ, ও তমিজের বাপ, বাড়িত আছো নাকি গো?'

ভেতর থেকে সাড়া দেয় কুলসুম, 'বাড়িত নাই।'

'হামাক না আসবার কলো।' কেরামতের গলাটা কাঁপে. এক্ষুনি তো তাকে সে দেখে এলো গোলাবাড়ি হাটে। ভোটের আর একদিন বাকি, মাঝিপাড়ার কয়েকজনকে নিয়ে কালাম মাঝি ক্যানভাস করে বেড়াচ্ছে, তাদের খাওয়াদাওয়া পানবিড়ির খরচ সব কালাম মাঝির। এসব খবর কুলসুমের সব জানা, 'কালাম মাঝি ভাত খিলাচ্ছে। ভোট হলে বলে তার বেটা খালাস পাবি, সেই খুশিত বুড়া বাড়িত আসে আত হলে।'

'হুঁ, তাক তো হাটোত দেখলাম।' মিথ্যা কথা বলে ধরা পড়ার ভয়ে কেরামত কৈফিয়ৎ দেয়, 'তা মনে হলো, এতোক্ষণ কি আর বাড়িত আসে নাই।'

'এখন আর আসবি না। বাড়িত কেউ নাই তো।'

'তুমি তো আছো।' বলেই ভয় পেয়ে কেরামত বলে, 'তমিজের বাপ কলো, হামার বাড়িত আজ চারটা ভাত খায়া যায়ো।'

'ভাত খাবেন?' বলে কুলসুম দরজা খুলে দিয়ে নিজে চলে যায় উঠানে। উঠান থেকে দেখা যায়, লোকটার মুখ খিদায় শুকনা। মাথায় বড়ো করে ঘোমটা দিয়ে কুলসুম নিজের ভাতটা সবই একটা সানকিতে ঢেলে দেয়, বলে, 'খেসারির ডাল আছিলো কালকার। ঐ দিয়াই খাওয়া লাগবি।'

কেরামত ভাত খায় আর আড়চোখে বসে থাকা কুলসুমকে দেখে। তার মুখে রোদ লেগে তার কালো মুখে তাপ বেড়ে উঠছে তা আন্দাজ করতে পারে সে এখান থেকেই। এই তাপ বাড়তে বাড়তেই তো আগুন জ্বলে উঠবে। তাই না? আজকাল রোজ দেখা স্বপ্নের মুখটা তো ভালো করে ঠাহর করা যায় না, এর সঙ্গে কি তার কোনো মিল আছে নাকি? তার খাওয়া হতে থাকে আস্তে আস্তে, সে কেবল দরজার ওপারে ভেতরের বারান্দায় বসে থাকা কুলসুমের একদিকের গাল দেখে। একটা শোলোক যেন মাথায় তার একটু একটু খোঁচা দিচ্ছে। কেরামত তার নজর সরায় না, তার ভয়, নিজের চোখটাকে একটু এদিক ওদিক করতে দিলেই কালো মুখটা হারিয়ে যেতে পারে। 'খোয়াবে আগুন জ্বলে দুনিয়া আসমানে।'—এই তো শোলোক তো তার আসছে। কিন্তু না, এতে তার কথা বেরিয়ে আসছে না। না গো। শোলোক বুঝি তার জীবনে আর লেখা হবে না। ভাত খেয়ে খিদে তার মেটে, কিন্তু হঠাৎ করে মাথাটা ব্যাথায় টনটন করে। বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে দেখে, দুপুরের রোদের আঁচে চৈত্রের শিমুল জ্বলছে দাউদাউ করে। দুপুরের তাপে শিমুল ফুল থেকে রক্ত ফোটে আর ফেটে পড়ে সাদা তুলা হয়ে।

ফের ভাতের সানকিতে মন দিলে নতুন একটা চরণ আসে তার মাথায়, 'আগুনের এতো রূপ নাই কোনোখানে'। না, ঠিক হচ্ছে না। খাওয়া হয়ে গেলে সানকিতেই হাত ধুতে ধুতে কেরামত মরিয়া হয়ে বলে, 'তোমার দাদার বইখান একবার দেখবার চাইছিলাম।'

'দরজাত বসেন। হামি বই বার করি।'

ঘরের বাইরে দরজার চৌকাঠে বসে কেরামত ফের চৈত্রের দুপুর দেখে। 'খোয়াবে আগুন জ্বলে দুনিয়া আসমানে,' এর পরের লাইনটি জুত করে মনে করার জন্যে মুখে মুখে সে নানান কথা বিড়বিড় করে, ভেতরে মাচায় খসখস আওয়াজ শুনে তার বুক ছমছম করে, ফকির কি এসে হাজির হলো নাকি? ঐ মাচা থেকেই তো সে একদিন বেশ লম্বা গান করলো একটা। আবার তার খুশিও লাগে ফকিরের ছায়া একবার যদি তাকে ছোঁয়, তা হলে হয়তো গান তার গলায় আসবে আপনাআপনি। কিন্তু ভয়ে ভয়ে ও একটু আশায় আশায় আবছা অন্ধকার ঘরে ভাবে, না, ফকির আসবে কোত্থেকে? মাচার ওপর কুলসুম। নাকের কাছে তার দাদার বই নিয়ে প্রাণপণে সে ওটার গন্ধ শুঁকছে। কেরামতের গলা শুকিয়ে যায়, গন্ধে গন্ধে কুলসুম কি বইয়ের সব কথা শুষে নিচ্ছে? গন্ধে গন্ধে সব টেনে আত্মসাত করে তার হাতে তুলে দেবে বইয়ের একটা ছিবড়ে? বইয়ের সব অক্ষর শুঁকে সাদা পাতা দেখিয়ে কুলসুম কি চেরাগ আলির নিরক্ষতা প্রমাণ করে ছাড়বে?

বইটা নিয়ে মাচা থেকে কুলসুম নামলে কেরামত তার দিকে হাত বাড়ায়। বই তার হাতে দিতে দিতে কুলসুম বলে, 'বই দেখ্যা দিয়া যান।'

কেরামত হঠাৎ বুকে বল পেয়ে বলে, 'যদি না দেই?'

'না, এই বই এটি থাকবি। ঐ বই দিয়া আপনে কী করবেন?'

বইয়ের পাতা ওলটায় আর কেরামত আলি দেখে, কোনোখানে কোনো শোলোকই নাই। খাকি রঙের কাগজে বইয়ের মলাট সেলাই করা, সেখানে কার কাঁচা হাতের লেখা, 'খাবনামা ফালনামা ও তাবির।' এসব খাবনামা তো কিনতেই পাওয়া যায়। তবে এটার ভেতরে ছাপা কোনো পাতা নাই। অর্ধেকের বেশি পাতা জুড়ে চৌকোণা চৌকোণা দাগ, সেইসব বর্গক্ষেত্র আবার ভাগ করা হয়েছে ছোটো ছোটো ঘরে। একেকটি ঘরে একেকটি আরবি অক্ষর। নাপাক শরীরে আরবি লেখা ছুঁয়ে ফেলায় কেরামতের একটু একটু ভয় করে, কিন্তু এখন অজু করতে গেলে বইটা হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। সে আস্তে আস্তে পাতা ওল্টায়, জীর্ণ পাতা, ধরতে হয় সাবধানে, একটু এদিক ওদিক হলেই পাতা ছিঁড়ে যাবে। এরপর গোটা গোটা বাঙলা অক্ষরে নানারকমের খোয়াবের বিবরণ। কোন খোয়াব দেখলে কী হতে পারে, এর ফলাফল কী, খোয়াবের তাবির—সব বুঝিয়ে বলা। মুনসি কি এখান থেকেই মানুষকে সব খোয়াবের বৃত্তান্ত বলে দিতো? কিন্তু বইয়ের কোথাও কোনো শোলোক লেখা নাই। তা কেরামত তো খাবনামা অনেক দেখেছে, শান্তাহারে এক লোক কেরামতের কবিতার বই বেচতো, সে আবার খাবনামা, মকসুদুল মোমেনিন, বেহেশতের জেওর—এসব বইও বেচতো। ওসব অবশ্য ছাপানো বই, সবই কলকাতায় ছাপা। তা এই বইটা কি কেবল হাতের লেখা বলেই এতো দামি? না-কি মুনসির শোলোকের ইশারা সব দেওয়া রয়েছে ঐ আরবি অক্ষরগুলোর ভেতরে? ঐ চৌকোণা রেখাগুলো দেখে আর কেরামত মুনসির পাওনা-গানের ইশারা খোঁজে হন্যে হয়ে। কিন্তু সমস্ত মনোযোগের ওপর তার মাথায় দপদপ করে জ্বলে কুলসুমের মুখ। বইয়ের দিকে তাকিয়েই সে বোঝে কয়েকদিন ধরে তার খোয়াবে আগুনলাগা ঘরে যে মুখটি দেখা যাচ্ছে সেটা হলো কুলসুমের মুখ। কুলসুমের চোখ থেকে আগুনের শিখা বেরিয়ে তার ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে দাউদাউ করে। চারকোণা রেখার বর্গক্ষেত্র দেখতে দেখতে কেরামতের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, 'খোয়াবে আগুন জ্বলে দুনিয়া আসমানে। আল্লা সেই রূপ রাখিয়াছে এইখানে॥' কিন্তু শোলোক কেরামতের মনমতো হয় না, সে

অস্থির হয়ে বইয়ের পাতা ওলটাতেই জীর্ণ পাতার একটু ছিঁড়ে গেলে কুলসুম চট করে তার মাথার ওপর ঝুঁকে পড়ে, 'বই ছিঁড়িচ্ছেন কিসক? দাও হামার হাতোত দাও।' কিন্তু কেরামতের মাথা এখন জ্বলছে দপদপ করে, জুতমতো শোলোক না পেলে এখন সে বাঁচবে না। খোয়াবের আগুন এসে ধরে যাচ্ছে তার মাথার ঝাঁকড়া চুলে, তাপে সে ছটফট করে। মনমতো না হলেও ঐ দুটো লাইনই সে বিড়বিড় করে আওড়ায়।—কিন্তু হলো না। হচ্ছে না।

তার বিড়বিড় ধ্বনি শুনে কুলসুম তাকায় ঘরের মাচার দিকে। কুলসুম ফিসফিস করে বলে, 'বই দেন। দাদা আসিচ্ছে, দাদা বই উটকাবি।' কিন্তু বইয়ের জন্যে সে আর হাত বাড়ায় না, বরং হাঁ করে তাকিয়ে থাকে কেরামতের দিকে। কেরামত বিড়বিড় করে, 'আগুনে জ্বলিল মুখ দেখিয়াছি কোথা। খোয়াবের সেই মুখ রহে এই হেথা॥' কিন্তু হয় না। শোলোক তার গানে খটখট করে, তেলের মতো গড়িয়ে পড়ে না। কুলসুম বলে, 'এই শোলোক তো দাদা কোনোদিন কয় নাই। কুটি পালেন আপনে?'

বারবার বিড়বিড় করেও কেরামত মনমতো শোলোক আর পায় না। কুলসুম তার অসন্তুষ্ট আবৃত্তি শোনে আর কেঁপে কেঁপে ওঠে, কাঁপতে কাঁপতেই বলে, 'দাদা এই শোলোক তো কোনোদিন কয় নাই গো। মনে হয় মরার পরে এটা পাছে। দাদার লতুন পাওনা-গান, মরণের পরে দাদা তোমাক শোলোক দিলো?' কুলসুম বড়ো ধান্দায় পড়ে, তমিজের বাপের সঙ্গে সঙ্গে কেরামত আলিও কি চেরাগ আলির সাগরেদ হয়ে গেলো? এই বইয়ে কি তবে কেরামতের অধিকার রয়েছে? এখন সে কী করবে? কেরামতকে বই দিয়ে দেওয়ার জন্যে চেরাগ আলি কি ইশারা পাঠিয়ে দিলো? এখন সে করে কী?

তবে কুলসুমের এই সমস্যার সমাধান করে দেয় কেরামত নিজেই, মনমতো শোলোক আসছে না দেখে এমনিতেই সে বলতে গেলে কাতর, এর ওপর আবার তার শোলোক-সন্ধানে অন্য কাউকে কৃতিত্ব দেওয়া,—একটু রাগ করেই কেরামত বলে, 'আরে তোমার দাদা এটা পাবি কুটি গো? শোলোক বান্দিলাম হামি। তোমাক দেখ্যা খুশি হলাম, শোলোক বান্দিলাম।'

ও, এটা তা হলে কেরামতের পাওনা-গান নয়, এমন কি চেরাগ আলির মারফতেও সে এটা পায় নি। এ আবার কেমন ধারার মানুষ গো, যে কি-না নিজের মুখে ফাঁস করে দেয়, সে নিজেই শোলোক বাঁধে। তার দাদা চেরাগ আলি, যখন তখন তার মুখে শোলোক এসেছে গায়েবি জায়গা থেকে, সেই জায়গার খোঁজ জানতো একমাত্র চেরাগ আলি নিজে। আর তারই খোঁজে উত্তর সিথানে পাকুড়তলায় রাতবিরেতে ঘোরাঘুরি করে বেড়াচ্ছে তমিজের বাপ। আর কোথাকার কোন কেরামত আলি, তার দাদার বইয়ের দিকে তাকিয়ে ইশারা পেয়ে যা বলে তাই আবার চালায় নিজের বাঁধা শোলোক বলে। কুলসুম খুব ঝুঁকে প্রায় ছোঁ মেরে বইটি তুলে নেয় কেরামতের কোল থেকে।

কুলসুমের রাগের তাপ লাগে কেরামতের মুখে, তার ঝাঁঝ লাগে তার চোখে। তার কাতর মাথা ব্যথায় নুয়ে আসে। বই নিয়ে মাচায় উঠে কুলসুম তার দিকে স্থির তাকিয়ে থাকলে তপ্ত চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। ঐ আগুনের শিখা লাগে কেরামতের শরীরে এবং দেখতে দেখতে সব তাপ জমা হয় তার মাথায়। ঘরের চালের ফুটো দিয়ে রোদের রোগা একটা রেখা এসে কুলসুমের মুখে সত্যি সত্যি আগুনের আভা জ্বালিয়ে দিলে কেরামত বোঝে, সে আসলে স্বপ্ন দেখছে। কোন স্বপ্ন—না, কয়েকদিন থেকে দেখা স্বপ্নের পুনরাবৃত্তি ঘটছে আজ তমিজের বাপের ঘরে। কিন্তু আজকের স্বপ্নের নতুন উপসর্গ প্রচণ্ড

মাথাব্যথা। ভেতরে মগজ তার আগুনের তাপে গলে গলে পড়ছে। ভয়ে, ব্যথায়, কষ্টে, উদ্বেগে ও উৎকণ্ঠায় তার গোটা মাথাই কাঁপে প্রবল বেগে।

কেরামত আলি তার উথাল পাতাল মাথাটা নিচু করতেই মগজ সব তোলপাড় করে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে এই দুটি লাইন :

এ জেবনে রূপ যদি দেখিয়াছি কোথা।
খোয়াবে আগুন মুখ নাহিক অন্যথা॥

৩২

'বাঙালি নদীর কোলে মা ভবানীর দ', দ'য়ের মাছ তো মায়ের সেবার জন্যেই, না কী বলিস?' প্রশ্নের জবাবের জন্যে নায়েববাবু পরোয় করে না, 'ঐ মাছ চুরি করে বেটা মাঝি, ম্লেচ্ছ মাঝি, এ্যাঁ? মায়ের সন্তান হয়ে আমরা তা সহ্যও করি! আবার তার সঙ্গে তোদের মহা খাতির! ছি!'

ধিক্কারটি নায়েবমশাই থুক করে ছোঁড়ে সরাসরি বৈকুণ্ঠের দিকে। বৈকুণ্ঠের জড়সড় ভাবটি এতে কাটে, সে বলল, 'না বাবু। এটা হলো ভবানী সন্ন্যাসীর দ'। ভবানী পাঠক। যুদ্ধ করিছিলো গোরা কোম্পানির সেপাইদের সাথে। বছর বছর হামরা তেনারই পূজা করি পোড়াদহ মেলার দিন।' একটু থেমে সে জানায়, 'ওই দ'য়ের কাছে তিনি দেহ রাখিছিলেন।'

'দেবী আর সন্ন্যাসী কি এক হলো রে পাগলা?' বিরক্ত হলেও পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী গলা চড়ায় না, বরং স্বর আরো নরম করে বলে, 'ভবানীপুর চিনিস তো? সেরপুরের কাছে ভবানীপুর—'

'চিনি বাবু। হামাগোরে জ্ঞাতিগুষ্টি—।'

'তা হলে তো ভালোই চিনিস। ভবানীপুরে মায়ের মন্দির। জমিদারি নাটোরের। কিন্তু মন্দির তো আর রানী ভবানীর নামে হয় নি। দক্ষযজ্ঞের সময় মা দুর্গা ক্রোধান্বিত হয়ে নিজের দেহ রাখলে মহাদেব ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন। আপন পরিবারের দেহ নিয়ে মাথার ওপর ঘোরাতে লাগলেন। তো নারায়ণ দেখলেন, মায়ের দেহে পচন ধরলে ধরিত্রীর বায়ু বিষাক্ত হয়ে যাবে। তিনি তাঁর চক্র দিয়ে মায়ের পবিত্র দেহ টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিলেন বিশ্বময়। নানা স্থানে পড়লো দেহের নানা অংশ। আর মায়ের বাম কর্ণ পড়লেন কোথায়?—না, ঐ করতোয়া তীরে, ভবানীপুরে।'

টাউনের সতীশ মুক্তার চোখ বুঁজে ঘাড় নাড়লে নায়েব পূর্ণচন্দ্র উৎসাহিত হয়ে বলে, 'সেই থেকে ঐ স্থানের মাহাত্ম্য, স্থানের নাম হলো ভবানীপুর। মায়ের কর্ণ এখনো সেখানেই স্থাপিত, নিত্য পূজা হয়, ভক্তবৃন্দ প্রসাদ পান। কর্ণ ওখানে থাকলো আর মায়ের ভোগের নিমিত্ত মাছ রাখা হলো মানাস নদীর দ'য়ে। আহা, মানাস এখন মৃত, কিন্তু সেই দ'য়ের জল শুকায় না, বাঙালি ঐ দ' কোলে করে মা ভবানীর মাছ পাহারা দেয়। আহা, ঐ জল বড়ো পবিত্র!'

দশরথ, যুধিষ্ঠির ও পালপাড়ার কেষ্ট পাল তার এই ভাষ্য শুনে থ'। টাউনের সতীশ মুক্তার ও সেরপুরের অনিল সান্যাল চুপচাপ সায় দেয়। কিন্তু ছটফট করে বৈকুণ্ঠ। বাবুরা এসব বলছে কী? এই এলাকার ব্যামাক মানুষ জানে, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সাহা, পাল, নমঃশূদ্র, মোসলমান সবাই জানে, এই দ'য়েই কোম্পানির সেপাইয়ের গুলিতে দেহরক্ষা করেন ভবানী পাঠক। সঙ্গে ছিলো তার পাঠান সেনাপতি। তো সেটা কী আর আজকের কথা? বৈকুণ্ঠের ঠাকুরদার ঠাকুরদা, তারও বাবা, না-কি তার ঠাকুরদা, সে তো সন্ন্যাসীর সঙ্গেই ছিলো। তা হলে?—আজ আবার মা ভবানীর কথা ওঠে কেন? বৈকুণ্ঠ আস্তে আস্তে বলে, 'না বাবু, পোড়াদহ মেলার নাম তো সন্ন্যাসী ঠাকুরের নামেই। মেলার আগের দিন মঙ্গলবার মেলার বটতলায় তাঁর বিগ্রহ রাখা হয়, সন্ন্যাসী ঠাকুর নিজে আবির্ভূত হন মেলার দিন ভোররাতে।'

'মেলার কথা রাখ। পোড়াদহ মেলা আমোদ-প্রমোদের জায়গা, সাত জাতের মানুষ আসে। সেখানে তোরা যে কিসের পূজা করিস তোরাও তো ভালো করে জানিস না। তা পূজা কর, ভালোই। কিন্তু মানাসের দ'য়ের এতো নিকটে মায়ের পূজা হয় না, এটা কি সহ্য করা যায়? মা আমার বিশ্বমাতা, জগজ্জননী। তাঁর অপমান আর কতো সহ্য করা যায়?' মায়ের অপমানে আহত পূর্ণচন্দ্র হামলায়, 'মা, মা। মা গো, মা গো!'

এই ব্যাকুল ডাকে মা তো মা, মায়ের বাপের পক্ষেও তিষ্ঠানো দায়। দাদামশায় বা মায়ের কিংবা দুজনেরই আবির্ভাবের আশায় ও আবির্ভাবের ভয়ে সবাই এদিক ওদিক দেখে। তাদের ভয় ও ভক্তিকে পোক্ত হবার সুযোগ দিতে নায়েবমশাই একটু থামে। তারপর নিশ্চিত হয়ে ফের মুখ খোলে, 'মায়ের ভোগ চুরি করলো এক মোসলা মাঝি, ম্লেচ্ছের স্পর্শে দ'য়ের জল অপবিত্র হলো। মায়ের আমার দয়ার শরীর, তিনি কিছু করলেন না। কিন্তু আমরা? আমরা তাঁর অধম সন্তান। আমরা কী করলাম?—না, হাত গুটিয়ে বসে রইলাম। ম্লেচ্ছ বেটা আস্কারা পেয়ে গেলো। ওর ছেলে নামলো বিল ডাকাতিতে। আরে বিল হলো জমিদারের, যাকে খুশি পত্তন দেবেন, তাতে কার কী?'

'কাৎলাহার বিলের মাছ তো গিরিরডাঙার মাঝিরাই ভোগ করিচ্ছিলো বাবু।' দশরথ কর্মকারের এই মন্তব্যে নায়েববাবু অসন্তুষ্ট হয়, 'আরে আগে অনাচার হচ্ছিলো বলে সব সময় কি তাই হতে থাকবে? জমিদার যদি আইনকানুন না দেখেন, প্রজার হিতসাধনে যদি মনোযোগী না হন তো প্রজার মঙ্গল হয় কী করে? গায়ের জোরে যে যা খুশি তাই করবে, আর জমিদার কি বসে বসে ঘাস খাবে? এ্যাঁ, ঘাস খাবে?'

তৃণভোজী জমিদার এদের কারো পছন্দ নয়। নায়েবের মুখে জমিদারের প্রতাপের বিবরণ শুনলে এদের কালোকিষ্টি শরীরে রক্ত চলাচল বাড়ে। নায়েব পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী তখন ছাড়ে তার প্রকৃত ক্ষোভটি, 'ঐ যে তমিজের বাপ, মায়ের দেহ অপবিত্র করে, নিজের ছেলেকে উস্কানি দিয়ে বিল ডাকাতি করায় আর তোমরা ঘোরো তার পিছে পিছে। তাদের বাড়ি যাও, শুনেছি জল পর্যন্ত খাও। তোমাদের জাত কী? মায়ের অপমানে তোমাদের রক্তে আগুন জ্বলে না?'

সেরপুরে অনিল সান্যালের পাতলা ঠোঁটে ভোরের চাঁদের পানা বেদনার হাসি, গম্ভীর দীর্ঘশ্বাসে চাঁদটিকে উড়িয়ে দিলে থাকে শুধু বেদনাটি। তাই সম্বল করে সে বলে, 'আরে, দেশটাই ভাগ করতে বসলো। আর এ তো সামান্য নদীর দ'। এসব বলে—।'

'মা ভবানীর অসম্মানকে আপনি সামান্য বললেন? আপনার মায়ের গায়ে হাত দিলে আপনি সহ্য করবেন? আর দুর্গা হলেন বিশ্বমাতা, এঁর অপমানে তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জ্বলে

ওঠবার কথা।' সতীশ মুক্তারের ক্ষোভ জ্বলে ওঠে রুদ্র তেজে, 'এই করেই তো আপনারা দেশটাকে তুলে দিলেন ওদের হাতে। কংগ্রেস যদি প্রথম থেকে ধর্মরক্ষায় মন দেয় তো দেশের অবস্থা কি আজ এরকম হতে পারে? মোসলমানদের কতো আস্কারা দেওয়া হয়েছে, ভেবে দেখেছেন কখনো?'

কংগ্রেসের সেরপুর থানার সহকারী যুগ্ম সম্পাদক অনিলচন্দ্র সান্যাল কৈফিয়ৎ দেয়, 'সতীশবাবু, সবাইকে নিয়েই তো দেশ। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে কোল দিয়ে, হৃদয়ে সবাইকে ঠাঁই দিয়েই তো মহাত্মা গান্ধি মহাত্মা হয়েছেন।'

'এখন তার ঠেলা সামলান। দেশের শরীর কাটার জন্যে ওরা তলোয়ার নিয়ে খাড়া। নিজের ধর্মই তো মহাত্মার হাতে পড়ে নষ্ট হতে চলেছে।'

'না সতীশবাবু।' অনিলচন্দ্র ধর্মভাবে উদ্দীপ্ত হয়, 'মহাত্মা নিজের ধর্মকে খাটো করবেন কেন? হিন্দুর ধর্ম, হিন্দুর স্বার্থের বিরুদ্ধে তিনি কি কিছু করতে পারেন? তিনি নিজেই তো বলেছেন, "আমি সর্বপ্রথম হিন্দু, তারপর দেশপ্রেমিক।" তাঁর আদর্শ হলো শ্রীমদভগবদ গীতা।'

এইসব রাজনৈতিক আলোচনায় নায়েববাবুর দরকারি কথাটাই সেরে ফেলা যাচ্ছে না। শরাফত মণ্ডল এসে পড়বে, তখন তো খোলাখুলি কথা বলা মুশকিল হয়ে পড়বে। সুতরাং সতীশ মুক্তার আর অনিল সান্যালের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনা বিঘ্নিত করে নায়েববাবু প্রজাদের বলে, 'শোনো বাবারা, যতো নষ্টের গোড়া ঐ শালা তমিজের বাপ। বোকা বোকা ভাব করে থাকে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে পাকা শয়তান একটা। ঐ বেটাকে আমি পুলিসে দেবো। মাঝিপাড়ার মানুষ একটু গোলমাল করতে পারে, ভোটের জন্যে কাদেরও তেমন কিছু করতে সাহস পাবে না। ওদের আঁটো করতে হবে তোমাদেরই।'

দশরথ, যুধিষ্ঠির ও কেষ্ট পাল ভয়ে এবং বৈকুণ্ঠ গিরি ভয়ে ও দুঃখে চুপ করে থাকে। তমিজের বাপের সঙ্গে চেরাগ আলির মাধ্যমে পাকুড়গাছের সরাসরি যোগাযোগের কথা গিরিরডাঙা, নিজগিরিরডাঙা, গোলাবাড়ি, পালপাড়া, রানীরপাড়া, পারানিরপাড়া, এমন কি সাবগ্রাম ছাইহাটার সব মানুষ জানে।

দশরথ আস্তে আস্তে বলে, 'বাবু, একটা কথা কই। তমিজের বাপের গাওত হাত না তোলাই ভালো।'

'কেন?' নায়েববাবুর গলায় ঝাঁঝ মেশে, 'শরাফত মণ্ডল যে খড়ম দিয়ে তাকে পেটালো, তাতে মণ্ডলের হাত কি খসে পড়েছে নাকি?'

'না বাবু।' বৈকুণ্ঠ নায়েববাবুর ভুল ধরে, 'তমিজের বাপের গাওত হাত তুলিছিলো পাকুড়গাছের মুনসি। সন্ন্যাসীর ভোগের মাছ লেওয়ার শাস্তি দিছে মুনসি।'

'ইস! এই টুয়েনটিয়েথ সেনচুরিতেও এমন সুপারস্টিশন থাকলে স্বরাজ দিয়েই বা কী হবে, স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলনের ফলই বা কী হবে?' অনিল সান্যাল মূর্খদের কুসংস্কারে বড়োই হতাশ। তবে দশরথ জানায়, 'মণ্ডল তার সাথে খারাপ ব্যবহার করিছে, কাদের মিয়া নিজে যায়া মাফ চায়া আসিছে।'

'দূর। এ জাতের বিশ্বাস নেই।' সতীশ মুক্তার সোজা হয়ে বসে, 'মাঝির ঘরে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসে কোন আক্কেলে? আরে বাবা, লেখাপড়া যতোই শিখুক আর টাকাপয়সা যতোই করুক, জাতের স্বভাব যাবে কোথায়?'

তবে প্রকৃত তথ্য জানা আছে নায়েববাবুর, 'আরে নাঃ। কিসের মাফ চাওয়া? ভোটের ক্যানভাস করতে গিয়েছিলো মাঝিপাড়ায়। তমিজের বাপের সঙ্গেও দেখা

করেছে। তমিজকে খালাস করে আনার কথা বলে এসেছে ইসমাইল। অতো সোজা? ৩৮৭ ধারায় মামলা ঠুকে দেওয়া হয়েছে। নন-বেলেবল কেস। জামিনই পাবে না।' নায়েববাবু মোটেই হতাশ নয়। আজ বৈকুণ্ঠ আর কর্মকারদের ডেকে আনা হয়েছে মণ্ডলের পরামর্শেই। তবে মরা মানাসের দ' থেকে সন্ন্যাসীর উৎখাতের বুদ্ধিটা নায়েববাবুর নিজের। মণ্ডলের তাতে বরং সায়ই আছে। পোড়াদহ মেলায় মুসলমানরা যেসব কীর্তি করে মণ্ডল সেসব সহ্যই করতে পারে না। ওখানে মা দুর্গাকে বরং প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে মাঝিপাড়ার মানুষদের ওখান থেকে হটানো যায়। নায়েববাবুর স্বপ্ন : টাউনের ভদ্দরলোকরা তখন কেবল মেলা দেখতে আসবে না, পূজার উৎসবেও হৈ চৈ করতে পারবে। ভূতের পূজা বাদ দিয়ে মানুষকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে যদি মা ভবানীর পূজার প্রচলন করা যায় তো আশেপাশের তো বটেই, টাউনের ভদ্দরলোকদেরও এখানে টানা যাবে। তাদের ছাড়া আনন্দবাজার পত্রিকায় এই খবর ফলাও করে ছাপাবার মুরোদ কি আর নায়েববাবুর হবে? এখন বোঝা যাচ্ছে, এখানে বড়ো ঝামেলা তৈরি করে বৈকুণ্ঠ গিরি। নায়েববাবু তাকেই কড়া করে ধমক দেয়, 'শোন বৈকুণ্ঠ, মাঝিপাড়ায় তোর এতো দহরম মহরম কিসের রে? ওখানে যাওয়াটা ছাড়। তোদের এইসব ভূতের পূজা বন্ধ করে দিলে দেখি শালার ম্লেচ্ছ মাঝিরা পোড়াদহ মেলায় ভেড়ে কী করে।'

কাছারি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যুধিষ্ঠিরের পা আর চলতে চায় না। মাঝিপাড়ার মানুষের সঙ্গে মাখামাখি করলে নায়েব তো চটেই, মণ্ডলও সহ্য করবে না। মণ্ডল ফসল তাকে যতো কমই দিক, বর্গার জন্যে এবারেও তার কাছে ধন্না না দিয়ে তার আর উপায় কী? ভোটের ডামাডোলে মাঝিপাড়ার সঙ্গে কাদেরের একটা বুঝসুঝ হতেও পারে, তমিজ বেরুতে পারলে কাদেরকে ধরে তার একটা গতি হয়তো হয়ে যাবে। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের দশাটা হবে কী? জমি বর্গা না পেলে জগদীশ সাহার সুদ সামলাতে জমি বেচতে হবে মণ্ডলের কাছে। জেদ ধরে জমি ধরে রাখো তো সুদ সামলাতে ভিটেমাটি, থালবাসন, বাপের হাঁপর, কামারশালা সব দিতে হবে সাহাকে। একবার জগদীশ সাহা, একবার শরাফত মণ্ডল।—যুধিষ্ঠির দিশা পায় না, তবে ভগবানের কৃপায় এর মধ্যেই একটা বুদ্ধি তার মাথায় ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ইসমাইল সাহেবের ভোটের ক্যানভাসে যদি কাদেরের পিছে পিছে সে ঘোরে তো তার মনটা পাওয়া যায়। বিল ডাকাতির মামলা দেওয়ার পর মণ্ডল কি আর মাঝিদের বর্গা দেবে? যুধিষ্ঠির কি কামারপাড়ার কেউ তো আর মণ্ডলের সম্পত্তিতে হাত দিতে যায় নি, সুতরাং এই সুযোগে মাঝিদের বর্গা করা জমিগুলো সে তো দিব্যি হাতিয়ে নিতে পারে। এখন কাদেরের পেছনে ছোটাছুটি করলেই হয়।

কাদেরের দোকানের সামনে, কালাম আর মুকুন্দ সাহার গদিতে মানুষ গিজগিজ করে। মুকুন্দ সাহার টিনের বেড়ায় কংগ্রেসের তেরঙা পতাকার ছড়াছড়ি। কংগ্রেসের লোকজন এসেছে টাউন থেকে। এমন কি লাঠিডাঙা কাছারি থেকে পরে রওয়ানা দিয়েও টমটমে করে এসে পড়েছে অনিলবাবু। ওখানে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাম কী? কাদেরের কর্মীদের সঙ্গে সে ভিড়ে গেলে একজন বলে, 'তুমি এখানে কী করো?' কংগ্রেসের এক ছাত্র কর্মী তাকে টেনে আনে সাহার দোকানের দিকে, ছেলেটি বলে, 'তুমি ওখানে কী করছো?' আরেকজন হাসে, 'আরে ইসমাইল সাহেবের তো মোহামেডান কনস্টিটুয়েনসি। তোমরা ভোট দেবে সুরেনবাবুকে, সুরেন সেনগুপ্ত, আমাদের কংগ্রেসের ক্যানডিডেট।'

যুধিষ্ঠির একটু দমে যায়, কাদেরের সঙ্গে ভিড়তে পারলে মণ্ডলের জমিটা পাওয়া যায়। আবার ইসমাইল সাহেব এমনিতে মানুষটা ভালো, আবার ভোটে জিতলে নাকি

আধিয়ারদের ফসলের হিস্যা বাড়াবার আইনও বানাবে। সুরেনবাবুও হয়তো ভালো মানুষ, কিন্তু যুধিষ্ঠির তো তাকে চেনে না। যুধিষ্ঠিরের মাথার এসব জট সাফ করতে এগিয়ে আসে অনিল সান্যাল, 'মুসলিম ভোটারদের জন্যে একজন এম এল এ, আমাদের এম এল এ আরেক জন।' যুধিষ্ঠির এবার বোঝে, দুই জাতের জন্যে দুইজন মেম্বর।

বিকালে মুকুন্দ সাহা বৈকুণ্ঠকে আড়ালে ডেকে বলে, 'নায়েববাবু তোক সকালে কী কলো রে? শরাফত মিয়া তো কালই হামাক কয়া গেলো, নায়েববাবুর খুব রাগ তোর উপরে। তা তোর বাপু মাঝিপাড়ার সাথে এতো মাখামাখি কিসের রে? তমিজের বাপ বুড়া মানুষ, তার জোয়ান বৌটার সাথে তোর এতো কথাবার্তা কিসের রে? তোরা বলে সন্ন্যাসীর বংশ, তালে ঐ মোসলমান মাঝিগোরে ঘরে এতো আসা যাওয়া কিসক রে?'

হাটের ভেতরে কোলাহল, হাটের পুবে ও উত্তরে রোদের শেষ তাপে খুলে-যাওয়া শিমুল বৈকুণ্ঠ গিরির চোখের মণি ঢেকে ফেলে তুলার অভ্র উড়িয়ে। বন্ধ চোখের মণিতে জ্বলজ্বল করে ওঠে অন্য এক জোড়া চোখ, সেই চোখ দুটো একটু ছোটো করে ঠোঁট বাঁকা করে বলা কথাটা বৈকুণ্ঠের কানে বাজে চেরাগ আলির দোতারার সঙ্গতের সাথে, 'হামার পানি লিলে তোমার জাত যায়, তা'লে আম খাও তুমি ক্যাংকা কর‍্যা? হামার আম হামাক দাও, তুমি তোমার জাতখান লিয়া বাড়িত যাও।' কিন্তু মুকুন্দ সাহা আজ তাকে কীসব বলে সব ওলটপালট করে দিলো। কুলসুমের বিয়ের দিন মহা হৈ চৈ করে বাতাসা আর খাগড়াই আর হাতিবান্ধার দৈ খেয়ে বৈকুণ্ঠ চলে গিয়েছিলো পোড়াদহ মাঠে সন্ন্যাসীর থানে। গাঁজায় ভালো করে দম দিয়ে বসে সে গান ধরেছিলো বিকট রবে। আজ এতোকাল পর কান ভরে সে শোনে সেই গানের কলি। গানটাই ভালোভাবে শোনার তেষ্টায় না-কি অন্য কোনো তাগিদে হাটের কোলাহল থেকে বেরিয়ে বৈকুণ্ঠ চলতে থাকে পোড়াদহ মাঠের দিকে। সন্ন্যাসীর থানের নিচে বসতেই, গাঁজায় দম না দিয়েও সে শুনতে পায় একই গান :

সন্ন্যাসী শোণিতে রাঙা মানাসের জল।
বিবাহের চেলি পরি করে ঝলমল॥
ধনে জামায়ের অনাসক্তি যৌতুক লইয়াছে ভক্তি
মৃত্তিকা বিগ্রহ তাহার সকল সম্বল॥

গান শুনতে শুনতে এবং তার সঙ্গে নিজের বেসুরো গলা মেলাতে মেলাতে ভবানী পাঠকের মহাপ্রয়াণ ও সংসারে তার বৈরাগ্য বৈকুণ্ঠের চোখে জলের জোয়ার নামালে তার নুনের ধকে তার চোখমুখজিভ খরখর করে। ভবানী তো ঢুকে পড়েছিলো মাটির বিগ্রহের মধ্যে, মাঘের শেষ বুধবারে পূজার পর বিসর্জন দিলেও তার মাটি বাঙালি নদীর রোগা স্রোত ধরে চলে যায় মরা মানাসের দ'য়ে। এখন নায়েববাবু ম্লেচ্ছ মাঝির ওপর রাগ করে এখানে যদি সন্ন্যাসীকে উৎখাত করে, তা হলে সন্ন্যাসী যাবে কোথায়? নায়েব এখানে প্রতিষ্ঠা করবে মা দুর্গাকে। সন্ন্যাসী কি আর অতো জগ্রত দেবীর সঙ্গে পেরে উঠবে? কোথায় মা দুর্গা?—মহিষমর্দিনী, জগত্তারিণী মা, তুমি অম্বিকা, তুমি অন্নদা, তুমি মা চণ্ডী! তোমার বাহুতে শক্তি, সর্বাঙ্গে তোমার মানুষের ভক্তি মাখা। তুমি মা তারা, তুমি মা কালী!—সেই জগজ্জননী মা কেবল নামের জোরে ভবানী পাঠকের স্থান দখল করার লোভে চড়ে বসেছে নায়েববাবুর ঘাড়ে। বেজাতের মানুষের পাপের দণ্ড দিতে নায়েব সন্ন্যাসীকে উৎখাত করে সেখানে বসাবে দুর্গা মা ঠাকুরণকে? তা হলে পোড়াদহের পূজার

স্থানে বেজাতের মানুষের আসাটা বন্ধ করা যাবে, টাউন থেকে এমন কি ভদ্দরলোক, বামুন কায়েতরাও সেখানে পূজা দিতে আসবে। বাঙালি নদীর কোলে বৌড়োবা দ'য়ে মানাসের চোখের জলটুকু পর্যন্ত ঠাকুরের বেদখল হয়ে যাবে, সেটাও থাকবে মা দুর্গার দশ হাতের মুঠের মধ্যে!—তা হলে? তখন বৈকুণ্ঠের এখানে আর থাকার অধিকার থাকবে কোথায়? সাহার কর্মচারী ছাড়া সে তখন আর কিছুই থাকবে না? সেরপুরে ঠাকুর্দার সৎ ভায়ের ছেলেদের হাতে তার সম্পত্তি বেদখল হবার কথা কি কেবল গল্প হয়ে যাবে?—উত্তেজনায় ও দুশ্চিন্তায় এবং নিজের সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার ফলেও বটে, বৈকুণ্ঠ ছটফট করে। তমিজের বাপের ওপর রাগ করার প্রবল চেষ্টা করেও লাভ হয় না। সে ফের রওয়ানা হয় গোলাবাড়ি হাটের দিকে। সেখানে তমিজের বাপকে যদি পাওয়া যায়।

ভোটের দিনেও তমিজের বাপের দেখা নাই। মাঝিপাড়া ভেঙে মানুষ এসেছে। কালাম মাঝি হাজির করেছে সবাইকে। নাই খালি তমিজের বাপ। তা তার অবশ্য ভোটও নাই। তবু যারা এসেছে তাদের বেশিরভাগই ফালতু মানুষ, বছরে ছয় আনা ট্যাকসো দেওয়ার মানুষ এদিকে আর কয়জন?

তমিজের বাপের দেখা পেতে বৈকুণ্ঠের কেটে যায় আরো দেড় দেড়টি মাস। সেদিন মুকুন্দ সাহার খবর নিয়ে বৈকুণ্ঠকে যেতে হয়েছিলো গিরিরডাঙা। মণ্ডলের বড়ো ছেলে আবদুল আজিজ বিলের উত্তর সিথানেরও উত্তরে ইঁটখোলা করেছে। সেখান থেকে কয়েক হাজার ইঁটের বায়না দেওয়ার কথা মুকুন্দ সাহার। তা সাহা নিজেরই আসার কথা, কিন্তু গত রাতে সাহার ভাইপো মরে যাওয়ায় বেচারা আসতে পারে নি। চোখে জল নিয়েই সে বলে, 'তাড়াতাড়ি যা বৈকুণ্ঠ, টাইম মতো না গেলে আজিজ মিয়া আবার কোদ্দ করবি। কোস, পরশুদিন বায়নার ট্যাকা সব হামি লিজে দিয়া আসমু।' কিন্তু বৈকুণ্ঠের আবার কখনো তাড়া থাকে নাকি? একটু ঘুরে ফিরে যাওয়াই তার চিরকালের খাসলত। মোষের দিঘির দক্ষিণ ঢালের ঠিক নিচে দুই বিঘা জমি এবার পত্তন নিয়েছে শরাফত মণ্ডল। হুরমতুল্লা সেখানে নিয়োজিত আউশ বোনার আয়োজনে। নতুন চষা জমিতে মই দিচ্ছিলো হুরমতুল্লা। সাত সকালে লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে ফুলজান বাপের মইয়ের পেছনে পেছনে ঘুরছে। বৈকুণ্ঠ একটু দাঁড়ায়, 'ক্যা গো, লতুন জমিত তো চাষ ভালোই দিলা।' তারপর গলা নামিয়ে বলে, 'তোমার জামাই আছে না? হাটের মধ্যে গান তো ভালোই বান্দিচ্ছে। আছে নাকি? ঘরত আছে?'

হুরমতুল্লা জবাব দেয় না। সেটা কি কথা বলতে গেলেই কাশির দমক ওঠে বলে? না-কি শ্বশুরবাড়িতে জামাই একেবারেই আসে না বলে সে শরম পায়? কেরামত আলির নতুন গান 'মোসলমানের রাতের আঁধার হইলো অবসান' গানটা গুনগুন করতে করতে বৈকুণ্ঠ বিলের ধার দিয়ে হাঁটতে থাকে।

তমিজের বাপকে সে দেখতে পায় মণ্ডলবাড়ি থেকে ফেরার সময়। কালাম মাঝির বাড়ির সামনের উঠানে সে বসেছিলো। কালাম তাকে বোঝাচ্ছে, 'আরে, ইসমাইল সাহেব জবান যখন দিছে, তমিজকে খালাস করার বন্দোবস্ত তো একটা হবিই। তা উকিলের পয়সাপাতি তো কিছু লাগে। হামি দুই হাতোত পয়সা ঢালিচ্ছি, তোমার কাছে কিছু চাইছি, কও?'

তমিজের বাপ মাথা নেড়ে না বললে কালাম মাঝি ফের বলে, 'তুমি কিছু না দিলে হামি আর কতো টানি, কও?'

'হামার আছে কী? বাড়ির পালানে ভিটাও তো মণ্ডলকে দিলাম আকালের বছর।'

'মণ্ডলকে তোমরা মনিব মানছো? ঘরটাও কি তাকই বেচবা?'

ঘরের কথা তমিজের বাপ কখনো ভাবে না। ঘর বেচলে সে থাকবে কোথায়? কালাম মাঝি বোঝায়, 'ঘর তোমারই থাকবি। তোমার ঘর গেলে তোমার বৌবেটার থাকার ব্যবস্থা তো করা লাগবি হামাকই, লয়?' এ সম্বন্ধে তমিজের বাপ তার সঙ্গে একমত হলে সে বলে, 'আর তো কিছু লয়। হামি ট্যাকা দিয়াই যাচ্ছি, বেটা তো তোমার, তোমার দায়িত্ব আছে না? হামার বেটা লায়েক, চাকরিবাকরি করে, হামাক লেখে, মাঝিপাড়ার ব্যামাক মানুষের জিম্মাদারি কি তুমি একলা লিছো? তাই তোমাক যা কলাম, চিন্তা ভাবনা কর‍্যা দেখো।'

কালাম মাঝি বাইরে বেরিয়ে গেলে বৈকুণ্ঠ হাঁটে তমিজের বাপের পাশে পাশে। কয়েক পা হেঁটেই বলে, 'তমিজের বাপ, কামটা তুমি ভালো করো নাই গো!' তমিজের বাপ তার দিকে তাকালে সে গলা নামিয়ে বলে, 'ভবানীর দ'য়ের মাছ ধর‍্যা যে পাপ করিছো তার দণ্ড দেওয়া লাগিচ্ছে হামাগোরে সোগলির।'

তমিজের বাপের ঘোলা চোখ আরেকটু ঘোলাটে হয়, 'পাপ? গুনার কথা কচ্ছিস? মাছ ধরলে গুনা হবি কিসক?'

'ঠাকুরের ভোগের মাছ লিয়া আসিছো পূজার দিন। লয়? ঠাকুরেক তাই এটি বুঝি আর রাখা যাচ্ছে না। লায়েববাবু কছে, সন্ন্যাসীর থানেত উগলান সাত জাতের পূজা বাদ দিবি। ইগলান কী, কও? গুনার ফল লয়?'

'পানির মাছ, পানিতই দিয়া আসিছি। দোষ ধরে ক্যাংকা কর‍্যা?'

এবার ভাবনায় পড়ে বৈকুণ্ঠ। তাই তো সকালবেলা বাঘাড়টা তো তমিজের বাপ ফেলে এসেছে কাৎলাহার বিলে। উত্তরদিকে যাত্রা করে বাঙালির রোগা স্রোত ধরে বাঘাড় নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে ঠাকুরের দ'য়ে। তা হলে আর দোষ হলো কী?

উত্তরে তাকিয়ে তমিজের বাপ যেন কী দেখতে দেখতে বলে, 'মুনসি পাকুড়গাছ থ্যাকা ন্যামা আসিছিলো, তার সাটাসাটি শূন্যা হামি মাছ তো পানিত দিয়া দিলাম। হামার দোষ হলো কোটে?'

৩৩

মুকুন্দ সাহার দোকানে কয়েক দিনের বাসি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় হুমড়ি খেয়ে পড়ে লোকজন। কলকাতায় মুসলমানরা হিন্দুদের মেরে সাফ করে ফেললো। সুরাবর্দি নিজে পিস্তল নিয়ে বেরিয়েছে হিন্দু মারতে। সতীশ মুক্তারের গলাটা ঘ্যারঘ্যারে হলেও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' জোরে জোরে পড়ে মন্তব্য করার দায়িত্বটা পালন করতে হয় তাকেই। তবে তার সাটাসাটি শুনে বৈকুণ্ঠের তেমন উত্তেজনা হয় না, এইসব মানুষের রাগ করার ক্ষমতাও তার জানা আছে। এই সময় দরকার ভবানী পাঠকের মতো তেজি সন্ন্যাসীর, পাঠান সেনাপতিকে নিয়ে সুরাবর্দি একশোটাকেও সে ঠিক সাফ করে ফেলতে পারে। আজ সন্ধ্যার পর পোড়াদহে তার থানে বৈকুণ্ঠ গিয়ে একবার বসবে।

বেশ এক পশলা বৃষ্টিতে ভাদ্রের গুমোটটা ধুয়ে গিয়ে বিকালবেলা ঝকঝক করে উঠলে গাল ভরা জর্দা দেওয়া পান নিয়ে বৈকুণ্ঠ কাদেরের ঘরে গেলো কেরামতের গান শুনতে।

কিন্তু কাদেরের দোকানে আজ সুরের লেশমাত্র নাই। কাদেরের চেয়ারে বসে রয়েছে আবদুল আজিজ। চোখজোড়া তার লাল, দাড়ি-না-কামানো গালে দাড়ির ছোটো ছোটো কাঁটার গোড়ায় গোড়ায় কাঁপুনিতে তাকে অচেনা ঠেকে। বৈকুণ্ঠকে দেখে কেউ কেউ তার দিকে তাকায় চোখ পাকিয়ে এবং কয়েকটা ছেলে হঠাৎ করে চেঁচিয়ে ওঠে, 'লড়কে লেঙে পাকিস্তান।'

আবদুল কাদের বলে, 'বৈকুণ্ঠ, তুই যা, এখন যা। পরে আসিস।'

বৈকুণ্ঠ একটু সরলেও দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে এবং শোনে, কলকাতায় হিন্দুদের হাতে খুন হয়েছে আবদুল আজিজের সম্বন্ধী আহসান আলি। আহসানের সঙ্গে ছিলো আজিজ নিজে। সে কোনোমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। কলকাতার ময়দানে সেদিন মুসলিম লীগের মস্ত মিটিং; মিটিং থেকে ফেরার সময় হিন্দুরা তাদের হামলা করলে সম্বন্ধীর হাত ধরে আজিজ দৌড় দেয়। মিটিঙেই ওরা শুনেছিলো, শহরে অনেক জায়গায় দাঙা লেগে গেছে। সভা শেষ হওয়ার আগেই তারা বেরিয়ে পড়েছিলো। ধর্মতলা পর্যন্ত আসতেই দেখা গেলো, দোকানপাট সব লুট হচ্ছে। একটা হিন্দু দোকানের সামনে দাঁড়াতে চাইছিলো আজিজ, কিন্তু আহসানই তাকে টেনে নিয়ে যায় সামনে। তালতলার কাছাকাছি এলে এক মুসলমান দোকানে তারা উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় কয়েকটা হিন্দু আহসানের পেটে বসিয়ে দিলো ছুরির ফলা। আহসান সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেলো। আজিজকে নিজের দোকানে টেনে নেয় এক হিন্দু দোকানদার। সেখান থেকেই সে দেখলো, আহসানের বুকে ছুরির আরো কয়েকটা ঘা বসিয়ে দিয়ে গুণ্ডারা পাকড়াও করলো ১৪/১৫ বছরের এক পানবিড়ির দোকানদারকে। আজিজ সেখানে কী করতে পারে? তাকে নিজের দোকানে আলমারির পেছনে পুরো দুটো দিন দাঁড় করিয়ে রেখে ঐ হিন্দু দোকানদার রাস্তায় ছেড়ে দেয়। আজিজ এইসব বলে আর হাঁপায়। কলকাতায় দাঙা হবে কে জানতো? আজিজ গিয়েছিলো আহসানের দোকানের জন্যে মাল কিনতে। ১৬ তারিখে কলকাতায় সব বন্ধ, কেনাকাটা তো কিছুই হলো না। ভেবেছিলো পরদিন বাজার থেকে মাল কিনে রাত্রে দার্জিলিং মেলে ফিরবে। আহসান শান্তাহারে নেমে ধরবে মিটার গেজের ট্রেন আর আজিজ চলে যাবে জয়পুর। তা আল্লা তার কপালে যে এই রেখেছে তা জানতো কে? শেষে কলুটোলায় এক দর্জির দোকানে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আজিজ আজ টাউনে পৌঁছেছে দুপুরবেলা। শ্বশুরবাড়িতে কোনোমতে খবরটা দিয়ে টমটম নিয়ে বাড়ি এসেছে। তার বৌ এখন বাড়িতে, বৌকে খবরটা দিতে সাহস হচ্ছে না বলেই আজিজ হাটে এসে বসে রয়েছে। সে তেমন কথাও বলতে পাচ্ছে না, তার সম্বন্ধীর খুন হওয়ার বিবরণ [illegible] যে, মনে হয় সে নিজে ঐ হত্যামায় রীতিমতো অংশ নিয়েছে। [illegible]তে আবদুল আজিজ হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে, [illegible] সম্বন্ধীর শোকে আর কতোটা সম্বন্ধীর বোনের ভয়ে তা জরিপ করা মুশকিল হলেও তা সাড়া তোলে কাদেরের তরুণ কর্মীদের শরীরে। একজন বলে, 'কাঁদেন কেন? শোধ নেওয়া হবে।' আবদুল কাদের বৈকুণ্ঠকে ধমক দেয়, 'বৈকুণ্ঠ, তুই গেলু না? ঘরত যা।'

বৈকুণ্ঠ নড়বে কি, তার সামনে তখন ঝুলছে সন্ন্যাসীর হাতের খাঁড়া। আবদুল

আজিজের সম্বন্ধীকে সে কয়েকবার দেখেছে, টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ আর টিকালো নাক দেখে কে বলবে, এ বামুনের ঘরের ছেলে নয়? আর ব্যবহার কতো ভালো, তাকে বলতো বৈকুণ্ঠবাবু; সাহার দোকানের কর্মচারী বলে কখনো হেলা করে নি। খুব পান খেতো, জর্দাও খেতো একই মার্কার। একবার খুশি হয়ে নিজের জর্দার কৌটা জোর করেই দিয়ে দিলো বৈকুণ্ঠের হাতে, বললো, 'আরে টাউনে এই জর্দা তো যখন তখন পাই। আপনে রাখেন।'—তো সেই মানুষকে খুন করলো কারা গো? ঐ খুনীদের ঘাড়ের ওপর ভবানী সন্ন্যাসীর খাঁড়া যদি নেমে না আসে তো সেটা সন্ন্যাসীর হাতে রেখে কী লাভ? সে কি কেবল মাগীমানুষের গয়না হয়ে হাতে ঝুলবে? মুকুন্দ সাহার দোকানে কয়েকদিন থেকেই সে শুনে আসছে, কলকাতায় খুব দাঙা চলছে। মোসলমানরা হিন্দু মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের ঘরে, আর হিন্দু পুরুষমানুষগুলোকে কচুকাটা করছে। তা মোসলমান জাত শালারা বড়ো মাথাগরম, শালাদের খাওয়াদাওয়ায় বাছবিচার নাই, এর এঁটো সে খায়, পুরুষগুলো আছে খালি বিয়ের তালে। কিন্তু আবদুল আজিজের সম্বন্ধী, আহা কী সুন্দর ছেলেটা, এভাবে খুন হবে কেন? বৈকুণ্ঠের মাথাটা এলোমেলো হয়ে যায়। তার খুনীদের ওপর সন্ন্যাসীর খাঁড়াটিকে ঝুলতে দেখার জন্যে সে ওখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। সন্ন্যাসী এই এলো বলে। পাছে সে চোখের আড়াল হয় এই ভয়ে বৈকুণ্ঠ এক পা নড়ে না।

তার পিঠে হাত রেখে আবদুল কাদের তাকে একরকম ঠেলে বাইরে নিয়ে যায়। মুকুন্দ সাহার দোকানে তাকে ঢুকিয়ে বারান্দা থেকে চিৎকার করে, 'মুকুন্দবাবু, আজ রাতটা আপনারা ঘরের ভেতর থাকবেন। চিন্তার কারণ নাই। তবু বাইরে না বারানোই ভালো। কলকাতায় মোসলমান মারার খবর পায়া চ্যাংড়াপ্যাংড়া একটু চেত্যা আছে। তা আমাদের ওয়ার্কাররা হাটের মধ্যেই থাকবি, ভয় নাই।'

মুসলিম লীগের কর্মীরা হাটে থাকবে শুনে মুকুন্দ সাহার ভয় বাড়ে। কলকাতার খবর সে কম রাখে না। কাদের তো পড়ে 'দৈনিক আজাদ', সতীশ মুক্তার সবসময় বলে 'অজাত'। মুক্তার লেখাপড়া জানা বামুন, ঠিকই বলে, শালা মোসলমানরা ভাষা পর্যন্ত লিখতে জানে না ঠিকমতো, আবার কাগজ হাঁকায়। মূর্খের হাতে ভুলভাল ভাষায় মিছে কথা ছাড়া আর কী বেরুবে? —আবদুল কাদের চলে গেলে মুকুন্দ সাহা ফিসফিস করে, 'বৈকুণ্ঠ, দরজার খিল লাগাবু, ছিটকিনি দিবু, বাঁশের ডাঁশাটাও লাগায়া দিস।' তারপর ধানের বস্তা দরজার সামনে এনে বলে, 'এই দুইটা দরজার সাথে ঠেস দিয়া রাখিস। যে শালাই আসুক, দরজা খুলবু না। শাবল থাকলো, ভয় করিস না। আজ হামার বাড়িত যাওয়াই লাগবি। বাড়ি খালি। হরিপদ থাকলে— ।' কয়েকদিন আগে মৃত ভাইপোর কথা মনে পড়ায় তার গলা ভারী হয়ে আসে। তবে ঘর থেকে নামতেই তার পা হয়ে আসে খুব হালকা, তাড়াতাড়ি চলে যায় বাড়ির দিকে।

লণ্ঠনের আলোয় বৈকুণ্ঠ বিছানা পাতে ঘরের কোণে তক্তপোষের ওপর। ঘুমের ঘোরে খাঁড়া হাতে সন্ন্যাসীকে তৎপর দেখার লোভেই হোক আর হঠাৎ-নামা টিপটিপ বৃষ্টির সঙ্গে চেরাগ আলির গান শোনার সখেই হোক, কিংবা চোখ জুড়ে ঘুম নেমেছিলো বলেই হয়তো বিছানায় শোবার সঙ্গেসঙ্গে বৈকুণ্ঠ ঘুমিয়ে পড়ে। তার ঘুমোবার সুযোগ নিয়ে দরজায় ঠেস দিয়ে রাখা বস্তা দুটোয় ঢুকে পড়ে ইঁদুর! তাদের ব্যস্ত চলাচলের শব্দে জেগে উঠে বৈকুণ্ঠ সারা ঘরে ভালো করে ঘুরে ঘুরে দেখে। না, কোথায় ইঁদুর! বৃষ্টি বোধহয় থেমে গেছে, টিনের চালে এখন আর টুপটাপ আওয়াজ নাই। বিছানায় ঘুমোলে

বৈকুণ্ঠ ফের শোনে, এই শুরু হলো ইঁদুরের উৎপাত। এদিকে কারা যেন আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে, এতেও শালা ইঁদুরের আসাযাওয়া এতোটুকু কমে না। ধানের বস্তা সব সাফ করে ফেললো। তারপর আলো বাড়তে থাকলে ইঁদুর আর থাকে না। কিন্তু এতো হ্যাজাক জ্বলে কেন? এসব কিসের আলো? এতো মানুষ মশাল নিয়ে এসেছে কেন? এতো আলো, এতো লোকজন দেখেও, তার মাথায় টোপর দেখেও চেরাগ আলি গম্ভীর হয়ে থাকে। 'কী হলো? ও ফকির, কথা কও না কিসক?' তার ব্যাকুলতায় ফকির একটু হাসে, বলে, 'তোর বিয়া, তুই বুঝিস না?' তা তার বিয়েতে ফকিরের এমন মন খারাপ করার কী হলো? 'বিয়া হলে কি আর হামাগোরে সাথে তুই থাকবু, না তোক থাকবার দিবি?' বলতে না বলতে তার হাতের দোতরার টুংটাং আওয়াজে বেজে ওঠে :

> নওশা সাজে আপনারে দেখি মুসা হাসে।
> শুনিয়া মজনুর মুখে বেদনা পরকাশে॥
> শাদিতে মিলন শাদি পরম মিলন।
> পরম মিলনে ছিন্ন হয় নিজ জন॥

ফকিরের খটখটে কথায় বৈকুণ্ঠের ঘুম ভেঙে যায়, তার গা ছমছম করে। বিয়ের স্বপন দেখা ভালো কথা নয়। ফকির তো সেই কথাই জানিয়ে গেলো। এখন প্রথম জানালো, না-কি আগেও এই শোলোক সে কখনো বলেছে? একবার তমিজের বাপের কাছে গেলে হতো, অনেক করে ধরলে সে নিজে কিংবা কুলসুম এই স্বপ্নের একটা বৃত্তান্ত ঠিক বলে দেবে।

'ক্যা রে, বৈকুণ্ঠ, আয় ঘরত আয়।' বৈকুণ্ঠের গলা শুনে তাকে আদর করে ঘরে ডেকে তমিজের বাপ বিছানা ছেড়ে ওঠে। ঢুকতে ঢুকতে বৈকুণ্ঠ বলে, 'স্বপনের মধ্যে ফকির আসিছিলো, শোলোক কয়া গেলো। মনে হলো, তোমার কাছে বিত্তান্তটা শূন্যা লেই।'

তমিজের বাপ ধীরেসুস্থে উঠে ডোবার দিকে যায়, তার কোনো তাড়া নাই। তাড়া দেয় বরং কুলসুম, 'তুমি এটি আসো কোন আক্কেলে? কামারপাড়ার সোম্বাদ শোনো নাই?'

না তো।—রাত্রিবেলা কামারপাড়ায় কারা যেন আগুন লাগিয়ে এসেছে। তারা সব চিৎকার করতে করতে যায় এবং আগুন লাগিয়ে ঐভাবে 'নারায়ে তকবির, আল্লাহ আকবর' বলতে বলতে ফেরে। তবে কামাররা একজোট হয়ে আবার 'বন্দে মাতরম' চিৎকার করতে করতে তাদের তাড়া করে। কামারের ঘরে তো আর অস্ত্রের অভাব নাই, তাই হামলাটা তাদের ওপর বেশিক্ষণ চালানো যায় নি। এই পর্যন্ত বলতে কুলসুম বেশি সময় নেয় না। বৈকুণ্ঠ কেবল জিগ্যেস করে, 'আগুন ধরাছিলো কী দিয়া?'

কুলসুম তা জানবে কোত্থেকে? গলা একেবারে খাদে নামিয়ে ফিসফিস করে সে কেবল জানায়, 'মানুষ গেছিলো এই পাড়া থ্যাকা। কালাম মাঝির ঘরত কাল মেলা মানুষ জড়ো হছিলো। তামান রাত কথাবার্তা শোনা গেছে। তমিজের বাপোক ডাকে নাই। তাই ঘুম পাড়িচ্ছিলো, একবার বুধা বুঝি ডাক দিলো, হামি শুনলাম কালাম মাঝি কচ্ছে, "দূর ঐ বোগদাটাক লিয়া কী হবি? তোমরা যাও।" '

ডোবা থেকে ফিরে উপুড় হয়ে লুঙির কোঁচড়ে মুখ মুছতে মুছতে তমিজের বাপ বলে, 'উগলান থো। তুই ক বৈকুণ্ঠ, কী দেখলু ক।'

কিন্তু মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে দেখা স্বপ্ন বলতে বৈকুণ্ঠের এলোমেলো হয়ে যায়। একবার বলে, টিনের চাল থেকে ইঁদুর পড়ছিলো টপটপ করে, ধানের বস্তায় ঢুকে তারা

ধান সব খেয়ে ফেলেছে। তারপর অনেক মশাল জ্বলতে দেখে সে চেরাগ আলিকে জিগ্যেস করে, এতো আলো কিসের? চেরাগ আলি বললো, এসব হলো বৈকুণ্ঠের বিয়ের আতসবাজি। তারপর কী একটা শোলোক বললো, এখন সেটা আর মনে পড়ছে না। নিজের বিয়ের স্বপ্নের কথা কুলসুমের সামনে বলতে তার কেন যেন বাধো বাধো ঠেকে। মানুষের স্বপ্নের বৃত্তান্ত শোনার খাঁই এই ছুঁড়িটার কখনো গেলো না। দাদার আমলে ছিলো যেমন, এখনো তেমনি আছে। দাদার ধাতই পেয়েছে, স্বপ্নের কথা শুনতে হলে পয়সা চাই তার। এখন কেমন বেহায়ার মতো বলে ফেললো, 'শোনো, ইগলান কাম পয়সা ছাড়া হয় না। দাদা কম কর‍্যা হলেও একটা কানা পয়সা না লিয়া খাবের তাবির কয় নাই।' তমিজের বাপ তাকে হাত তুলে চুপ করতে বললে ভেতরের উঠানে যেতে যেতে সে গজর গজর করে, 'মানুষটাক গাঁও পার কর‍্যা দিয়া আসো গো, অক তো মারবিই, তোমার ঘরতও আগুন দিবি।'

কুলসুমের এসব কথায় বৈকুণ্ঠের স্বপ্নের বিবরণ ফের উল্টাপাল্টা হতে থাকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'ইন্দুরে ধানের বস্তাত ঢুক্যা খালি খুটখাট করিচ্ছিলো। তারপরে —।'

কুলসুমের বিড়বিড় বকা হঠাৎ ছন্দ পায়,

'ইন্দুরে খাইলো ধান বড়ো কুফা বাত।
জানিয়া রাখিও বান্দার কমিলো হায়াৎ।'

কুলসুমের একটিমাত্র শোলোকে বৈকুণ্ঠের সারা রাতের স্বপ্নই মনে পড়ে। প্রথম থেকে সে সব বলে আর চেরাগ আলির বই সামনে রেখে তমিজের বাপ একটা কাঠি দিয়ে মাটিতে চৌকা চৌকা দাগ কাটে। এর মধ্যে কালাম মাঝির বাড়ি থেকে শোর শোনা যায়, 'আজ শালা হাতিয়ার লিয়া যামু। মালাউন এটি একটাও রাখা হবি না।' অন্য একটি ভারী গলায় কে বলে, 'আজ শালা লায়েবেক ধরা হবি। শালা হামাগোরে মানুষ জ্ঞান করে না।' শুনতে শুনতে তমিজের বাপের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় কি-না বোঝা মুশকিল। মাটিতে আঁকিবুকি কাটা তার অব্যাহত থাকে।

'ক্যা গো তমিজের বাপ, ও চাচা ও তমিজের বাপ চাচা।' শমশেরের গলা শুনে একটু চমকে উঠলেও তমিজের বাপ তাকে ভেতরে ডাকে।

শমশের দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, 'মণ্ডলের বড়ো বেটা তোমাক খবর দিছে, এখনি যাওয়া লাগবি।'

'কিসক?' কুলসুম প্রায় তেড়ে আসে, 'ঐ বাড়িত যাওয়া লাগবি কিসক? যার বেটাক জেলের ভাত খিলাবার পাঠাছে, তাক আবার ডাকে কিসক?'

'মণ্ডলের বেটার সম্বন্ধি না শালা না শ্বশুরেক কলকাতাত হিন্দুরা জবো করিছে। খবর পাও নাই? তো আজিজ মিয়ার বৌ বিশ্বাস পায় না। স্বামীক কয়, তুমি হামার ভায়েক ছ্যাড়া পলায়া আসিছো। হামার ভাই মরে নাই। এটা ঠিক ঠিক কবার পারবি তমিজের বাপ। টাউনের মেয়ামানুষ, কাল থ্যাকা খবর শুন্যা খালি বেহুঁশ হয়া যাচ্ছে। তুমি না হয় একবার চলো।' তমিজের বাপকে রাজি করাতে সে টোপ দেয়, 'এই সুযোগে তমিজের কথাটাও না হয় তুলবা।' বৈকুণ্ঠের দিকে নজর পড়লে শমশের একটু কাঁচুমাচু হয়, 'ক্যা গো, তুমি? কলকাতাত বলে হিন্দুরা মোসলমান ধর‍্যা ধর‍্যা মারিচ্ছে। তুমি বাপু এটি থাকো না, হাটোত যাও, না হয় সাহার বাড়িত যায়া কয়টা দিন থ্যাকা আসো।'

তমিজের বাপ বৈকুণ্ঠকে ছাড়ে না, 'তুই হামার সাথে চল। তোর খাবের তাবির করা সোজা লয়। এখন চল। ঘুর্‌্যা আসি।'

মণ্ডলবাড়ি ঢোকার আগেই হামিদার হাউমাউ কান্না তমিজের বাপের বুকে জোরে ধাক্কা মারে। এই মেয়েটার বুক থেকে তার বেটাটা ছিঁড়ে গেলো এই তো কয়েক মাস আগে। এখন আবার হিন্দুরা কেড়ে নিলো তার ভাইকে। কাৎলাহারের মুনসি এসব দেখে না? কলকাতা অনেক দূরের জায়গা, অতোটা দূরে তার নজর বোধহয় আর যায় না।

তমিজের বাপকে দেখে শরাফত মণ্ডলের মেজাজ চড়ে যায়, 'বুড়াটা আবার এই বাড়িত ঢোকে কোন সাহসে? বিল ডাকাতি করিছে, এখন বাড়িত হামলা করবার চাস? শালা নিমকহারাম বুড়া।'

আবদুল আজিজ বিব্রত হয়, ভয় পায় আরো বেশি। তবে বাপের চেয়েও বেশি ভয় তার তমিজের বাপের অভিশাপকে। সে কিছু বলার আগেই আবদুল কাদের বলে, 'তমিজের বাপকে খবর দিয়া আনা হছে। ভাবি খালি বেহুঁশ হয়া যাচ্ছে। আহসান ভাইয়ের আসল অবস্থাটা যদি তমিজের বাপ কবার পাবে, ভাইজান তাই তাক খবর দিছে।'

বেটার বৌয়ের এসব আদিখ্যেতা শরাফতের অসহ্য ঠেকে। হায়াৎ মওতের মালিক আল্লা। আল্লা মওত দিয়েছে, ছেলেটা মারা গেছে। মুর্দাকে জিন্দা ভাবা, কিংবা মুর্দাকে জিন্দা করার চেষ্টা করা গুনা। রসুলুল্লা স্বয়ং কারো হায়াৎ মওত নিয়ে আল্লার কাছে তদবির করেন নি। আর কোথাকার কোন শালা তমিজের বাপ, এই বাড়ির নিমক খেয়ে বড়ো হয়ে আবার তারই বিল ডাকাতি করতে যায়, সেই ডাকাতটা আসে মরা মানুষের তত্ত্বতালাশ করতে। আবার এসব শেরেকি কাম হয় কি-না তারই বাড়িতে। বড়োবেটার বৌ এসে তার জামাতের ইজ্জত নষ্ট করে দিলো। টাউনের মেয়ে, গায়ের রঙ ফর্সা, আবার বৌ হয়ে আসার পর বাড়ির আয় উন্নতিও বেড়েছে, ছেলেমেয়েদের মানুষও করছে ভালো করে। বৌটাকে কিছু কওয়াও যায় না, আবার সওয়াও মুশকিল।

সুতরাং শাসাতে হয় তমিজের বাপকেই, শরাফত মণ্ডল তার আরেক দোষ ধরে, 'কাল তোমরা মাঝিপাড়ার মানুষরা আগুন ধরায়া আসিছো কামারপাড়াত। আর বেনবেলা সাথে লিয়া ঘোরো বৈকুণ্ঠক, তোমার মতলবটা কী কও তো? এই চ্যাংড়াটাক মারবার ফন্দি করিছো?'

বাপের কথায় কাদের একটু অসন্তুষ্ট, 'কামারপাড়াত আগুন ধরলো কীভাবে কেউ কবার পারে? কামারের ঘরে তো দিনরাত হাঁপরের আগুন জ্বলেই। হাঁপর থ্যাকাও তো দশরথের চালে আগুন ধরবার পারে। না-কি?'

কাদেরের তেজে একটুখানি জ্বলে ওঠে গফুর কলু, 'কলকাতাত মোসলমান মরিচ্ছে কুত্তাবিলায়ের লাকান। আর এটি দশরথ কর্মকারের মরিছে দুইটা গোরু। তা গোরু তো হিন্দুর দেবতা, গোয়ালেত যায়া দেবতাক ছ্যাড়া দিবার পারলো না কিসক, লিজের জানের ভয়ই বেশি হয়া গেলো?'

'গোরু ছাড়া থাকলে তুই ধর্‌্যা লিয়া আসবার পারিলিহিনি, না? আরে, তুই হলু কলুর বেটা, গোরু তো তোর জান রে! গোরু ছাড়া গাছ থ্যাকা ত্যাল করবার পারবু? মাঝিগোরে সাথে তুইও গেছিলু? মাঝিপাড়ার ঘাটা না তোর জন্যে বন্ধ করা হছে?'

'বাপজান!' সংযম রাখা কাদেরের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে, 'আজ হিন্দুর হাতে মার খাচ্ছে সব জাতের মোসলমান। মোসলমানের আবার জাত কী? কিন্তু হিন্দুরা কলকাতায় কি কোনো মোসলমানকে বাদ দিচ্ছে, কন?' আহসান আলির হত্যাকাণ্ডটি সে বর্ণনা করে

প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায়। মরার আগে সে এক ফোঁটা পানি খেতে চাইলে হিন্দু গুণ্ডা তার মুখে পেচ্ছাব করে দিয়েছিলো। হিন্দু মেয়েরা পর্যন্ত বাড়ির ছাদ থেকে লাঠিসোটা এগিয়ে দিচ্ছিলো। তার উত্তেজনায় শরাফত মণ্ডল নরম হয়, 'কিন্তু বাপু আজিজের জানটাও তো বাঁচলো হিন্দু দোকানদারের হাতেই। এটাও তো দেখবা।'

'সে রকম তো আমরাও করি। করি না? এই যে বৈকুণ্ঠ গিরি, কাল সন্ধ্যা থ্যাকা কচ্চি, বাপু, একটু হুঁশিয়ার হয়া থাকো। চেনাজানা মানুষ, একে আমরা চিনি, এর জন্যে কি আমাদের মায়ামমতা নাই?'

'আর ঐ হিন্দু দোকানদার?' শরাফত মরিয়া হয়ে তর্ক করে, 'আজিজের সাথে ঐ মানুষটার কি চেনাজানা আছিলো?'

'আপনে একটা একটা মানুষ ধর‍্যা যদি কথা কন তো আর কিছু কওয়া যায় না। কিন্তু এখন উঠিছে জাতের সওয়াল। হিন্দু মোসলমান কাটাকাটি করে দুই জাত হয়া।'

একটা একটা মানুষ নিয়েই তো জাত, এই কথাটা বলা শরাফতের বুদ্ধিতে কুলায় না। আবার এই সময় আজিজ তমিজের বাপকে ডেকে নেয় বাড়ির ভেতরে, এতেও সে বিরক্ত। বরং এতেই বেশি অসন্তুষ্ট হয়ে সে বড়ো বেটাকে বলে, 'দেখো, বাপু, বাড়ির ভেতরে পর্দার দিকে খেয়াল রাখো।'

কিন্তু ততোক্ষণে তমিজের বাপ ভেতরের উঠানে গিয়ে বসে পড়েছে তার দাদাশ্বশুরের ছেঁড়াখোঁড়া বই আর একটা কঞ্চি নিয়ে। এই বাড়ি পাকা হবার পর সে ভেতরে ঢুকলো এই প্রথম। উঁচু পাকা বারান্দায় জলচৌকিতে বসে রয়েছে হামিদা, পাশে শরাফতের দুই নম্বর বিবি। হামিদার মাথার ঘোমটা তার কপালের ওপরেই ওঠানো। কাঁদতে কাঁদতে সে যা বলে তা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয় তার সৎশাশুড়ি। হামিদার মতো তারও বিশ্বাস, আহসান আলি মরে নি। হিন্দুরা তাকে হয়তো কোথাও লুকিয়ে রেখেছে, কিংবা সে পালাতে গিয়ে আটকা পড়েছে কোথাও।

তমিজের বাপ উঠানে বসে নানারকম দাগ কাটে, বিড়বিড় করে কী বলে, বইটা দেখে, তারপর রায় দেয়, 'কুটি আছে এখন কওয়া যাচ্ছে না। মরলে তো— ।'

'কই নাই? হামি কই নাই?' হামিদা এমনভাবে চেঁচিয়ে ওঠে যে, তমিজের বাপ তার ভাইয়ের জীবিত থাকার কথা ঘোষণা করলো। ফোঁপাতে ফোঁপাতে সে বলে, গত কয়েকদিন ধরে বাড়ির পশ্চিমদিকে খালি কাক ডাকে, খালি কাক ডাকে। তখনই তার মনে হয়েছে, কোথাও কী সর্বনাশ হচ্ছে। কিন্তু মিয়াভায়ের কথাটা তার একবারো মনে হয় নি। তবে তার মিয়াভাই নামাজরোজা করা মানুষ, সে অপঘাতে কখনোই মরতে পারে না। হাজার হলেও সে হলো টাউনের লোক, কলকাতায় চলাফেরায় সে কি আবদুল আজিজের চেয়ে অনেক বেশি পারঙ্গম নয়? তমিজের বাপ তো দুনিয়ার আর আখেরাতের অনেক কথা জানে। সে কি একটু গোনাগাথা করে মিয়াভাইয়ের এখনকার অবস্থাটা বলে দিতে পারে না?

তমিজের বাপ উঠতে উঠতে বলে, 'অমাবস্যার আগে আর কিছু কওয়া যাবি না।'

অমাবস্যার রাতে কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে পাকুড়তলায় মুনসির দেখা পাওয়ার সম্ভাবনাটা বাড়ে। এ তো সবাই জানে। আজিজের কেমন ভুলো লাগে, সম্বন্ধীকে সে কি সত্যি একেবারে মরে যেতে দেখেছে? তাকে মেরে কি নালার ভেতর ফেলে দিতে দেখলো? তা অমাবস্যার সময় না হয় তমিজের বাপকে আরেকবার ধরা যাবে। তার তো এখনো দিন বিশেক বাকি।

সন্ধ্যার আগেই আজিজ তার বৌকে টমটমে উঠিয়ে নিয়ে গেলো টাউনে। সেখানে তার শ্বশুরবাড়িতে বৌকে রেখে সে চলে যাবে জয়পুর। বাবরটা একা পড়ে আছে সেখানে। ছেলেকে নিয়ে সপ্তাহখানেক পর সে ফের শ্বশুরবাড়ি আসবে। ঐ সময় বাড়িতেও এক পাক ঘুরে যাবে। এইসব ঝামেলায় ইঁটখোলায় লোকসান হচ্ছে। মুকুন্দ সাহাকে কয়েক হাজার ইঁট দেওয়ার কথা। তাকেও কিছু বলার সময় পাওয়া গেলো না।

বেটা বেটার বৌ চলে গেলে খড়ম পাল্টে পাম্পস্ পায়ে শরাফত মণ্ডল রওয়ানা হয় কামারপাড়ার দিকে। যুধিষ্ঠির এবার তার জমিতে বর্গা করে আউশ ফলালো, কামারের হাতে খন্দ মন্দ হয় নি। কিন্তু কাল তো আগুনে তার দুটো গোরুই পুড়ে মরেছে। এবার তাকে বর্গা করতে দেয় কী করে সেই ভাবনায় মণ্ডল বেশ কাতর।

৩৪

'নারায়ে তকবির'—'আল্লাহু আকবর' স্লোগানে গোলাবাড়ি থেকে ওদিকে লাঠিডাঙা এবং এ দিকে গিরিরডাঙা পর্যন্ত কেঁপে উঠলে শীতরাত্রির হিম কেটে লাফিয়ে ওঠে চারপাশের গ্রামগুলো। শরাফত মণ্ডল নিজেই প্রায় দৌড় দিয়ে হাজির হয় গোলাবাড়ির হাটে, কাদেরকে ধরে এই মানুষগুলিকে যে করে হোক ঠেকাতে হবে। কিন্তু কাদের দোকানেও নাই। চেয়ার ও বেঞ্চ জোড়া দিয়ে নবিতনের বোনা কাঁথার ওপর রেড ক্রসের কম্বল গায়ে মাথায় জড়িয়ে অঘোরে ঘুমায় কেরামত আলি। তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে ওঠাতে হয়। 'কাদের ভাই তো সন্ধ্যার অনেক আগেই টাউনে গেলো, কাল দুপুরবেলা আসবি।' তো দরজা আটকানো নাই কেন? ভালো করে চোখ মুছে কেরামত দেখে, পাশে গফুর নাই। দরজা খুলে বাইরে থেকে ভালো করে ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেছে কেরামত টেরই পায় নি। শরাফত হায় হায় করে। দরজা ভেতর থেকে ভালো করে না আটকে এরকম কুম্ভকর্ণ মার্কা একটা লোককে রেখে যায় সে কোন আক্কেলে? কলুর বেটাকে একশোবার বেচলেও দোকানের মালপত্রের দাম উঠবে না। তবে শরাফতের হায় হায় করার দ্বিতীয় কারণটি আরো গুরুত্বপূর্ণ। গফুরও তা হলে কাছারি হামলা করতে গেছে, এর মানে এতে কাদেরেরও সায় আছে। কাছারির একটা প্রাণীর গায়ে আঁচড় লাগলে নায়েববাবু আশেপাশের গ্রামে একটা মানুষকে রেহাই দেবে না। টাউনের নেতাদের সঙ্গে কাদের দিনরাত ঘোরে, অথচ বোঝে না, জমিদারবাবুর বড়ো ছেলে হলো খান বাহাদুর আলি আহমদের গেলাসের ইয়ার। বন্ধুকে খুশি করতে খান বাহাদুর মন্ত্রীর সমস্ত ক্ষমতা খাটাবে।

শরাফত বলে, 'কেরামত, চলো, মাঝিগোরে আটকান লাগবি। কাছারির কিছু হলে সর্বনাশ হয়া যাবি গো।' কিন্তু ততোক্ষণে আশেপাশের গ্রামের মানুষ সব ভিড়ে গেছে মাঝিদের সঙ্গে, কাদেরের দোকানের ভেতর থেকেও বোঝা যায়, সবাই চিৎকার করতে করতে ছুটছে লাঠিডাঙা কাছারির দিকে। শরাফত একবার বাইরে বেরিয়ে ও কাছারির দিক থেকে বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজে ঘরে ঢুকে কাঁপতে থাকে।

ওদিকে কাছারি থেকে কয়েকবার বন্দুকের আওয়াজ হতে থাকলে কালাম মাঝির ভাইপো আফসার দলবল নিয়ে পিছু হটে। কিন্তু অনুসারীদের সামলানো তখন তার সাধ্যের বাইরে, সমলাবার ইচ্ছাও তার ছিলো কি-না সন্দেহ। লোকজন উল্টোদিকে দৌড় দেয় বটে, তবে রাস্তা থেকে কয়েক গজ ভেতরে মুচিপাড়ার সবেধন নীলমণি আটটা ঝুপড়ি তছনছ করে দেয় এবং গোটা বারো শুওরকে মেরে ফেলে মাছ মারার বড়ো বড়ো কোঁচ দিয়ে। কেউ কেউ গোলাবাড়ির হাট পর্যন্ত আসে এবং কাদেরের অফিস-কাম-দোকানের ভেতর থেকে শরাফত ও কেরামত শুনতে পায় 'শালা মুকুন্দ সাহার দোকানটা ধরা হোক।' কিন্তু কালাম মাঝির উচ্চকণ্ঠ ধমকে তারা থামে, 'আরে এটাক ধর‍্যা কী হবি? বাদ দাও। খাড়াও, কালই শালা একটা বন্দুক জোগাড় করি, শালার নায়েবেক জখম করবার না পারলে হামার জিউ ঠাণ্ডা হবি না।'

পরদিন গোলাবাড়িতে হাটবার। কিন্তু দোকানপাট সব বন্ধ, লোকজন যা আছে সবাই চাপা উত্তেজনায় চুপচাপ হাঁটে। আগের রাতে নায়েবের নাকি কাছারিতেই থাকার কথা, বোধহয় খবর পেয়েই বিকালবেলা কেটে পড়েছে। গুজব শোনা যাচ্ছে, নায়েববাবুর কাছ থেকে খবর পেয়ে জমিদারবাবুর বড়ো ছেলে আলি আহমদ সাহেবের কাছে রিপোর্ট করেছে। হাটে হয়তো পুলিস এসে পড়বে, পুলিস এলে কী হতে পারে, কার কার ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশি,—এই নিয়ে জল্পনা চলে। আবদুল কাদের কাছারি হামলার ব্যাপারটা জানতো না, গফুর কলুকে সে একটু বকেও দিয়েছে। তবে এই নিয়ে নায়েবের থানা পুলিস করার কথায় সে বেশ রেগে যায়। তার দোকান-কাম-অফিসে বসে প্রথম রাগটা সে ঝাড়ে অনুপস্থিত বাপের ওপর, 'বাপজানের এটা বাড়াবাড়ি। কাছারিত হামলার খবর শুনলে তার এতো মাথা গরম হয় কিসক? বাপজানের সম্পত্তিত হাত দেওয়ার ক্ষমতা কি নায়েবের আছে? নায়েব আছে কয়দিন? এ্যাসেম্বলিতে জমিদার উচ্ছেদের বিল তো ওঠানোই হছে, কয়দিন পরে জমিদারই পাছার কাপড় তুল্যা দৌড় মারবি, আর নায়েব তো তার চাকর।'

আলিম মাস্টার এই বিলের ব্যাপারে তার আপত্তি জানায়, 'কিন্তু জমিদারগোরে আবার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে কিসক? তা হলে তো জমিদারগোরে কাছ থ্যাকা জমিদারি একরকম কিন্যাই লেওয়া হচ্ছে। এটা কি জমিদারি উচ্ছেদ হচ্ছে, কও?'

সেদিন টাউনে লীগ অফিসে এই নিয়ে কথা উঠেছিলো, 'মিল্লাত' পত্রিকায় এই নিয়ে সরকারকে নাকি খুব একচোট নেওয়া হয়েছে শুনে শামসুদ্দিন খোন্দকার বলছিলো, 'আরে মানুষকে সর্বস্বান্ত করার রাইট তো সরকারকে দেওয়া হয় নাই।' ইসমাইল হোসেনের কথা শুনে শুনে কাদেরও জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই বলে আসছে। কিন্তু এই আলিম মাস্টার মুসলিম লীগের কোনো কাজেই ভালো কিছু দেখতে পায় না বলে কাদের এখন সাদেক উকিলের কথার প্রতিধ্বনি করে, 'ইসলামে কারো সম্পত্তি জোর দখল করার আইন নাই, বুঝলেন? সরকার একজনের সম্পত্তি লিবি দাম না দিয়া, তা কি ইনসাফের কাম হয়, কন?'

'দেড়শো বছর ধর‍্যা জমিদাররা সম্পত্তি ভোগ করিচ্ছে, প্রজার ধনপ্রাণ সব তারাই ভোগ করলো, এতো করার পরেও জমিদারির দাম উশুল হয় নাই? কয়েকটা মানুষ কাছারির সামনে হৈ চৈ করলো, এখন শুনি পুলিস অ্যাসা সবগুলাক বান্দিবার ব্যবস্থা করিচ্ছে।'

আলিম মাস্টারের প্রথম কথাটির জবাব দেওয়া কঠিন বলে কাদের প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যায়। তা ছাড়া কয়েকদিন আগে ইসমাইল হোসেনও অবিকল এই কথাগুলোই বললো।

তবে মাস্টারের দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি নিয়ে সে বেশ উৎসাহিত, 'আরে রাখেন আপনার পুলিস! গোলাবাড়িত পুলিস ঢোকানো অতো সোজা নয়।'

কেরামতের সমর্থনের আশায় সে জিগ্যেস করে তাকেই, 'কী হে কবি, আধিয়াররা পুলিসকে আচ্ছা কোবান দেয় নাই? জয়পুরে পুলিস তো ভালোই মার খাইছিলো, নয়?'

কাদেরের কথায় কেরামত চাঙা হয়ে ওঠে এবং একদিন পরেই গান বেঁধে ফেলে। তা ভালো সুযোগও পাওয়া গেলো একটা। গোলাবাড়িতে সেদিন সাদেক উকিল আর শামসুদ্দিন ডাক্তার উপস্থিত। কাছারির হামলার ব্যাপারটা বোধহয় তারা সরেজমিন দেখতে এসেছিলো আলি আহমদের হুকুমেই। কাদেরের অনুমোদনে কেরামত আলি শুরু করলো,

বিসমিল্লা বলিয়া আজি বাঁধিনু শোলোক।
খোশখবর দিব আজি শুন সব্রলোক। আজি দীন গরিবের
আজি দীন গরিবের আঁধার দিনের হইল অবসান।
এই ভারতে কায়েম হবে আজাদ পাকিস্তান। সেথায় সবাই সমান
সেথায় সবাই সমান দীনী ফরমান হইবে সেথায় জারি।
প্রজার মঙ্গল তরে উচ্ছেদ হইবে জমিদারি॥ জমিদারে প্রজায়
জমিদারে প্রজায় জোতদার চাষায় একই আসন পান
চাষীমজুর দীনদরির্দ্রের মুশকিল আসান॥

গানের তখনো মেলা বাকি, সাদেক উকিল হাত তুলে থামায়, 'রাখো। তোমরা একটা পয়েন্ট বোঝো না, মোসলমান গরিব ধনীর ভেদাভেদ করলে এখন লাভ হচ্ছে কার? সলভ্যান্ট মুসলমান থাকলে বেনিফিটেড হবে এন্টায়ার মুসলিম নেশন। সলভ্যান্ট লোক না থাকলে ডেভেলপমেন্ট হবে কী করে? এখন গভর্নমেন্ট বিলংস টু আস। দেয়ার শুড বি নো এজিটেশন এগেনস্ট আওয়ার ওন গভর্নমেন্ট। নাজিমুদ্দিন সাহেব সেদিন কারেকটলি পয়েন্ট আউট করলেন, এখন আমাদের ফাইট হলো এগেনস্ট দি হিন্দুস।'

কাদের পর্যন্ত সমর্থন করে সাদেক আলিকে, 'শুনলা তো। তোমার গানে ইসলাম কৈ? ইসলামের মহিমা লিয়া গান লেখো, তেজি গান লেখো মিয়া।'

এই গান জুতের না হওয়ায় কেরামতের তেজ নিভু নিভু। আজকাল কোনো গানই সে আর বাঁধতে পারে না। আলিম মাস্টার ঠিকই বুঝেছে, 'তোমার ভালো গান ঐ তেভাগার কথা লিয়া যিগলা লেখিছিলা উগলানই।' তা জয়পুর পাঁচবিবিতে সে ঘটনা দেখতো, মানুষের তেজ দেখতো আর কলমের আগায় গান ঝরে পড়তো ঝরঝর করে, এমনই তোড় আসতো যে, দোয়াতে কলম চোবাবার তরটাও সইতো না।

আজ তার এই হাল হলো কেন? অথচ কেরামত তো নিজে দেখেছে, চেরাগ আলি মানুষের যে কোনো খোয়াবের তাবির করতে চট করে একটা করে গান ধরতো আর খোয়াবের সঙ্গে তার শোলোক কেমন ফিট করে গেছে চমৎকার। চেরাগ আলি ভাঁওতা মারতো, এসব হলো তার পাওনা-গান। তার সেই বইতেও কিন্তু ঐসব শোলোকের কিছুই পাওয়া যায় না। তবে?—তা হলে হয়তো বইতে আঁকা চৌকো চৌকো ঘরের ভেতরে আরবি অক্ষর কিংবা সংখ্যা যেগুলো আছে সেখানেই লুকিয়ে রয়েছে ফকিরের শোলোকের ইশারা। তমিজের বাপের মতো একটা হদ্দ মাঝি, মুখ্যুর মুখ্যু, হাবাগোবা মানুষ,—সেও মানুষের কাছে এতো খাতির পায় ঐ বইয়ের বরকতেই। তার ঐ যে ঝিম ধরে বসে থাকা, রাত হলে বিলের উত্তর সিথান না কী বলে শালারা, সেখানে পাকুড়তলা

না কী যেন আছে, সেখানে ঘুমের 'ধ্যে ঘুরে বেড়াবার মধ্যে কী এমন মাজেজা থাকতে পারে? এসব তো আসলে শালার ব্যারাম! ব্যারাম ছাড়া আর কী? খালি ব্যারামের জোরে কেউ কি আর মানুষের কাছে ইজ্জত পেতে পারে?—আসলে তার বল হলো ঐ ফকিরের বই। বইয়ের জোরে সে ঝিম মেরে বসে থাকে, বইয়ের জোরে সে মানুষকে এভাবে টানতে পারে আর ধরে রাখতে পারে! ঐ বই যদি কেরামতের হাতে পড়ে তো প্রত্যেক দিনই সে মেলা শোলোক বেঁধে ফেলে। সব তার নিজের বাঁধা শোলোক, সেসব গান চেরাগ আলির পাওনা-গানের সুনাম ছাড়িয়ে উঠে যাবে কোথায়! মানুষে খালি শুনবে আর বৈকুণ্ঠ পর্যন্ত মাথা নাড়বে, বলবে, 'হুঁ বাপু, গান বান্দিছো একখান। হামাগোরে ফকিরও এংকা শোলোক কোনোদিন পায় নাই।' আহা! কেরামতের গা শিরশির করে ওঠে, বইটা যদি নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়!—অবশ্য শীতেও তার গা শিরশির করতে পারে। নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

সে রাতে শীতও পড়েছিলো! গোলাবাড়ি হাটে সব কয়টা দোকানঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছিলো ভেতরের মানুষেরা। বটতলার বাঁধানো চাতালে বসে কেরামত দুই হাত তফাতের কিছু দেখতে পায় না। ঘোলাটে সাদা কাদার মতো থকথকে কুয়াশায় গাঁথা হতে থাকে তমিজের বাপের ঘরের চৌকাঠ। চৌকাঠের ওপারে মাটির মেঝেতে হাঁটু ভেঙে লম্বাটে পায়ের পাতায় চাপ দিয়ে বসে থাকে কুলসুম। বসে-থাকা অবস্থাতেও মেয়েটাকে কী লম্বা দেখাচ্ছে গো! আর কী সোন্দর তার গলার রেখা! গলায় ঘ্যাগের আভাসমাত্র না থাকায় বুক তার ফুটে উঠেছে মস্ত দুটো ফুলের মতো। না, না ফুল নয়, জমজ গম্বুজের মতো। জোড়া গম্বুজের মাঝখানে এবং প্রত্যেকটি গম্বুজের চূড়ায় সেজদা দেওয়ার জন্যে কেরামতের মাথা নুয়ে নুয়ে পড়ে। জোড়া গম্বুজে, না, জমজ গম্বুজে সেজদা দেওয়ার জন্যে কেবল মাথা নয় তার গোটা শরীর এতোটাই কাঁপে যে, ভয় হয়, বটতলার ঘোলা কুয়াশার ঝাঁপিয়ে পড়ে খোদাই-করা পাথরের গম্বুজ দুটোকে সে তছনছ করে ফেলবে। হুঁশিয়ার হয়ে সে একটু সরে বসে। তখন তার জিভে সুড়সুড়ি লাগে, জিভে ফুসকুড়ির মতো শোলোক ফুটে উঠছে। কেরামতের খুশি খুশি লাগে। এইবার যদি এসে পড়ে পাকিস্তানের তেজি গান! গান তেমন তেজি হলে কাদেরই টাউন থেকে খরচপাতি করে ছাপাবার ব্যবস্থা করবে। গান একবার চালু হলে কতো মানুষ কিনবে, পাইকারদের দিয়ে সে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। পাকিস্তানের তেজি গান ভেবে বিড়বিড় করলে ওঁয়া ওঁয়্যা করে বেরিয়ে আসে নতুন শোলোকের একটি চরণ,

সিনাতে খোদাই করা জমজ গম্বুজ।

কিন্তু এর পরের চরণ আর আসে না। এটা কী ধরনের শোলোক তার মাথায় পয়দা হয়? এটা তার নিজের বাঁধা শোলোকের লাইন তো? কী জানি, সেদিন কুলসুমের ঘরের দরজার চৌকাঠে যে দুটো চরণ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো বমির মতো, সেটাও কি তার বাঁধা? কৈ, তার কোনো শোলোকের সঙ্গে তো এর কোনো মিল নাই। তা হলে, এটা কি বেরিয়ে এসেছে ফকিরের ঐ বইয়ে পাওয়া কোনো ইশারা থেকে? কুলসুম কি বই তাকে কিছুতেই দেবে না?

মণ্ডলবাড়িতে একদিন গিয়ে ফকিরের বই হাতে পাওয়ার সম্ভাবনা দেখে কেরামত। কাদের ছিলো না, তবে দেখা হলো আবদুল আজিজের সঙ্গে। আজিজের মন খারাপ,

বেশ মুসিবতে আছে। ফসল কাটার সময় নিয়ম মাফিক বৌকে নিয়ে এসেছে, কিন্তু ধানের মাপজোকের দিকে হামিদার এবার মন নাই। তার ভাই আহসান আলি যে কলকাতায় দাঙায় মরে যায় নি, এই ধারণা এখন তার বিশ্বাসে দাঁড়িয়েছে। জয়পুরের কাছেই খঞ্জনদিঘির পীরসাহেবের কাছে তাকে নিয়ে গিয়েছিলো আজিজ। হুজুর জানিয়েছে যে, আহসান আলি মরে নি। দক্ষিণের কোনো বড়ো শহরে ছোটো গলির একটি ঘরে তাকে আটকে রাখা হয়েছে। শহরটি যে কলকাতা এ তো বোঝাই যায়, কিন্তু গলির ঠিকানা পীরসাহেবে দেয় নি।

এরপর হামিদা প্রথমদিকে সপ্তাহে দুই দিন, পরে চার দিন এবং দিন পনেরো হলো রোজ রোজ স্বপ্ন দেখছে : মোটাসোটা কয়েকটা টিকিওয়ালা লোক খালি গায়ে খাটো ধুতি পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আহসানকে ঘিরে, তাদের সর্দারের কপালে লাল চন্দন লাগানো, হাতে সিঁদুর লাগানো খাঁড়া। খাঁড়াটা ঝুলছে আহসানের মাথার ওপরে, তার কোপ নিচে পড়তে শুরু করতেই, আহসানের গলায় কি মাথায় ঘা পড়ার আগেই হামিদার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙে তার নিজেরই বিকট চিৎকারে, জেগে উঠে সে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। আর এবারে শ্বশুরবাড়ি এসে প্রথম রাত্রেই স্বপ্নে সিঁদুরমাখা খাঁড়ার নিচে আহসানের মুখে একটি কচি চেহারার লক্ষণ দেখে মানোযোগ দিয়ে লক্ষ করে।—আরে, এ তো তার হুমায়ুনের মুখ। নরণাং মাতুলক্রমঃ প্রবাদটি অনুসারে হামিদার এই স্বপ্নসিরিজের অনেক আগে থেকেই ছেলেবেলার আহসানের সঙ্গে হুমায়ুনের স্বভাব, আচরণ ও চেহারায় অনেক মিল ছিলো; আর স্বপ্নে দুজনকে অভিন্ন শরীরে দেখে হামিদা ভয় পায়, আবার একটু খুশিও হয় বৈ কি?—মামা ভাগ্নে এক সঙ্গে, এমন কি একই শরীরে থাকলে সিঁদুরমাখা খাঁড়াটা হয়তো ঠেকাতে পারবে।

এসব হলো তার ঘুমের ভেতরকার ভয় এবং ঘুমের ভেতরকার ভরসা। কিন্তু জাগরণে সে বড়ো ধন্দে পড়ে : আহসান তো আসলে বেঁচেই রয়েছে, বেঁচে থাকতে সে হুমায়ুনের সঙ্গে মিলিত হয় কীভাবে? এখন মরার পর হুমায়ুন যদি তাকে কোনো ইঙ্গিত দেয় এই আশায় হামিদা সুযোগ পেলেই বাড়ির পালানে গোরস্থানের দিকে রওয়ানা হয়। মেয়েমানুষের গোরস্থানে যাওয়া জায়েজ নয় বলে বাড়ির লোকজন তার দিকে কড়া নজর রাখে। হামিদার ধন্দের তাই আর সুরাহা হয় না। হয়তো এ জন্যেই যত্‌ক্ষণ জেগে থাকে মাথাটা তার দপদপ করে। এই শীতের বিকালে এমন কি সন্ধ্যাবেলাতেও তাকে প্রায়ই গোসল করতে হয়। এতে তার ঠাণ্ডা লাগে না, সর্দি হয় না, এমন কি গা গরম পর্যন্ত করে না। শাশুড়ি তাই অসন্তুষ্ট, এতো পাথরের মতো শরীরের বৌ থাকলে ঘরে লক্ষী থাকে না। মণ্ডলের ছোটোবিবি অবশ্য তাকে সাব্যস্ত করে মাথাখারাপ বৌ বলে, 'ইগলান পাগলি হবার চিহ্ন গো। পাগলের শরীলে শীত কম, তার তাপ বেশি।' সব কিছুর মতো এই ব্যাপারেও বড়োবিবি তার সঙ্গে একমত নয়, 'কিসের পাগলি? উগলান সব ঢং। পাগলের চোখেত বলে নিন্দ থাকে? পাগলা মানুষ এতো নিন্দ পাড়ে?' তা কথাটা ঠিক। সন্ধ্যা হতে না হতে হামিদার চোখ ঢুলুঢুলু হতে থাকে, তার হাই ওঠে এবং প্রায়ই না খেয়ে সে শুয়ে পড়ে। ভাই ও বেটার হালহকিকত জানতে ঘুম ছাড়া তার আর কোনো আশ্রয় আছে?

আবদুল আজিজের হয়েছে বিপদ। ভাই আর বেটাকে স্বপ্নে দেখার ভয়ে ও আশায় হামিদার উৎকণ্ঠা ও প্রস্তুতি দেখতে দেখতে সে অতিষ্ঠ, অথচ ঐ স্বপ্নের খবরা তার

জোটে না। সে একজন গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি, এর উপর মাসখানেক হলো টাউনে ট্রান্সফার হয়ে এসেছে অন প্রোমোশন। টাউনের সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে হেড এ্যাসিস্টট্যান্ট হয়েও বাড়িতে এতো জ্বালা সে আর কাঁহাতক সহ্য করে? বাড়ির বৌয়ের আচরণে নানাজনের কৌতূহল, কৌতুক, বিরক্তি ও হতাশার সবই তো বেঁধে আজিজেরই গায়ে।

আবার ঘন ঘন বাড়ি না এলেও কথা শোনায় কাদেরও। তার প্রমোশন দিয়ে টাউনে ট্রান্সফারটা অবশ্য কাদেরের তদবিরের ফলেই হয়েছে। টাউনে ছোটোখাটো একটা বাড়ি ভাড়া করে কাদের এখন কন্ট্রাকটরি শুরু করেছে, তাই বাড়ির সব সামলাতে হয় আজিজকে। টাউনে সে উঠেছে শ্বশুরবাড়িতে, কিন্তু একদিন পর পর বাড়ি না এলে কাদের রাগ করে। ইটখোলার দেখাশোনা সব তার ওপর। মুশকিল হলো এই যে, এটা শুরুও তো হয় তার হাতেই। হুমায়ূনের কবর বাঁধাবার পর অনেকটা ইঁটসিমেন্ট বাঁচলে প্রথমে পাকা করলো কলপাড়। পাকা কলপাড়ের পানি গড়াতে শুরু করলো পায়খানা যাবার পথে। গোরস্থানে যাবার পথও তো ঐটাই। গোরস্থান থেকে দুটো দুটো করে ইট বসিয়ে একেবারে উঠান পর্যন্ত নিয়ে আসা হলো। তখন দুই ভাইয়ের মাথায় চাপলো বাড়ি পাকা করার হাউস। নায়েবের ভয়ে শরাফত একটু দোনোমনো করছিলো, তাতে কাদেরের জেদ চড়ে গেলো দশগুণ, 'মোসলমানের বাড়ি পাকা হলে নায়েবের গাও কামড়ায়?' কাদের অবশ্য টাউন থেকেই ইঁট আনতে চেয়েছিলো। তাতে ঝামেলা মেলা, খরচাও পড়ে বেশি। বিলের উত্তরে জমি পত্তন নিয়ে আজিজ ইঁটখোলা করলো। বাড়ি পাকা হলো, কিন্তু ইঁটের ভাঁটা আর বন্ধ হলো না। ইঁটের ভাঁটা সম্পূর্ণ ভাগ্যের ব্যাপার; হাজার চেষ্টা করেও, হাজার হুঁশিয়ার থেকেও কতো ভাঁটা থেকে থার্ড ক্লাস ইঁট বেরোয়, ঝামা বেরোয়। কিন্তু আজিজের ইঁট এ পর্যন্ত খারাপ হলো না। প্রথম প্রথম মানুষ কতো কথা বলেছে, জায়গাটা খারাপ, এটা হবে সেটা হবে। মুকুন্দ সাহার দোকানের ঐ বেয়াদব ছোঁড়াটা একদিন আজিজের সামনেই বললো, 'মুনসি সহ্য করবি না। মুনসির ইশারা পালে সন্ন্যাসী ঠাকুর কী করে না করে কওয়া যায় না।' তা এখন মুকুন্দ সাহা তো নিজেই ইঁটের ব্যবসা শুরু করলো এই ইঁটখোলা থেকেই। কাদেরের কন্ট্রাকটরি করতে ইঁট যা লাগে সব তো টানে এখান থেকেই।—চাকরিতে বলো, ব্যবসায় বলো, আল্লার রহমতে আজিজের দিন এখন ভালোই।

কিন্তু বৌ এরকম করলে তার আর কিসের সুখ? কেরামতকে দেখে প্রথমে সে তেমন আমল দেয় না, 'কাদের বাড়ি নাই।'

কেরামত হাসে, 'আজ তো আসার কথা!' তারপর সে জানতে চায়, 'ভাবিসাহেবার অসুখ শুনিচ্ছিলাম!' গাঁওশুদ্ধ মানুষের কৌতূহল আজিজের আর সহ্য হয় না। জবাব না দিয়ে বাড়ির ভেতরে সে যাবার জন্যে পা তোলে, কেরামত বলে, 'তমিজের বাপ কিন্তু বই দেখ্যা যা কছিলো, জয়পুরের পীরসাহেব শুনলাম একই কথা কছে?'

আবদুল আজিজ ঘুরে দাঁড়ায়, 'তমিজের বাপ কী বলছিলো? ঐ যে উঠানে দাগ কেটে কেটে কী যেন বললো, না?'

এলাকার সব মানুষের মতো কেরামতও জানে, 'তমিজের বাপ বই দেখ্যা কলো, ভাবিসাহেবার ভাই মরছে কি-না কওয়া যাচ্ছে না। অমবস্যার রাতে ফির কবার চাইছিলো, আপনেরা তো আর আসলেন না।'

আজিজ এবার ভাবনায় পড়ে। তমিজের বাপকে একবার খবর দেওয়া যায় না? কিন্তু বেটার বৌয়ের এই রোগ রাষ্ট্র করতে শরাফতের ঘোর আপত্তি। কাদের আবার

ফকিরালি পানিপড়া সহ্য করতে পারে না। কেরামতের সঙ্গে আজিজ একটু হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে নিচু গলায় বলে, 'মুশকিল, তমিজের বাপেক বাঁপজান একদম দেখবার পারে না। তমিজটা খালি খালি জেলের ভাত খাচ্ছে।' সে যা বলতে পারে না তা হলো এই যে, এসব জুলুম করলে বাড়িতে রোগবালাই লেগেই থাকবে। তবে এটা বলতে পারে 'তমিজের বাপ হয়তো অসুখটার কারণ—।'

কেরামত আলি সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে একমত পোষণ করে এবং আবার ভিন্নমতও জানায়, 'জে। তমিজের বাপ এই বাড়িত আসলে আবার বড়োমিয়া কোদ্দ করবি। আর তমিজের বাপ তো জাহেল মানুষ। তার জারিজুরি সব পাওয়া যায় ঐ ফকিরের বইয়ের মদ্যে। বইটা যদি নেওয়া যায় তো—।'

'ঐ ছেঁড়াখোঁড়া বইটা? তমিজের বাপ তো লেখাপড়াই জানে না। ঐটা দেখে মাটিতে কীসব দাগ কাটে।'

'বইয়ের মধ্যে ইশারা দেওয়া আছে। ঐ বই আমার হাতে পড়ে তো আমিও বুঝমু। আপনেও বুঝবেন।'

'তা ঐ বইটা চায়া আনলেই তো হয়। ও কি বই দিবি?'

'আপনে হুকুম করলে বাপ বাপ কর‍্যা দিয়া যাবি।'

'না না, জুলুম করার দরকার নাই।' তমিজের বাপের শক্তিতে আজিজের একটু ভয় আছে, 'এমনি যদি দেয়। নিয়া আসো না। তাড়াতাড়ি করো। বাবরের মাকে বোধহয় এখানে রাখা যাবে না বেশিদিন।'

'না। দেরি হবি না। বই আমি নিয়া আসমু।'

'ক্যা গো, মণ্ডলবাড়িত শুনলাম, তমিজ বলে বারায়া আসিচ্ছে। তদবির চলিচ্ছে, না?'

'কেটা কলো?' তমিজের বাপের হিম গলায় কোনো আশা বা সন্দেহ বোঝা মুশকিল। কালাম মাঝি তো দৌড়াদৌড়ি খুব করছে, একদিন পর পর টাউনে যায়, ইসমাইল হোসেনের সঙ্গে দেখা করে, ভোটের আগে দেওয়া তার ওয়াদার কথা নাকি মনেও করিয়ে দেয়। উকিলের পেছনেও কালাম মাঝি খরচ করেছে মেলা। তার ছেলের জন্যে কালাম এতো ঢালছে, তমিজের বাপ সে টাকা শোধ করবে কী করে? কালাম মাঝি কাগজে তার একটা টিপসই নিয়ে তমিজের বাপের ভিটাসুদ্ধ ঘরগুলো নিজের নামে করে নিয়েছে। কুলসুম একটু গাঁইগুঁই করছিলো, তার ভাবনা, বুড়া মরলে তার ঠাঁই হবে কোথায়? কালাম মাঝি তো হেসেই অস্থির, 'আরে এই বাড়ি হামি লিয়া করমু কী? বাড়িঘরভিটা তোমারই থাকলো, তোমরাই ভোগ করবা। ট্যাকা দিলে একটা কাগজ রাখা লাগে না? না হলে ঐ শালা মণ্ডলই একদিন কবি, তোর ভিটার পালান তো হামাক বেচিছুই, ঐ সাথে বাড়িঘরও বেচা হয়া গেছে। আরে জাল দলিল একটা বানাতে ঐ বুড়ার আর কতোক্ষণ?'

তা ভিটাবাড়ি লিখে দেওয়ার পর তমিজের বাপের আশা হয়েছে, তমিজ এবার ছাড়া পেতে পারে। চেরাগ আলি বলতো, মানুষের একদিকে লোকসান মানেই অন্য দিকে কোথাও লাভের ইশারা। বলতো,

বানেতে ভাসিল ধান ন' ভাঙিও মন।
পেঁয়াজরসুনে হইবে দ্বিগুণ ফলন॥

তমিজের বাপ ও কুলসুমের দিক থেকে তেমন সাড়া না পেয়ে কেরামত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'আজিজ ভাই তমিজের জন্যে আফসোস করে খুব। তার বৌটা ক্যাংকা হয়া গেছে, হামাক কয়, তমিজের বাপ ছাড়া তার ব্যারাম আর কেটা ধরবার পারবি না।'

'তার আর দেখার কী আছে? ভাইয়েক লিত্যি খোয়াবের মধ্যে দেখে। ভাই তো তার মর্যাই গেছে।' কুলসুমের এরকম ঠাণ্ডা কথায় কেরামত চুপসে যায়। হামিদার ভাইয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে কুলসুমের এরকম নিশ্চিত ধারণা তার পছন্দ হয় না, একটা ভুল গণনা যদি বোনের কলজেটাকে জুড়াতে পারে তো কার কী লোকসান?

'ঐ খোয়াবের কথাই তো হামি কলাম, আজিজ ভায়েক কলাম। আরে, ফকিরের বই তো যি সি বই লয়। খোয়াবের যিগলান তাবির ল্যাখা আছে, তোমরা তো বুঝবার পারো না। তমিজের বাপ গেলে ভালো হয়। না হলে হামাক বইটা দাও, তমিজের বাপের কাছ থ্যাকা হামি না হয় শিখ্যা পড়্যা লিয়া মণ্ডলবাড়িত যাই।' কেরামতের এতো কথাতেও কুলসুম কিছু না বললে কেরামত জানায়, আজিজ হাজার হলেও একটা অফিসার মানুষ। তমিজের মুক্তির জন্যে সেও তো চেষ্টা করতে পারে। এরকম সুযোগ সহজে আসে না। তমিজ জেলের ভাত খাবে আর কতোদিন?

'বছর ঘুরতে আর এক মাস বাইশ দিন।' কুলসুমের সংক্ষিপ্ত দীর্ঘশ্বাসে কেরামত ভরসা পায়। ব্যাকুল হয়ে সে জানায়, বইটা একবার মণ্ডলবাড়িতে নিয়ে গেলে আজিজ হয়তো তার বাপের হাতে পায়ে ধরে মামলাটা উঠিয়েও নিতে পারে। কুলসুম কিছুই বলে না। তমিজের বাপ একটু উসখুস করলেও কুলসুমের চেহারায় পাথরের মূর্তি অবিচল থাকে। কেরামত বিরক্ত হয় না, বরং তার বুকের গম্বুজে পাথরের শক্তি তাকে বইটা হাত করার জন্যে তাকে আরো তাগাদা দিতে থাকে। কেরামতের সরব ও নীরব অনুনয়ে কাজ হয় না। কুলসুম চুপচাপ উঠানে গিয়ে বিপরীত দিকে মুখ করে, বুক বিপরীত দিকে রেখে বসে থাকে।

তমিজের বাপ জানে, আর বেশি চাপাচাপি করলে কুলসুম রান্নাবান্না না করে উঠানেই শুয়ে থাকবে। তখন তার খাওয়া দাওয়াও বন্ধ। তমিজের বাপ আস্তে করে বলে, 'আজ থাক। দেখি।'

৩৫

অমাবস্যার রাত, কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটলেও তমিজের বাপের তো কিছু ঠাহর করতে কখনো ভুল হয় না। কিন্তু পাকুড়গাছটা আজ সে কোথাও খুঁজে পায় না কেন? পাকুড়গাছ না পেলে তার চলবে না। পাকুড়গাছের তলায় দাঁড়িয়ে মুনসির সঙ্গে তার চোখাচুখি হতে হবে। তমিজ আটকা পড়ে আছে, সে প্রায় এক বছর হতে চললো। বেটাটা তার ছাড়া পায় না কেন? কোথাও কোনো দোষ হলো কি-না কে জানে? গতবার মেলার দিন ভোরে, না ভোররাতে এমন ক্যাচালে পড়ে গেলো যে, পোড়াদহের মেলায়

একটিবারের জন্যে উঁকিও দিতে পারলো না। সন্ন্যাসীর থানে জোড়া পায়রা দেওয়ার কথা, তমিজ দিলো কি-না তাও তো জিগ্যেস করতে পারলো না। আবার ভবানী সন্ন্যাসীর ভোগের বাঘাড়টা ধরলো। তা সেটা তো বাপু কাৎলাহারের পানিতেই ছেড়ে দিলো। সন্ন্যাসী কি মেলার অছিলা করে মুনসিকে একটা মাছ দিতে পারে না? কী জানি বাপু, কোথায় কী দোষ হলো, পাকুড়গাছ থেকে অন্তত ইশারা করে একবার জানিয়ে দিতে পারে। আবার দেখো, দশরথ, কতো পুরানা আমলের মানুষ, তার ঠাকুরদার ঠাকুরদা, না-কি তারও বাপ না ঠাকুরদা এখানে এসেছিলো গিরিদের সঙ্গে, একই সময়ে বিলের এপার ওপারে বন কেটে বসত করলো তমিজের বাপের দাদা, না তারও দাদার দাদা, না-কি তারও বাপ না দাদা,—এসব হিসাব তমিজের বাপ করতে পারে না—তো সেই দশরথ কর্মকারের বাড়িতেও কি-না মাঝিরা আগুন ধরিয়ে দেয়। মুনসি কি এতেই গোস্বা করলো কি-না কে জানে? পাকুড়তলায় তমিজের বাপ একবার পৌছুতে পারলেই গাছের মগডালের দিকে তাকাবে, তা হলে মুনসি ইশারা করে ঠিকই বলে দেবে, কোনটা তার দোষ, কী তার গুনা।

মণ্ডলদের ইঁটখোলা উত্তরে বেড়েছে, দক্ষিণেও অনেকটা এগিয়ে আসছে। বিল প্রতি বছর পুরট হয়, ইটখোলা বাড়ে। কিন্তু পাকুড়গাছ কোথায়? এদিকে গাছ কাটা পড়েছে অনেক, বড়ো বড়ো গাছ সব চলে যায় ইঁটের ভাঁটার পেটে। কিন্তু তাই বলে পাকুড়গাছ কি আর কাটা পড়তে পারে? ঐ গাছে কুড়ালের কোপ পড়ার আগেই কুড়াল গলে যাবে না? সারাটা রাত বিলের ধারে ধারে ঘুরে ঘুরে শীতে ও কাদায়, ঘুমে ও খোয়াবে তমিজের বাপের পায়ের পাতা থেকে শুরু করে সারাটা গতর জমে জমে আসে। একবার মুনসির একটা শোলোক 'আগুনের জীব যতো মুনসির নফর। সম্মুখে দর্শনমাত্র জান ধড়ফড়॥' তমিজের বাপের মাথায় গুনগুন করলে সে আশায় আশায় ছুটে যায় আরো উত্তরে। না। পাকুড়গাছ তো নজরে পড়ে না।

তার ঘুরতে ঘুরতে, হয়তো তার পায়ের চাপে চাপে কিংবা চোখের নজরে নজরে শীতকালের ভোর হয় এবং আরো একটু বেলা হলে ইঁটখোলার লোকজন এসে দেখে তমিজের বাপের ঘোরাঘুরিতে ভেঙে পড়েছে কাঁচা ইঁটের বেশ কয়েকটা সারি। কে একজন মিস্ত্রি তেড়ে আসে, 'তুমি কেটা গো? বেআক্কেলে বুড়া, চোখোত দ্যাখো না?' কিছুক্ষণ পর আসে গফুর কলু। তমিজের বাপকে কাঁচা ইঁট নষ্ট করতে দেখে তাকে সে বকাঝকার সুযোগ পায়, 'বুড়া হয়া গেলা, তোমার বুদ্ধি আর হবি কুনদিন? হামাগোরে বড়ো সাহেব ছোটো সাহেব আসুক, তারপর তোমার বিচার কী হয় তাই দেখো।'

আজকাল আজিজ হলো বড়ো সাহেব এবং কাদের হলো ছোটো সাহেব। কিন্তু এই খবর তমিজের বাপের জানা নাই। সেই সম্মানিত ব্যক্তিদের খোঁজে সে এদিক ওদিক দেখে। গফুর কলু কি মুনসি আর ভবানী সন্ন্যাসীর কথা বলছে? তমিজের বাপ কাঁচা ইঁটের ভাঙাচোরা পাঁজায় চারদিকে তাকায়, সকালবেলার আলোয় পাঁতি পাঁতি করে খোঁজে। কিন্তু পাকুড়গাছ দূরের কথা বড়ো মাপের কোনো গাছের চিহ্নও দেখতে পায় না।

ফকির বাহিরিলো তার না থাকে উদ্দিশ।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ঘোড়া করিলো কুর্নিশ।
দুল্‌দুল উড়াল দিলো নাহিক উদ্দিশ॥

কিন্তু এই গান আসে কোত্থেকে? গফুর কলু তাকে সাবধান করে দেয়, 'এই বুড়ার

বেটা, তামান রাত ঘুরিছো, ঐতো দলদলা, যদি পড্যা গেলাহিনি?' ফুটখানেক উঁচু ইঁট দিয়ে ঘেরা চোরাবালির জায়গাটা দেখে তমিজের বাপের কিছুই এসে যায় না। গফুর কলুকে সে জিগ্যেস করে, 'ক্যা রে, গফুর, পাকুড়গাছটা কুটি রে?'

'মুনসির পাকুড়গাছ? ওটা তো বিলের উত্তর সিথানে। তুমি এটি কী উটকাও?'

'উত্তর সিথান তো এটাই,লয়? এই যে বাঙালির স্রোত এটি ঢুকলো। এর উত্তরে আর বিল কুটি?'

গফুর কলু বিচলিত হয়, 'তাই তো, উত্তর সিথান তো এটাই হবি। পাকুড়গাছ তো দেখি না।'

এর মধ্যে 'হামাগোরে বাবু কয়া দিলো কাল বাদে পরশু কিছু ইঁট দেওয়াই লাগবি।' বলতে বলতে জর্দার গন্ধে বিলের সোঁদা হাওয়াকে সচল করে এসে হাজির হয় বৈকুণ্ঠ গিরি। তমিজের বাপকে দেখে সে পানভরা গাল ভরে হাসে, 'ক্যা গো, তুমি বুঝি তামান রাত এটি ঘুরিচ্ছো?' গলা নামিয়ে সে জানতে চায়, 'কী কথাবার্তা কিছু হলো?'

তমিজের বাপ জিগ্যেস করে, 'বৈকুণ্ঠ, তুই তো বাবুর কামে ইঁটখোলা লিত্যি আসিস। পাকুড়গাছ কুটি রে? তামান আত উটকানু। গাছ তো পাই না।'

'আরে পাকুড়গাছ তো কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে। তুমি উটকাও কুটি?'

তখন গফুর কলু এমন কি মিস্ত্রিদের কেউ কেউ পর্যন্ত বলে, 'আরে উত্তর সিথান তো এটাই।'

মুনসির পাকুড়গাছ পাওয়া যাচ্ছে না শুনে বৈকুণ্ঠের গালের পান শুকিয়ে যায়, তার মুখ থেকে বেরোয় কথার ছিবড়ে, 'তাই তো। ও গফুর, ভাঁটার জন্যে এতো গাছ তোমরা কাটলা, পাকুড়গাছোত কুড়ালের কোপ মারো নাই তো? তা কুড়ালের কোপে কি আর মুনসির আসন লড়ে? মুনসি হামাগোরে সন্ন্যাসী ঠাকুরের সেনাপতি আছিলো না? তার কিছু হলে ঠাকুরে কি সহ্য করবি?'

'তোর খাসলত গেলো না বৈকুণ্ঠ। মুনসি সন্ন্যাসীর চাকরি করিছে কোনদিন? সন্ন্যাসীর সাথে মজনু শাহের—।' মুনসিকে সন্ন্যাসীর অধীনস্থ করার জন্যে বৈকুণ্ঠের প্রচেষ্টার প্রতিবাদ করতে গিয়েও তমিজের বাপ থেমে যায়। না, না, সন্ন্যাসীর সঙ্গে বেয়াদবি করাও ঠিক নয়, ওরা দুই জনেই তো এই এলাকার মুরুব্বি।

বৈকুণ্ঠও তমিজের বাপের কথায় কান না দিয়ে এদিক ওদিক খোঁজে। মুকুন্দ সাহার ইটের তাগাদা দেওয়া মাথায় ওঠে তার। শুধু খোঁজে আর খোঁজে। পাকুড়গাছ কোথায়?

তা খোঁজাখুজি করার আর আছেই বা কী? চারদিকে তো সব সাফ, কয়েক মাস আগের গাছপালা যা ছিলো সবই তো ঢুকে পড়েছে ইঁটের ভাঁটার পেটের ভেতরে। তবে গফুর কলু ও মিস্ত্রিরা বলে, শিরীষ গাছ, গোটা চারেক শিল কড়ুই, অনেক কটা পিতরাজ, গোটা চারেক অর্জুন, উত্তর পশ্চিমে উঁচু ডাঙা জমির বেশ কয়েকটা কাঁঠাল, খান তিনেক আমগাছ—তাদের কেটে-ফেলা বড়ো বড়ো গাছের মধ্যে ছিলো তো এইই। বিলের একেবারে উত্তরে দাঁড়ালে পুব দিকে কোনো গাছই আর চোখে পড়ে না, একবারে দেখা যায় পোড়াদহ মাঠের সন্ন্যাসীর থানের বটগাছের ঝাপড়া মাথা। তা হলে পাকুড়গাছ কোথায়?

আবদুল আজিজও এসে বড়ো উদ্বিগ্ন হয়। মুনসির আসন যদি তারা কেটে থাকে তো সেটা ভালো কথা নয়। তার বেটা মরলো আর বছর, এ বছর তার সম্বন্ধী হলো খুন। খঞ্জনদিঘির পীরসাহেবের হিসাব মতো আহসান যদি কলকাতায় কোনো ঘরে বন্দি হয়ে

থাকে তো এই মুনসির বদদোয়াতেই এখন মারা পড়বে হামিদার স্বপ্নে দেখা সেই সিঁদুর মাথা খাঁড়ার ঘায়ে। হামিদা আজকাল যা শুরু করেছে, এই পাকুড়গাছ সরে যাওয়ার কারণেই সে আবার বদ্ধ উন্মাদ হয়ে না পড়ে। উতলা মনে আবদুল আজিজ বাড়ি ফেরে এবং 'বাপজান! কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে পাকুড়গাছটা—'পর্যন্ত বলতেই জোহরের নামাজে দাঁড়ানো শরাফত স্থির চোখে তার দিকে তাকায় : তাড়াহুড়ায় সে নামাজে দাঁড়িয়ে পড়ে বাপের পাশে। শরাফত বলে, 'অজু কর‍্যা আর একটা জায়নামাজ বিছায়া নামাজ পড়ো।'

তাদের নামাজ শেষ হওয়ার আগেই মণ্ডলবাড়িতে চাউর হয়ে যায়, কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে পাকুড়গাছের কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আবদুল আজিজ কৈফিয়ৎ দেওয়ার মতো করে বলে, 'কিন্তু পাকুড়গাছ তো একটাও কাটা পড়ে নাই। ইটখোলার প্রত্যেকটা গাছ কাটার সময় আমি নিজে খাড়া হয়া থাকিছি।'

আবদুল কাদের টাউন থেকে এসে গোসল করে ভাত চেয়েছে কয়েকবার। আজকাল নামাজ তার প্রায়ই কামাই হয়। তবে নামাজ নিয়ে শরাফত তার সরকারি চাকুরে বড়ো ছেলেকে যেভাবে বলতে পারে, ছোটো ছেলেকে সেভাবে তাগাদা দেওয়াটা দিন দিন তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ছে। কাদের হঠাৎ চিৎকার করে, 'আরে ভাত দেও না!' তারপর ভুরু কুঁচকে বলে, 'আরে পাকুড়গাছ থাকলেই কি আর না থাকলেই কী? মুনসির কি আবার জায়গার অভাব আছে নাকি? ইটের ভাঁটা আছে না? এতো বড় ভাঁটা, মুনসি বসবার পারবি, শোবার পারবি।'

মুনসিকে নিয়ে এভাবে ঠাট্টা করায় আবদুল আজিজ চমকে ওঠে। তবে রাগের চেয়ে তার ভয়টা বেশি হওয়ায় এভং কাদেরের সামাজিক ও পারিবারিক দাপট দিন দিন বাড়ছে বলে কাদেরের কথাকে স্রেফ রসিকতা বলে গণ্য করার প্রাণপণ চেষ্টায় একটুখনি হাসি তৈরী করার জন্যে সে ঠোঁটের ব্যায়াম করে।

তবে এই হাসির ব্যায়াম তার ক্ষান্ত হয় শরাফত মণ্ডলের কথায়, 'বিলের উত্তর দিকে পাকুড়গাছ কেউ কোনোদিন দেখিছে? পাকুড়গাছ ওটি আছিলো কবে?'

এমন কি আবদুল কাদের পর্যন্ত বাপের কথায় থ' হয়ে যায়। এরকম কথা বুড়া বলে কীভাবে?

শরাফত মণ্ডলের বড়োবৌ তখন পুবদুয়ারি পুরনো টিনের ঘরে বসে তার ক্লান্ত বেটারা এখন পর্যন্ত অভুক্ত থাকায় আক্ষেপ প্রকাশে ব্যস্ত। মণ্ডলের ছোটোবিবি রান্নাঘরে মাদুরের ওপর ভাত তরকারি বাড়ে আর স্বামীর কথা শুনে তার প্রতিবাদ করার জন্যে জিভে শক্ত শক্ত শক্ত কথা শানায়। তার পাশে চুপচাপ বসেছিলো হামিদা। স্বামী, দেওর কী শ্বশুরের সব কথা না বুঝলেও কোনো অমঙ্গলের আঁচ পেয়ে সে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে চায়। খাওয়া হলেই সে একটু ঘুমিয়ে নেবে। হুমায়ুন আর আহসানের কী হলো তা জানতে ঘুমের ওমে না ঢুকে তার আর উপায় কী?

সবার এরকম বিপন্ন উদ্বেগ দেখে শরাফত মণ্ডল কাষ্ঠহাসি ছাড়ে, তার গলার স্বর এখন বড়ো খরখরে, 'বিলের পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ–কোনো জায়গার এক ইঞ্চি জায়গাও হামি বাদ দেই নাই। লায়েববাবুর সাথে ঘুর‍্যা ঘুর‍্যা দেখিছি। লিজে একলা একলাও দেখিছি। ওটি পাকুড়গাছ আছিলো কোনোদিন? দেখি নাই তো। হবার পারে, আগিলা জামানার মানুষ দেখিছে! হামার লজরেত পড়ে নাই।'

'কাদের, এটা আমার জায়গা, মানো তো? আমি এখান থেকে ইলেকটেড। ঠিক কি না?' কাদের মাথা নেড়ে সায় দিলে ইসমাইল জিগ্যেস করে, 'আমার কনস্টিটুয়েনসিতে রায়ট হলে এ্যাসেম্বলিতে জবাব দিতে হবে আমাকেই তো? না কী? কামারপাড়ায় তোমরা আগুন ধরাতে যাও কোন আক্কেলে? মানুষ রাত্রে কাছারি হামলা করতে ছোটে, তোমরা বাধা দাও না কেন?'

'কিন্তু কলকাতায় মোসলমান তো কিছু রাখলো না। মুসলিম লীগের সরকার, মোসলমান যদি এভাবে মরে তো—। আমাদের আত্মীয়স্বজন যখন হিন্দুর হাতে খুন হয়—।'

কাদেরের এরকম প্রতিক্রিয়ায় ইসমাইল অভ্যস্ত নয়। তবে অবাক হলেও সে জবাব দেয় সঙ্গে সঙ্গে, 'তোমার ভায়ের সম্বন্ধীকে কি মেরেছে কামারপাড়ার মানুষ? ঐ বুড়ো দশরথের ঠ্যাং পুড়িয়ে আর ওর দুটো গোরু মেরে কি তোমার আত্মীয়কে ফিরিয়ে আনতে পারবে?'

কাদেরের দোকানে জমায়েত সবার সঙ্গে সে পরিচয় করিয়ে দেয় তার সঙ্গীদের, 'আমার বন্ধু, ছোট ভায়ের মতো, অজয় দত্ত। কম্যুনিস্ট পার্টির ডেডিকেটেড লোক। আমরা এক পাড়ার ছেলে, মানুষ হয়েছি এক সঙ্গে। এ হলো অজয়ের বোন মিনু, মিনতি দত্ত, দুই ভাইবোনই কম্যুনিস্ট পার্টির কাজ করে। এঁরা আজ আমাদের সঙ্গে কামারপাড়ায় যাবেন।' তারপর কালাম মাঝিকে ডেকে ইসমাইল বলে, 'কালাম মিয়া, আপনি তো যাবেনই, আপনার মাঝিপাড়ার লোকজনও সঙ্গে থাকবে। কাদের, তুমি কয়েকটা লণ্ঠনের ব্যবস্থা করো, ফিরতে রাত হবে, ফেরার সময় তোমার বাড়িতে আমাদের দাওয়াত।'

কাদেরের বুক চিনচিন করে, টাউনে নিজের পাড়ায় ইসমাইলের খায়খাতির সব হিন্দুদের সঙ্গে, মনে হয় হিন্দুরাই তাদের বাড়ির সবার আত্মীয়স্বজন। অথচ দেখো ভোটের আগে ইসলামের মহিমা আর মোসলমানের দুর্দশা ছাড়া আর কিছু বলতো না। আর কালাম মাঝি এখন কামারপাড়ায় যাবার ব্যাপারটা একেবারেই অনুমোদন করে না, 'ওদিকে আজ খুব গরম হয়া আছে। গেলে আবার একটা মুসিবত না হয়।'

অজয় দত্ত তাকে থামিয়ে দেয়, 'গরম বলেই তো যাওয়া দরকার।'

মিনতি থাকায় একটু ভাবনা হলেও ইসমাইল হোসেন জোর দিয়েই বলে, 'চলেন তো যাই। দেখি না কে কী করে।'

এখন বাধা দেওয়া কাদেরের জন্যে মুশকিল। সে একটি অতিরিক্ত কর্মসূচির প্রস্তাব করে, 'ঠিক আছে। তো আপনারা আসলেন, মানুষ জমা হছে, কিছু কয়া যান।'

কথাবার্তা চলছিলো দরজা ভেজিয়ে দিয়ে, কপাট ফাঁক করলে দেখা গেলো দোকানের সামনে মেলা মানুষ। হাটের দিনে টাউনের শিক্ষিত তরুণীকে টমটম থেকে নামতে দেখে হাটুরেদের কেনাবেচা লাটে উঠেছে, সবাই এসেছে তাকে দেখতে।

সময় নাই। কোনো ভূমিকা ছাড়াই ইসমাইল হোসেন শুরু করে, 'ভাইসব, পাকিস্তান হাঁসেল হলে জমিদার মহাজনের জুলুম থাকবে না। তখন হিন্দু মুসলমানের ভেদ লোপ পাবে। আমরা বাঙলার হিন্দু, বাঙলার মুসলমান স্বাধীনচেতা জাতি। বাঙলার রাজা নবাব সুলতানরা দিল্লীর কাছে কখনো মাথা নত করে নি। আজ এই বাঙলাকে ভাগ করার চক্রান্ত চলছে। বাঙলা ভাগ হলে হিন্দু, মুসলমান–সমস্ত বাঙালির মেরুদণ্ড ভেঙে

পড়বে। বাঙলাকে লুটেপুটে খাবে পশ্চিমা বেনিয়ারা। আপনারা ভায়ে ভায়ে মারামারি করে, দাঙা করে বাঙলাকে টুকরো করে ফেলতে দেবেন না।'

ইসমাইল হোসেন কেন, কারো মুখেই লোকে এ ধরনের কথা আগে শোনে নি। তারা আরো শুনতে চায়। কিন্তু ইসমাইল শেষ করে ফেলে তাড়াতাড়ি করে, 'আমার বন্ধু, আমার ছোটোভাই অজয় দত্ত এবারে আপনাদের সামনে বলবেন। কয়েক বছর আগে রেড ক্রসের রিলিফ বিতরণ করার সময় অজয় আমাকে খুব সাহায্য করেছিলো। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে।'

অজয় দত্তকে এগিয়ে দিতেই সে শুরু করে, 'হিন্দু মুসলমান চাষীরা একসাথে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে জমিদার জোতদারদের জুলুমের বিরুদ্ধে। আমরা কম্যুনিস্ট পার্টি হিন্দু মুসলমান চাষীদের নিয়ে জোতদারদের সঙ্গে তেভাগা আদায়ের জন্যে আজো লড়াই করে চলেছি। এখন আমরা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ আর তাদের তল্পিবাহক জমিদার ও জোতদারদের সঙ্গে লড়াই না করে লেগে পড়েছি নিজেদের ভাইদের সঙ্গে দাঙা হাঙ্গামায়। নিজেদের এই সর্বনাশ করার উন্মাদনা থেকে আমাদের বিরত থাকতেই হবে। ভাইয়ে ভাইয়ে দাঙা বন্ধ করতে আমরা যে কোনো দলের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত। তাই রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও আমরা আজ এসেছি ইসমাইল হোসেনের সঙ্গে। ইসমাইলদা আমাদের ভাই, ভাইয়ের সঙ্গে মিলে আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে সংঘাত বন্ধ করতে চাই।'

অজয়ের গম্ভীর গলার বক্তৃতা চলে, কাদের ফিসফিস করে কথা বলে ইসমাইলের কানে কানে। কামারপাড়ায় আজ খুব উত্তেজনা। আজ দুপুরে দশরথ কর্মকার মারা গেছে। সেদিন আগুন ধরালে গোরু দুটোকে বাঁচাতে গিয়ে আগুন লাগে দশরথের পায়ে। তেমন কিছু নয়, পায়ে ফোস্কা পড়েছিলো বড়ো বড়ো। কিন্তু গোয়ালের জ্বলন্ত চালার ছোটো একটি টুকরা পড়ে তার বুকে। হরেন ডাক্তার চিকিৎসা করে তার পায়ের; বুকের ব্যাপারটাকে সে গুরুত্ব দেয় নি। কাল থেকে তার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিলো, ফুসফুস নাকি একটু পুড়ে গিয়েছিলো। দশরথ আজ মারা গেলে কামারপাড়ার মানুষ খুব গরম হয়ে আছে। এমন কি বছর তিনেক আগে আকালের সময় কামারদের যারা জমিজমা বেচে পুবে চলে গিয়েছিলো তাদেরও কেউ কেউ আজ নাকি এসে পড়েছে দা সড়কি নিয়ে। কাদের একটু ভয় পাচ্ছে। তার একটু আশা, অজয় দত্ত বক্তৃতাটা আরো লম্বা করলে সন্ধ্যা হবে, তখন কামারপাড়া যাবার পোগ্রামটা বাদ পড়তে পারে। কিন্তু ইসমাইল আস্তে করে অজয়ের কানে কানে বলে, 'সংক্ষেপে সারো। একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। সিচুয়েশন খুব খারাপ।'

অজয় দত্ত তখন অবশ্য উপসংহারে এসে পড়েছে, 'ভারতবর্ষের দুই প্রধান নেতা মহাত্মা গান্ধি ও কায়েদে আজম জিন্নার কাছে আমরা আকুল আবেদন জানাই, আপনারা সাম্প্রদায়িক হানাহানি বন্ধ করতে ঐক্যবদ্ধ হোন। হিন্দু মুসলিম হানাহানি বন্ধ হোক।' তারপর সে স্লোগান ধরে, 'গান্ধি জিন্নার মিলন চাই, হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই।'

আজ সারাদিন খুব গরম। কামারপাড়া যেতে যেতে গ্রীষ্মের লম্বা বিকাল হালকা গোলাপি হতে থাকে। ইসমাইল, অজয় ও মিনতি খুব ঘামে। ঘামতে ঘামতে অজয় স্লোগান ধরে 'গান্ধি জিন্নার মিলন চাই'; কেবল কেরামত আর বৈকুণ্ঠই জোরেসোরে সাড়া দেয়, 'হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই।' আর সবাই কথাগুলো ভালো করে ধরতেই পারে না।

মুকুন্দ সাহা আর কেষ্ট পালকে জোর করেই ধরে এনেছে কাদের। কেষ্ট পালের উৎসাহ কম নাই, কিন্তু মুকুন্দ কাছছাড়া করতে চায় না বৈকুণ্ঠকে। বৈকুণ্ঠ একটু পিছিয়ে পড়লে সে দাঁড়ায়, সে এগিয়ে গেলে মুকুন্দ পা চালায় জোরে। কালাম মাঝি একটু পেছনে পেছনে ছিলো। কিন্তু হঠাৎ আমাশার বেগ হয়েছে বলে কেবল বুধাকে বলে সরে পড়েছে।

কামারপাড়ার লোকজন তখন দুই পা ও ফুসফুস পুড়ে-মরা দশরথ কর্মকারের পুরো শরীরটার দাহ সেরে স্নান করে এসে বসেছে দশরথের পোড়া গোয়ালের সামনে অর্জুনগাছের তলায়। স্নান করার পরেও ওদের কেউ কেউ ঘামছে। এদের যাবার খবর ওরা পেয়েছে একটু আগেই, কিন্তু এতোগুলো ভদ্দরলোক দেখে উসখুস করলেও কেউ সামনে এগিয়ে আসে না। কিছুক্ষণ পর মাতব্বর গোছের এক কামার হাঁক দেয়, 'বাড়ির মধ্যে থ্যাকা একটা টুল লিয়া আসো তো।'

মিনতি সোজা চলে যায় বাড়ির ভেতরে। কাদেরকে দেখে হামলে কাঁদতে শুরু করে যুধিষ্ঠির, বৈকুণ্ঠ এগিয়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলে সে হাউমাউ করে কাঁদে। এর বিপুল প্রতিধ্বনি ওঠে বাড়ির ভেতরে। মেয়েদের কান্নায়, বিশেষ করে যুধিষ্ঠিরের বোনের আর্তনাদে কামারপাড়ায় সন্ধ্যা নামে একটু তাড়াতাড়িই। আকাশে চাঁদ নাই, তারার আলোয় মেয়েলি কান্না জমতে থাকে পাতলা মেঘের মতো, ফলে বিলাপের শব্দ ওপরে উঠতে না পেরে ঘুরপাক খায় অর্জুন গাছের নিচেই। গুমোট বাড়ে।

পুরুষদের অনেকে চোখ মোছে। কাঁদে না কিন্তু দশরথের জামাই। তার শ্বশুরের নিভে-যাওয়া হাঁপরের আগুন জ্বলছে তার চোখেমুখে। তার কথায় তাই পোড়া পোড়া গন্ধ, 'আপনারা এখন আসিছেন সোয়াগের কথা কবার। মণ্ডলে তো জলের দামে জমি লিয়া আদ্দেক কামারকে ভিটাছাড়া করিছে, এখন যি কয়টা মানুষ আছে সিগলানেক পুড়্যা মারার ফন্দি করিছে মাঝিপাড়ার মোসলমান। আপনারা এখন আসিছেন কিসক?'

গফুর কলু এর মধ্যেও তেতে ওঠে, 'মণ্ডলে তখন জমি না কিনলে জগদীশ সাহা তোমাগোরে ব্যামাক জমি ক্রোক কর্যা লিচ্ছিলো।'

'কথা তো একই হলো।' দশরথের জামাই বলে, 'জমি তো আর রাখা গেলো না। সাহা জমি লিলে লিজের জাতের কাছেই জমি থাকলোহিনি।'

অজয় দত্ত বলে, 'আজ ঐসব কথা থাক না ভাই। আর জাত জাত করেন, মহাজন কি আপনার জাতের মানুষ?'

'মহাজন জাতের মানুষ না হলে কি শরাফত হাঁমার জাতের মানুষ হলো?'

'না। জোতদারও আপনার নিজের জাতের মানুষ নয়।' অজয় দত্ত সোজা করে বোঝাবার জন্যে আস্তে আস্তে বলে, 'জোতদার মহাজন কেউই আপনার জাতের মানুষ হতে পারে না। জোতদার মহাজনদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করছি। আমাদের লড়াই এখনো চলছে।'

কেরামত অনেকক্ষণ ঘুরঘুর করছিলো অজয় দত্তের কাছাকাছি। এখন সুযোগ বুঝে সামনে আসে, বলে, 'জয়পুর, পাঁচবিবি এলাকায় তেভাগার সময় আমি ছিলাম। তেভাগা লিয়া আমার অনেক গান ওদিকে চলিচ্ছিলো। শুনিছেন লিচ্চয়?'

'এখানে গান করেন না?'

'না।' কেরামতের কথাকে নালিশও ধরা যায়, আবার কৈফিয়তও বলা যায়,

'এদিককার মানুষের মধ্যে তো তেভাগার জোস নাই। ধরেন একটা জোস না থাকলে কি গান বান্দা যায়?'

'এদিকে মানুষ তেভাগা নিয়ে মাথা ঘামায় না?' অজয় দত্ত ইসমাইলকে বলে, 'কী ইসমাইলদা এখানে কি তেভাগা ইমপ্লিমেন্ট করে ফেলেছো নাকি?'

'এদিকে বড়ো জোতদার নাই বললেই চলে। তাই আধিয়ারের নাম্বার কম।' ইসমাইল বলে, 'এ্যাসেম্বলিতে টেনেনসি বিল তো মুভ করাই হলো। জমিদারি এ্যাবোলিশ আর তেভাগা একই সঙ্গে করা হবে।'

বুধা, শমশের পরামাণিক, এমন কি যুধিষ্ঠির পর্যন্ত ইসমাইল আর অজয়ের কথা শুনতে তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। ইসমাইল তো এখন গভর্নমেন্টের মানুষ, তেভাগা হচ্ছে কি-না সে ঠিক বলতে পারবে। কিন্তু সে তোলে অন্য প্রসঙ্গ। দশরথের এই হত্যার শোধ নেওয়ার জন্যে কামাররা এখন যদি মাঝিদের ধরে ধরে মারে, তো একদিন মাঝিরা ফের হামলা করবে। ওদিকে পালপাড়ার লোকদের কথাও ভাবতে হবে। এরকম মারামারি কাটাকাটি চললে মানুষের রুজিরোজগার বন্ধ, মনের মধ্যে সবসময় হিংসা পুষে রাখলে কেউ শান্তিতে থাকতে পারে না।

অজয় দত্ত বলে, এই হানাহানিতে লাভ হচ্ছে কার? গরিব মানুষেরা নিজেদের মারে, বড়োলোকেরা বসে বসে মজা লোটে।

সবাই চুপচাপ শোনে, নিজেরা কোনো কথাই বলে না। যুধিষ্ঠিরের ভগ্নীপতির চোখের আগুন নেভে না, সে বসে থাকে একটু দূরে।

রাত্রে লণ্ঠনের আলোয় সবাই কাদেরের বাড়িতে আসে। ইসমাইল, অজয় দত্ত ও মিনতি এই গরমে খাওয়ার এতো এতো আয়োজন দেখে কাদেরকে মিষ্টি করে বকে, কিন্তু পেট পুরে পোলাও কোর্মা খায়। বড়ো জাতের শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে এভাবে খাওয়াতে পেরে শরাফত গদগদচিত্ত। কামারপাড়ার ঘটনায় সে সত্যি অসন্তুষ্ট, 'মাঝিরা কোনোদিন খাসলত বদলাবার পারে না। টাকাপয়সা যতোই করুক,-ছোটোজাত শালারা ছোটোজাতই থাকে। মানুষ আর হবার পারে না। কামারপাড়াত যা করলো!'

মণ্ডলবাড়ির বাইরের উঠানে তখনো জটলা, টমটম দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানেই। অজয় ও মিনতির পর ইসমাইল টমটমে উঠতে যাচ্ছে তো সামনে এসে দাঁড়ায় তমিজের বাপ, 'হামার বেটাটা এখনো জেল খাটিচ্ছে বাবা। ভিটাবাড়ি বন্ধক থুয়া ট্যাকা খরচ করলাম, তাও তাক খালাস করবার পারলাম না।'

ইসমাইল কিছু বলার আগেই কাদের তাকে ধমকায়, 'আরে রাত হছে কতো। তুমি এখন ইগলান কি দরবার নিয়া আসিছো?' ইসমাইল টমটমে ওঠার পর কাদের নিজেও উঠতে যাচ্ছে তখন সামনে আসে বৈকুণ্ঠ, তমিজের বাপকে সে মনে করিয়ে দেয় পাকুড়গাছের কথা, 'ক্যা গো, পাকুড়গাছের কথা কলা না? পাকুড়গাছ পাওয়া যাচ্ছে না—।'

'তোর কি মাথা খারাপ হছে বৈকুণ্ঠ? ভায়ে ভায়ে খুনাখুনি ঠেকাবার জন্যে ইনারা বলে ছুটাছুটি করিচ্ছে, আর এখন তুলিস ইগলান ফালতু কথা?'

৩৭

কামারপাড়ার হত্যাকাণ্ডে নায়েব পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী খুবই মর্মাহত। দশরথের মৃত্যুর দুইদিন পর মুকুন্দ সাহাকে খবর দিয়ে কাছারিতে সে ডেকে এনেছে কামারপাড়ার লোকদের, কেষ্ট পালকে খরব দেওয়া হয়েছিলো, সেও এসেছে কয়েকজনকে নিয়ে। টাউনের সতীশ মুক্তার আর সেরপুরের অনিল সান্যাল ছাড়াও আরো দুজন বাবু বসে সিগ্রেট টানছিলো, এদের একজনের চিকন ফ্রেমের চশমা, আরেকজনের হাতে ইংরেজি খবরের কাগজ।

'আগে খবর দিলে ভালো চিকিৎসা করা যেতো। বাপটাকে হয়তো বাঁচাতেও পারতিস! তা তোদের খাতির তো সব বেজাতের মানুষের সাথে, তাদের হাতে জান গেলেও নিজেদের মানুষের কাছে আসিস না।' নায়েববাবু দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে আর দশ টাকার কড়কড়ে দুটো নোট তুলে ধরে যুধিষ্ঠিরের দিকে। তার পরিত্যক্ত দীর্ঘশ্বাসে নোট দুটো উড়ে পড়ে মেঝেতে, যুধিষ্ঠির উপুড় হয়ে টাকা তুলতে তুলতে শোনে, 'বাপটা তোর বড়ো ভালো মানুষ ছিলো রে। এই সাদাসিধা লোকটাকেও ওরা ছাড়লো না।'

'কেন, এখন তো বেটাদের মুখে আবার ইউনিটির বুলি।' সতীশ মুক্তার ক্ষোভ ও রাগ চেপে রাখতে কথা বলে একটু ধীরে ধীরে, 'সুরাবর্দি নিজের হাতে পিস্তল দিয়ে হিন্দু মারলো, মীনা পেশোয়ারিকে দিয়ে কতো কতো হিন্দুর প্রাণ নিলো। পাঞ্জাব থেকে পুলিস আনিয়ে হিন্দু মারলো কতো। আবার ধুয়া তুলেছে ইউনাইটেড সভেরিন বেঙ্গলের। নেড়েগুলো কতোরকম ফন্দিই যে জানে!'

'নেতাজির ভাইও তো ইউনাইটেড্ বেঙ্গলের পক্ষে।' অনিল সান্যাল একটু ভয়ে ভয়েই বলে, 'শরৎ বোস, কিরণশঙ্কর রায়, সত্য বকসি, তারপর ধরুন আমাদের সুরেনবাবু, — ।'

'আরে রাখেন। নেতাজির ভাই হলেই নেতাজি হওয়া যায় না।' সতীশ মুক্তার এবার আর রাগ চেপে রাখতে পারে না, 'সাত ঘাটের মাছ খেয়ে বিড়াল সেজেছে সাধু তপস্বী! সুরাবর্দি হিন্দু মারে নি? তার সঙ্গে এরা জোটে কী করে? আমাদের শ্যামাপ্রসাদ ইজ রাইট, উই ডিমান্ড এ ডিভাইডেড বেঙ্গল ইভন ইন এ্যান আনডিভাইডেড ইনডিয়া। নো মোর উইথ দি বারবেরিয়ান মহামেডানস।'

টিন থেকে আরেকটি সিগ্রেট বার করে ধরাতে ধরাতে রোল গোল্ডের ফ্রেমওয়ালা বাবু বলে, 'রিলিজিয়ন যে খুব বড়ো ফ্যাকটর তা নয়। কিন্তু দে বিলং টু এ ডিফারেন্ট কালচারাল লেবেল। উই ক্যান নট লিভ টুগেদার। ইম্পসিবল।'

'সেদিন গোলাবাড়িতে অজয় দত্ত বোনকে নিয়ে এসেছিলো গোলাবাড়িতে ইসমাইলের সঙ্গে। কামারপাড়ায় খুব সোয়াগ দেখিয়ে ভাত খেয়ে গেলো মণ্ডলের বাড়ি। দত্তবাড়ির ছেলে, তার অধঃপতনটা দেখুন।' বলতে বলতে সতীশের রাগ চড়ে যায়, 'কামারপাড়ায় আগুন দিলো যারা, তাদের বাড়ির অন্ন তুলিস মুখে?' এবার সে ঝাল ঝাড়ে অনিল সান্যালের দিকে, 'সেরপুরে নাকি কংগ্রেস পাব্লিক মিটিং করলো ঐ ইসমাইলকে নিয়ে? আপনাদের রুচির বাহাদুরি বটে!'

ইসমাইলকে আর দোষ দেবে কি, সেদিন সেরপুরের মিটিঙে অনিল সান্যাল নিজেই আবেগময় এক ভাষণ ছাড়লো অবিভক্ত বাঙলার পক্ষে। কিন্তু এর কয়েকদিনের মধ্যেই জ্যাঠতুতো দাদার চিঠি পেয়ে অনিল খুব দমে যায়। দাদা লিখেছে, "তোমরা হিন্দু বাঙালি কি আত্মঘাতি হইতে চাও? নিম্নবর্ণের ধর্মান্তরিত অমার্জিত কুলাঙ্গারদিগের সহিত

এক রাষ্ট্রভুক্ত হইয়া বাস করিবার কুমতি বর্জন কর। এইরূপ উন্মাদনা হইতে আরোগ্য লাভ না করিলে উত্তরাধিকারিগণের প্রতি যে অন্যায় করিবে উহা ক্ষমার অযোগ্য।" দাদা তার মহাপণ্ডিত মানুষ, ইংরেজি লিখে বিলাতের সায়েবদের পর্যন্ত তাক লাগিয়ে দিয়েছে, এখন দিল্লী রেডিওতে ইংরেজি স্ক্রিপ্ট লেখে। দাদা বাঙলায় লেখে খুব কম, লিখলেও সাধু ভাষার নিচে কখনোই নামে না। তা সেই দাদা পর্যন্ত নিদারুণ ক্রোধবশত পত্রের উপসংহারে গুরুচণ্ডালী দোষ ঘটিয়ে ফেলেছে, 'তোমরা কি বৃটিশ সাম্রাজ্যের কল্যাণে অর্জিত শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়া চাষাদের সঙ্গে থাকতে চাও?"

চিঠি পড়ে অনিলের মন খারাপ হয়ে যায়, তার দলের সহকর্মীদের মধ্যে মুসলমান কম থাকলেও তারা কি সবাই চাষাভূষা? আবার তার দাদার ইংরেজি লেখা এই ছোটো জেলায় পড়ে আর কয়জন? অনিল সান্যালের চেনাজানা লোকদের মধ্যে এক ইসমাইল হোসেনের বাবাই তো দাদার ইংরেজির পরম ভক্ত।—কিন্তু দাদা তার বংশের গৌরব, তার কথা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা কি আর অনিলের হয়? সে এখন চুপ করে সতীশ মুক্তারের কথা শোনে।

'ইউনাইটেড সভেরিন বেঙ্গল মানেই মুসলমানদের পার্মানেন্ট মেজরিটি মেনে নেওয়া। ওদের সংখ্যা তো বাড়ে অনেক বেশি, একেকটা মুসলমান বিয়ে করে তিনটে চারটে করে, বাচ্চা প্রডিউস করে ডজন ডজন। আমরা কি এই লেভেলে নামতে পারবো? না নামা উচিত? শরৎ বোস বোঝে কী? প্যাটেল কি জওহরলালের ফারসাইটেডনেস কি তার আছে?'

সতীশ মুক্তার কথা বলতেই থাকে আর নায়েববাবু নিচু গলায় উপদেশ দেয়, কামারদের, 'এখন আমাদের দরকার এক হওয়ার। জমিদারবাবু এখন থেকে সন্ন্যাসীর স্থানে দুর্গাপুজা করবেন। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সব হিন্দু সেখানে মিলিত হবে, ভক্তিভাবে মিলিত হবে। মুসলিমদের দেখো না, ওদের ঈদ ফিদ কী সব হলে সব পালে পালে জুটে যায় এক ময়দানে। সেখানে কি তোমাদের ঢুকতে দেয়?'

কেষ্ট পাল প্রতিবাদ করে, 'কিন্তু পোড়াদহ মেলাত এটিকার মোসলমান সোগলি আসে। গোলাবাড়ি থ্যাকা পোড়াদহ মেলার সন্ন্যাসীর থান পর্যন্ত ঘোড়দৌড় হয়, তার সওয়ারি তো ব্যামাক মোসলমান।'

'কিন্তু সন্ন্যাসীরা তো ছিলো মুসলমানের শত্রু, সে খবর রাখো?'

'না বাবু।'

'তুমি বেশি জানো?' সতীশ মুক্তার কেষ্ট পালকে ধমক দেয়, 'সন্ন্যাসীরা ম্লেচ্ছদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিলো, তা জানো? আনন্দমঠ পড়েছো?'

'না বাবু।' বলে কেষ্ট পাল তার আনন্দমঠ না পড়ার তথ্য এবং সতীশ মুক্তারের কথায় অবিশ্বাস প্রকাশ করে এক সঙ্গে, 'হামাগোরে ভবানী সন্ন্যাসীর সেনাপতি আছিলো এক পাঠান।' বলতে বলতে কেষ্ট পালের আত্মবিশ্বাস এতোটাই বাড়ে যে গল্পের মধ্যে সে ইতিহাস ঢুকিয়ে দেয়, 'ফকির মজনু শাহ আছিলো ফকির রাজা, আর সন্ন্যাসী দলের রাজা আছিলো ভবানী সন্ন্যাসী।'

'কোথাকার রাজা হে? নাটক নভেল না পড়লে কী হয়, ইতিহাস বেশ মেলা পড়েছো।' ইংরেজি খবরের কাগজ হাতে বাবুর ঠাট্টা না বুঝে কিংবা গায়ে না মেখে কেষ্ট পাল বলে, 'এই দুইজন যুদ্ধ করিছে কোম্পানির গোরা সেপাইয়ের সাথে। আর

পাকুড়গাছের মুনসি শুনিছি আছিলো মজনুর সাথে। আবার বৈকুণ্ঠ কয়, না, ঐ মুনসি হলো ভবানী সন্ন্যাসীর সেনাপতি। মরার পরে মুনসি ঠাঁই লেয় পাকুড়গাছে। কয় বছর পর পর আষাঢ় মাসের অমাবস্যার রাতে বিলের মধ্যে যে কাৎরা ভ্যার্সা ওঠে সেটাত বলি দেওয়ার পাঁঠাও পাঠায়া দেয় ঐ মুনসি। বিলের গজার মাছ সেদিন পাঁঠার আকার পায়।'

'বাঃ তোমাদের ঐ মুনসি মনে হয় ম্যাজিশিয়ান।' ঠাট্টা করলেও এই বাবু দেশবাসীর কুসংস্কারে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন, 'পিপল এতো সুপারস্টিশাস হলে ইনডেপেনডেন্স উইল বি মিনিংলেস! আরে তোমার ঐসব লোক রাজাউজির নয়, ফকির সন্ন্যাসীও নয়, বুঝলে? সব ডাকাত। বুঝলেন পূর্ণবাবু', নায়েববাবুর দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ দেশে ল' এ্যান্ড অর্ডার রেস্টোর করতে গেলে এদের সঙ্গে ক্ল্যাশ হয়।'

'ডাকাত লয় বাবু।' এবার যুধিষ্ঠির পর্যন্ত বলে ওঠে, 'ডাকাত লয়, সন্ন্যাসী। এই দেখেন না, ইঁটখোলা করলো মণ্ডলের বেটা, পাকুড়গাছ লিয়া কোনটে উড়াল দিছে মুনসি। তার অভিশাপেই তো ইগলান অনাছিষ্টি শুরু হছে। দুই বছর হলো শুনি সন্ন্যাসী ঠাকুরও মেলা দেখবার আসে না।'

কেষ্ট পাল কথাটা তুলে নেয় নিজের মুখে, 'সন্ন্যাসীক দেখবার পায় বৈকুণ্ঠ, অরা তো তার সাথেই এটি আসিছিলো। তা দুই বচ্ছর বৈকুণ্ঠ তার আর দেখা পায় না। আবার তার স্থানে যদি অন্য কোনো পূজা হয় তো হামাগোরে সব্বোনাশ হয়া যাবি বাবু!'

এসব শুনে তো নায়েববাবুর ক্ষান্ত দিলে চলে না, তার দায়িত্ব অনেক বেশি। সে বলে, 'আর জমিদারি উঠ্যা গেলে? ওটা তো জমিদারের খাস ল্যান্ড, জমিদারি উঠ্যা গেলে তোদের ঐ পূজা হবে?'

'হবি না কিসক বাবু?' কেষ্ট পাল জোর দিয়ে বলে, 'দলিল দেখেন। দলিলে ল্যাখা আছে, "সন্ন্যাসীর থানের সাত শতাংশ জমি সাধারণ্যের ব্যবহারের নিমিত্ত নির্দিষ্ট রহিল।"

এ কথা পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর ভালো করে জানা আছে। বলে, 'তা সন্ন্যাসী ঠাকুরের এতো ক্ষমতা, সে কি তোদের রক্তও শীতল করে দিয়েছে নাকি?'

'না বাবু।' যুধিষ্ঠিরের স্বল্পবাক বোনাইয়ের রক্ত উত্তপ্ত হয়, 'অক্ত হামাগোরে গরমই আছে। আপনারা চরণে ঠাঁই দিলেই হামরা ভরসা পাই।'

চোখা চোখে নায়েববাবু এই কর্মকার তরুণটিকে দেখে, চোখ না নামিয়েই সে বলে, 'মাথা গরম করে কোনো কাজ করো না বুঝলে? তুমি আমার সঙ্গে একটু কথা বলে যেও তো। সাপও মারতে হবে, লাঠিও ভাঙা চলবে না।'

৩৮

কামারপাড়ায় আগুন লাগিয়ে আসার পর থেকে আফসার মাঝির বালামুসিবত আসতে লাগলো একটার পর একটা। কয়েকদিন আগে চোর এসেছিলো তার ঘরে সিঁধ কেটে। ঘরে ঢুকে চোর কিছু না নিয়েই চলে যায়, সিঁধ কাটার গর্ত ছাড়া আর কোনো চিহ্ন রেখে

যায় নি, কিছু নিয়েও যায় নি। কিন্তু দশরথ মরার পরদিন আফসারের বৌ টের পায়, চোর সিঁধ কাটতে গিয়েই তার লুকানো টাকার কৌটা পেয়ে গিয়েছে এবং কৌটায় টাকা ছিলো দুই কুড়ির বেশি। ঐ সময় বৌ তার ভরা পোয়াতি; তিন দিন পর টাকার শোকে কিংবা কামারপাড়ার অভিশাপে তার একটা মরা ছেলে জন্মালো। দুই মেয়ের পর এক ছেলে, ছেলেটা বাঁচলো না। বৌটা আবার সুতিকার রোগী, প্রসবের পর একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। বারবার তাকে পায়খানায় যেতে হয় বাঁশঝাড়ে, একদিন পাছার কাপড় তোলা অবস্থায় বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলো সেখানেই, ঐ অবস্থায় তাকে দেখে ফেলে আফসারের এক জোয়ান ভাগ্নে। ঘরে মাচায় শুয়ে বৌটা দিনরাত কোঁকায় আর আফসারকে বকে, কামারপাড়ায় হামলা করে আফসার তার সর্বনাশ ডেকে এনেছে।

আফসার কাউকে কিছু বলতে পারে না, বৌকে যতোটা পারে এড়িয়ে চলে। নামাজ পড়ার দিকে হঠাৎ তার খুব মন গিয়েছে, বাড়িতে থাকলে জুম্মাঘরে তো যায়ই, কালাম মাঝির দোকানেও নামাজের ওকতে দোকানদারি বন্ধ রেখে নামাজ পড়ে। এর মধ্যে জুম্মার নামাজের পর কুদ্দুস মৌলবি মোনাজাতে কলকাতা আর বিহারের মুসলমানদের দুর্দশা নিয়ে আল্লার দরবারে কান্নাকাটি করে, যে দেশ একদিন মুসলমানের অধীনে ছিলো সেখানে আজ মুসলমানদের মেরে মেরে শেষ করা হচ্ছে দেখে আল্লা পরওয়ারদিগারের কাছে সে রীতিমতো নালিশ করে। এতে আফসার একটু হালকা হয়, যেখানে দেশ জুড়ে এতো এতো মুসলমান নিধন চলছে, সেখানে কামারপাড়ার একটা হিন্দু মারা এমন কিছু গুনার কাজ নয়। কিন্তু ঐ কুদ্দুস মৌলবি আবার একদিন পরই ফকিরের ঘাটে আফসারকে একা পেয়ে চাপা গলায় বলে, 'আফসার, ইগলান তোমরা কী কাম করো গো? কামারপাড়ার বুড়া মানুষটা তোমাগোরে কী করিছিলো যে তাক এংকা কর‍্যা পুড়ায়া মারো? কাফের হবার পারে, তার বিচার করবি আল্লাতালা। তোমার সাথে তো ঐ বুড়া কোনো মোনাফেকি করে নাই, জুলুম করে নাই। তার ঘরত তোমরা আগুন দাও কোন আক্কেলে? আখেরাতের দিন তোমাক জবাব দেওয়া লাগবি না?'

আখেরাত তো অনেক দূরে, তার সংসার তো ছারখার হয়ে যাচ্ছে এখনি। আফসার এখন করে কী? এর মধ্যে দুপুরবেলা বৈকুণ্ঠ একদিন কালাম মাঝির দোকানে ঢোকে। হাটবার নয়, লোকজন নাই, কালাম মাঝিও গেছে বাড়িতে। এদিক ওদিক তাকিয়ে বৈকুণ্ঠ বলে, 'আফসার, মাঝিপাড়াত তোরা একটু হুঁশিয়ার হয়া থাকিস। কামারপাড়ার নারদ আর ওদিক থ্যাকা আসিছে যুধিষ্ঠিরের বোনাই,—এই দুইটাক লিত্যি কাছারিত যাবার দেখি। লায়েব এই দুইটাক হাত কর‍্যা ফালাছে, সন্ন্যাসীর থানেত এবার অরা দুর্গাদেবীর পূজা করবিই।' বৈকুণ্ঠকে আফসার কখনো এমন মন খারাপ করতে দেখে নি। নায়েববাবু মুকুন্দ সাহাকে বলেছে, মেলা টেলা যেমন চলছে চলুক। মেলার দিন পূজাও যদি এরা করতে চায় তো করবে। কিন্তু বটতলার থানটা পাকা করা হবে, বছরে একবার করে মাকে নিয়ে আসা হবে সেখানে। নায়েববাবু বামুন মানুষ, শিক্ষিত লোক, কেন যে এসব তাল তুলেছে কে জানে? আবার কামারদেরও একদিন সুযোগ করে দেবে, তারা মাঝিপাড়ায় হামলা করে দশরথ কর্মকারের হত্যার প্রতিশোধ নেবে।

শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে আফসার। তার আসরের ওকত যায়, সেদিকেও খেয়াল নাই। হঠাৎ সে জড়িয়ে ধরে বৈকুণ্ঠের হাত, ভারী গলায় বলে, 'বৈকুণ্ঠদা, হামার তো সব্বোনাশ হয়া গেলো। হামার আখেরাত গেছে, সংসারও যায়। দশরথ বুড়ার

গোয়ালেত আগুনটা তো হামিই লাগাছিলাম গো।' খুব এলোমেলোভাবে আফসার কামারপাড়ার ঘটনার পর তার পারিবারিক দুর্যোগের কথা বলে; তার ধারণা, দশরথ এবং জন্মের-আগেই-মরা তার নিজের ছেলে দুজনকেই খুন করেছে সে নিজে। তার এখন উপায় কী? এতো নামাজ বন্দেগি করে, মনে হয় না আল্লা তাকে মাফ করবে। কুদ্দুস মৌলবি পর্যন্ত তার নিজের ও আল্লার অসন্তোষের কথা তাকে জানিয়ে দিয়েছে।

শুনে বৈকুণ্ঠ নতুন করে ভাবনায় পড়ে। ফকির চেরাগ আলি থাকলে তো কথাই ছিলো না, পথ সে একটা বাতলে দিতোই। ভবানী সন্ন্যাসী দুই বছর এদিকে মাড়ায় না, আসলে তার অসন্তোষের জন্যেই এই এলাকায় এতো বিপদ। পাকুড়গাছও নাই যে তমিজের বাপকে সেখানে নিয়ে মুনসির একটা পরামর্শ শোনা যায়। তবু তমিজের বাপের কাছে না হয় বৈকুণ্ঠ একবার গিয়ে সব বলুক। আফসার ভয় পায়, 'না, না। মাঝিপাড়াত কোনো কথা হলেই চাচা শুনবি।'

বৈকুণ্ঠ নতুন একটি পথ বাতলায়, 'তুই না হয় হামার সাথে কামারপাড়াত চল।' শুনে আফসার আঁতকে উঠলে বৈকুণ্ঠ বলে, 'যুধিষ্ঠিরের মাও মানুষ খুব ভালো, যুধিষ্ঠিরও চ্যাংড়াটা সাদাসিধা। তুই যুধিষ্ঠিরের মায়ের পাও ধর্যা মাফ চালে ঠিকই মাফ কর্যা দিবি। মাঝিপাড়ার উপরে কামারগোরে রাগটাও আর থাকবি না। চল।'

আফসার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, 'হামাক লিয়া গেলে হামাক তো ধরবিই, তোমাকও খাম করবার পারে।'

'হামাক? হামাক ইস্পর্শ করবি ঐ শালা কামারের গুষ্টি?' বৈকুণ্ঠের তেজ জ্বলে ওঠে, 'আরে হামি হলাম গিরি বংশের সন্তান। এই গিরিরডাঙা, নিজগিরিরডাঙা, গোলাবাড়ি–ইগলান আগে কার আছিলো, ক তো? কবার পারিস? আরে হামার ঠাকুরদা, তার ঠাকুরদার বাপ, না-কি ঠাকুরদা—।' তার পূর্বপুরুষের সিংহতেজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে সে তার সিদ্ধান্তের সামান্য পরিবর্তন ঘটায়, 'ঠিক আছে। হামি একদিন যামু, একলাই যামু। যুধিষ্ঠিরের মায়ের সাথে, যুধিষ্ঠিরের সাথে, নারদ, গৌরাঙ্গ, তারপর ঐ শালা জামাইটার সাথে কথা সাব্যস্ত কর্যা আসি, তারপরে তোক লিয়া যামু।'

কিন্তু এরপর তিনদিন বৈকুণ্ঠের আর কোনো সাড়াশব্দ নাই। এদিকে আফসারের বৌ এখন একেবারে বিছানায় পড়ে গিয়েছে, দুই মেয়েকেই এক সাথে ধরেছে কামলা রোগে, গায়ের বন্ন হয়েছে হলুদ, গায়ে জ্বর, যখন তখন বমি করে। বাড়িতে অসুখবিসুখ, চাচার কাছ থেকে সন্ধ্যাসন্ধি ছুটি নিয়ে আফসার হাঁটা দিয়েছে বাড়ির দিকে, দেখে আগে আগে চলেছে বৈকুণ্ঠ। তাঁকে দেখে বৈকুণ্ঠ থামে, বলে, 'তুই বাড়িত যা। হামি কামারপাড়াত যাচ্ছি। কাল পাছাবেলা হামার সাথে কথা কোস হাটের মধ্যে, বটতলাত আসিস।'

আফসারের গা ছমছম করে, 'তোমার যদি কিছু হয়?' বৈকুণ্ঠ তার পূর্বপুরুষের সৌর্যবীর্য ও নিজের বীরত্ব নিয়ে কথা বলার সুযোগটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে, আফসার ভরসা পায়। ফকিরের হাটে নৌকা নাই, বৈকুণ্ঠ বিলের পশ্চিম তীর ধরে হাঁটে। আফসারকে বলে, 'তুই বাড়িত যা। বাড়িত না তোর অসুখবিসুখ।' কিন্তু আফসার হাঁটে তার পাশাপাশি।

আকাশে খুব রোগা একটা চাঁদ উঠে কিছুক্ষণের মধ্যে নিভে গেছে। মেঘ নাই, তারার আলোয় বিলটাকে চরের মতো দেখায়। মণ্ডলবাড়ির কাছাকাছি শিমুলগাছে

কয়েকটা বক উড়তে উড়তে মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটিয়ে নিজেদের শরীরে হাওয়া করে, তাদের শরীর হয়তো জুড়ায়, কিন্তু ঐসব শরীরের তাপ ঝরে পড়ায় নিচে গরম পড়ে আরো বেশি। হাঁটতে হাঁটতে আফসার হাঁপায়। তার ভয় করে, বারবার ভাবে, বৈকুণ্ঠদাকে বরং না করে দিই, ওখানে গিয়ে কাজ নাই। বৈকুণ্ঠ অবিরাম কথা বলে চলেছে বলে ভয়টা তার ভালো করে দানা বাঁধার সুযোগ পায় না। আবার এতো কথা শুনতে তার ভালোও লাগছে না। বৈকুণ্ঠের ওপর রাগ হয়। একেকবার বুকের ভেতর খচখচ করে : ময়লা ধুতিপরা লোকটা তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না তো? মণ্ডলবাড়ির পর কয়েক বিঘা জমি পেরিয়ে কলুপাড়া, কলুপাড়ার পর বিলের দক্ষিণ ধার ধরে মণ্ডলের বিঘার পর বিঘা জমি পার হলে খাল। রোগা খাল, এখন পানি একেবারেই নাই। খালের ওপারে বিলের পুবদিকেই কামারপাড়া। খালের এপারে এসে বৈকুণ্ঠ হঠাৎ চুপ করে। তখন এতোক্ষণের ভয়টা একশো গুণ ভারি হয়ে চেপে বসে আফসারের ওপর। সে আস্তে করে বলে, 'আজ না হয় থাক। আরেকদিন আসো।'

বৈকুণ্ঠ জবাব দেয় না। শুকনা খালের এপারে দাঁড়িয়ে দুজনেই দেখে কামারপাড়ার দক্ষিণ সীমানা থেকে খালের দিকে এগিয়ে আসছে কয়েকটি ছায়া। একটা চিৎকার শোনা যায়, 'শালারা আসিচ্ছে রে, আজ আবার আগুন ধরাবার আসিছে।' গলাটা দশরথের জামাইয়ের বলে সনাক্ত করে বৈকুণ্ঠ বলে, 'না রে আফসার, চল যাই। কামারগোরে হাতত মনে হয় হাতিয়ার আছে।'

খালের ওপার থেকে টর্চের আলো এসে পড়ে বৈকুণ্ঠ ও আফসারের মুখের ওপরে। দশরথের জামাই চিৎকার করে বলে, 'আরে শালার মাঝিপাড়ার ডাকাতগুলান আসিছে গো। ও যুধিষ্ঠির, ও নারদ কাকা, ও গৌরাঙ্গ খুড়া সোগলি আসো। আজ শালারা আবার আগুন দিবার আসিছে। শালা ডাইঙ্গা মাঝির জাত, আজ একটাকো জান লিয়া যাবার দিমু না।' দেখতে দেখতে দা সড়কি হাতে কামাররা ছুটে আসতে থাকে। বৈকুণ্ঠ প্রথমেই তাকেও মাঝিদের অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদ জানায়, 'আরে মাঝি কুটি? হামি বৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ গিরি, হামাক চিনিস?' কিন্তু গলা তার বেশি উঁচুতে চড়তে পারে না, আফসারকে বরং একটু জোরে বলে, 'আফসার, তুই পালা, দৌড় মার, দৌড় মার।'

আফসারের পা তখন গেঁথে গেছে খালের এপারের শুকনা মাটিতে, সে দাঁড়ায় বৈকুণ্ঠের পিঠ ঘেঁষে, তার ঘাড়ে হাত রেখে। পলকের মধ্যে অন্তত আট দশজন কামার ছুটে আসতে থাকে, দশরথের জামাই গলা ফাটিয়ে চেঁচায়, 'বন্দে মাতরম।' স্লোগানে সাড়া দেয় না সবাই, কিন্তু তিন চারজনের 'বন্দে মাতরম' কাঁপিয়ে তোলে বিলের এপার-ওপার জুড়ে। কামারদের মধ্যে থেকে কেউ বলে, 'হামি না আগেই কছিলাম, শালারা আবার আসবি। দেখলা তো?' ওরা ছুটে আসতে আসতে লোহার একটা বল্লম ছুটে আসে আরো আগে, কিন্তু প্রায় ঐ মুহূর্তে বৈকুণ্ঠ আর আফসার দৌড়াতে শুরু করায় বল্লমটা ওদের পাশ কাটিয়ে চলে যায় আরো সামনে। কলুপাড়ার কাছাকাছি যেতেই কামারদের একজন অন্তত ওদের নাগাল পেয়েছে, দায়ের একটা কোপ এসে পড়ে আফসারের ঘাড়ে। বৈকুণ্ঠ ততোক্ষণে দৌড়ে চলে গেছে আরেকটু সামনে। আফসারের আর্তনাদে সে থমকে দাঁড়ায় এবং ফিরে এসে তখনো দৌড়াতে-থাকা আফসারকে জড়িয়ে ধরে এবং ফের একটা হুঙ্কার ছাড়ে, 'খবরদার! হামি গিরির বংশের মানুষ। হামি অভিশাপ দেই, শালা কামাররা তোরা নিব্বংশ হবু।' কিন্তু নির্বংশ হবার ভয় না করে

কিংবা বংশরক্ষার পরোয়া না করে দশরথের জামাই কিংবা নারদ কর্মকার,—বৈকুণ্ঠ ঠাহর করতে পারলো না,—মস্ত একটা ছুরি চেপে ধরে আফসারের পেটে এবং বেশ দক্ষতার সঙ্গে একটা পোঁচ দিতেই আফসারের পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসে। আফসার মাটিতে পড়ে গেলে তার সঙ্গে পড়ে যায় বৈকুণ্ঠও এবং তখন আফসারের মৃত্যু নিশ্চিত করতে অন্য আরেকজন কামার আরেকটি দায়ের কোপ মারে তার বুকে। এই কোপটা ঠেকাতে বাঁ হাতটা উঠিয়েছিলো বৈকুণ্ঠ, তার বুড়ো আঙুলটা সম্পূর্ণ ফেলে দিতে কোপটার জোর একটু ক্ষয় হয়ে গিয়েছিলো বলে আফসারের বুকের ডান দিকে এটা পড়ে দুর্বল হয়ে। ওদিকে অনেকটা ভেতরে চলে এসেছে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি এবং এর জবাবেই বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ আসে মণ্ডলবাড়ি থেকে। কলুপাড়ায় পুরুষমানুষ কম, তবু অল্প কয়েকজন ছেলে, গফুরের ভাই ভাইপোই হবে, 'নারায়ে তকবির' 'আল্লাহু আকবর' বলে বেরিয়ে পড়ায় কামারের দল পিছু হটে।

কলুপাড়ার লোকজন ও মণ্ডলবাড়ির কামলাপাট এসে আফসারকে পাঁজাকোলা করে তোলে। শরাফত মণ্ডল খানকা ঘরের বারান্দা থেকে হাঁক দিয়ে বলে, 'মাঝিপাড়ার কেটা রে?' জবাব শুনে সে এগিয়ে আসে এবং নিজের লোকদের হুকুম দেয়, 'বাঁচে কি-না সন্দেহ। বাড়িত লিয়া যা।'

ছাইহাটা থেকে করিম ডাক্তারের আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিলো। এতো কাছে তাদের হরেন ডাক্তার, কিন্তু তার কথা কেউ মুখেই আনতে পারলো না। বৈকুণ্ঠের অবিরাম প্যাচাল পাড়া শুনে কালাম মাঝি কটমট করে তার দিকে তাকায়, বলে, 'তুই শালা হামার ভাইসতাক ভুলায়া লিয়া গেছিলু তোকই ধরা লাগে।' কিন্তু আফসার কোনোমতে বলতে পারে, 'বৈকুণ্ঠদাক লিয়া গেছিলাম হামি। দাদা—।' কলুপাড়ার মানুষ ও মণ্ডলবাড়ির কামলারাও আফসারকে রক্ষা করতে বৈকুণ্ঠের চেষ্টার কথা বারবার বললে কালাম মাঝি চুপ করে এবং ডাক্তারের হাত ধরে কেঁদে ফেলে, 'হামার ভাইস্তা, হামার বেটার চায়াও বেশি। যত ট্যাকা লাগে খরচ করমু। কন তো টাউনের ডাক্তার লিয়া আসি।'

তমিজের বাপ এসে হাত ধরে বৈকুণ্ঠের, 'তুই হামার ঘরত চল।'

ডাক্তার আসার ঘণ্টাখানেক পর আফসার মারা গেলো। কাদের এসে পরামর্শ দেয়, পুলিস খবর পাওয়ার আগে লাশ দাফন করা ভালো, নইলে লাশ একবার থানায় গেলে, থানা হয়ে ফের টাউনে কাটাছেঁড়া হয়ে ফিরতে ফিরতে অন্তত এক সপ্তাহ। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে-যাওয়া লাশ পচে গলে যাবে। ফজরের নামাজের পরপরই আফসারকে কবর দেওয়া হলো মাঝিদের পুরনো গোরস্তানে। এতে শরাফত মণ্ডলের ঘোরতর আপত্তি ছিলো। কিন্তু অবস্থা এমন আর কালাম মাঝির জেদের কাছে কাদের যেভাবে নত হয়ে গেলো, তার আর করার কী আছে?

কুলসুম দূর্বাঘাস ছেঁচে দিলে তমিজের বাপ সেটা লাগিয়ে দেয় বৈকুণ্ঠের পড়ে-যাওয়া বুড়ো আঙুলের গোড়ায়। নিজের পুরনো শাড়ি ছিঁড়ে দেয় কুলসুম, তমিজের বাপ ঠিকমতো জড়াতে না পারলে কুলসুম বলে, 'লেও হছে। হামাক দাও।' কুলসুম বেশ পুরু করে কাপড় জড়ালেও তার রক্ত পড়া বন্ধ হয় না। তমিজের পুরনো লুঙি বৈকুণ্ঠের হাতে দিয়ে তমিজের বাপ বলে, 'তবনটা তোক পরায়া দেই। সারা গাওত তোর অক্ত।' কুলসুম হঠাৎ জিগ্যেস করে, 'দেখো তোমার জাত যাবি না তো?' তারপর ফের বলে, 'তোমার আক্কেলটা ক্যাংকা কও তো বাপু? আফসারকে তুমি লিয়া গেছো

কামারপাড়ার দিকে। আরে সেদিন তো কামারপাড়াত আগুন লাগালো, আফসারই আছিলো সোগলির আগে।'

বৈকুণ্ঠ এই কথার জবাব না দিয়ে জানায়, কামাররা বৈকুণ্ঠ গিরির গায়ে হাত তুলেছে, শালারা কোন বংশের মানুষকে জখম করলো টের পাবে! শালারা নির্বংশ হবে। তারপর সে কৈফিয়ৎ দেয়, আফসারকে সে যেতে মানাই করেছিলো। আফসার তাকে বলেছিলো, যুধিষ্ঠিরের মায়ের কাছে সে মাফ চাইবে। বেচারার একটার পর একটা বিপদ আসছিলো, খুব দমে গিয়েছিলো। তা পরিবার মাফ করলে স্বর্গ থেকে দশরথ কি আর রাগ পুষতে পারে?

তমিজের বাপ বলে, 'বৈকুণ্ঠ তুই চুপ কর।' সে একটু ভয় পেয়েছে। বৈকুণ্ঠকে মাঝিপাড়া থেকে তাড়াতাড়ি সরানো দরকার। বুধা একবার চিৎকার করে উঠেছে, 'শালা মালাউন একটাকো রাখা হবি না।'

জাত খোয়াবার ভয়ে কিংবা হাতের যন্ত্রণায় বৈকুণ্ঠ কিছুই খায় না। তমিজের বাপের মাচায় শুয়ে সে কোঁকায়, আবার কথাও বলে। মেঝেতে চেরাগ আলির বই নিয়ে কুপির আলোয় তমিজের বাপ কী কী দেখে। বৈকুণ্ঠ বলে, 'ফকিরের বই?'

কুলসুম বসে থাকে তমিজের ঘরে, কিন্তু একটু পরপরই উঁকি দিয়ে যায়। ভোরে মাঝিপাড়ার কাক ডাক শুনে তমিজের বাপ বাইরে গেলে কুলসুম বলে, 'দাদার বই তুমি লিয়া যাও।'

তমিজের বাপ অনেকক্ষণ পর ঘরে ফেরে। তার মুখ থমথমে। বলে, 'বৈকুণ্ঠ, তোক পার কর‍্যা দিয়া আসি রে।'

বৈকুণ্ঠ উঠে দাঁড়ালে কুলসুম ফের বই এগিয়ে দেয়। 'লিয়া যাও।'

তমিজের বাপ কিছুই বলে না। কিছুক্ষণ পর বিড়বিড় করে, 'বই কি আর থাকবি? পাকুড়গাছই বলে উটক্যা পাই না। বই তুই লিয়াই যা। এই বই হামরা রাখবার পারমু না রে বৈকুণ্ঠ!'

তমিজের বাপ বৈকুণ্ঠকে জড়িয়ে ধরে বাড়ির পেছন দিয়ে বেরুতে যাচ্ছে, কুলসুম 'খোয়াবনামা' এনে ধরলো তার সামনে, 'বই লিলা না? লেও।'

'না। ঐ বই লেওয়া যাবি না।'

কুলসুমের হঠাৎ রাগ হয়। এই বই থেকে বৈকুণ্ঠ তার নিজের কতো বানোয়াট ও আসল স্বপ্নের মানে জেনে নিয়েছে তার দাদার কাছে বসে। এমন কি ভবানী পাঠকের মতিগতি ও গতিবিধির খবরও তো জানতে এসেছে এই বই থেকেই। এখন সে এই বই নেবে না কেন? কুলসুম কি বোঝে না? এতো ঝামেলা যাচ্ছে, লোকটার জাতের ব্যারাম গেলো না। কুলসুম ভারী গলায় বলে, 'হামার দাদাক তুমি হেলা করলা?'

বৈকুণ্ঠ একটু দাঁড়ায়, ভরা চোখে কুলসুমকে দেখে, কোনো জবাব দেয় না।

একদিন পর কালাম মাঝি গোরু জবাই করে মেলা মানুষকে ভাত খাওয়ায়। কুদ্দুস মৌলবি এসে কোরান খতম করে। কালাম মাঝির পৃষ্ঠপোষকতায় জুম্মাঘরের সঙ্গে চালু-হওয়া মক্তবের ছোটো ছোটো তালেবেলেমদের চিকন গলার করুণ সুরে আল্লার কালাম বাজতে থাকে মাঝিপাড়া জুড়ে। কালাম মাঝির ওখানে গোরুর গোশত দিয়ে পেট পুরে ভাত খেয়ে কোরান শরিফের সুরে বিভোর কেরামত আলি হেঁটে যাচ্ছিলো তমিজের বাপের বাড়ির সামনে দিয়ে। কুলসুমকে দেখা যায় কি-না ভেবে সে এদিক

ওদিক চোখ ফেরায়। এমন সময় ডাক শোনে, 'শোনেন।'

আরে, দরজা খুলে তার সামনে দাঁড়ায় কুলসুম। হাত থেকে ফকির চেরাগ আলির বই কেরামতের দিকে এগিয়ে দেয়, 'দাদার বই না চাইছিলেন। লেন।'

কেরামত অভিভূত হয়ে যায়। চেরাগ আলির ছেঁড়াখোড়া বই হাতে পেয়ে এতোটাই অভিভূত হয় যে অভিভূত হওয়ার ক্ষমতাও তার লোপ পায়। কী বলবে কীভাবে বলবে ভাবতে ভাবতে দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে কুলসুম নাই, দরজাটাও তার বন্ধ।

আলিম মাস্টারের ঘরে ঢুকেই কেরামত এক গাল হাসে। তার মাথায় এখন পদ্য আর পদ্য। চেরাগ আলির বই হাতে এলো, আর ভাবনা নাই। গান্ধি জিন্নার মিলন নিয়ে পদ্যের কথা ভাবতে ভাবতে বলে, 'মাস্টারসাহেব, ঐদিন ইসমাইল সাহেব তেভাগার নেতাক লিয়া আসিছিলো, অজয়বাবু, কী সোন্দর কথা কয়া গেলো, শুনিছিলেন? গান্ধি জিন্নার মিলন চাই, হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই। এখন এইরকম কথার খুব দরকার।'

'আরে দূর মিয়া!' অজয় দত্তের কথায় আলিম মাস্টারের কোনো উৎসাহ নাই, 'এ্যাদ্দিন পরে ওরা কয় গান্ধি জিন্নাক একত্তর হবার। দুইজনে আলাদা থ্যাকা যে জুলুমটা চালাচ্ছে, একত্তর হলে দ্যাশের মানুষ একটাকও বাঁচবার দিবি না। তেভাগার মানুষ হয়া অজয় দত্ত হিন্দু মুসলমান মিল করাবার আর মানুষ পায় না? মাথা পাতে গান্ধি আর জিন্নার কাছে?'

এসব কথা কেরামতের কানে যায় না। কাগজ পেনসিল নিয়ে সে সামনে রাখে চেরাগ আলির বই। মাঝিপাড়ায় উত্তেজনার খবর পেয়ে পরদিন ইসমাইল হোসেন ফের আসে। এবার তার সঙ্গে অজয় ও তার বোন নাই, সে এসেছে কংগ্রেসের সুরেন সেনগুপ্তকে নিয়ে। হঠাৎ করে দুইজন এম এল এ গ্রামে আসায় আমতলি থানার দারোগাও হাজির হয়, টাউন থেকে এসেছে একজন সার্কেল অফিসার। মাঝিপাড়া বা কামারপাড়া কোথাও যাবার দরকার হয় না তাদের। সুরেনবাবুকে নিয়ে ইসমাইল সোজা ঢোকে কালাম মাঝির দোকানে। সুরেনবাবু কালাম মাঝিকে জড়িয়ে ধরলে লোকটা কান্নায় ভেঙে পড়ে, 'বাবু, আফসার হামার ভাইসতা লয়, হামার বেটা, হামার বেটাই কবার পারেন তাক।' বৈকুণ্ঠকেও ডাকা হয়, তবে সে তার পূর্বপুরুষের ইতিহাস বলার সুযোগ পায় না। সুরেনবাবু মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনে তাকেও জড়িয়ে ধরে, তারও চোখ ছলছল করে। কালাম মাঝির শোক একটু থিতিয়ে এলে সে তোলে বিলের ইজারা দেওয়ার কথা। সুরেন সেনগুপ্ত বলে, মাঝিদের হক মেরে অন্য পেশার মানুষকে বিল ইজারা দেওয়া ঠিক হয় নি। তবে জমিদারের কাছ থেকেও শোনা দরকার। কিন্তু ইসমাইল ওয়াদা করে, জমিদারকে অনুরোধ করে, দরকার হলে সরকারি চাপ প্রয়োগ করে এ বছর থেকেই বিল মাঝিদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

কালাম মাঝি এর মধ্যেই গোলাবাড়ি হাটে মাঝিদের মস্ত সমাবেশের আয়োজন করে ফেলেছে। মুকুন্দ সাহার দোকানের বারান্দা উঁচু বলে সেখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে সুরেন সেনগুপ্ত আর ইসমাইল হোসেন। পালপাড়াও ভেঙে পড়েছে সুরেনবাবুকে দেখতে। ছোটোখাটো দেখতে খাটো ধুতি ও খালি গায়ে পাতলা একটা চাদর জড়ানো সুরেনবাবু হিন্দু মুসলমান মিলন নিয়ে এমন মিষ্টি করে, এতো সহজ করে বলে যে, লোকজন মুগ্ধ হয়ে শোনে। ইসমাইলের বক্তৃতার পর দুজনে টাউনে ফিরে গেলে গান ধরলো কেরামত আলি। চেরাগ আলির বইটা পাওয়ার পরই তার গানের স্রোত এসে গেছে। সবাইকে ঝুঁকে সালাম করে সে শুরু করে :

বিসমিল্লা বলিয়া শুরু করে কেরামত। ভারতবর্ষে কায়েম হবে ইনসাফি হুকমত॥
প্রথম বলি নিরঞ্জন সংসারের সার। দ্বিতীয় বলি যম রাজা করিবে সংসার॥
শিঙা হাতে ইসরাফিলে যখন দিবে ফুঁক। থাকবে না দালান কৌঠা থাকবে না তালুক॥
দরবেশ সাধুর মন্ত্র নিতে কেহ ভুইলো না। লীগ কংগ্রেসের হিংসা কেন গেলো না॥

লোকজন খুশিতে হৈ হৈ করে ওঠে। বিপুল করতালিতে কেরামতের কণ্ঠ চাপা পড়ে। আলিম মাস্টার হঠাৎ দাঁড়িয়ে ধমক দেয়, 'আরে চুপ করেন না।' কেরামত ফের শুরু করে,

নমরুদে রাখিত হিংসা ইব্রাহিমের পর। বেহেস্ত করিল তোয়ের নমরুদ বব্বর॥
কোথায় গেলো নমরুদ কোথায় তাহার আমিরানা। লীগ কংগ্রেসের হিংসা কেন গেলো না॥
মুসলিম লীগে ভারতবর্ষে যাহা দাবি করে। পাকিস্তান করিবে তারা লেয্য অধিকারে॥
কংগ্রেসিরা বলে তাহা নাহি দিব ছাড়ি। এই বলিয়া দুইটি পাত্তি করে মারামারি॥
কাঁচা ফলে কিল মারিয়া নষ্ট করলো বেদানা। লীগ কংগ্রেসের হিংসা কেন গেল না॥
লীগ কংগ্রেসের চারি নেতা পাইলো নিমন্তন। আনন্দিত হইয়া করে লন্ডনে গমন॥
মহামান্য লীগের নেতা কায়েদে আজম। লিকচারে লন্ডন সভা করিল গরম॥
লিয়াকত আলী খান সঙ্গে গেলো তার। লর্ড ওয়াভেল বটে ভারত সরকার॥
বলদেও সিং বটে কংগ্রেসের একজন। জহরলাল পণ্ডিত সহ এই পাঁচজন॥
লন্ডন শহরে গিয়া লাভমুনাফা হইলো না। লীগ কংগ্রেসের মিলন কেন হইলো না॥
চিরযুগের দুক্ষি মোরা হিন্দু মোসলমান। স্বাধীন পাবো আশা করি হতেছি বিরান॥
এই দেশ আমার এই দেশ তোমার গণ্ডগোল আর কইরো না।
লীগ কংগ্রেসের হিংসা কেন গেলো না॥
কেরামত আলীতে বলে স্বজাতির কাছে। ভালো মনে বোঝো ভাগ্যে কিবা তোমার আছে॥
দুধ বেচিয়া তামুক কিনি শরীল কৈলা ক্ষয়। বুঝিয়া দেখহ মানুষ কেরামত কী কয়
স্বাধীন পাবো আশা করি সকল জাতে দেওয়ানা। লীগ কংগ্রেসের হিংসা কেন গেলো না॥

গান শুনে মানুষের হর্ষধ্বনি উপচে পড়ে তাদের গলার ওপর দিয়ে। অনেকে মুখে তার গানের ধুয়াটা গাইতে থাকে। অভিভূত কেরামত আলি তার ঝোলা থেকে চেরাগ আলির বইটা নিয়ে মাথায় ঠেকায়। আবদুল কাদের তাকে ডেকে নেয় দোকানের ভেতর, 'কালই তুই চল টাউনেত। ইসমাইল ভাই এই গান দেখ্যা খুব খুশি হবি। পাকিস্তানের কথা আছে। আবার অজয়বাবুরাও দেখবি, লীগ কংগ্রেসের মিলনের কথা আছে। তারাও খুশি হবি। চল, কালই চল।'

আজিজ বাইরে ডেকে নেয় কেরামতকে, 'তোমার গান বাপু খুব ভালো হছে। তুমি তমিজের বাপকে নিয়া একদিন টাউনে আমার বাড়ি আসো। বাবরের মায়ের অসুখ তো কমে না। এতো খরচপাতি করলাম, ফল নাই।' একটু চাপা স্বরে বলে, 'কাদের ইগলান ফকির্যালি কথা শুনবার পায় না। আমার মামাশ্বশুর আলেম মানুষ, তমিজের বাপের সাথে কথা বলে ঐ বইটা দেখে যদি— ।'

'তমিজের বাপের দরকার কী?' কেরামত বেশ জোরের সঙ্গে তমিজের বাপকে প্রত্যাখ্যান করে, 'তার জারিজুরি সব তো হামার কাছে।'

'কেমন?'

'তার দাদাশ্বশুর চেরাগ আলির বই তো হামার কাছে। একদিন তার বৌ কলো, কবি, হামার স্বামী জাহেল মানুষ, এই বইয়ের বোঝে কী? বই আপনে লিয়া যান, দশের কামেত আসবি।'

'বই তোমার কাছে? চেরাগ আলির বই তুমি জোগাড় করিছো?' আজিজ উত্তেজিত হয়ে বলে, 'সত্যি?' কেরামত সামনে ধরলে বইটা সে তুলে নেয় নিজের হাতে। কেরামত তার গৌরবের কথা বলেই চলে আর ছেঁড়া বইটার পাতা ওলটায় আজিজ। কেরামতের কথায় বিরতি পড়লে সে বলে, 'বই এখন আমার কাছে থাক। আমার মামাশ্বশুরকে কালই পড়তে দেবো। আলেম মানুষ, বড়ো মওলানা, খালি বড়ো বড়ো কেতাব নিয়ে থাকে।'

'ঐ বই তো আমার খুব দরকার ভাইজান।' কেরামত মিনতি করে, 'তমিজের বাপের বৌ তো আমাক কিছুতেই দিবার চায় না। অনেক কষ্ট কর্যা আনিছি। বই তো তাক ফেরত দেওয়া লাগবি।'

'আমার কাছে থাকা যা, তোমার কাছেও থাকাও তো তাই', চেরাগ আলি ফকিরের বই নিজের ব্যাগে ভরতে ভরতে আজিজ বলে, 'আমার মামাশ্বশুরকে একবার দেখাবো। আলেম মানুষ। খালি পানিপড়া আর তাবিজ দিয়াই তার মাসের রোজগার শও টাকার উপরে। এই বই তিনিই বুঝবেন।' কেরামতের হাতে দশ টাকার একটি নোট দিয়ে আজিজ বলে, 'তোমার ঐ গানের বই ছাপায়া ফালাও। এই টাকাতেই হবে তো?' কেরামত টাকাটা হাতে নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকলে আবদুল আজিজ কাদেরের দোকানে ঢুকতে ঢুকতে বলে, 'তোমার গানের বই ছাপালে আমাকে দুই কপি দিও। মনে করে দিও কিন্তু।'

৩৯

টাউনের বড়ো রাস্তা জুড়ে লাল নীল সবুজ বেগুনি হলুদ রঙের কাগজের তেকোণা নিশান টাঙানো মাথার ওপরে; বাড়িঘরের ছাদে কাপড়ের নিশান, সাদা চাঁদ তারা হাসছে সবুজ রঙের জমিতে। মানুষ খুশিতে টইটম্বুর। খুশি তো তমিজও, তার ট্যাকে দুই টাকা বারো আনা পয়সা। জেল থেকে খালাস দেওয়ার সময় জেলের ছোটোবাবু একটা কাগজে তার টিপসই নিয়ে বললো, 'সরকার থেকে রাহাখরচ বাবদ তোমাকে দেওয়া হলো।' তা সেই বাবুটিও খুশি, 'কাল স্বাধীনতা ঘোষণা করা হবে। এই উপলক্ষে কিছু কয়েদিকে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই খালাস করার হুকুম পাওয়া গেছে। ইসমাইল হোসেন সাহেব ডি এমকে বলে তোমার নাম পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেও।'

কিন্তু ইসমাইল সাহেবের বাড়িতে যা ভিড়! ভালো ভালো কাপড়পরা মানুষের মধ্যে অবশ্য গ্রামের মাতব্বর মানুষও কিছু কিছু আছে। কিন্তু তমিজের চেনা কাউকে পাওয়া গেলো না। ঐ বাড়িতে তমিজ ঢোকে কোন সাহসে?

রেল স্টেশনের কাছে পুরো তিন আনা পয়সা খরচ করে ভাত আর গোরুর গোশত খেয়ে স্টেশনের পাকা মেঝেতে শুয়েই ঘুমে তমিজের চোখ জড়িয়ে আসে। কিন্তু ভোর হবার অনেক আগে অনেকগুলো ট্রেনের হুইসেল বেজে উঠলে সে জেগে ওঠে। লোকজন সব ছুটছে বড়ো রাস্তার দিকে। সকাল হলে দোকানপাট খুললে বাজানের জন্যে একটা লুঙি আর কুলসুমের জন্যে রুটি বেলার চাকি বেলুন কিনতো তমিজ। কুলসুম রুটি খেতে চায় খুব, রুটি নাকি বানাতেও শিখেছে মণ্ডলবাড়িতে। কিন্তু দোকানপাট তো আর খোলে না। রাস্তায় মানুষ গিজগিজ করে। থানার কাছে আকবরিয়া হোটেলের সামনে সে কয়েকবার ঘুরঘুর করে, পোলাও, গোশত, পরোটার কী সুন্দর ঘেরান। কিন্তু ভেতরে ঢোকার সাহস তার হয না। কল্পনা সিনেমার পাশের গলিতে উড়ে ঠাকুরের দোকানেও পাজামা পাঞ্জাবি, ধুতি শার্ট, ধুতি পাঞ্জাবিপরা লোকদের ভিড় দেখে সেখানেও তার ঢোকা হলো না। সিনেমা হলের সামনে দুই পয়সার বাদাম ভাজা কিনতে কিনতে জিগ্যেস করলে জানতে পায়, আজ তো সব বন্ধ। এখুনি মিছিল বেরুবে।

তা বাপু মিছিলও বেরোলো একখান! মানুষে মানুষে সয়লাব। মিছিলের মধ্যে নাই কী?—হুড-খোলা মোটরগাড়িই তো গোটা দুয়েক। একটা গাড়িতে সায়েবদের পোশাকপরা কয়েকটা ছেলে সায়েব সেজে ভারতবাসীর কাছে বিদায় চাইছে, 'হামরা ডুইশো বছর টোমাডের শাসন করিয়াছে। এখন আবার নিজেডের ডেশে ফিরিয়া যাইটেছি।' লোকজন তাদের অঙ্গভঙ্গি দেখে হেসেই অস্থির। মিছিলের মাঝখানে অনেকটা জায়গা জুড়ে পুলিসের মতো ঢাকনি-দেওয়া পকেটওয়ালা শার্ট পরে পুলিসের মতো সমান তালে পা ফেলতে ফেলতে চলছে কয়েকজন জোয়ান ছেলে। তমিজের পাশের লোকটি বলে, 'পাকিস্তান ন্যাশনাল গার্ড।' আরে এদের সঙ্গে তো আবদুল কাদেরকেও দেখা যাচ্ছে। কাদের ভাই কি পুলিসে নাম লেখালো? কাদের পুলিসে যদি বছরখানেক আগে ঢোকে তো তমিজের এই হেনস্থাটা হতো না। কয়েকটা টমটমে পাকিস্তানের নিশান হাতে নিয়ে কয়েকজন খুব জোরে জোরে স্লোগান দেয়, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ।' খোলা গোরুর গাড়িতে কয়েকটা ছেলে হেলেদুলে নাচে আর রাস্তার দুই পাশের মানুষকে সালাম দেয়। মিছিল এগিয়ে চলে। এরপর আসে মস্ত উঁচু একটা হাতি। হাতির ওপর উল্টো করে রাখা তক্তপোষ , তার চার পায়ায় পাকিস্তানের চারটে নিশান। মাঝখানে গদির ওপরে বসে রয়েছে কয়েকজন। আরে ঐ তো ইসমাইল হোসেন। কিন্তু এই ভিড় ঠেলে তমিজ কি আর ইসমাইলের হাতির কাছাকাছিও যেতে পারবে? তবু না হয় একটু চেষ্টা করা যেতো। কিন্তু এই সময় থানার মোড়ে হঠাৎ সোরগোল ওঠে।—কী গো?—আঠারো বিশ বছরের একটা ছেলে, লুঙি আর গেঞ্জিপরা, আটকা পড়েছে উঁচু লাইট পোস্টে। লোকটা আঁ আঁ করে চিৎকার করছে আর হাতের মুঠিতে ধরা পাকিস্তানের নিশান, নিশানটা সবচেয়ে উঁচুতে টাঙাবে বলে সে উঠে পড়েছে বিজলি বাতির পোলে। নিচে থেকে সবাই চ্যাচায়, 'আরে পিছনের দোতলায় লাফায়া পড়ো', 'নিচে লাফ দাও।' সবার পরামর্শ ও অনুরোধ অগ্রাহ্য করে ছেলেটা পড়ে যায় রাস্তায়। তবে তাকে জায়গা দিতে ঐ জায়গাটুকুর লোকজন ভিড়ের চাপ সহ্য করেও সরে গিয়েছিলো। খোয়া বিছানো রাস্তায় পড়ে ছেলেটা মাথা ফাটিয়ে ফেলেছে। নিশানটা সে ছাড়ে নি, তার গায়ের রক্তে নিশানের সবুজ ও সাদা জায়গার অনেকটা ফুটে ওঠে লাল টকটকে রঙে।

ছেলেটির লাশ নিয়ে কয়েকজন লোক থানার ভেতর চলে গেলে মিছিল এগিয়ে চললো সামনের দিকে। রেল লাইন পার হয়ে ঝাউতলা না বাদুড়তলা কি বলে,—টাউনের জায়গাগুলোর নাম তমিজের মনে থাকে না,—মিছিল চলে যায় সেই দিকে। তমিজের আর এগুনো হয় না। নিশান অনেক উঁচুতে ওঠাতে গিয়ে ছেলেটি মরলো, নিশানটিকেও ছাপিয়ে দিলো লাল রঙে। এটা কেমন হলো গো?—জেলখানায় তার সঙ্গে খাতির হয়েছিলো লাল নিশানের কয়েকটা মানুষের সঙ্গে। বড়ো ভালো ভালো মানুষ গো। বলতো, জোতদারি জমিদারি আর মহাজনি যদি থেকেই যায় তো পাকিস্তান বলো আর স্বাধীনতা বলো, এসবের মানে হয় না। এই মিছিলে এসে তমিজ বুঝতে পারে পাকিস্তানে তেভাগা তো হবেই। এতোগুলো মানুষ কি আর বেকুব নাকি? পাকিস্তানের নিশান ওড়াতে বিজলির ধাক্কায় মানুষটা মরলো, সে তো তমিজের মতোই গরিব গরবা মানুষ। সে কি এমনি এমনি নিশান ওড়াতে উঠেছিলো? তমিজ ভরা গলায় শ্লোগানের জবাব দেয়, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'কায়েদ আজম জিন্দাবাদ'।

আকাশে মেঘ দেখে কুলসুম উঠানের ডালপাতা সব উঠিয়ে রাখছিলো তমিজের ঘরে। তমিজকে দেখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তমিজ সামনে গিয়ে বলে, 'ভালো আছো?' কুলসুম কিছু না বললে সে ফের বলে, 'কাল খালাস পালাম।'

কুলসুম শাড়ির আঁচলে নিজের মুখ ঢাকে। তমিজ অবাক হয়ে দেখে। কুলসুমকে তো সে এভাবে কখনো কাঁদতে দেখেনি। এটা দেখে তার নিজের চোখও ভারি হয়ে ওঠে। হয়তো সেটা সামলাতেই তমিজ জিগ্যেস করে, 'বাপজান কোটে?'

তমিজের গলার স্বর ভারী, কথাবার্তা ধীরস্থির। চোখ মুছে তার দিকে তাকিয়ে কুলসুম জোরে জোরে নিশ্বাস নেয়। ছোঁড়াটার গায়ের গন্ধও পাল্টে গেছে। অনেকক্ষণ পর কুলসুম বলে, 'শুক্যা গেছো। গাওত গোশত নাই।'

জেলখানায় নিয়মিত খেয়ে তমিজ বরং একটু মোটাই হয়েছে। কুলসুমের কথা মেনে নেওয়ার ভঙ্গি করে সে হাসে, 'খিদা নাগিছে। ভাত চড়াও।'

তমিজ খেতে বসলে শুরু হয় কুলসুমের অবিরাম কথা। তমিজের বাপ আজকাল ঘরেই থাকে না, দিনরাত ঘুরে বেড়ায় বিলের উত্তর সিথানে। কয়েক দিন পর পর কালাম মাঝির কাছ থেকে সে টাকা নিয়ে আসে, এই বাড়িঘর তার কাছে বেচেই দিলো কি-না কে জানে? কালাম মাঝি আজকাল খুব বড়ো মানুষ, বিলে মাঝিদের হক নাকি সে আদায় করে ছাড়বে।—তা কথা তো ঠিকই, তমিজও জানে পাকিস্তানে সবার হক ঠিকই আদায় হবে। অনেক রাত পর্যন্ত কুলসুম কথা বলে এবং এক বছরের বৃত্তান্ত সবই বয়ান করে।

ঘুমাতে নিজের ঘরে ঢুকে তমিজ দেখে ঘরের চাল একেবারে পাতলা। মেঝে ভর্তি পাতা আর গাছের ডাল। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, ঘরের মেঝে কাদাকাদা। একটা বছর জেলখানায় পাকা ঘরে থেকে অভ্যাস অন্যরকম হয়ে গেছে তার। তবে নিজের মাচায় পিঠ ঠেকাতেই কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোরবেলা দুই পা ভরা কাদা নিয়ে ঘরে ফেরে তমিজের বাপ। আর একটু বেলা হলে তমিজ তার ঘরে এসে দুটো টাকা তুলে দেয় বাপের হাতে, 'জেলখানা থ্যাকা বারাবার সময় দিলো।'

তমিজের বাপের চোখ থেকে ঘুম ঝরে পরে,'সোম্বাদ শুনিছিস?'

'কালাম ভায়ের কাছ থ্যাকা ট্যাকা লিয়া ঘরখান বেচিছো।'

'বেচমু কিসক? বন্দক দিছি। কী করমু, তোর মামলার খরচ দেওয়া লাগে। তো সোম্বাদ সিটা লয়।'

'আফসার চাচার খবর? শুনিছি। যুধিষ্ঠিরের বাপের খবর শুনিছি আগেই।'

'আরে না। খবর সিটা লয়। সব্বোনাশ হয় গেছে।'

'বৈকুণ্ঠদার হাতের আঙুল—।'

'আরে দূর। সব্বোনাশ হছে। বিলের উত্তর সিথানত পাকুড়গাছ খুঁজ্যা পাই না। পাকুড়গাছ নাই।'

'নাই। গাছ কাটিছে।' তমিজের কাছে এ তো সোজা হিসাব, 'মণ্ডলরা ইঁটখোলা করলো না?'

'মুনসির গাছ কাটা অতোই সোজা? কার হাতোত এংকা জোর আছে রে?'

'মুনসি গাছেত চড়্যা উড়াল দিছে।' বেপরোয়া হয়ে বললেও তমিজের একটু ভাবনা হয়, 'গাছ মনে হয় ক্যাটাই ফালাছে, দিশা পায় নাই।' তবে এই নিয়ে কথা বলার মতো সময় কোথায় তার? 'দেখি, কামকাজ তো কিছু দেখা লাগে।'

তমিজকে দেখেই ফুলজান হাউমাউ করে এক পশলা কাঁদে, 'তুমি আসিছো গো মাঝির বেটা? হামার বেটাক তুমি ডাক্তোরের কাছে লিয়া গেলা না গো? এখন হামার বেটা নাই, তুমি অ্যাসা আর কী করবা?'

ফুলজানের বেটার মরার খবর তমিজ পেয়েছে কুলসুমের কাছে। ফুলজানের পুত্রশোক অবশ্য কুলসুমের প্রধান বিবেচনা নয়। সে বলছিলো, 'বেটাটাক তো মাগী খালো। ভাতারও আসে না। ঘেগি মাগী এখন লিকা বসবি কার সাথে?' কুলসুমের এইসব দুশ্চিন্তা শোনার পর থেকেই তমিজের খুব ইচ্ছা হয়, ফুলজানের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

ফুলজানের মা মেয়েকে ধমক দেয়, 'লে বাপু হছে। জাত নাই বিচার নাই, মানুষ দেখলেই কান্দন আরম্ভ হলো!' তারপর সে নিজেই শুরু করে তার স্বামী হুরমতুল্লার গপ্পো। বুড়া তো জমি ছাড়া কিছু বোঝে না কিন্তু সারাটা জীবন তার কাটলো বর্গাচাষ করে। এবার মণ্ডলের আরো জমি বর্গা পেয়েছে, এখন আউশ কাটার মানুষ পাওয়া মুশকিল। মজুরি বেড়ে গেছে, খিয়ারে আরো বেশি মজুরির লোভে লোকজন অনেকেই গ্রামছাড়া। কিছু কিছু জমিতে আউশ কাটা হয়েছে, সেখানে আমন বোনার পাঁয়তারা কষছে বুড়া। এদিকে নিজের জমিতে কি বুনবে না বুনবে এখনো ঠিক করতে পারছে না। মণ্ডলের জমিতেই দিনরাত খাটে, নিজের জমির যত্ন নেয় কম।

যে জমিতেই হোক, হুরমতুল্লার ফসল কাটা আর ফসল বোনার গুঞ্জনে তমিজের সারা শরীরেই কোলাহল ওঠে : সেই কুয়াশায় পাকা আমনের জমির পাশে ফুলজানের সঙ্গে কাটানো। ফুলজানকে জড়িয়ে ধরতে না লাঙল ধরতে, না-কি দুটোর তাগিদেই তার হাত নিশপিশ করে বোঝা মুশকিল।

মোষের দিঘির পূর্ব ঢালের নিচে থেকে সন্ন্যাসীর ভিটার উত্তর সীমা প্রায় চার বিঘা জমি মণ্ডল নতুন পত্তন নিয়েছে। 'ক্যা গো বুড়ার বেটা, চিনবার পারো?' দিঘির ঢালে জমিতে মই দিতে দিতে হুরমতুল্লা জবাব দেয় তমিজের দিকে না তাকিয়েই, 'না চেনার কি হলো? জেল খাটা কয়েদি, চিন্যা তো রাখাই লাগে।'

তমিজের চোখমুখ গরম হলেও নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে, 'জেলেত পাঠালা তো

তোমরাই। মণ্ডলের চাকর। মণ্ডল হুকুম দিছে, তোমরা নাঠি লিয়া গেলা। উগলান দিন শ্যাষ। কাৎলাহার তো আর রাখবার পারিচ্ছে না। মাঝিগোরে বিল, মাঝিরাই পাবি।'

এবার হুরমতুল্লা একটু ঘাবড়ায়, ছোঁড়ার তেজ তো আরো বেড়েছে! একবার জেলের ভাত খেয়ে এসেছে, এদের কোনো বিশ্বাস আছে? হুরমতুল্লার ভয়-পাওয়া বুঝতে পেরে তমিজ প্রস্তাব করে, 'জমি তো শুনলাম মেলা বর্গা লিছো।কামলা লাগলে কয়ো।'

মইয়ের ওপর শমশের পরামণিকের ভাগ্নেকে উঠিয়ে দিয়ে হুরমতুল্লা বলে, 'মণ্ডল তো তোক জমি বর্গা দিবি না। এখন তারই জমিত যদি তোক কামলা লেই তো তাঁই কোদ্দ করে যদি?'

'উগলান ভয় এখন মাচাত তুল্যা রাখো। শোনো, মণ্ডলের বেটা ঘোরে ইসমাইল সাহেবের পাছে পাছে। ইসমাইল হোসেনের নাম শুনিছো?'

'ভোট দিলাম না?'

'হুঁ, ভোট দিয়া তাক কাউন্সিলে পাঠাছো না? ঐ মানুষ নিজে মটোর লিয়া জেলখানাত যায়া হামাক খালাস কর্যা আনিছে। এখন বোঝো! তুমি জমি বর্গা লিছো, হামি জমিত খাটমু, পয়সা দিবা। মণ্ডলের কী?'

হুরমতুল্লার আউশ কাটলো সে মজুরি নিয়ে। কিন্তু প্রায় পাশাপাশি আমনের জমি তৈরি করতে কামলা দেওয়ার শর্তে তমিজ একটু অন্যরকম করতে চায়। মজুরি দিলে চলতি হারেই দেবে। কিন্তু হুরমতুল্লা ইচ্ছা করলে অন্যভাবেও দিতে পারে। ধান উঠলে মণ্ডলের গোলায় তুলে হুরমতুল্লা বর্গাচাষী হিসাবে যা পাবে তার একটা ভাগ দেবে তমিজকে।—এটা কেমন কথা?—তমিজ জোর দিয়ে বলে, 'ততোদিনে তেভাগা হয়া যাচ্ছে। জোতদার পাবি এক ভাগ, তোমার ভাগ দুইটা। তার দুই আনিও যদি হামাক দাও তো তোমার কতো ধান থাকে হিসাব করিছো?'

হুরমতুল্লা ব্যাপারটা ঠিক বোঝে না। আবার নিজে দুই ভাগ পাবে—এই ভরসায় তমিজের প্রস্তাব মেনে নিতেও তার আপত্তি নাই। হ্যাঁ না কিছুই না করে বলে, 'দেখা যাক। কাম কর তো।'

ছোঁড়াটার কাম তার খুব পছন্দ। দেখো না, একে মাঝির বেটা, তাতে আবার এক বছর ছিলো জেলে, ধানের জমি চোখেও দেখেনি তখন। অথচ তার আমন বোনার হাতটা দেখে। চারা লাগায় এমন সোজা সারিতে যে তাই দেখতে দেখতে হুরমতুল্লার সারিগুলো আরো এলোমেলো হয়ে যায়। আবার ছোঁড়াটা আসার পর ফুলজানও জমিতে আসতে শুরু করেছে। মাঝখানে কেরামতের ধমকে এদিকে ভিড়তে সাহস করে নি। শালা জামাই একটা!—মাসের পর মাস উধাও হয়ে হাটেবাজারে ঘুরে বেড়ায়, এর বাড়িতে ওর ঘরে গিয়ে থাকে, আবার একেক দিন হুমকি ছেড়ে যায়, মেয়েমানুষ আবার জমিতে যাবে কেন?—ঐ জামাইকে পরোয়া করার দরকারটা কী?

আমনের শীষে দুধ আসতে শুরু করেছে, তমিজ এখন রাত্রিবেলায় এসেও জমি দেখে যায়। ফুলজান অকারণে খবরদারি করে। হুরমতুল্লা মেয়ের ওপর বিরক্ত হয় : তমিজকে কাজ অতোটা না দেখালেও তো তার চলে। সে পারে না কোন কাজটা? তবে হাজার বাঁকাচোরা কথা বললেও জমিতে তমিজ থাকলে ফুলজানের মেজাজটা থাকে ভালো।

হাটে তমিজের সঙ্গে দেখা হলে কেরামত তার সঙ্গে খুব গল্প করে। জেলখানায় তেভাগার যেসব নেতার সঙ্গে তমিজের আলাপ হয়েছে, আরে তারা সবাই তো

কেরামতের বন্ধুমানুষ। তার বাঁধা গান শুনেই তো চাষারা রুখে দাঁড়িয়েছিলো। তেভাগা তো হয়েই যাচ্ছে, কেরামতের তখন কদর আরো বাড়বে। কেরামতের বেশির ভাগ কথা তমিজ যে বিশ্বাস করে তা নয়, আবার সেসবকে মিছে কথা বলেও মনে হয় না। গানও বাঁধে সে ভালো। পাকিস্তান হয়ে পড়ায় তার 'লীগ কংগ্রেসের হিংসা কেন গেলো না' বইটার বিক্রি পড়ে গেছে। ইসমাইলের কথায় সে এখন 'নয়া ওয়াতন পাকিস্তান' নামে একটা গান বাঁধার কথা খুব ভাবছে। ঠিক জুত হচ্ছে না।

মানুষটা এমনিতে তো ভালোই। কিন্তু ফুলজানের সঙ্গে সে এমন করে কেন? ফুলজানকে কেরামতের কথা একদিন জিগ্যেস করতেও চেয়েছিলো তমিজ। আজ বলি কাল বলি করতে করতে মেলা দিন হয়ে গেলো। ধানের শীষ ততোদিনে বেশ জমে এসেছে। এবার শীত পড়ছে একটু তাড়াতাড়ি, ধানের কি হয় কে জানে—এই ভাবতে ভাবতে মোষের দিঘির পুবের জমিতে নিড়ানি দিচ্ছে, এমন সময় হুরমতুল্লার বাড়ি থেকে মেয়েলি গলায় সমবেত কান্না শুনতে পেয়ে তমিজ সেদিকে ছোটে।

গফুর কলু এসেছে তার বৌকে নিয়ে। আবিতনের হাতের কাগজটা নিয়েই এতো কান্নাকাটি। পড়তে না পারলেও গম্ভীর মুখে হুরমতুল্লা কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখে। তার হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে তমিজও দেখলো। তবে কাগজে লেখা বিষয়টি বলেছে আবিতন নিজেই। হুরমতুল্লা মেয়েকে ধমক দেয়, 'কুত্তার বাচ্চাটা থাকার চায়া না থাকাই তো ভালো। তালাক দিছে, হামাগোরে শনি বিদায় হলো। আপদ গেলো।'

মাচায় শুয়ে ফুলজানকে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে দেখে তমিজের কষ্ট হয়। কেরামত আলি তালাক দিলে ফুলজানের এতো ভেঙে পড়ার কী হলো? তো ফুলজানের দুঃখ দেখেই সে কষ্ট পায় কি-না তাই বা কে জানে? জমিতে ফিরে গিয়ে তমিজের নিড়ানি দেওয়া সেদিন ভালো হয় না। এই ফুলজানই তো তমিজকে কয়েকবার বলেছে, কেরামত বাইরে এতো ভালো সাজলে কী হয়, ওটা কোনো মানুষের পয়দা নয়। শালা একটা শয়তানের বাচ্চা। ফুলজান বলেছে, শয়তানটা তাকে ইচ্ছা করেই তালাক দেয় না। হুরমতুল্লার তিন মেয়ে ছাড়া আর কে আছে? তার জমি যা আছে সব পাবে তো তার মেয়েরাই। শয়তানটা জমির লোভেই ফুলজানকে তালাক দিচ্ছে না। শরিয়তে নিয়ম থাকলে তালাকনামা পাঠাতো ফুলজানই।—তা এখন বাপু তালাক পেয়ে অমন কাঁদো কেন? কেরামতেরও কি জমির মায়া ছিলো? এখন ফুলজানের ভাগের জমিটা পাবে যে তাকে বিয়ে করবে সে-ই তো? তমিজকে বিয়ে করতে ফুলজানের এখন আর আপত্তি কি থাকতে পারে। তমিজ বরং ফুলজানের জমি আরো কতো বাড়িয়ে দিতে পারে। ফুলজানকে বিয়ে করলে, বেশি না, কেবল তার জমিটুকুও যদি হুরমতুল্লা তাকে দেয় তো তিন বছরের ফসল বেচে তমিজ নিজের বাড়ির পালানটা কিনে ফেলতে পারে শরাফতের কাছ থেকে। তার আগে কালাম মাঝিকে টাকা শোধ করে উদ্ধার করতে হবে তার ঘর আর ভিটা। মোষের দিঘির পুবের জমিটা তো পত্তন নিলো হুরমতুল্লা, পশ্চিমের জমি নেবে তমিজ। জমিদারি তো উঠেই যাচ্ছে, তখন জমিদারদের এইসব খাস জমি পাবে তো তারাই। তখন জমিতে নামো, লাঙল বাও আর ফসল তোলো। ফুলজানকে জমিতে অতোটা না খাটলেও চলবে। চাষবাস নিয়ে সে যদি তমিজকে একটা মুখ ঝামটা দেয় তো তাতেই ফসল যা হবে তাই খাবে কে? এক দাগে ছয় বিঘা জমির মালিক হতে তার তিন বছরও লাগবে না।

একদিন অনেক রাতে বৈকুণ্ঠ আসে তমিজের বাপের হাত ধরে। তমিজও তখন কেবল ফিরেছে। বৈকুণ্ঠ বলে, 'তোর বাপ নিন্দের মধ্যে পাকুড়তলাত ঘুরিচ্ছিলো। হামাক চিনবার পারলো না। ধর‍্যা লিয়া আলাম।' মাচায় শুয়ে তমিজের বাপ তার ঘুম অব্যাহত রাখে। বৈকুণ্ঠ বলে, 'তমিজ, তোর বাপোক দেখ্যা রাখিস। আজ ক্যামা মুনসির ডাক শুনলাম রে। পাকুড়গাছ তো নাই, মুনসি কোটে বস্যা ডাক পাড়ে দিশা পাই না।'

তমিজ বলে, 'বাজানেক ধরবি এক মুনসি। তোমাকে ধরার মানুষের অভাব নাই বৈকুণ্ঠদা । হুঁশিয়ার হয়া থাকা ভালো।'

মুকুন্দ সাহাও বলে, 'বৈকুণ্ঠ রাতবিরাতে ঘোরাফেরা করিস, দিনকাল ভালো লয়। আসমান আর মোসলমান—এই দুয়ে বিশ্বাস নাই। এই মেঘ, এই ফর্সা। এই রোদ এই আন্ধার। কাদের মিয়া কয়া গেলো, ইনডিয়ার রিফিউজি দিয়া টাউন বলে ভর‍্যা গেছে। ইগলান কথা হামাক শোনায় কিসক?'

যুধিষ্ঠির একদিন মুকুন্দ সাহার দোকানে এসে কেঁদে ফেলে, 'কন তো বাবু, ইগলান কী জুলুম! মাঝিপাড়ার কয়টা চ্যাংড়া সেদিন বাড়িত যায়া দুইটা কোদাল আর একটা দাও লিয়া আলো। দাম চালাম তো চেত্যা উঠলো । কয়, এই দাও দিয়া আফসারের মরার শোধ লেওয়া হবি । কন তো বাবু, এখন কি করি?' যুধিষ্ঠিরের দুজন সঙ্গীর একজন অতোটা ভীতু নয়, সে এটার বিহিত করতে যাবে নায়েববাবুর কাছে। নায়েববাবুর ভরসাতেই তো তারা দশরথের হত্যার প্রতিশোধ নিতে তৈরি হচ্ছিলো। তা মুকুন্দ সাহা কি আর করে, নায়েববাবুর কাছে চললো ঐ তিনজনকে নিয়ে। নায়েব কাছারিতে নাই, কয়েকদিন ধরে সে আসে না। কামারদের আবদারে মুকুন্দকে তখন দল নিয়ে ছুটতে হলো টাউনে । নায়েববাবু টাউনেও নাই। পরিবার ছেলেমেয়ে নিয়ে গেছে জলপাইগুড়ি। চাকরের কাছে শোনা গেলো, কোন মুসলমানের সঙ্গে বাড়ি বদল করার ব্যবস্থা করতে গেছে।নায়েবাবু অবশ্য আসবে, তাকে তো আসতেই হবে। নইলে জমিদারি দেখাশোনা করবে কে? কিন্তু সেরকম আসাযাওয়ায় মুকুন্দ সাহা কি কামাররা ভরসা পায় না।

বৈকুণ্ঠ অভয় দেয়, 'হামাগোরে সন্ন্যাসী ঠাকুর আছে না? মোসলমানরা কি তাক কম মানে?'

ভরসা দিয়ে যায় কালাম মাঝি, 'সাহা' চিন্তার কারণ নাই। কোনো শালা কিছু করবার পারবি না।' তবে সে নিজেই খানিকটা চিন্তিত,'মুশিকল কি, হিন্দুস্থানে মোসলমানেক কচুকাটা করিচ্ছে, টাউনের মানুষ দেখলাম খুব গরম।'

হিন্দুর লাশভরা বগি নিয়ে পাকিস্তান থেকে রোজ ট্রেন যাচ্ছে শেয়ালদা স্টেশনে।—আজ টাউন থেকে নিয়ে আসা তিন দিন আগের আনন্দবাজার পত্রিকার এই খবরটা বলতে মুকুন্দ সাহার ভয় করে। কালাম মাঝির মেজাজ যে কখন কী হয় বলা মুশকিল। এর এক সপ্তাহের মধ্যে টাউন থেকে ফিরে কালাম মাঝি তার দোকানে হাটের স্থায়ী দোকানদারদের সবাইকে ডাকে। বৈকুণ্ঠকে দশ টাকার নোট দিয়ে বলে, 'গোপালের দোকান থ্যাকা মিষ্টি লিয়া আয়। দশ ট্যাকারই আনবু।'

এতো খুশি কিসের?—আজ ইসমাইল হোসেনের সাক্ষাতে নায়েববাবুর সঙ্গে কালাম মাঝি বন্দোবস্ত করে এলো, কাৎলাহার বিলের পত্তন এখন থেকে তার নামে। লেখাপড়া

সব শেষ । মণ্ডলের মেয়াদ চৈত্র পর্যন্ত। নায়েববাবুর তেমন ইচ্ছা ছিলো না, মণ্ডলের কাছ থেকে টাকা তো কম খায় নি। কিন্তু ইসমাইল হোসেন কলকাতা থেকে জমিদারের চিঠি নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলো। নায়েব বাপ বাপ করে কালামের নামে লিখে দিলো।

মাঝিপাড়ায় খবর চলে যায়। কালাম মাঝি রাত্রে বাড়ি আসবে জেনেও মাঝিরা দলে দলে তার মুখে সব শুনতে ছুটে আসে গোলাবাড়িতে। মাঝিদের বিল মাঝিদের হাতে ফিরে এসেছে শুনে কেউ কেউ তখনি বিলে গিয়ে জাল ফেলতে চায়। কালাম মাঝি তাদের থামায়, 'উগলাম কাম করো না গো। ল্যাখাপড়া সব ফাইনাল। এখন মণ্ডলের কাছ থ্যাকা বুঝ্যা লেওয়া বাকি।'

তমিজও খবর পেয়ে ছুটে এসেছিলো হুরমতুল্লার জমি থেকে। বাড়ি থেকে তার বাপটাও এসেছে। তমিজের বাপের হাত ধরে নিজের দোকানে তুলতে তুলতে কালাম মাঝি বলে, 'এই বুড়া মানুষটাক কী বেইজ্জতি না করিছে! এখন ইনসাফ কায়েম হবি। হামার কাৎলাহার বিলে পরথম জাল ফেলার হুকুম হামি দিমু এই বুড়া মানুষটাক। তোমরা সোগলি শুন্যা রাখো। বাঘাড় মাঝির লাতি, যি সি মানুষ লয়।'

৪১

কিন্তু কাৎলাহার বিলে জাল ফেলার সুযোগ তমিজের বাপের আর হলো না। ঐ দিন গোলাবাড়িতে কালাম মাঝির দোকানে মিষ্টি খেয়ে সে ঘরে ফেরে একটু রাত করে। তখন তার খিদেও পেয়েছে। শুধু নুনমরিচ দিয়ে ভাত, কুলসুম সেটাও একবারের বেশি দিতে পারে না। তবে তমিজের ধান তো এসে যাচ্ছে কয়েক দিনের মধ্যেই। আর কয়েকটা দিন এরকম এক বেলা কি আধপেটা খাওয়া। তারপর অন্তত মাস দুয়েক সানকি সানকি ভাত জুটবে। কয়েক মাসের মধ্যে বিলের দখল এসে গেলে ভাতের সাথে বড়ো বড়ো মাছের চাকা। মাছভাত খাওয়ার সম্ভাবনায় তমিজের বাপের পেটে নতুন হাওয়া খেলে, সেই হাওয়ায় তার চোখে নামে রাজ্যের ঘুম। এক পশলা ঘুমের পর তার ঘুম তন্দ্রায় নেমে এলে সে উঠে পড়ে মাচা থেকে এবং হাঁটা দেয় কাৎলাহার বিলের দিকে। কদমে কদমে ঘুম তার ফের ঘন হয়, সুতরাং চেনা পথ ধরে উত্তর সিথান পর্যন্ত যেতে তার একটুও এদিক ওদিক হয় নি।

সেই সন্ধ্যায় মাঝিপাড়ার অনেকেই বিলের এ মাথা ও মাথা ঘুরে এসেছে। কিন্তু তমিজের বাপ যখন পৌঁছলো তখন কেউ নাই। ইটের ভাটার পাশে খড়ের চালার নিচে ঘুমিয়ে রয়েছে ইঁটখোলার মিস্ত্রিরা। বিলের ধারে দাঁড়িয়ে নিজের পায়ের আঙুলে ভর করে ঘাড়ের রগ টানটান করে সে যতোটা পারে ওপরে তাকায়। পেছনের ইটের ভাটার মস্থর ধোঁয়া কুয়াশায় মিশে উত্তরের আসমানকে যতোটা পারে আড়াল করে রেখেছে। উত্তরের গাছ তার নজরে ঠেকে আর কি করে? ঐ আড়ালের সুযোগ নিয়ে লুকোচুরি খেলার টু-কি দেওয়ার মতো কে যেন ফুটো গলায় গলা খাঁকারি দেয়। তমিজের বাপের সারা শরীর

কেঁপে ওঠে। তার হাত পা বুক চিনচিন করে, এমন কি আধপেটা খাওয়া পেটটাও মোচড় দিয়ে ওঠে, হাত পা বুক, পেট, উরুর ওপরকার ও হাঁটুর নিচের ঘা শিরশির করে; চোখে মুখে ও গালে শিরশির করে মুনসির গলার স্বর ।

কিন্তু এই শোলোকের কথা তো বোঝা যায় না। এটা মুনসি ছাড়া কেউ নয়, চেরাগ আলি কখনো এমন কথাছাড়া শোলোক কয়নি, তার গলাও তো এটা নয়। শোলোক আসছে উত্তর থেকে, সুতরাং এর উৎস খুঁজতে তমিজের বাপকে একটু পিছু হটতে হয়। উত্তরের আকাশ জুড়ে তখন ফুঁড়ে ওঠে নানান রঙের আলো। মুনসির মুখের আদল বড়ো ঝাপসা, কিংবা চারদিকের আলোতে তার মুখ ঢাকা পড়েছে আলোর নিচে। তার কালো টুপি·জ্বলছে কালো আগুনে, বন্দুকের গুলিতে-ফাঁকা গলার নিচে লোহার শেকলে লাল আগুনের আভা। আর সমস্ত কুয়াশা জ্বলে তার সাদা দাড়ির ঝাপটায়। মাছের মুখের নকশা-আঁকা লোহার পান্টি তার জ্বলছে দাউদাউ করে। সেই সঙ্গে পোড়ে তার পাকুড়গাছ। হায়, হায়, মুনসির আরস পুড়ে যাচ্ছে তার নিজের আগুনে? তমিজের বাপের গায়ে আগুনের আঁচ লাগলে সে তাড়াতাড়ি করে পেছনে হাঁটে। একটু দক্ষিণে সরলে তার বামে বিলের ধারে অনেকটা জায়গা জুড়ে বালি, সেই বালির ওপর মুনসির আরস-পোড়া ছাই পড়তে দেখে সে সাহস করে ওপরে তাকায়। মণ্ডলের শিমুলগাছের পোষা ঝাঁকের উড়াল দেখে তার ভয় বাড়ে, বালির ওপর কি তাদের ডানার ছায়া পড়ে? না-কি পোড়া পাকুড়গাছের ছাই ঝরে পড়ছে তাদের ডানা থেকে? সেই ছাই থেকে বাঁচতে কিংবা গায়ে মাখার জন্যে সেই ছাই নিতে তমিজের বাম পা ফেলে আরো পুবদিকে। তার পা লাগে চোরাবালির সীমানা ঠিক করার জন্যে ইঁটখোলার মিস্ত্রিদের পোঁতা বাঁশের সঙ্গে। তার ভীতু ও তেজি কদমের তোড়ে বাঁশ উপড়ে তমিজের বাপ পড়ে যায় চোরাবালির ভেতর।

সকালবেলা তমিজের বাপের বাম পা প্রথম দেখতে পায় ইঁটখোলার মিস্ত্রিরা। ওপড়ানো বাঁশের গাঁটের সঙ্গে মোটা কঞ্চির ফাঁকে আটকে ছিলো তার ভাঁজ হওয়া হাঁটু। হাঁটুর ঘায়ের ওপর মলমের মতো লেগে ছিলো বালির একটা পরত। পশ্চিমা মিস্ত্রি বলে, ভাটার আগুন ঠিকমতো জ্বলছে কি-না দেখার জন্যে অনেক রাত্রে উঠে সে খেয়াল করে যে, ঐ আধ পাগলা মাঝিটা আসমানের দিকে তাকিয়ে দেওদানার সাথে কিসব বাতচিত করছে। তা লোকটা তো প্রায় রোজই আসে।—ভাটা ঠিকঠাক আছে দেখে মিস্ত্রি ঢুকে পড়ে ফের তার ঝোপড়ির মধ্যে। তারপর ভোররাতের দিকে সে এদিকে হুটোপুটির আওয়াজ পায়, তখনি তার মনে হয়েছিলো কোনো দেও বুঝি কারো সঙ্গে মারামারি করছে।

বেলা হতে হতে খবর চাউর হয়ে যায় চার দিকে। গিরিরডাঙা, নিজগিরিরডাঙা, গোলাবাড়ি, পালপাড়া এমন কি লাঠিডাঙার কাছারি থেকেও মানুষ আসতে থাকে দলে দলে।

তমিজের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলো হুরমতুল্লা, বুড়া খুব ভয় পেয়েছে, তমিজের কাছ ছাড়া হতে চাইছে না। তমিজ একেবারে চুপ। সে কেবল দেখছিলো বাপের হাঁটুর দিকে। বৈকুণ্ঠ একবার কাঁদছিলো তমিজকে জড়িয়ে ধরে, একেকবার সে ছুটে ছুটে যাচ্ছিলো চোরাবালির দিকে। তাকে ধরে রাখছিলো কেষ্ট পাল। কখনো কখনো চোরাবালি থেকে বৈকুণ্ঠকে দূরে সরিয়ে রাখার দায়িত্ব পালন করছিলো কেরামত আলি।

তবে কুলসুমকে সমবেদনা জানানোটা আরো জরুরি বলে মনে হচ্ছিলো তার। স্বামীর এরকম অপঘাতে মরণে হতবিহ্বল মেয়েটির শোকমোচনের জন্যে যা কিছু করা সম্ভব সবই করায় জন্যে কেরামত ছটফট করছিলো।

কালাম মাঝির আক্ষেপের প্রধান কারণ হলো, 'হায়রে, হামার বিলে পরথম জালটা হামি ফালাবার চাছিলাম বাঘাড় মাঝির লাতিক দিয়া। আল্লা হামার নিয়তটা পুরা করবার দিলো না। কপাল! হামার কপাল!'

আবদুল আজিজ ও কাদের দুজনেই টাউনে। তবে শরাফত মণ্ডল এসেছে তার কামলাপাট নিয়ে। তার লোকদের দিয়ে লম্বা লম্বা বাঁশ বেঁধে আঁকসি তৈরি করিয়ে তমিজের বাপের হাঁটুর ভাঁজের সঙ্গে আটকে তার লাশ তোলার আয়োজনও করলো মণ্ডলই । কিন্তু বাঁশের আঁকশি লাগিয়ে একটু টানতেই গোটা শরীর তার ডুবে যায় চোরাবালির ভেতরে। ওপরের কাঁপন দেখে মনে হয় তার শরীরটা বোধহয় নেমে যাচ্ছে অনেক নিচে। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই।

বৈকুণ্ঠ বারবার তার বুড়ো আঙুল কাটা হাতটার সঙ্গে সবগুলো আঙুলওয়ালা হাত জোড়া করে সবাইকে মিনতি করে, 'তমিজের বাপেক আপনেরা ওটি থাকবার দেন গো! তিনি লিজে তার আসন পছন্দ করিছে, হামরা বাধা দেই ক্যাংকা করায়্যা?' কান্নায় তার গলা আটকে আসে, 'দলদলা দিয়া তমিজের বাপ কোটে গেছে হামরা তার কী জানি? পাকুড়গাছ লিয়া মুনসি কোনমুখে গেলো কেউ কবার পারে? তমিজের বাপ তার সাথ ধরিছে! তাক লিয়া আপনেরা আর টানাটানি করেন না গো!'

শরাফত মণ্ডল তার ওপর রাগ করে, 'আঃ তুই এতো কথা কোস কিসক রে? মোসলমানের মুর্দা, শরিয়ত মোতাবেক তাক গোসল করান লাগবি না? তার কাফন লাগবি না? তার জানাজা পড়ান লাগবি না?'

কালাম মাঝি মণ্ডলের সঙ্গে একমত। তবে তার অতিরিক্ত প্রস্তাব হলো এই যে, তমিজের বাপের কবর হবে মাঝিদের পুরোনো গোরস্তানে। ওখানে তার বাপদাদা পরদাদার কবর। কেউ দখল করলেই ঐ গোরস্তান তার সম্পত্তি হয়ে গেলো না। পাকিস্তান কোনো মগের মুল্লুক নয়! আর তমিজের বাপের মাজার হবে গোরস্তানের ঠিক মাঝখানে! সে তো আর যে সে মানুষ ছিলো না, এই এলাকার সবাই তাকে ইজ্জত করেছে।

তমিজের বাপের লাশ কিন্তু আর তোলা গেলো না। তখন কালাম মাঝি প্রস্তাব করে, সে নিজেই চোরাবালির চারদিকে অনেকটা জায়াগা ইঁট দিয়ে বাঁধিয়ে দেবে।

এর মানে মণ্ডলদের ইটখোলার অনেকটা চলে যাবে এই মরা মাঝির দখলে। তবু গোরস্তান দখলের তুলনায় এতে লোকসান অনেক কম। শরাফত তখন নিজেই প্রয়োজনীয় সমস্ত ইঁট বরাদ্দ করার কথা ঘোষণা করে।

তিন দিনের মধ্যে ইঁটখোলার এক নম্বর ইঁট দিয়ে চোরাবালির সবটাই ঘিরে দেওয়া হলো। চোরাবালির খানিকটা পড়ে পানির ভেতরে সেদিকটা অবশ্য ফাঁকাই রইলো। কুদ্দুস মৌলবী তার তালেবেলেমদের নিয়ে কোরান খতম করতে লাগলো দেওয়ালের ধারে বসে । কালামের দোকান থেকে রোজ রোজ আগরবাতির কাঠি আসতে লাগলো গোছা গোছা।

তমিজ আজ এতো রাত করে কেন? দরজা খুলে চৌকাঠে বসলে কুলসুমের চোখের সামনে ঝোলে ঘন কুয়াশা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চাঁদের ময়লা আলোয় কুয়াশা একটু তরল হয় এবং হালকা বাতাসে একটু দোলেও বৈ কি! মরার চাঁদ যদি উঠলিই তো কয়টা দিন আগে উঠলি না কেন? সাত মাসের পোয়াতির মতো প্রায় ভরা ভরা চাঁদটা যদি দশ দিন আগে এমনি থাকে তো মানুষটা কী বিলের ধারে দলদলায় অমনি করে গড়িয়ে পড়ে? নিন্দের মধ্যে যে মানুষ হাঁটে তার সলকই কি আর আন্ধারই বা কি? কে জানে চোরাবালিকে পানি ঠাউরে সে নিজেই হয়তো ঝাঁপ দিয়েছিলো মুনসির ভেড়ায় সওয়ারি হবার আশায়। এ ছাড়া মুনসিকে সে আর ধরবে কোথেকে? পাকুড়গাছের নাকি চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও নাই। তা মুনসি এখন তা হলে বিল শাসন করে কোন চুলায় বসে? চোরাবালির ভেতর থেকেই কী তমিজের বাপ এখনো উচাটন হয়ে খুঁজে বেড়ায় মুনসির কালো পাগড়িতে ঢাকা লম্বা দাড়িওয়ালা মুখ? তা টলতে টলতে মানুষটা কী একবার তার নিজের ভিটাটা দেখতে আসতে পারে না?

এক রবিবার আরেক রবিবার আট দিন, তারপর সোমবার গেলো মঙ্গলবার গেলো, কয়দিন হলো? এই দশ দিনে কুলসুমের খোয়াবেও সে কি একবার উঁকিটাও দিতে পারে না? এই কাৎলাহার ছেড়ে, গিরিরডাঙা নিজগিরিরডাঙা ছেড়ে, তাদের সবার মায়া কাটিয়ে নিজের পাকুড়গাছটাকে পর্যন্ত উপড়ে নিয়ে মুনসি যদি হাওয়া হয়ে যেতে পারে তো তার জন্যে তমিজের বাপের অতো দরদ কিসের?

মাটির হাঁড়িতে রেখে রোজ পান্তা খাওয়া হচ্ছে আজ কয়দিন থেকে। পান্তা মজে টক হয়, সেই ঘেরানে ভুরভুর করে সারা ঘর। সানকিতে পান্তা নিয়ে পেঁয়াজে কামড় দিতে গিয়ে কুলসুমের দাঁত বসে থাকে পেঁয়াজে, চিবানোর বল আর পাওয়া যায় না। দুই সানকি ভাত খেতে যে মানুষ শেষ করে ফেলে পাঁচটা পেঁয়াজ তার খোরাক এখন জোটে কীভাবে? কুলসুমের শুকনা চোখ খরখর করে। চাঁদের আলো তার চোখের সব পানি শুষে নিয়ে শিশিরের ফোঁটা করে ফেলে দিচ্ছে সামনের উঠানে, ঘরের চালে, নতুন খড়ের গাদায়। কুলসুমের চোখে পানি আর জমতে পারে না। তবে চোখে পানি না জমার একটি কারণ কিন্তু হতে পারে তার বড়ো বড়ো নিশ্বাস। গন্ধ নিতে নিতে কুলসুম হাপসে হাপসে পড়ে। কৈ তমিজের বাপের গন্ধ কোথাও নাই। মানুষটা তার গায়ের আঁশটে গন্ধ, মুখের পচা মাছের গন্ধ, হাঁটুর ওপরকার ঘায়ের পুঁজের গন্ধ, উরুর ঘায়ের বাসি গন্ধ সব নিয়ে গেছে মুনসিকে ভেট দিতে? এই যে দশটা দিন গেলো, কৈ কুলসুমের খোয়াবের মধ্যেও তো একবার এলো না।

আর মুনসিরই বা এ কেমন ধারা গো? তমিজের বাপকে কি মুনসি এতোই ভালোবাসে যে, তার নিজেরই খাস মানুষ ছিলো চেরাগ আলি, সারা জেবন কাটালো তারই শোলোক বলে বলে, তার নাতনিটার কথাটা কি একবার মনেও করলো না? আবার তমিজের বাপই বা কেমর মরদ যে, মুনসিকে বলতে পারলো না, তোমার নিজের আরস পাকুড়গাছের খবর নাই, ইটের ভাঁটায় ঢুকলো না কি উড়েই গেলো, তুমি আমাকে বসতে দেবে কোথায়? বলতে পারে না, এখানে আমি খাবো কী? আধপেটা খেয়ে কাটলো তার কতোগুলো দিন, এখন হুরমতুল্লার জমিতে ধান কেটে বেটা তার নতুন ধানের চালের ভাত খাওয়াবে। সে কি বলতে পারে না, তার বৌ আমন ধানের আতপ

চালের পিঠা করবে, গুড় দিয়ে খির করবে, আমি এখন যাই!

হয়তো নতুন চালের ঘেরানে পিঠা খাবার লালচেই কুয়াশার ভেতর দিয়ে মাথায় শিশির নিয়ে এগিয়ে আসে তমিজের বাপ। তার ছায়া লেপ্টে থাকে জ্যোৎস্না মাখানো কুয়াশার সঙ্গে। কুলসুম চোখ বন্ধ করে রাখে, পাছে তার চোখের কাঁপনে মানুষটা ফের হারিয়ে যায়!

'দরজাত বস্যা কী করো? ভাত খাছো?' তমিজের গলা ঠাহর করতে পেরেও কুলসুম কাঁপে; ভয়ে কাঁপে, খুশিতে কাঁপে। মরার পর তমিজের বাপ বেটার রুহের সাথে মিশে এসেছে নিজের ঘর দেখতে।

ধান কিন্তু তমিজ এবারে তেমন পেলো না। মজুরি নিয়ে কাম করলেই ভালো হতো। হুরমতুল্লার মন খারাপ, তার ধানের ভাগ তো সেই আগের মতোই রয়ে গেছে। তমিজের সঙ্গে সে গজরগজর করে, 'তোক কেটা কী কয়, আর তুই তাই লিয়া নাফ পাড়িস?'

হুরমতুল্লা পরামাণিক হদ্দ চাষা, তার দৌড় বড়োজোর গোলাবাড়ি হাট পর্যন্ত।

আবদুল কাদের বলেছে। কেরামত গান বেঁধেছে। ইসমাইল হোসেনের মতো মানুষ পর্যন্ত কতোবার করে বলেছে, পাকিস্তানে জমিদারি মহাজনি থাকবে না। তেভাগা নিয়ে বলেছে, পাকিস্তান হলে ওসব এমনি এমনি হয়ে যাবে। মোসলমান চাষারা অন্তত এসব নিয়ে হুজ্জত করা বন্ধ করলো কি মিছেমিছি? জেলখানায় তেভাগার নেতারা আফসোস করেছে, তাদের কতো তেজি তেজি মুসলমান ছেলে পাকিস্তানের ডাকে মুসলিম লীগে ভিড়ে গেছে। তারা কি এমনি এমনি ভিড়েছিলো?

গোলাবাড়িতে কাদেরকে জিগ্যেস করলে সে গম্ভীর হয়ে যায়, 'উগলান কথা এখন রাখ। আমাদের নতুন রাষ্ট্র, ইনডিয়ার দালালরা মানুষকে খেপাতে চায়, মানুষ গোলমাল করলে ইনডিয়া সুযোগ নিয়া নয়া দেশটাকে খপ কর্যা খায়া ফালাবি।' ইনডিয়ার সমস্যাও কাদের তাকে বোঝায়, 'হিন্দুস্থানেত যারা চাষাদের নিয়া গোলমাল করে ঐ দেশের সরকার তাদের জেল দেয়। জহরলাল নেহেরু নিজে কতো জেল খাটিছে, এখন প্রধান মন্ত্রী হয়া কম্যুনিস্টদের জেলের মধ্যে ভরে।'

তমিজ ধন্দে পড়ে। একই দলের মানুষ পাকিস্তানে গোলমাল করে হিন্দুস্থানের টাকা খেয়ে। আবার হিন্দুস্থানে গেলে তারা জেল খাটে। এর মানে কি? কিন্তু লোকে এখানে গোলমাল করবে কেন? ইসমাইল সাহেব না সেদিনও বলে গেলো, নতুন আইন পাস হলে বর্গাচাষাকে তার ন্যায্য পাওনা দেওয়া হবে।

'সেই কথা বল।' কাদের এবার তমিজের কথাটা বোঝে, 'জমিদারি উচ্ছেদের একটা বিল সেদিন সরকারের মন্ত্রী তুলিছে। তার মধ্যে একটা কথা আছে, জোতদার ইচ্ছামতো বর্গাদারেক জমি থেকে উচ্ছেদ করবার পারবি না। হ্যাঁ, বিল একটা উঠিছে।'

এবার তমিজ খুশি, 'বিল হোক আর জমি হোক, মাঝি হোক আর চাষা হোক, হামরা ল্যায্য হক পালেই খুশি।'

বিল সম্বন্ধে তমিজের ভুলটা ভাঙাবার ধৈর্য কাদেরের এখন নাই। সে হাসে, 'তোর এতো খবরের দরকার কী? তুই তো আর জমি বর্গা করিচ্ছিস না।'

এবার না পারুক, সামনের আবাদ তমিজ বর্গায় করবে। জগদীশ সাহা আড়াই বিঘা জমি বেচলো হামিদ সাকিদারের কাছে। তবে তার এক দাগে প্রায় বারো বিঘা জমি

বেচবে, কালাম মাঝি নাকি সবটাই কিনে নেবে। এই দুজনের যে কোনো একজনের কাছে গেলে তমিজকে কি আর খালি হাতে ফিরতে হবে? আবার একই জমিতে চিরকাল বর্গা করার হক পেলে তেভাগার আইন হতে আর কদ্দিন লাগবে?

নিশ্চিন্ত হলে তমিজের মনে পড়ে বাপের কথা। তিন চার দিন হয়ে গেলো বাজানের কাছে যাওয়া হয় নি।

চোরাবালির ধারে দাঁড়িয়ে তমিজের শীত শীত করে। বাপটা তার ঢুকে আছে ওর মধ্যেই, অথচ ঐ শরীর থেকেই তাপ নিতে তমিজের গা আইঢাই করে। সারা জীবন বিলের ধারে ধারে ঘুরলে কি হয়, বাজানের গতরে তাপ ছিলো অনেক। এখানে আছে, একদিক থেকে ভালোই, বাপ তো তার এই বিলেরই মানুষ। তমিজকেও রাখতে চেয়েছিলো পানিতে পানিতে। বাঘাড় মাঝির বংশের ছেলে হয়ে সে লাঙল ধরবে বাজান এটা কখনোই চায়নি। আবার এই নিয়ে যে জেদ করবে সেই জোরটাও তো তার ছিলো না। এই দুনিয়ায় বাপ যদি কাউকে ভয় করতো তো সেই মানুষটা সে নিজে ছাড়া আর কে? খিয়ারে ধান কেটে বাড়ি ফিরে বাপকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলে কি রাতভর বিলে কাটিয়ে তাকে ফিরতে দেখেলে তমিজ কী ত্যারাত্যারা কথাই না বলতো! বাপের খাবার লালচ নিয়েও কী না বলেছে! মানুষটা খেতে বড়ো ভালোবাসতো। তার খুব খাওয়ার হাউস ছিলো গো। খালি জেয়াফতের ধান্দায় থাকতো। জেয়াফতে খেতে খেতে তার তবনের গেরো খুলে গেছে, বমি করে ফেলেছে, খেতে বসে পাদতে শুরু করে পাশের লোকের গালি খেয়েছে। এখানে এই শীতের মধ্যে তার খাওয়া নাই, পেট ছোটানো নাই, বমি করা নাই। মরার আগে কতোদিন সে আধপেটা খেয়ে কাটিয়েছে। তখন নিত্যি রাত হলে বিলে চলে আসতো, পাকুড়গাছ খোঁজ করে করে খালি ঘুরপাক খেয়েছে। চোরাবালিতে ঢুকে মানুষটা এখন করে কী? এখানে না আছে পাকুড়গাছ, না আছে তার মুনসি। আবার বালির মধ্যে জেয়াফতের ধান্দাই কি সে করে বেড়ায়? খাওয়ার ঘেরান খুজতে খুঁজতে মানুষটা বালি খুঁড়ে খুঁড়ে কোথায় যে চলে গেলো কে জানে?

ডোবার এপার থেকেই ঘরের দরজার চৌকাঠে বাপকে বসে থাকতে দেখে তমিজ চমকে ওঠে, ভয়ও পায়। বাপ তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ঘরে নতুন চালের ভাত রান্না হচ্ছে, সকালে পান্তা, দুপুরে ভাত , রাত্রে ভাত। এই দুটো মাস তিন বেলাই ভাত খাওয়া। বাজান এখানে হাজার বসে থাকুক, সেই ভাত খাবার অবস্থা কি তার আর হবে?

তবে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে কুলসুমকে সে ঠিক কুলসুম বলেই ঠাহর করে ফেলে এবং কুপির আলোয় তার চোখে বাজানের চাউনি দেখে সটান শুয়ে পড়ে বাজানের বিছানায়। 'বাজান! বাজান! কী খাবা গো?' ডাকতে ডাকতেই শুরু হয় তার ফোঁপানো কান্না, এই কান্না তার জমতে শুরু করেছিলো চোরাবালির ধারেই, এবং কাঁদতে কাঁদতেই বাপকে তার প্রিয় খাদ্য সম্বন্ধে জিগ্যাসা করা অব্যাহত রাখে। পাশে বসে কুলসুম হাত রাখে তমিজের ঝাঁকড়া চুলে, তারপর ঐ চুলে নাক গুঁজে সে নিশ্বাস নিতে থাকে জোরে জোরে। এই ঝাঁকড়া চুলে মিশেছে তার বাপের পাটের আঁশ কিসিমের চুলের গন্ধ। এতোকাল পর গন্ধটাকে পাখির ডানা ঝাপটানোর গন্ধ বলে সনাক্ত করতে পারলো। তমিজের ঘাড়ের গন্ধে মিশেছে তার বাপের গায়ের আঁশটে গন্ধ, তার বুকে কাদার গন্ধ। তমিজের সারা গায়ের গন্ধ নিতে নিতে কুলসুমও ফোঁপাতে শুরু করে এবং এখন

কিছুক্ষণের মধ্যে সে কেঁদে ওঠে হাউমাউ করে। তমিজ তার বাপের গতরের ওম নিতে মুখ গুঁজে দেয় কুলসুমের উঁচু বুকে। কাঁদতে কাঁদতে কুলসুম বলে, 'প্যাট ভর্যা ভাতও খাবার পারে নাই গো মানুষটা, মুনসির ডাক শূন্যা কোটে চল্যা গেলো, একবার কয়াও গেলো না।' 'বাজান জেয়াফতের বাড়ি উটকাতে ঐ বালুর মধ্যে কোটে কোটে ঘুরিচ্ছে গো।' 'এবার একটা পিটা মুখোত পড়লো না তার। শোলোক শুনবার গেলো, আর ফিরলো না। ত্যাল পিঠা হলে তাঁই একলাই এক কুলা শ্যাষ করিছে।' তমিজ হামলে কেঁদে ওঠে, 'মণ্ডলবাড়িত জিয়াফতের ভাত খাবার যায়া কি কাউলটা তাঁই করিছিলো গো।' কুলসুম জানায়, 'কাৎলাহারের কৈ মাছ দিয়া নাউ দিয়া ভাত খাবার চাইছিলো গো উদিনকা, খাবার পারলো না।'

পেটুক বাপের আধপেটা খাওয়া গতরের তাপ নিতে তমিজ হাত রাখে কুলসুমের পিঠে, তমিজের বাপের তাপ পোয়াতে তাকে নিবিড় করে টেনে নেয় নিজের শরীরে। পায়ের দুটো ঘা থেকে তার আধপেটা গতরের গন্ধ নিতে কুলসুম হাত বোলায় তমিজের হাঁটুতে আর উরুতে। আর তমিজের বাপ অনেক দূরে কাৎলাহার বিলের চোরাবালির ভেতর থেকে তার লম্বা হাত বাড়িয়ে কিংবা হাতটাই লম্বা করে আলগোছে টেনে নেয় তমিজের তবন আর কুলসুমের শাড়ি। গরহাজির মানুষটার গায়ের ওম পেতে আর গায়ের গন্ধ শুঁকতে দুজনে ঢুকে পড়ে দুজনের ভেতরে।

৪৩

মাঝরাত? না ভোরবেলা? বিকালবেলা না সন্ধ্যা? কী জানি মেঘলা দুপুরও হতে পারে। আবছা আন্ধারে ঘুটঘুটে কালা আন্ধার চলে গড়িয়ে গড়িয়ে, ওটা কী গো? কী! কুলসুম এতোক্ষণ দিশাই পায় নি।—ওটা না তমিজের বাপ! তমিজের বাপের শরীরটা কয়েকদিনে একটু রোগা হয়েছে। আহারে! আধপেটা খেয়ে মানুষটা গেলো বিলের উত্তর সিথানে, আর ফিরলো না। যাবার আগে তার চুল ছিলো পাটের আঁশের মতো, কয়দিনে তাই ঘন হয়ে ফেঁপে উঠেছে ঝাঁকড়া হয়ে। তার মাথায় আর দাড়িতে কী যেন চিকচিক করে, সেগুলি কি তার হাসির কুচি? একরম হাসির কণা তো তমিজের বাপের মুখে কখনো দেখা যায়নি। জেয়াফত বাড়িতে ডুমা ডুমা গোশত দিয়ে ভাত খেয়েও সে তো এতো খুশি কখনো হয়নি। তবে আজ এতো সুখ কিসের তার? মরার পর বেটার ভেতর ঢুকে পড়ে কি সে শরীরের স্বাদ এমন তারিয়ে তারিয়ে চেখে গেলো নাকি? দাড়ির জঙ্গলে চিকচিকে বালিতে তমিজের বাপ তাই কি এমন হেসে হেসে এভাবে ঘোরে? চেরাগ আলিকে পেলে কুলসুম ঠিক জিগ্যেস করতো 'ও দাদা, মরার পরে মানুষ খাব দেখবার পারে? তমিজের বাপ এখন কী খাব দেখে? কী দেখিচ্ছে কও তো।'

চেরাগ আলির দোতারার টুংটাং শোনা যায়। তার গানের প্রথম কথা শুনতে শুনতেই কুলসুম গলা মেলায় :

মরণ তাজ্জব বড়ো বুঝিবারে নারি।
তাজ্জব নিদ্রাও সহোদর যে তাহারি॥
ভায়ে ভায়ে মোহাব্বত না বুঝি ফারাক।
সাপটিয়া থাকে যেন বীজ আর খাক॥

'ও দাদা, খালি রহস্য করো কিসক গো? তমিজের বাপ এখন খেয়াব দেখে?'

হাতের দোতারার টুংটাং অব্যাহত রেখে চেরাগ আলি বলে, 'তুমিজের বাপ খোয়াব দেখিছে কুনোদিন? মানুষটা তো খোয়াবের মধ্যেই আছিলো!' কুলসুম অবাক হয়ে দাদার দিকে তাকিয়ে থাকলে চেরাগ আলি বলে, 'তাঁই খোয়াব দেখবি ক্যাংকা কর্যা? মরার পর তমিজের বাপ আসিচ্ছে তোর খোয়াবের মদ্যে, বুঝলু?'

কুলসুমের বোঝা না বোঝার পরোয়া না করে ফকির শোলোক গায়,

নিন্দে জীব বিচরয় স্বপনে স্বপনে।
খোয়াব দেখায় মুর্দা নিজ প্রিয়জনে॥

গাইতে গাইতে চেরাগ আলি দোতারা বাজায় খুব দ্রুত লয়ে, দুনিয়া বাজে ঝমঝম করে। শোলোকের তালে দুলতে দুলতে তমিজের বাপ চলে যায় বাঁশঝাড়ের দিকে। তার দাড়ি আর চুলে হাসির কণা চিকচিক করে।

শোলোক তমিজের কানে না গেলেও তার ঘুম ভেঙে যায়। কাঁথার নিচে লুঙি গুছিয়ে নিতে নিতে বিছানা থেকে উঠে আড়চোখে সে তাকায় কুলসুমের মুখে। অন্ধকারেও বোঝা যায়, তার ঠোঁটের কোণে থুথুর মতো সেঁটে রয়েছে হাসির কুচি। তার একটা হাত জড়ানো ছিলো তমিজের গলায়। তমিজ উঠে বসলে হাতটা আস্তে পড়ে যায় কাঁথার ওপর। সেখানেও তমিজের পায়ের ওম। কিন্তু তমিজ বড়ো উসখুস করে, ঘুমের আগে কীভাবে যে কী হয়ে গেলো! মাথাটা তার নিচের দিকে ঢলে পড়ে। অন্ধকারেও সে তাকাতে পারে না কুলসুমের দিকে। ঢলে-পড়া মাথাটা নিচু করে তমিজ উঠে দাঁড়ায় মেঝেতে এবং ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে যায় দরজাটা আস্তে করে ভেজিয়ে দিয়ে। নিজের ঘরে গিয়ে শোয়, কিন্তু ঘুম আর আসে না। ভোর হওয়ার আগেই বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে।

সেদিন মোষের দিঘির পুবের জমিতে ধানখেতে তমিজের কাস্তের পোঁচ পড়ে এমন তেজে যে দেখতে দেখতে তার আঁটির পরিমাণ হয়ে যায় পাহাড় সমান, হুরমতুল্লা বলে, 'কেটা কবি চাষার ঘরের মানুষ তুই লোস!'

খুশি হয়ে তমিজ ফুলজানকে তার নিকার কথাটা বলতে চায়। ফুলজানও একটু দূরে থেকে তাকিয়েছিলো তার ধানের দিকে। তার ঘ্যাগটা আজ বড়ো বেঢপ বড়ো, কুলসুমের গলার ওই জায়গাটা বড়ো মসৃণ, ওখানকটায় গাল দিলে বড্ডো আরাম লাগে। কিন্তু যতোই সন্ধ্যা হয়, বাড়ির দিকে মেলা করতে তার পা আর ওঠে না। অতো সুন্দর মসৃণ গলা সত্ত্বেও কুলসুমকে দেখতে তার ভয় ভয় করে। হুরমতুল্লার বাড়ির উঠানে একটার পর একটা কাজ হাতে নেয়, শেষকালে একবার গুণে-রাখা ধানের আঁটি সে ফের গুণতে শুরু করলে ফুলজান এসে দাঁড়ায় তার পাশে, 'বাড়িত যাবা না? মাও তোমার একলা আছে না বাড়িত?' ফুলজান কুলসুমকে তার মা বলায় তমিজের গা ছমছম করে, তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আসে, গলা শুকিয়ে যায়। ফুলজান ফের বলে, 'মরার বাড়ি, এখনো চল্লিশ দিন হয় নাই। তোমার মাও একলা থাকলে ভয় করবি না? বাড়িত যাও।'

পাকুড়তলায় এখন তো মানুষ কিছু না কিছু থাকেই, ইঁটের ভাটা সেখানে জমজমাট। কিন্তু চোরাবালি এড়াতে তমিজ বাড়ি যায় একটু ঘুরে। বাপের যে হাত এখান থেকে তার লুঙি উঠিয়ে দিয়েছিলো সেই হাতই যদি সাঁড়াশি হয়ে চেপে ধরে তার গলা? ইঁটখোলার এক পাশে তমিজ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে দুইজন পশ্চিমা মিস্ত্রি তাকে দেখে আফসোস করে, আহা, বাপের টানে ছেলেটা রোজ একবার এখানে আসে। একজন তাকে জানায়, তার বাপ প্রত্যেক রাত্রে বড়ো আওয়াজ করে। সংসারের টান সে এখনো কাটাতে পারে নি।

বাপের দুনিয়ার মায়ার কথা শুনে তমিজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে। কুলসুমের দিকে তাকাতে তার ভয় হয়। 'ভাত দিছি। ভাত খাও।' কুলসুমের এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে খিদে পেটে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলে, 'ভাত খায়া আসিছি।' তার পিছে পিছে কুলসুমকে আসতে দেখে সে দরজা ভেজিয়ে দেয় ভেতর থেকে।

চোরাবালির ভেতর থেকে তমিজের বাপ আজকাল রোজ রোজ আসে, কুলসুমের সঙ্গে এটা ওটা কথাও বলে। তা মানুষটা আগের মতোই আছে, কথাবার্তা তেমনি কম। তবে রোগা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাকে কেমন খুশি খুশি দেখায়। সন্ধ্যার অনেক পরে বাড়ি ফেরে তমিজ। কিন্তু ভাত খেতে বসলে কুলসুমের সারা দিনের বৃত্তান্ত তাকে শুনতেই হয়। বাপের খুশি থাকার খবরে তমিজ একটুও খুশি হয় না। মরা মানুষ প্রতিদিন জীবিত মানুষের খোয়াবে আসবে কেন? লক্ষণ তো ভালো নয়। কুলসুমকে কী তমিজের বাপ চোরাবলির ভেতরে টেনে নেবে নাকি? শাস্তিই যদি দিতে চায় তো তমিজ বাদ পড়ে কীভাবে?

মাথা নিচু করে তমিজ ভাত খায়, ভাত খেয়েই জোর করে হাই তুলতে তুলতে নিজের ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দেয়। কুলসুমের মসৃণ গলাটা বারবার দেখতে ইচ্ছা করলেও সে ওদিকে তাকায় না।

ওদিকে শরাফত মণ্ডলের বাড়ি থেকে ফিরে হুরমতুল্লা একদিন খুব খুশি। জগদীশ সাহার এক দাগে বারো বিঘা জমি মণ্ডল পানির দামে কিনে ফেললো। রেজিষ্ট্রি করা হয়ে গেছে। কালাম মাঝি ভালো করে খবর পাবার আগেই আজিজকে নিয়ে মণ্ডল সাব রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে সব ঠিকঠাক করে ফেলেছে। মণ্ডলের সাফল্যে হুরমতুল্লা অনেকদিন পর হাসে, কাশিতে তার গলা বন্ধ হয়ে এলেও হাসি তার আর যায় না।

তমিজ কিন্তু গম্ভীর। হুরমতুল্লার কাশির দমক কমলে তমিজ বলে, 'জমি তুমি কিছু রাখবার পারলা না? এতো সস্তা!'

হুরমতুল্লা হঠাৎ চুপ করে, তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'পানিত বাস করি, কুমিরের সাথে লাগা ভালো লয়। মণ্ডলের ভাগেত মুখ বসাবার যায়া মাঝিপাড়ার কী দশাটা হলো, তুই বুঝিস না?'

তমিজ অবশ্য বোঝার চেষ্টাও করে না। সে বরং তার পরিকল্পনা বোঝায় হুরমতকে।—হুরমত তো এখন ব্যস্ত থাকবে মণ্ডলের নতুন জমি নিয়ে, সে তো খালের পুবে। তো হুরমতুল্লার বাড়ির পেছনে তার পালানের জমিটা তমিজকে বর্গা দিক না। সবটাই দিক। চার বিঘার ওপর জমি, জমিতে তমিজ সোনা ফলিয়ে ছাড়বে। এই জমির ফসল বেচেই হুরমত নতুন জমি কিনতে পারে। এমন কি, তমিজ ভাগে যা পাবে তাই দিয়ে সে মণ্ডলের কাছ থেকে তার ভিটার লাগোয়া জমি ফেরত না-ও পায় তো অন্তত

কালাম মাঝির হাত থেকে ভিটাটা উদ্ধার করবেই। লাঙল দিলে জমি তার বশে থাকে, তমিজ কতো ধান তোলে হুরমতুল্লা নিজেই দেখতে পাবে।

তার কথা শুনতে শুনতে হুরমতের চোখ চকচক করে, নিশ্বাস ফেলে সে বলে, 'হামিও পারিচ্ছিলাম রে, এখন শরীলেত কুলায় না।'

'তুমি করবা কিসক? তুমি মণ্ডলের জোতের দেখাশোনা করো।' তমিজ তাকে আশ্বাস দেয়, 'তোমার বিটি হামার সাথে থাকলে জমিত হামি কী করি তুমি দেখো।' নিজের কথাতেই বুকে বল পায় সে, 'বিটিক তো তোমার লিকা দেওয়াই লাগবি। ইংকা রাঁড়ি কর‍্যা রাখবার তো আর পারবা না। তা হামার সাথে—!'

'মাঝির বেটার সাথে লিকা দিলে মানষে আবার—!' হুরমতুল্লার গলায় আগের তেজ নাই। তমিজকে রাখতে পারলে জমির ফসল সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। ফুলজানটা তার বড়ো হতভাগী। মেয়েটার মুখের দিকে তাকাতে গেলেই তার বুক পোড়ে। তা তমিজের সঙ্গে তার নিকা হলে মেয়েটার মুখ আন্ধার থাকে না। হুরমতুল্লা আস্তে আস্তে বলে, 'হামার সমাজ আছে একটা বুঝিস তো? দেখি, সোগলির সাথে কথা কয়া—।'

কিন্তু শরাফত মণ্ডলের অনুমতি চাইতে গেলে মানুষটা গম্ভীর হয়ে বলে, 'হুরমতুল্লা, তোমার বিটি তুমি কাটো, তুমি মারো, যার কাছে খুশি তুমি তার হাতোত দিবা। হামার কী?' কিন্তু এরপর তার গলা চড়ে, 'কিন্তু ঐ বিটিজামাইক লিয়া তুমি এটি থাকলে হামার ইজ্জত থাকে কুটি?' একটু থেমে সে ধীরেসুস্থে বলে, 'এখন আল্লা হামার অবস্থা ভালো করিছে। কিন্তু তোমার সাথে রক্তের সম্পর্ক তো আর বাদ দিবার পারি না। মাঝির বেটার সাথে তুমি কুটুম্বিতা করলে হামার ইজ্জত থাকে কুটি? হামার জমির তদারকি তুমি করবা। তোমাক কিসক দেই?—না, তুমি হামার আত্মীয়, না কী? তার সাথে তুমি আত্মীয়তা করলে তোমার সাথে হামি সম্পর্ক রাখি ক্যাংকা কর‍্যা? তুমিই কও।'

হুরমতুল্লা কিন্তু তমিজকে এসব কিছুই বলে না। ফুলজানের ব্যাপারে তাকে একেবারে না করে দিতে হুরমতুল্লা মন থেকে সায় পায় না। ছোঁড়াটাকে দিয়ে তার জমির আয় উন্নতি হচ্ছে, তা হোক না! ফুলজানের পেছনে সে ঘুরবে আর কতোদিন? নিজে নিজেই একদিন কেটে পড়বে। ছোঁড়াটাকে জামাই করে নিজের কাছে রাখতে পারলে ভালো হতো। তবে মণ্ডল সহ্য করবে না। ভিটামাটি থেকে তাকে উচ্ছেদ করবে না ঠিকই, কিন্তু মণ্ডলের এতোগুলো জমি বর্গা করা, বর্গাদারদের ওপর খবরদারি করা এসব তার বন্ধ হয়ে যাবে। শরাফত তার সঙ্গে আত্মীয়তার কথাটা এভাবে বললো, তাতেও হুরমতের বুকটা একেবারে ভরে গেছে। তার মানে আবদুল আজিজ, আবদুল কাদের আর সে একই বংশের মানুষ। আজিজ কাদের এদের ছেলেরা সব বড়ো অফিসার হবে। তারাও তার আত্মীয় হবে। মাঝির বেটার হাতে বেটিকে তুলে দিয়ে হুরমতুল্লা বংশের ইজ্জত হারায় কী করে?

এসব নিয়ে তার মাথার কামড়াকামড়ি অবশ্য হুরমতুল্লা খুব একটা টের পাচ্ছে না। কেন?—বুড়া বয়সে মণ্ডল তাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে তাই দেখতে তাকে দিনমান থাকতে হয় বাইরে বাইরে। হামিদ সাকিদার জগদীশের কিছু জমি কিনে নেওয়ার পর নিজেই এখন জোতদার, তার বর্গা খাটে বেশ কয়েকজন চাষা। হুরমতুল্লার কাজ এখন অনেক।

তমিজের ওপর ভরসা না করে তার আর উপায় কী? হুরমতুল্লার জমি সে বর্গা তো করেই, এর ওপর মোষের দিঘির পুবে মণ্ডলের জমিটার খাটাখাটনি বেশিরভাগ করতে হয় তাকেই। শমশের হয়েছে হুরমতুল্লার বড়ো কামলা। কিন্তু বেলা ডোবার আগেই তার

বাড়ি ফেরা চাই; সন্ধ্যা হতেই তার জ্বর আসে, জ্বর একবার এসে পড়লে হাঁটতে তার ভারি কষ্ট। ওই জমি থেকে পেঁয়াজ আর মরিচ তোলা হলো, এখন চলছে আউশ বোনার জন্যে জমি তৈরি। এই গরমে অবশ্য সন্ধ্যার পর ওখানে কাজ করতে তমিজের ভালোই লাগে। ওই সময় মানুষজন থাকে না, ফুলজান এসে একটু আধটু হাত লাগায়, তবে ভুল ধরে অনেক বেশি। চৈত্রের এক সন্ধ্যায় মোষের দিঘির ঢালে দাঁড়িয়ে তমিজ বলে, 'তুই কি খালি হামাক ইংকা হেলাই করবু? এতো কর‍্যাও হামি মাঝির বেটাই থাকি?' ফুলজান বসে পড়েছে মোষের দিঘির পুবের ঢালে। সে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঝামটা না দেওয়ায় তমিজ হয়তো একটু দমেও যায় আবার একটু লাইও পায়, সে তোলে তার মরা বেটার কথা, 'হামার কাছে থাকলে তোর বেটা ওংকা কর‍্যা মরে? কৈ, গেরস্থ চাষার ঘর তো করলু। তাও আবার ল্যাখাপড়াজানা মানুষ, শোলোক বান্দে, বই বেচে। সেই মানুষটা কী করলো?'

তার কথায় ফুলজান এই প্রথম বড়ো বিচলিত হয়, তার পায়ের নিচে মাটি কাঁপে, কাঁদতে কাঁদতে সে বলে, 'হামার নসিব! তুমি মাঝির বেটা হলা কিসক?' তমিজ তার গা ঘেঁষে বসে পড়লে ফুলজান তার বুকে হঠাৎ করে কিল মারে আর অভিযোগ করে, 'তুমি মাঝির ঘরত জর্ম লিলা কিসক? কিসক? কিসক?'

এই কঠিন প্রশ্নের জবাব নিয়ে তমিজ মাথা ঘামায় না। ফুলজানের কিল খেতে খেতেই সে তাকে জড়িয়ে ধরে দুই হাতে। মোটা ঠোঁটে ফুলজানের চোখের নোনতা পানি চুষে নিতে নিতে নুনের ধকে তার সারা শরীর জ্বলে। ফুলজানের গালে, ঠোঁটে ও ঘ্যাগে অবিরাম মুখ ঘষতে ঘষতে সে তাকে নিয়ে শুয়ে পড়ে মোষের দিঘির ঢালে। তাদের কয়েক হাত পরেই চৈত্রের খরখরে চষা জমি। তাদের মাথার কাছে হুরমতুল্লার জোড়া বলদ। আকাশে তারা ফোটে। ফুলজান নিজের শাড়ি গুছিয়ে নিতে নিতে বলে, 'মাঝির বেটা, কাপড়খানা ছিঁড়া ফালালা।'

অনেকদিন পর সেদিন বাড়ি ফিরে তমিজ কুলসুমের সঙ্গে খুব গল্প করে তার মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে। তমিজের বাপ নাকি অনেক রাত্রে রোজই কুলসুমের কাছে একবার না একবার আসে। তমিজ কিন্তু ভয় পায় না; বরং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিগ্যেস করে বাপের কথা।

৪৪

জুম্মাঘরে কুদ্দুস মৌলবির মিলাদ পড়াবার পর মাঝিদের হাতে হাতে বাতাসা। এর ওপর তহসেন দারোগা টাউন থেকে নিয়ে এসেছে ঘিয়ে-ভাজা জিলাপি। মিলাদে এতো এতো তবাররক পেয়ে মুখ ভরে সেসব চিবোতে চিবোতে মাঝিরা বিলের ধার ধরে দাঁড়ায় সার করে। বুধা মাঝি কেরামত আলির তিন বছর আগের গানটা ধরলে সবাই খুব হৈ চৈ করে ওঠে এবং বুধার ভুলভাল কথার সঙ্গে কেউ কেউ বেসুরো গলা মেলায়। মুখ ভার শুধু আবিতনের বাপের। ধরা গলায় সে আক্ষেপ করে, 'হামার লাতিটা এটি মরিছিলো গো!

ও মুনসি, আপনে তার জন্যে দোয়া করেন।' মিলাদের শেষে অবশ্য তমিজের বাপের জন্যে কুদ্দুস মৌলবি দোয়া করেছে, আবিতনের ছেলের কথাটা তাকে কেউ মনে করিয়ে দেয় নি। এখন সে হাত তুলে পরওয়ার দিগারের দরবারে মাসুম শিশুটির জন্যে দোয়া করে। তবে ঐ স্মৃতি ঘাঁটতে মাঝিদের উৎসাহ নাই। এমন কি চোরাবালির ধারে তমিজের বাপের পাশে দাঁড়িয়ে প্রথম জালটা ফেলার জন্যে কালাম মাঝির প্রস্তাবটিও অগ্রাহ্য করে তারই ছেলে তহসেন, 'না না। আজ ওখানে যাবার দরকার কী? ইটখোলায় একটা ঝামেলা করে লাভ নাই।'

তবে ফকিরের ঘাটে কালাম মাঝি প্রথম জালটা ফেলায় তমিজকে দিয়ে, 'হাজার হলেও কোন বাপের বেটা সেটা দেখা লাগে। আবার বাঘাড় মাঝির লাতির বেটা তো, এর পরদাদার দোয়া লিয়া কাম শুরু করলে বরকত হবি।'

বৈশাখ মাসে তমিজের হাতে কৈ জাল দেখে অনেকেই ঠাট্টা করছিলো। বিলে পানি কম, এখন ওই জাল দিয়ে সে করবেটা কী। কিন্তু বাঘাড় মাঝির ওয়ারিশের হাতে ওই জালে ঠিকই ধরা পড়ে বারোটা কৈ মাছ, তার নয়টাই পাকা কৈ। সেগুলোর লালচে আভা লাগে তমিজের কালো গালে।

অবশ্য তার জালে মাছ পড়তে পড়তে আবিতনের বাপের তৌড়া জালে ধরা পড়েছে রুই কাতলের মাঝারি আকারের কয়েকটা বাচ্চা। বেশিরভাগ মাঝির জালে কিছু না কিছু মাছ উঠলোই। যাদের তেমন কিছুই ওঠে না, তারা পলো দিয়ে, বড়শি দিয়ে পুঁটি, খলসে, ট্যাংরা, এমন কি ছোটো পাবদা পর্যন্ত ধরে। পাকুড়গাছশূন্য পাকুড়তলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছিলো মাঝিরা। কিন্তু তহসেন তাদের থামিয়ে দেয়, 'আজ ওদিকটা থাক।'

দুপুরবেলা শেষ হতে না হতে কালাম মাঝির ভাগ্নে বুধা মাঝি সবাইকে বলে, 'এখন তোমরা থামো গো। আর মাছ ধরা হবি না।' কালাম মাঝির বাড়ির ঘাটে নতুন আমগাছের নিচে কয়েকটা কলাপাতা পেতে বুধা জোরে হাঁক দেয়, 'এটি সোগলি মাছ দিয়া যাও। যা ধরিছো তার ছয় আনা কর‍্যা মাছ ঢালো।'

মাছ ধরার উৎসাহে মাঝিরা এই আহ্বান কানে তোলে না। কিন্তু বুধার ডাকটি বারবার শুনে এবং তাতে হুকুমের স্বর পেয়ে সেদিকে তাদের মন দিতেই হয়। মাছ ধরলো, এখন আবার মাছ দিতে হবে কাকে?

আবিতনের বাপ বুধাকে 'ওংকা চিক্কুর পাড়িস কিসক রে?' জিগ্যেস করে নিজেই খুব জোরে চিৎকার করে।

কালাম মাঝি এতোক্ষণ এদের সঙ্গেই ছিলো। একটু আগে সে বাড়ির ভেতরে গিয়েছিলো। এখন ফিরে এসে বলে, 'বাপু, আজ মাঝিগোরে বিল ফেরত পাবার পয়লা দিন। খাজনা টাজনা কিছু লাগবি না। মাছ যা ধরিছো তার ছয় আনা, না হয় চার আনা, কিছু না হলে অন্তত দুই আনা ভাগ হ'মাক দিয়া যাও।'

তিন বছর আগে এই বিলে মণ্ডলের অধিকার অগ্রাহ্য করে জাল ফেলার কথা মনে পড়ে আবিতনের বাপের। নাতির জন্যে তার শোক খুঁচিয়ে তোলার চেষ্টা কারো কাছে আমল না পাওয়ায় সে শোধ নিতে চায় এইভাবে, 'শালা মাঝিগোরে আবার খাজনা দেওয়া কী? মাঝির আবার খাজনা লিবি কেটা রে?'

নুলা ভিকুর পাঁচটা ট্যাংরার দুটোই যদি দিতে হয় তো তার আর থাকে কী? সে নিম সমর্থন করে আবিতনের বাপকে, 'খাজনা কিসের গো? কালাম মিয়া না কলো, মাঝিগোরে বিল মাঝিরাই মাছ ধরবি? তো এখনো মণ্ডলেক পয়সা দিয়া মাছ ধরা লাগবি?'

ফকিরের ঘাটে শ্যাওড়া গাছের নিচে জমায়েত মাঝিদের সবাই এই নিয়ে চ্যাঁচামেচি শুরু করলে ঠিক কে কোনটা বলছে বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে।

'মণ্ডল বিল পত্তন লিছিলো লায়েবেক ঘুষ দিয়া। শালা লায়েব তো শুনি ভাগিছে। কিসের লায়েব, কিসের পত্তন?'

'লায়েব? আরে পাকিস্তানে জমিদারিই থাকিচ্ছে না। কিসের জমিদার? তার আবার পত্তন দেওয়ার ক্ষমতা আছে নাকি?'

'পাকিস্তানেত আবার জমিদার আর লায়েবেক পোঁছে কেটা?'

এর মধ্যে চলে আসে তহসেন দারোগা। লুঙিপরা আর খালি পায়ে থাকলেও তার হাতে ঘড়ি, সাদা শার্টের পকেটে সিগ্রেটের প্যাকেট। গলা এতোটুকু উঁচু না করে সবাইকে সে বোঝায়, 'বাবা এই বিল ইজারা নিয়েছে। বিলের মালিকানা— ।'

কালাম মাঝি তাড়াতাড়ি তাকে থামায়, 'রাখো, হামি কই। শোনো, বিল তো হামি ইজারা লিছি। দস্তুরমতো টাকাপয়সা খরচ কর‍্যা ইজারা লিছি এই বৈশাখ মাস থ্যাকা। মণ্ডলের কবজা থ্যাকা বিল খালাস করতে হামার খরচ তো কম হয় নাই বাপু। হামাক খাজনা না দিলে হামার চলবি ক্যাংকা কর‍্যা?'

আবিতনের বাপ বলে, 'সেই পয়সা না হয় হামরা সোগলি মিল্যা তুল্যা দেই। তো খাজনা চাও কিসক? খাজনা হলে তো এই বিলেত জাল ফেলালেই ট্যাকা দেওয়া লাগবি। না কী?'

তহসেন এবার এদের মূর্খতায় বিরক্ত হয়, 'অতো কথা কিসের? বিল তো বাবা ইজারা নিয়েছে। রীতিমতো দুই বছরের টাকা জমা দিয়ে ইজারা নেওয়া হলো। এখন খাজনা না দিয়ে বাবা কাউকে মাছ ধরতে দেবে কেন?'

তহসেনের কথায় কালাম মাঝির অস্বস্তি হলেও ছেলের ন্যায্য কথা সে অনুমোদন করে। তবে তহসেনের দারোগাগিরি এখানে করাটা ঠিক নয়। মাঝির জাত বড়ো ত্যাঁদোড়। কোন কথায় যে কী করে বসে তার ঠিক নাই। তমিজকে হাত করলে সেই বরং সবাইকে বুঝিয়ে বলতে পারবে। তাকে একটু সরিয়ে নিয়ে কালাম মাঝি ফিসফিস করে বলে, 'তমিজ, দেখ তো ভাই ইগলান কী কচ্ছে? তুই একটু ভালো কর‍্যা বুঝায়া দে না বাপু!'

তমিজ মাঝিদের বোঝাবে কী, সে তো নিজই ধন্দে পড়েছে। মণ্ডলের ইজারার মেয়াদ শেষ, এখন এই বৈশাখ থেকে বিল তো ফিরে আসবে মাঝিদের হাতে। তা হলে খাজনা দিতে হবে কাকে? সে জিগ্যেস করে, 'বিল তো মাঝিগোরে হাতেত ফির‍্যা আসিছে। না কী?'

'আসে নাই? আসে নাই?' কালাম মাঝি গলা চড়ায়, 'হামি মাঝি লই? হামার বাপদাদা চোদ্দ পুরুষ মাঝি আছিলো না? তোরা মাঝি লোস? তোরা হামার রক্তের আত্মীয় লোস? তা হামার নামে বিল পত্তন লিছি। তা হলে বিল কি মাঝির কাছে আসলো না?'

বাপকে থামিয়ে তহসেন বলে, 'সম্পত্তি তো কারো না কারো নামেই থাকতে হয়। তো বাবা এটা দুই বছরের জন্যে কিনে নিয়েছে। সামনের বার আপনারা কেউ নেবেন। এখন যে মাছ ধরলেন তার সামান্য একটা ভাগ এখানে দিয়ে যান। এর পর থেকে মাছ ধরতে হলে খাজনা দিয়ে জাল ফেলবেন। একটু তাড়াতাড়ি করেন। খালি খালি ঝামেলা করে লাভ কী?'

তার শুদ্ধ কথা ও বলার ভঙ্গিতে মাঝিরা একটু থমকে যায়। কয়েক মিনিট কেউ কথা বলে না। তহসেন হাতের ছাতাটা খুললো। আবিতনের বাপ হঠাৎ সামনে এসে

তার খলুই উপুড় করে দেয় কলাপাতার ওপর। কালাম মাঝি বলে, 'ব্যামাক মাছ দাও কিসক? তোমার ভাগ তুমি লিয়া যাও।' আবিতনের বাপ শোনে না, হনহন করে চলে যায় নিজের বাড়ির দিকে। কালাম মাঝি ফের ডাকে, 'ও আবিতনের বাপ।' আবিতনের বাপ ফিরে তাকায় না। আরো দুই তিনজন মাঝি মাছের ভাগ দিয়ে গেলেও হঠাৎ ঝড়ের আভাস পেয়ে কিংবা এর সুযোগ নিয়ে খলুই ও জাল নিয়ে আর সবাই হাঁটা দেয় নিজের নিজের ঘরের দিকে। ছোটো ছেলেদের সবাই হঠাৎ করে দৌড় দেয়, তাদের অন্তত দুইজন আছাড় খেয়ে পড়লে খলুইয়ের মাছ পড়ে যায় মাটিতে। তমিজ কী করবে, মাছ ঢেলে দেবে কি-না, এই নিয়ে দোনোমনো করতে করতে ঝড় শুরু হয়ে যায়, সেও ছুট দেয় নিজের ঘরের দিকে।

এর মধ্যে ঝড় শুরু হয়েছে বেশ ভালোভাবেই। কালাম মাঝির ঘরের বারান্দা থেকে তহসেনের চিৎকার শোনা যায়, 'বুধা, কে কে মাছ দিয়ে গেলো সেই হিসাব রাখলি না কেন? পরে যখনি কেউ মাছ ধরতে আসে, হিসাব করে আজকের পাওনা আদায় করা হবে—'

কুলসুমের ঘরে মাটির একটা হাঁড়িতে কৈ মাছগুলো পনিতে জিইয়ে রাখতে রাখতে তমিজ বলে, 'কাল শলুক দিয়া নাউ দিয়া পাক করো। পাকা কৈ!'

এর মধ্যে ঝড়ের পর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সোঁদা সোঁদা গন্ধে মাথা ভরে যায়, এই গন্ধে আবার খিদেও লাগে। কিন্তু এখন তমিজের যাওয়া দরকার হুরমতুল্লার জমিতে। এমন সুন্দর বৃষ্টি হলো, এখনো সন্ধ্যা হয় নাই, মোষের দিঘির ঢালে জমিটায় একটা চাষ দেওয়া যায়।

কুলসুম বলে, 'এখন আবার জমিত যাবা? ভাত খায়া যাও।'

বিলে যাবার আগে ঘরে বসে কড়কড়া ভাত খেয়েই বেরিয়েছিলো, গরম ভাতের লোভে তমিজ ফের বসে পড়ে।

খেয়ে উঠে মাটির হাঁড়ি থেকে বেছে বেছে পাঁচটা মাছ খলুইতে তুলে তমিজ রওয়ানা হলে কুলসুম বলে, 'মাছ কয়টা কুটি লেও?'

'পাঁচটা মাছ কালাম মাঝিক খাজনা দেওয়া লাগবি।' বলেই সে মিথ্যা কথাটা শোধরায়, 'কিসের খাজনা? অর বাপের সম্পত্তি নাকি? খাজনা দেওয়া লাগবি কিসক?' এইসব ঝাঁঝালো কথা বলে বলে তমিজ খাজনা না দেওয়ার সিদ্ধান্তটি পাকা করে। তারপর বলে, 'দেখি, পরামাণিক বুড়া একদিন কৈ মাছ খাওয়ার হাউস করিছিলো।' লাজুক খুশিতে সারা মুখ তার হালকা কালো আলোতে চুবিয়ে নিয়ে তমিজ বেরিয়ে পড়ে।

৪৫

কালিতলায় আবদুল আজিজের নতুন বাড়ি চিনতে কেরামত আলির বেগ পেতে হয় না। কার্তিক ভাদুড়ির বাড়ি বলতেই রিকশাওয়ালা এক কথায় চিনে ফেললো। মাধবীলতায় ছাওয়া কাঠের গেটের সামনে রিকশা থেকে নামতে কেরামতের সংকোচ হয়, এই বাড়িতে রিকশায় আসাটা বোধ হয় বেয়াদবিই হয়ে গেলো! গেটের পরে ঘাসে ঢাকা

ছোটো মাঠ পেরিয়ে বারান্দা, বারান্দায় সতরঞ্চির ওপর বসে রয়েছে ১৫/২০ জন মানুষ। আবদুল কাদের কেরামতকে দেখে হাসলো।

ছোটোখাটো দালানটার ছাদের দিকে দেখতে দেখতে কেরামত সহজ হতে চেষ্টা করে। ছাদের রেলিঙের মাঝখানটা উঁচু, সেখানে সিমেন্টে খোদাই করা 'ওঁ' এবং এর নিচে লেখা 'শ্রীশঙ্করালয়' এবং তার নিচে '১৩০৭'।—এসবের কোনো কিছুই সাম্প্রতিক চুনকামে মুছে ফেলা যায় নি। রেলিঙটা না ভাঙলে ওগুলো ওঠানো মুশকিল।

'আরে আসো, আসো। বসে পড়ো। বাবর টেস্ট পরীক্ষায় ফার্স্ট হছে। স্কুলের স্যারদের একটু মিষ্টিমুখ করানো হচ্ছে আর কি।' আবদুল কাদের সরে বসে কেরামতকে বসার জায়গা করে দেয়।

মিষ্টির প্লেট সাবাড় হলে আসে চা। বাবরের মেধা ও শ্রম নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রশংসা ও উপদেশ পর্ব শেষ হলে শিক্ষকগণ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দ্রুত অবনতি সম্বন্ধে নিজেদের উদ্বেগ ও বেদনা জানাতে থাকে, কখনো একে একে, কখনো একসঙ্গে।ভালো টিচাররা সবাই চলে যাচ্ছে ইনডিয়া। স্কুল কলেজে কি তালা ঝুলবে নাকি? আবদুল আজিজ বিশেষভাবে উৎকণ্ঠিত : বাবর অঙ্ক কষতো অখিল বসুর কাছে, দিন পনেরো হলো তার বাড়িতে তালা ঝুলছে। শোনা যাচ্ছে অখিলবাবু চলে গেছে বালুরঘাট, তার বাড়ি একসচেঞ্জ করেছে এক মুসলমান রিটায়ার্ড সাব-ডেপুটির সঙ্গে।

শেরোয়ানি, পাজামা ও জিন্না টুপিপরা লম্বা ও রোগা হেডমাস্টারের কষ্টটা একটু বেশি। তার ব্যক্তিগত বন্ধু বলে কেউ থাকছে না। আবার স্কুলে পড়াশোনার মান ঠিক রাখতে তার হিমসিম খাবার জোগাড় হয়েছে।

হেডমাস্টারের কাছ থেকে একটু তফাতে বসেছিলো নীরেন লাহিড়ী, ২৫/২৬ বছরের যুবক, ওপরের ক্লাসে ভূগোল পড়ায়। বাবরের সবচেয়ে প্রিয় স্যার। নীরেন বারবার ওপরে তাকিয়ে বারান্দার ছাদের বিম, একদিকের দেওয়াল এবং অন্যদিকে বারান্দা ঘেঁষে পঞ্চজবা, টগর ও কামিনীর ফুলভরা গাছগুলো দেখছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে দেখা গেলো সামনের ছোটো বাগানে। বাড়ির সংস্কার করতে গিয়ে দোপাটি ও গাঁদা গাছগুলো চাপা পড়েছে বাঁশের নিচে, সে ঘুরছিলো ঐ জায়গাটায়। বাবর তাকে বারবার বলছিলো, 'চলেন না স্যার, ভেতরে চলেন। আমার পড়ার ঘরটা দেখবেন স্যার।' আবদুল কাদের বারান্দা থেকেই ডাকে, 'নীরেনবাবু, যান না, ভেতরে যান।'

নীরেন বারান্দায় ফিরে এলে আবদুল আজিজ বলে, 'বাবরের মুখে দিনরাত খালি নীরেন স্যারের নাম। যান, ওর পড়ার ঘরটা দেখে আসেন।' তারপর জিগ্যেস করে, 'আগে এদিকটায় আসেন নাই, না? আপনার বাড়িতো মালতিনগর, না? আপনারা রেল লাইন পারই হতে চান না।'

নীরেন কিছুক্ষণ ফাঁকা চোখে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'এটা আমার পিসিমার বাড়ি।'

'তাই নাকি? কার্তিকবাবু আপনার—।'

'পিসেমশাই। বড়োপিসেমশাই।'

'তাই নাকি?'

'পিসিমা মারা গেলো ফর্টি ওয়ানে, পিসেমশাই ফের বিয়ে করলেন। তারপরেও আমরা আসতাম। আর পিসিমা বেঁচে থাকতে তো প্রায় রোজই আসা হতো। আমার বড়োপিসিমা এই পঞ্চজবা, কামিনী লাগিয়েছিলেন। পিসিমার হাতের গাছ হতো! যা

লাগাতেন তাই হতো!' নীরেন লাহিড়ীর মনে হয় কথার ব্যামোতে পেয়ে বসেছে। তার প্রিয় শিক্ষক ও বর্তমান বস এই হেডমাস্টারের সামনে অনেক দিন মাথা নিচু করে বসে থাকাটা সে হঠাৎ করে পুষিয়ে নিতে যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে, 'আর পিসেমশাই লাগিয়েছিলেন কনকচাঁপার গাছটা। কলকাতা থেকে কলম নিয়ে এসে দুটো লাগান, একটা মরে গেলো, আর একটা বাঁচলো। কী সুন্দর ফুল যে হতো! ঐ যে ওদিকটায়, তাই না? গাছটা দেখছি না।' কনকচাঁপার গাছ খুঁজতে সে এদিক ওদিক তাকালে আবদুল আজিজ কৈফিয়ৎ দেয়, 'ওখানেই ছিলো। লম্বা গাছটা তো? পাঁচিল তোলার সময় গাছটা আর রাখা গেলো না।'

'অতো সুন্দর ফুলের গাছটা নষ্ট করলা? কী সুন্দর গন্ধ! ইসমাইল ভাইয়ের বাড়িতে দুইটা আছে।' কাদেরের এই আফসোসে আজিজ রাগ করলেও নীরেন লাহিড়ীর কাছে গাছ কাটার কারণ ব্যাখ্যা করে, 'এই বাড়িতে তো চুনকাম হয় নি বহুদিন। ঘরের দেওয়াল টেওয়াল সব নষ্ট হয়ে গেছিলো। পাশের বাড়ির সঙ্গে সীমানা নিয়ে গোলমাল, তাই পাঁচিল ছিলো না ওদিকে। পাঁচিল দেওয়ার সময়— ।'

বাড়ির সংস্কার ও উন্নয়নে নীরেনের উৎসাহ নাই, সে দাঁড়িয়েই থাকে। বাবর তাকে ভেতরে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলেও সে নড়ে না।

এর মধ্যে বড়ো রাস্তায় শোনা যায় 'নারায়ে তকবির' 'আল্লাহু আকবর' আওয়াজ। বারান্দার লোকজনের মধ্যে উসখুস শুরু হয়। এদের অনেকেই এই দুই বছর আগেও এই স্লোগানে উত্তেজিত, এমন কি উদ্দীপ্ত হয়েছে। আবদুল কাদের উঠে দাঁড়ায়, 'শালা শুক্কুর শেখ বোধহয় এসেছে। শালা রিফিউজিদের নিয়ে গোলমাল পাকাবার তালে আছে।'

একজন শিক্ষক বলে, 'গত কয়েক দিনে টাউনে খালি রিফিউজি আসছে। যতীন রায়ের বাড়িটা রিফিউজিতে ভরে গেছে।'

'যতীন রায়? আমাদের যতীনবাবু? তাঁর বাড়ি কি রিকুইজিশন করা হয়েছে নাকি?' হেডমাস্টারের এই উদ্বেগের জবাবে কাদের বলে, 'উপায় কী? এতো এতো রিফিউজি আসছে। তাদের শেলটার দিতে হবে তো।'

হেডমাস্টার সন্তুষ্ট নয়, বিড়বিড় করে বলে, 'এতো বড়ো লিডার। তাঁর মতো লোকের বাড়ি নিয়ে নেওয়া— ।'

এই আক্ষেপের দিকে খেয়াল না করে কাদের নির্দেশ দেয়, 'আপনারা কয়েকজন আমার সঙ্গে আসেন। হিন্দু পাড়া, শুক্কুর আলি যা তা কিছু করে ফেলবে।' হিন্দু শিক্ষকদের সে অভয় দেয়, 'আপনারা বরং বাড়ির-ভেতরে যান। নিশ্চিন্ত থাকেন।'

কয়েকজন নিয়ে সে বেরিয়ে গেলে হেডমাস্টারও তাদের সঙ্গে যায়।

বাইরের 'নারায়ে তকবির আল্লাহ আকবর'-এর বুলন্দ আওয়াজের সাড়ায় এই বাড়ির ভেতর থেকে মেয়েলি গলার তীক্ষ্ণ চিৎকারে লোকজনের কাপড়চোপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ও কোঁচায় কোঁচায় এবং বারান্দায় ঝুঁকে পড়া পঞ্চজবা ফুলের লাল আভায়, টগরের সাদা পাপড়িতে, এমন কি কেটে-ফেলা কনকচাঁপার হারিয়ে-যাওয়া ছায়ায় শিরশির করে ছমছমে কোলাহল, 'ও বাবরের বাপ! ও বাবর! আসিচ্ছে রে, আসিচ্ছে। ভাইজানের গলাত কোপ তুললো রে। হুমায়ুনেক টান দিয়ে লিয়া আসো গো। ও বাবরের বাপ।'

আবদুল আজিজের স্ত্রীর ব্যারামের কথা বাইরের লোকদের মধ্যে জানে কেবল নীরেন। বাবরের মুখে তার মায়ের কষ্টের কথা শুনে ছেলেটির মাথায় সে হাত রেখেছে

কয়েকবার। কিন্তু মহিলার সরাসরি আর্তনাদ নীরেনকে বড়ো বিভ্রান্ত ও বিব্রত করে তোলে। ছেলেটিকে কোনোভাবে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাবনাও তার মাথায় আসে না 'নারায়ে তকবির'-এর সঙ্গে হামিদার চিৎকার বাড়ে পাল্লা দিয়ে। আবদুল আজিজ বলে, 'মুশকিল, রাস্তায় সামান্য গোলমাল হলেই বাবরের মা অসুস্থ হয়া পড়ে। কলকাতায় হিন্দুরা তার ভাইকে মারলো—।' বাবরের শিক্ষকদের মুখেচোখে ভয় দেখতে পেয়ে সে থামে।

'ভাইজান, তাবিজ দিছিলেন?' আজিজের কানের কাছে মুখ নিয়ে জিগ্যেস করে কেরামত আলি। সে এসেছে ফকির চেরাগ আলির বইটা নিতে। বইটা হাতছাড়া করার পর থেকে কুলসুমের সঙ্গে সে দেখাই করতে পারে না। তার স্বামী মরেছে, তমিজটা বাইরে বাইরেই থাকে। কুলসুমের সঙ্গে দেখা করার, কথা কওয়ার কতো সুযোগ! অথচ তার ঘরে গিয়ে দাঁড়াবার জো নাই। কুলসুমের এক কথা, 'তুমি হামার দাদার বই বেচ্যা খাছো। তোমার ভালো হবি না।' কেরামতের পদ্য আর আসে না, 'খোয়াবনামা'র মধ্যে কী যে আছে, তার হাতে পড়লেই কপাল খুলে যাবে। এখানে এসে সে একটু সুযোগ খুঁজছিলো। গোলমালের মধ্যে যাওয়াটা নিরাপদ নয় বলে কাদের সবাইকে ডাকলে সে মুখ লুকিয়েছিলো মোটা থামের আড়ালে। এখন আজিজকে বাবরের মায়ের কথা জিগ্যেস করলে আজিজও মহা বিরক্ত হয়ে বলে, 'দূর! ডাক্তারবদ্যি ছেঁচা খাওয়ালাম। তাবিজ দিলো আমার মামাশ্বশুর। কৈ, তার ব্যারাম তো খালি বাড়েই দেখি।'

আবদুল আজিজের কোঁচকানো ভুরুতে দমে গেলেও কেরামত আলি মরিয়া হয়ে বুকে বল সঞ্চয় করে, 'ফকিরের ঐ বইটা যদি পাই তো না হয় একটু চেষ্টা কর‍্যা দেখা গেলো নি। কেতাবটা দেবেন?'

'কেতাব? কিসের কেতাব?' আবদুল আজিজ একটু ভেবে বলে, 'তোমার ঐ ছেঁড়া বইটা? তমিজের বাপের বই? আরে উগলান হাবিজাবি শোলোক শূন্যাই তো তার এই হাল। আমার মামাশ্বশুর কলো—।'

মামাশ্বশুরের উক্তি প্রকাশ না করেই সে জানায়, 'নয়' বাড়িত ওঠার সময় গোলমালের মধ্যে বইটা যে কোথায় গেলো! আরে কতো দামি দামি জিনিস হারালো। আর তোমার ঐ বই!'

আবদুল আজিজ বাড়ির ভেতরে লোকজনের ও তার স্ত্রীর খোঁজখবর নিতে গেলে কেরামত আরেকটি সুযোগ নেয়। বাবরকে সে কাছে টেনে বলে, 'বাবা, বইটা তোমার আব্বা কোটে থুছে তুমি কবার পারো?'

তার কথা শুনে এবং তাকে আরো কিছু প্রশ্ন করে বাবর মনে করতে পারে, 'ও হ্যাঁ, আপনার ওই বই? খোয়াবনামা না কী যেন নাম না?—বইটা তো আব্বা কাউকে দেখতেই দেয় না। ওই বই হাতে পাওয়ার পর আব্বা নাকি এতো সস্তায় এই বাড়ি কিনতে পারলো! তারপর—।'

'বইটা তোমার আব্বা কোথায় রাখিছে কবার পারো?'

'না। তা ওই বই দিয়ে আপনি করবেন কী? পিকিউলিয়ার বই! কী সব স্বপ্ন টপ্ন নিয়ে আজগুবি কথা। আবার লাইন টানা স্কয়ার, ট্রায়াঙ্গল,—মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না।' বাবরের হাসিতে বিজ্ঞানমনস্ক বালকের অবজ্ঞা। তা ছাড়া তার সঙ্গে কথা চালিয়ে যাওয়াও মুশকিল। এই বাড়ির উত্তর দিক থেকে 'বাঁচাও! বাঁচাও!' আর্তনাদ এবং তার জবাবে বাড়ির ভেতর থেকে হামিদার 'ও বাবরের বাপ, ভাইজানেক কোপ মারলো গো!' চিৎকারে সবাই চুপ মেরে গেছে। আবার এর মধ্যে কে যেন রাস্তা দিয়ে বলতে বলতে

দৌড়ে যায়, 'বোসবাড়ি লুট হলো গো!' আবদুল কাদেরের এক কর্মী এসে বলে যায়, 'আপনারা কেউ বাইরে যাবেন না। এখানে থাকলে ভয় নাই। পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে।' সে ফিরে যেতে যেতে জানিয়ে যায়, লুটের সময় বাধা দিতে গেলে শুক্কুরের লোকদের হাতে বুকে ছুরি খেয়ে সিঁড়ির ওপর পড়ে রয়েছে ফণীবাবু। বড়োভাই মণীন্দ্র বোস আগেই সরে পড়েছে, সে বোধহয় লুকিয়ে রয়েছে কোথাও।

এসব খবর আসছে তো আসছেই। এমন সময় এক গাদা ছেলেবুড়ো ও মেয়েমানুষকে নিয়ে আজিজের বাড়িতে ঢোকে কাদের। আজিজ যে কী করবে বুঝতে পারে না। তার মায়ের পেটের ভাই তার নতুন বাড়িটা মনে হয় সহ্য করতে পারে না, যতো সব উৎপাতের আখড়া বানাবার তালে আছে। দেখো, এর পরেই আবার হেডমাস্টারের নেতৃত্বে মণীন্দ্র বোস তার দুই ছেলে ও খুড়তুতো ভাই মিলে চ্যাংদোলা করে নিয়ে আসে এক বুড়িকে। মহিলা হলো মণীন্দ্র বোসের বিধবা পিসি, সিঁড়ি থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়ে নিচে পড়ে মাথা ফাটিয়ে ফেলেছে। তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সিঁথি খাঁ খাঁ করে রাখার পুণ্যে আজ তার মাথা ভরা তরল সিঁদুর। ভেতরের ঘরে একটা তক্তপোষে তাকে শুইয়ে দিতেই বয়স, লিঙ্গ ও সর্বোপরি জাতের কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে হামিদা 'ভাইজান, ভাইজান গো' বলে চিৎকার করে তার বুকে লাফিয়ে পড়তে গিয়ে পড়ে যায় মেঝেতে এবং কাণ্ডজ্ঞানের সঙ্গে হারায় তার এমনি জ্ঞান। দুইজন বেহুঁশ মহিলার গায়ে গা লাগে নি বলে পরম নিষ্ঠাবতী ও ভক্তিময়ী পিসি মৃত্যুর মুহূর্তেও ম্লেচ্ছাস্পর্শমুক্ত থাকায় মণীন্দ্রনাথ বসু স্বস্তি পায় এবং এই অবসরে তার তিন পুরুষের বনেদি বাড়ির মূল্যবান সম্পত্তি নিয়ে উৎকণ্ঠিত হবার সুযোগটির সদ্ব্যবহার করে। মিনিট পঁচিশেক পর তার ছোটোভাই ফণীন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত তার উৎকণ্ঠার টার্গেট অপরিবর্তিত ছিলো।

নীরেনকে এর আগেই বাবর নিয়ে গেছে তার পড়ার ঘরে। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ভেতরে ঢুকতে নীরেনের বাধো বাধো ঠেকছিলো, পিসি থাকতে এই ঘরে সে কখনো ঢুকতে পারে নি। এটা পিসিমার ঠাকুরঘর। খুব ছোটোবেলায় চুপ করে এই ঘরে ঢুকে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো পিসিমার পিঠে। পূজা ছেড়ে পিসিমা তাকে কোলে নিয়ে বারান্দায় তার মায়ের কোলে তুলে দিয়ে বলেছিলো, 'দুষ্টু ছেলে, তোমার জন্যে আমাকে এখন ফের ঠাকুরের ভোগ রাঁধতে হবে।' সেই থেকে ঠাকুরকে নীরেন একটু হিংসাই করতো। বড়ো হতে হতে সেই হিংসা আর রাগ তার আপনাআপনি ঝরে যায়। ঠাকুর কেউ থাকলে তো তার ওপর হিংসা হবে! ঠাকুরদেবতা নিয়ে স্কুলে ছেলেদের সামনে নীরেন কম ঠাট্টা করে না। বাবরদের ক্লাসেই একদিন বলেছিলো, পৈতার অসম্মান করলে নাকি মাথায় বজ্রপাত ঘটবে। তা কলেজে ভর্তি হয়েই তো পৈতা দিয়ে সে খাতা সেলাই করেছে। কৈ তার মাথায় তো একটা দেশলায়ের কাঠিও জ্বললো না। আর এখন তার প্রিয় ছাত্রের দেওয়াল জুড়ে টাঙানো পৃথিবীর মানচিত্র, আলমারির ওপর গ্লোব, টেবিলে ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স, রঙের বাক্স, বই খাতাপত্র। তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসগুলো দেখেও ঠাকুরের অভাবে নীরেনের বুকটা পিসিমার জন্যে হু হু করতে থাকে।

পুলিসের গাড়ি এসে জীবিত, আহত, মৃতপ্রায় ও নিহত সবাইকে নিয়ে গেলে আবদুল আজিজের বাড়িতে প্রকট হয়ে ওঠে হামিদার চিৎকার। জ্ঞান ফিরে পেয়ে লাভ হয় নি, তার পাশ থেকে হুমায়ুন অথবা আহসানকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে সে চিৎকার করে বিলাপ করতে থাকে।

আজিজ তার স্ত্রীর ব্যারামে ত্যক্ত হয়ে বাড়ির সামনে গেটের কাছে গেলে তাকে অনুসরণ করে আবদুল কাদের। বড়োভাইয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে সে বলে, 'বাড়ির খবর শুনিছেন?'

এই প্রশ্নে সে বাড়ির প্রতি আজিজের উদাসীনতাকে খোঁটা দেয়। আজিজ একটু বিব্রত হলেও পরিবারের নতুন সম্পত্তি হাতাবার জন্যে কাদেরের সন্দেহজনক প্রবণতার দিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলে, 'মুকুন্দ সাহার বাড়ির চাবিটাবি তুই রাখিছিস? দলিল দস্তাবেজ ঠিক রাখিছিস?'

'চাবি বাজানের কাছে। দলিলও তার সিন্দুকের মধ্যে। পাহারা মোতায়েন করিছি আমি।'

রাস্তায় বেরিয়ে কাদের দেখে তার পাশে পাশে চলছে কেরামত।

৪৬

এদিক ওদিক থেকে নানারকম খবর পেয়ে কেষ্ট পাল আসল খবর জানতে আসে গোলাবাড়ি হাটে। 'ক্যা রে বৈকুণ্ঠ, বাবু কোটে? ইগলান কি সোমাচার শুনিচ্ছি, ক তো?'

কেষ্ট পালের সঙ্গে পালপাড়ার আরো কয়েকজন। এরা সবাই জিগ্যেস করতে শুরু করলে বৈকুণ্ঠ ঘাবড়ে যায়, আমতা আমতা করে বলে, 'বাবু তো গেছে রাণাঘাট। বাবুর শ্বশুর সিরাজগঞ্জ থ্যাকা রাণাঘাট যাবার সময় কুটি য্যান মোসলমানের হাতে খাম হছে, পিঠেত চোট পাছে, বাঁচে কি না বাঁচে। বাবু তাক দেখবার গেলো।'

'পরিবার?'

'সোগলিক লিয়া গেছে। শ্বশুরের কী হয় না হয়!' পালদের স্তম্ভিত মুখ দেখে সে তাদের আশ্বাস দেয়, 'রাণাঘাট কয়দিন থাকবি। তারপরে কলকাতা যাবি। কলকাতা থ্যাকা আসতে দিন বিশেক লাগবার পারে।'

'ইগলান বিত্তান্ত বাদ দে', কেষ্ট পাল চড়া গলায় বলে, 'বাবু বলে বাড়ি বেচ্যা দিছে?'

এই গুজবটা বৈকুণ্ঠ শুনেছে কাল বিকালে। আলিম মাস্টার বলে গেলো, হাজারখানেক টাকা নিয়ে মুকুন্দ সাহা নাকি তার দুই বিঘা জমির ওপর বাড়ি, মানে একটা আটচালা আর দুটো চারচালা ঘর, দুইটা কাঁঠাল গাছ, ভালো জাতের আমগাছ গোটা বিশেক, চারটে লিচু গাছ এবং একটা করে বিলাতি আমড়া, জামরুল, কামরাঙা আর মেলা কূলগাছের বাগান আর পুকুর বেচে গেলো শরাফত মণ্ডলের কাছে। একে মোসলমান, তায় দাপটের মানুষ, ওদের হাত থেকে লুট করার সাধ্যি কারো হবে না।

'আরে চাবি তো নিলো লুট কর‍্যা' পালপাড়ার অর্জুন এই কথা বললে কেষ্ট পাল তাকে থামায়। বৈকুণ্ঠকে ফের জিগ্যেস করে, ' দোকানের ব্যবস্থা কী করিছে?'

'হামাক কলো, দোকান ভালো কর‍্যা দেখিস। ভালো দর পাস তো মাল যা আছে ব্যামাক ছ্যাড়া দিস। কলকাতা থ্যাকা মালের অর্ডার দিয়াই আসবি।' মুকুন্দ সাহার ওপর

বৈকুণ্ঠের আস্থা এখনো অটুট, 'দোকান ছাড়ার মানুষ তাঁই লয়। দোকান হলো তার জান। দেখো না, কয়টা দিন যাক। গোলমাল, কাটাকাটি কমুক। শ্বশুরের কী হলো তাও তো জানি না। কয়টা দিন দেখি। আসার দেরি হলে বাবু হয়তো দুই চারের মধ্যে টেলিগ্রাম করবার পারে।'

পালপাড়ার দল কাদেরের দোকানে গিয়ে গফুরকে একলা পেয়ে আসল খবর জানতে চায়। বলবে না বলবে না করেও সে শেষ পর্যন্ত বলে, 'ছোটোসাহেব ন্যাশনাল গার্ডের দুইটা মানুষ সাথে দিছে, তারা বর্ডার পার করায়া দিয়া আসিছে।'

'ভক্ষক গেছে রক্ষকের কাম করবার?' পাকিস্তান ন্যাশনাল গার্ডের লোকদের তৎপরতা নিয়ে অসন্তোষ জানাতে কেষ্ট পাল প্রবাদটির উল্টো ব্যবহার করেও কেষ্ট পালের উদ্বেগ যায় না, 'মালপত্র ব্যামাক লিবার পারিছে?' 'ব্যামাক। সোনাদানা তো বাবুর কম আছিলো না। কাঁসার বাসনকোসন, তামার বাসন, পূজার ঠাকুর,– জিনিস বাদ দেয় নাই একটাও। বাড়ির দর কম হলে কী হয়, ব্যামাক হিসাব করলে তার লাভই হছে।'

কেষ্ট পালের উৎকণ্ঠা, হতাশা ও ক্ষোভ বাড়ে চতুর্গুণ। তার মোটাসোটা পা দুটো কাঁপতে লাগলে গফুর তার পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়। বৈকুণ্ঠ অবশ্য বারবার বলে, 'আরে বাপু দুইটা দিন যাক না। বাবুর ব্যবসা আছে না?'

বৈকুণ্ঠের কথা কেষ্টর কানে ঢোকে কি-না সন্দেহ। গফুর জানায়, বাড়ি বিক্রির কাজটা সাহাকে করতে হয়েছে একটু গোপনেই, নইলে কালাম মাঝি টাকাপয়সা না দিয়েই তার সম্পত্তি গ্রাস করে ফেলতো।

কেষ্ট পাল এখন করেটা কী? লাঠিডাঙা কাছারির দিকে যাবার কথা বলতে গফুর জানায়, 'লায়েবাবাবু কাচারিত আসেই না।'

কেষ্ট পালের তরুণ সঙ্গী একজন তাড়া দেয়, 'টাউনেত চলো। লায়েববাবু না থাকলেও সতীশ মুক্তার আছে।'

'টাউন বলে গরম হয়া আছে', গফুর কলু হুঁশিয়ার করে দেয়, 'ইনডিয়ার রিফিউজি আসিচ্ছে দলে দলে। কখন অরা কী করে, কওয়া যায় না।'

'কী করবার পারবি?' অর্জুন পাল বীরত্ব দেখালেও পরবর্তী বাক্যেই তার তেজ অর্ধেক ক্ষয় হয়ে যায়, 'পোড়াদহ মেলার আর তিন দিন। কাছারিত থ্যাকা বরাদ্দ আসে নাই, সাহামশাই নাই।'

বিকালবেলাতেই কালাম মাঝি উঠে আসে মুকুন্দ সাহার বারান্দায়। বৈকুণ্ঠকে ডেকে বলে, 'তোর বাবু খুব নিমকহারাম রে! বাড়িঘর তো দেওয়ার কথা হামাক। হামার বেটা পুলিস ফোর্স সাথে দিয়া বর্ডার পার কর‍্যা দিবি, কথা পাকা হয়া গেলো। তো আজ কেষ্ট পালের কাছে শুনি অন্য কথা। হামি বায়নাও করলাম পাঁচশো ট্যাকা, দোকান দিবি, বাড়ি ঘর ব্যামাক দিবি। পাঁচ হাজার চায়, তা হামি তিন দিবার চাছিলাম। মণ্ডল কতো দিছে রে?'

পালরা চলে গেলে অনেকদিন পর ছিলিমখানেক গাঁজা খেয়ে বৈকুণ্ঠ চমৎকার একটা ঘুম দিয়ে উঠেছিলো। মেলার দিন ছাড়া এসব নেশা সে ছেড়ে দিয়েছে বহু আগে, আজ কী হলো, বাবুও নাই, চুপচাপ কয়েকটা সুখ টান দিয়ে সে বেশ মৌজে আছে। এখন তার মুখভরা পান। মুখে জর্দা ঢেলে ঠোঁটে পিক চেপে রেখে জবাব দেয়, 'কী যে কও মাঝিকাকা। বাবুর ঠাকুর্দার আমলের দোকান, সেটা ছ্যাড়া যাবার পারে? ব্যবসাপাতি ঠিকই চলিচ্ছে। যদি কিছু লেওয়ার থাকে তো কও। সস্তায় ছ্যাড়া দেই।'

কম দামে জিনিস কেনার টোপ গেলার বান্দা কালাম মাঝি নয়। 'প্যাচাল পাড়িস না।' সাহা ও বৈকুণ্ঠের দেশপ্রেমে সে কটাক্ষ করে, 'তোরা ভাত খাস এটি আর কুলিপানি খাস ঐপার। এটা কেমন কথা রে? বেটাবেটি রাখবি ইনডিয়াত, আর ব্যবসাপাতি করবি পাকিস্তানেত?'

কালাম মাঝি বলে, এই দোকান তো তার দখলেই আসবে। তবে আরো কয়েকটা দিন সে দেখবে। দেরি হলে বৈকুণ্ঠকেই সে পাঠাবে মুকুন্দ সাহাকে ডেকে আনতে। বৈকুণ্ঠের রাহা খরচ বহন করবে সেই।

বৈকুণ্ঠ রাজি হয় না, 'তাই কী হয়? বাবু কোটে না কোটে থাকে, কেটা জানে? হামি কলকাতা যাই নাই জেবনে, বাবুর শ্বশুরবাড়ি, সেটাও দেখি নাই।' পানের পিক একটু ফেলে সে ফের বলে, 'কয়টা দিন সবুর করো। পাকিস্তান কও হিন্দুস্থান কও, ইগলান কী হয় দেখা যাক।'

পাকিস্তানের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বৈকুণ্ঠের এরকম সন্দেহে কালাম মাঝির দেশপ্রেম চোট খায়, 'বৈকুণ্ঠ, কথাবার্তা সামলায়া কোস। যে পাতেত খাস, সেই পাতেত তোরা হাগিস! ফল ভালো হবি না কচ্ছি।'

বৈকুণ্ঠের গাঁজা কিংবা পানজর্দার মৌজ এতেও কাটে না। এমন কি পরদিন তমিজ 'বৈকুণ্ঠদা, মানুষের মাথা খারাপ হওয়া আরম্ভ হছে, কাত্তিক মাসের কুত্তাগুলার লাকান মানষে এখন পাগলা হয়া ঘোরে। তোমার এ্যানা হুঁশিয়ার থাকা লাগে।' বললে জেগে ওঠে তার পূর্বপুরুষের তেজ। পানের পিক গিলে বুক চিতেয়ে সে বলে, 'এটি হামাক হুঁশিয়ার থাকা লাগবি কিসক রে? এই হাট পিতিষ্টা করিছিলো কেটা সেই খবর রাখিস?' খবর রাখতে বয়ে গেছে তমিজের। বৈকুণ্ঠ গোলাবাড়ি হাটের প্রতিষ্ঠাতার নাম উল্লেখ না করে তোলে তার পুরনো প্রসঙ্গ, 'শোন, হামার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা, না-কি তার বাপ নাকি তারও ঠাকুর্দা', যথাযথ প্রজন্মটিকে চিহ্নিত করতে না পারলেও তার কিছু এসে যায় না, গোরা সেপাইদের সঙ্গে ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে তাদের লড়াইয়ের কাহিনী সে বলে ছাড়লো। তার সেনাপতি, নাকি মজনু ফকিরের সেনাপতি ছিলো পাকুড়গাছের মুনসি, 'ইগলান সোমাচার জানিচ্ছিলো তোর বাপ, পাকুড়গাছের মুনসিক লিয়া তোর বাপ কতো খবর পাচ্ছিলো—।'

'পাকুড়গাছই নাই।' তমিজ একটু তুচ্ছই করে, 'কিসের পাকুড়তলা পাকুড়তলা করো? পাকুড়গাছ কাটা পড়লো কোনদিন, হামরা দিশাই পালাম না!'

'পাকুড়গাছ কাটা অতো সহজ লয় রে পাগলা!'

কিন্তু এখন গোলাবাড়ি থেকে গিরিরডাঙার রাস্তা তো বিলের উত্তর সিথান দিয়েই, ইঁটখোলা হওয়ার পর সেখানে ঝোপজঙ্গল সাফ হয়ে কী সুন্দর রাস্তা হয়েছে। হাজার খুঁজেও তমিজ তো পাকুড়গাছের একটা পাতাও দেখতে পায় নি।

তা হলে কুলসুম এতো খবর পায় কোত্থেকে? ভর সন্ধ্যায় সেদিন খুব শীত পড়লে তমিজ ঘরে গেলো একটু সকাল সকাল। ঘর বন্ধ, ভেতরে ঘুটঘুটে আন্ধার, দরজা বন্ধ করে কুলসুম কথা বলে কার সঙ্গে? কেরামত আলি আসে নি তো? মানুষটাকে কুলসুম সহ্যই করতে পারে না, অথচ সুযোগ পেলেই সে প্যাচাল পাড়তে আসে তার সঙ্গে। আজ কি কুলসুম তাকে আস্কারা দিলো নাকি?। তা আন্ধার ঘরের মধ্যে জোয়ান মানুষটার সঙ্গে সে কিসের আলাপ করে? দরজার বাইরে কান পাতলে তমিজ শোনে কুলসুমের কথা, 'তুমি লিজে কবার পারো না? উদিনকা বেটার ওপরে আসর করিছিলা না? এখন

আসর না করো, তাক বুঝায়া কও।' তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। কুলসুম ফের কথা শুরু করলে বোঝা যায়, সে কারো কথার জবাব দিচ্ছে। কিন্তু আরেকজনের প্রশ্ন কিংবা অভিযোগ কিংবা প্রতিবাদের কিছুই শুনতে না পেলেও তমিজের বুক কাঁপে, কুলসুম তো কথা বলছে তমিজের বাপের সঙ্গে। তার এতোই ভয় করে যে, কুলসুমের গলার আওয়াজ পেলেও সেদিকে সে আর মনোযোগ দিতে পারে না। কতোক্ষণ পর সে জানে না, 'কাল আসো। ওটি তোমার খিদা নাগে না গো?' বলতে বলতে কাউকে বিদায় দিতে দরজা খুলে তমিজকে দেখে কুলসুম খুশিতে খলবল করে ওঠে, 'ল্যাও বাপু, তোমরা বাপবেটা ফয়সালা করো।' এই সময় তমিজের গায়ে হাওয়ার একটা ঝাপটা লাগে। কে গো? কাউকেই তো দেখা গেলো না।

অন্ধকার ঘরে দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়ে বাইরের কুয়াশা-ছাঁকা আলো। ঐ সুযোগে কুয়াশাও খানিকটা ঢুকে অদ্ভুত একটি সুরত নিয়ে ঝুলতে থাকে ঘরের ছোট্টো ঐটুকু শূন্যতায়, সেটা ছড়ানো একেবারে মাচার ওপর পর্যন্ত। নিজের ভয় কাটাতে তমিজ খ্যাক করে ওঠে, 'ঘরত বাতি দেও না কিসক?'

'তোমার বাপ তো আবার সলোক থাকলে ঘরত ঢুকবার পারে না। এখনি গেলো, তুমি দেখলা না?'

'তোমার মাথা খারাপ হছে! ইগলান কী কও?'

কুলসুম কুপি জ্বালালে তার দিকে তাকাতেও তমিজের ভয় করে। নিজের ঘরের মেঝেতে পিঁড়ি পেতে সে ভাত খেতে বসে, সামনে বসে কুলসুম বলে খালি তমিজের বাপের গল্প। 'তোমার বাপ আজ কয়দিন খালি এক কথা কয়! কী?–বেটাক হুঁশিয়ার হবার কও গো। কাৎলাহার বিলেত আগুন লাগবি, পানি থ্যাকা আগুন উঠ্যা ঘরত ধরবি।'

'তোমার মাথা পুরা খারাপ হছে। ইগলান হাবিজাবি কী কও গো?' তমিজের শাসন করার চেষ্টা চাপা পড়ে তার ভয়ের নিচে। 'প্যাঁচাল পাড়া বন্ধ করো। আর চারটা ভাত দেও।'

তমিজের ভয়-পাওয়া গলার ধমকে কাবু না হয়ে কুলসুম হাঁড়ি থেকে ভাত তুলে দেয় হাত দিয়ে। তারপর জানায় তার বাপের আজকের অভিযোগ-কাম-হুঁশিয়ারিটি, 'তুমি বলে হুরমুতল্লার ঘেগি বেটিটাক লিকা করিছো? তোমার বাপ কয়, বেটা যেটি খুশি লিকা করুক, কিন্তু বৌয়ের সাথে থাকবার পারবি না।'

তমিজ চমকে উঠলে তার গলায় ভাত আটকে যায়। পানি খেয়ে ফের খেসারি ডাল দিয়ে ভাত মাখে আর ভাবে, শালা শরাফত মণ্ডল হুরমতুল্লাকে যেভাবে শাসাচ্ছে, বুড়া খুব ভয় পেয়ে গেছে। মাঝির বেটার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে মণ্ডল হুরমতুল্লাকে জমি বর্গা করতে দেবে না। ওর জমি বর্গা করার দরকার কী? ফুলজানের হিস্যা বিঘা দেড়েক জমি তমিজ পাবে, অন্য দুই মেয়ের ভাগও চাষ করবে সে নিজেই। হুরমতুল্লা তো থাকবেই, বুড়া চাষবাসের তদারকি করে ভালো। এই সাড়ে চার বিঘা জমিতে তমিজ যে ফসল তুলবে, তার সঙ্গে আর কারো জমি বর্গা করে তার ও তার শ্বশুরের ও কুলসুমের চমৎকার চলে যাবে। ধান বরং খাওয়ার পর আরো বাঁচবে। সেই থেকে তমিজ বাপের জমি আর ভিটাঘর সব উদ্ধার করবে।

এখন এই কথাগুলো বাপজানকে জানায় কে? তাকে জানাতে স্বপ্নে বাপকে আসার সুযোগ দিতে তমিজ তাড়াতাড়ি ঘুমাতে চায়। কিন্তু ঘুমাতে না ঘুমাতে স্বপ্নে বাপের বদলে সে দেখে কাৎলাহার বিল সে পার হচ্ছে সাঁতরে। ফকিরের ঘাটে পানিতে নামলো,

উত্তরপুবে সাঁতরে সে পাড়ি দিচ্ছে বিলের পানি। ওপারে ঘাট। ঘাট থেকে নামলেই মোষের দিঘি। মোষের দিঘির ওপর তালগাছের নিচে উঁইঢিবির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফুলজান। ফুলজানের কোলে বাচ্চাটার রোগ যেন সেরে গিয়েছে। সবই দেখছে। কিন্তু বিলের মাঝামাঝি পৌঁছুতেই তমিজের ঘুম ভেঙে যায়। পাশের ঘরে একা একাই কথা বলে চলেছে কুলসুম। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করতে করতে তমিজ ফের ঘুমিয়ে পড়ে।

৪৭

অপশন দিয়ে পাকিস্তানে এসে এ এস আই পোস্টে প্রমোশন পেয়ে ও বাপকে দিয়ে ইসমাইল হোসেনকে ধরে নিজের জেলা সদর থানায় বদলি হবার পর তো বটেই, এর আগেও চাকরি জীবনে তহসেনউদ্দিনকে এমন কি হিন্দু বড়োবাবুদের হাতেও এরকম বিপাকে পড়তে হয় নি। বৈশাখের শুরুতে মাঝিদের উৎপাতে তার মেজাজটা খিচড়ে যায়। দিনে দিনে, মাসে মাসে এবং ঋতুতে ঋতুতে তার মেজাজ চড়ে চক্রবৃদ্ধিহারে। এটা কেমন কথা?—নিজের গাঁটের পয়সা খরচা করে রীতিমতো রশিদ নিয়ে তাদের লিজ নেওয়া বিল, সেখানে কাকে দিয়ে মাছ ধরাই আর নৌকা বাওয়াই আর পানি সেঁচি,—সেটা আমার ব্যাপার। তাতে কার কী করার আছে? বাবাকে তহসেন অনেকবার বলেছে, যমুনা পাড়ের মাঝিদের ডেকে একদিন শিমুলতলায়, একদিন ফকিরের ঘাটে, একদিন পাকুড়তলায় আরেক দিন কালাম মাঝির বাড়ির ঘাটে জাল ফেলা হোক। কিন্তু কালামের এক কথা, ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো। আরে ধৈর্যের তো একটা সীমা আছে।-মণ্ডলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকে সপ্তাহে অন্তত তিন দিন, হয় ভোরবেলা, নয়তো সন্ধ্যায়, এমনকি বর্ষার সময় ভরদুপুরে এখানে ওখানে ঝুপঝাপ করে কেউ না কেউ জাল ফেলছেই। বাবা বলে, 'বাপু, লিজেগোরে মানুষ, এরা নিজর দেয় তো গাঁওত মানইজ্জত লিয়া থাকা যাবি? নিজের মানুষের বল না থাকলে মণ্ডলেক আঁটো করা কঠিন। কখনো সে আবার আশ্বাস দেয়, 'সবুর করো। মাঝির জাত, এই কোন্দো করে, আবার এই দরদ করে। এই আগুন, এই পানি। হামিও তো বাপু মাঝির বেটা, মাঝির রগ হামার জানা আছে।'

কালাম মাঝি এরকম কথায় কথায় নিজেকে মাঝির বেটা বলে ঘোষণা করে, তহসেনের এটা পছন্দ হয় না। আবার বাপকে কষ্ট দিতেও মন থেকে সায় পায় না। ছেলের ওপর সৎমায়ের জুলুম সহ্য করতে না পেরেই কালাম মাঝি তাকে নিয়ে দিয়ে এসেছিলো তার প্রথম পক্ষের দূর সম্পর্কের এক বোনের বাড়ি। বোনাই ছিলো খেতলালের কনস্টেবল, পরে বদলি হয়ে চলে যায় অনেক দূরে,—মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানায়। খালার বাড়িতে থেকে তাদের কুয়ার পানি তুলে দিয়ে, বাজারঘাট করে, খালাতো ভাইদের চোপার বাড়ি খেয়ে তহসেন লেখাপড়াটা চালিয়ে গেছে অনেক কষ্টে। এক বছর বাদ দিয়ে দিয়ে সে ফেল করতো, কিন্তু বাপের মানি অর্ডার ফেল করে নি কোনোদিন। ক্লাস নাইনে একবার ফেল করতেই তার খালু পুলিস সাহেবকে ধরে

তাকে পুলিসে ঢুকিয়ে দিলো, আবার ওই সঙ্গে বিয়েও দিলো নিজের মেয়ের সঙ্গে। বৌ তার মাঝির বংশের মেয়ে হলে কী হয়, মানুষ হয়েছে দূরে দূরে। তার ভাষা প্রায় ভদ্দরলোকদের মতো, সে উর্দু বলতে পারে ভাঙা ভাঙা এবং শ্বশুরবাড়ি এসে চালচলন দেখে নাক সিঁটকায়। ছেলেমেয়েরাও পেয়েছে মায়ের ধাত। এখন বাপদাদাকে তারা যদি মাঝির বংশের মানুষ বলে শোনে তো তারাও কি ছোটো হয়ে যায় না?

আর এই মাঝির বংশ কালাম মাঝিকেও কম মুসিবতে ফেলে নি। এদের সে চেনে হাড়ে হাড়ে। চাষাদের সাথে বিবাদ বাধাও তো এরা থাকবে তোমার পাশে, ইশারা পাওয়া মাত্র দশটা চাষার মাথা ফাটিয়ে দেবে। যদি কলুর ঘরে আগুন লাগাতে চাও, ইঙ্গিত দিলেই কাম হাসিল। আবার এমনিতেই নরম স্বভাবের মানুষ, এক মাছ ছাড়া অন্য কোনো জীবের গায়ে আঁচড় লাগাতে গেলে এদের ঠ্যাঙে ঠ্যাঙ ঠেকে। কিন্তু একবার চেতে যায় তো মাছ মারার বর্শা দিয়েই পাঁচটা দশটা লাশ ফেলে দেবে পলকের মধ্যে। তহসেন এসব বুঝবে কোত্থেকে?

আবার তমিজের মতিগতি বোঝা তো কালাম মাঝির জন্যেও দিন দিন মুশকিল হয়ে পড়ছে। এর ওপরেই সে ভরসা করছিলো বেশি। তমিজের বাপ কম করে যায় নি। ঐ বছর পোড়াদহ মেলার মাছ ধরতে মণ্ডলের হাতে মানুষটার এতো হেনস্থা হওয়াতেই না মাঝিদের দখল এসেছে কাৎলাহার। তারই বেটা, মণ্ডলের সঙ্গে লাগতে গিয়ে জেলও খাটলো। তাকে হাতে রাখাটা কালাম মাঝির খুব দরকার।

কয়েকবার তার ঘরে উঁকি দেওয়ার পর তমিজের দেখা মিললো। ভাত খেয়ে উঠে সশব্দে সে কুলকুচো করছিলো দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। পেছনে কুপি হাতে কুলসুম। খোলা দরজা দিয়ে ঢোকা হাওয়ায় তার হাতে কুপির শিখা কাঁপে! এই ভরযুবতি মেয়েমানুষটা ঘরে থাকে একলা, পাশে তার সৎবেটা। তবে এই নিয়ে আরো কিছু ভাববার আগেই কালামের নাকে লাগে মাগুর মাছের গন্ধ। তার মগজে মাগুরের কাঁটা ফুটলে সে বলে, 'তমিজ মাছ ধরিস চুরি কর্যা? খাবার হাউস করে হামাক কলেই তো হয়। মানষে তোক মাছচোর কয়, হামার গাওত লাগে!'

'কাৎলাহার বিল থ্যাকা মাছ নিলে চুরি করা হয় ক্যাংকা কর্যা? বিল না মাঝিগোরে সোগলির?'

'সবই তো জানিস।' কালাম মাঝি তাকে একটু বোঝাতেই এসেছিলো, কিন্তু এসেই কাৎলাহারের মাগুরের গন্ধে এবং কুলসুমের কুপির আলোয়-কাঁপা মুখ দেখে তার গলা হঠাৎ চড়ে যায়, 'তোরা কি হামাক পুলিস ডাকবার কোস? তহসেনেক তো হামি বুঝসুঝ দিয়া রাখিছি। এখন তুই কি হামার লিজের চাচা ভাই জ্ঞাতিগুষ্টির কমোরেত দড়ি বান্দিবার কোস?'

তমিজ জবাব না দিয়ে ভেতরে চলে গেলে কালাম মাঝি বলে, 'বাপের বুড়া বয়সের জোয়ান বৌটাক লিয়া একলা থাকিস, কিছু কই না। আবার বিলের মাছও চুরি করিস। কতো সহ্য করমু?' কালাম মাঝি ফিরে যেতে যেতে কুলসুম ও তমিজের এভাবে একসঙ্গে থাকা নিয়ে কীসব বলে, তমিজ ওসব পাত্তাই দেয় না।

তমিজের ভাবনা এখন ফুলজানকে নিয়ে। সেদিন মোষের দিঘির ঢালে অনেকটা আমন কেটে সন্ধ্যাবেলা তমিজ দাঁড়িয়ে ছিলো দিঘির ধারে। রোজকার মতো ফুলজান এসেছে, কিন্তু কাজকামে তমিজের ভুল ধরার বদলে সে হঠাৎ ঢলে পড়ে তার বুকের

ওপর। তমিজের হাতে তখন ধান কাটার কাস্তে, ভাগ্যিস সেটা পড়ে গিয়েছিলো তার হাত থেকে, নইলে ফুলজানের হাত পা বুক পেট যে কোনো জায়গায় জখম হয়ে যেতো। ফুলজান তার বুক থেকে মাথা ফিরিয়ে নিয়ে কাঁদতে শুরু করে। সে কাঁদে, কেবলি কাঁদে। তমিজ হতভম্ব হয়ে বলে, 'কান্দো কিসক?' বারবার এই প্রশ্ন করলে ফুলজান বলে, 'আজ মা হামক পিঠেত খড়ি দিয়া পিটিছে।' কেন? তার মা তাকে মারবে কেন? ফুলজান ফের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে এবং জানায় যে, কয়েকদিন হলো ভাতে তার রুচি নাই। নতুন চালের ভাত সর্ষের তেল পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে মেখেও সে মুখে তুলতে পারে না। তার খালি বমি বমি লাগে। এক পোড়া মাটি আর তেঁতুল ছাড়া আর কিছুই তার রোচে না।

তা তেঁতুল জোগাড় করা তমিজের জন্যে এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। মোষের দিঘির দক্ষিণে ভবানীর মাঠেই জোড়া তেঁতুল গাছ। দুটোতেই ভূত পেত্নী থাকে বলে লোকে ঐ গাছ থেকে তেঁতুল সহজে পাড়ে না। তা ফুলজানের জন্যে না হয় ভূত পেত্নীর সঙ্গে মারামারি করবে। তবে ভয়ও তার হয় বৈ কি। চুপচাপ বাজার থেকে তেঁতুল এনে দিলেই বা ফুলজান কি আর জিগ্যেস করতে যাবে? কিন্তু ফুলজান তাকে ধিক্কার দেয়, 'তুমি এক আবোর মাঝির আবোর বেটা, কিছুটা বোঝো না? এখন গলাত দড়ি দেওয়া ছাড়া হামার গতি নাই। তুমি হামাক একটা দড়িই না হয় কিন্যা দাও।'

তখন ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে তমিজের শরীর কাঁপে। তার বাপ কি তাহলে মরতে না মরতে এসে ঢুকে পড়েছে ফুলজানের পেটের ভেতরে? পাকুড়গাছ যদি চিরকালের জন্যে হারিয়ে গিয়ে থাকে তো লোকসান নাই, বাপ তার ঠাঁই একটা ঠিকই বেছে নিয়েছে। উত্তেজনা তার এতোই বাড়ে যে ফুলজানকে জড়িয়ে নিজের বুকের সঙ্গে সে আঁকড়ে ধরে প্রবল বেগে। তার মুখে, চোখে, কপাল, ঘ্যাগে ও বুকে নিজের মুখ ঘষতে ঘষতে তার মনে হয়, মাঝির বেটার সঙ্গে এবার বেটির বিয়ে না দিয়ে হুরমতুল্লার আর পথ নাই। তবে বিয়ের আগে জমির ব্যাপারটা সে ফয়সালা করে নেবে।

আজ কালাম মাঝির ঝাঁঝালো কথাবার্তা শোনার পর নিজের ঘরে শুয়ে তার বাম চোখের পাতা কাঁপতে থাকে প্রবল বেগে। লক্ষণ তো ভালো নয়। মেলার আর বাকি দুইদিন। কাল বাদে পরশু কাৎলাহার বিলে ঝাঁপিয়ে পড়বে মাঝিপাড়ার সব মানুষ, সেখানে কালামের পক্ষে সে যদি দাঁড়ায় তো ফ্যাকড়া মিটে যায়। ফুলজানকে নিয়ে এখানে চলে এলে তাদের আগলে রাখবে কালাম মাঝিই ।

কিন্তু ভোরবেলা কালাম মাঝির বাড়ি গিয়েও সে ফিরে আসে বাইরে থেকেই। তাকে সোজাসুজি না বলাই ভালো। কেরামত আলিকে বললে হতো! কিন্তু ফুলজানের সঙ্গে তার বিয়ের খবর কি কেরামতকে বলাটা ঠিক হবে? বুধাকে বলা যায়?—এসব ভাবতে ভাবতে দেখা হয়ে যায় কুদ্দুস মৌলবির সঙ্গে। মৌলবি তাকে দেখে আক্ষেপ করে, 'কালাম মিয়া মসজিদের বেড়া নতুন কর‍্যা দিলো। তাও তোমরা জুম্মাঘরের দিকে একবার পাও দাও না? বাপু খাটাখাটনি যতোই করো, একদিন তো যাওয়াই লাগবি, ঐদিন কী লিয়া যাবা, কও তো?'

তমিজ সঙ্গে সঙ্গে ওয়াদা করে, জমিতে যাবার আগে ফজরের নামাজটা সে জুম্মাঘরেই পড়ে যাবে। কিন্তু আপাতত সে যে একটা বিপদে পড়েছে, হুজুর ছাড়া তাকে উদ্ধার করবে আর কে? বিপদের কথায় কুদ্দুস মৌলবি ঘাবড়ায়, আবার কাউকে উদ্ধার করার সাবাশি নেওয়ার লোভও তার কম নয়। মাঝিপাড়ার অসুখ বিসুখে সে পানিপড়া দেয়, কিন্তু নেমকহারামের বাচ্চাগুলো পয়সা দিয়ে মানত যা করার সব করে আসে

পোড়াদহ মাঠে। তমিজের দিকে তাকিয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, 'মানষের কাম কর্যা লাভ নাই। এটিকার মানুষ বড়ো নেমকহারাম। কাম হলে আর ফির্যাও দ্যাখে না।'

তমিজ জানায়, তার দেওয়া থোওয়া সব আগাম।—কাজটা কী?—হুরমতুল্লার বেটির সঙ্গে বিয়ে হলে তার বড়ো উপকার হয়। কিন্তু মণ্ডলের ভয়ে পরামাণিক সাহস পায় না। এক কালাম মাঝি যদি অভয় দেয় তো কাজটা সে করতে পারে, তার আর মুসিবত হবে না। সব শুনে কুদ্দুস মৌলবি গম্ভীর হয়ে যায়। দাড়িতে কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে বলে, 'ঠিক আছে। হামার কথা কালাম মিয়া কোনোদিন ফালাবার পারে না। তুই মগরেবের পরে জুম্মাঘরত আয়।'

দুপুরবেলা হুরমতুল্লার বৌ তাকে দেখে প্রথমে কটমট করে তাকায়। কিন্ত রাগী চোখে দেখতে দেখতে পানি জমে এবং এদিক ওদিক তাকিয়ে হুরতমুল্লার অনুপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে কাঁদে আর বলে, 'তুমি হামাগোরে কী সব্বোনাশ করলা বাবা? ছোটোজাতের মানষেক ঘরত ঢুকবার দিয়া ফুলজানের বাপ ইগলান কী করলো? তোমার আর কী, হামাগোরে সব গেলো!'

তমিজ মাথা নিচু করেই বলে, 'সব্বোনাশ কিসের? তোমার বেটিক বিয়া করমু। কও তো আজই করবার পারি। ফুলজানের বাপোক কও।' ফুলজানের মা তবু চুপচাপ কাঁদতে থাকলে তমিজ আশ্বাস দেয়, 'বিয়া করার কথা তো হামি আগেই কয়া রাখিছি।'

'মাঝির বেটার সাথে বিয়া দিলে হামরা এটি থাকবার পারমু?'

'তা'লে বিয়া দিও না, হাটোত যায়া সব কথা কয়া দেই তো কী হবি?'

হুরমতুল্লাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে তমিজ হনহন করে বেরিয়ে যাচ্ছিলো। নবিতন তার পিছে পিছে গিয়ে তাকে আটকায়। চাপা গলায় বলে, 'তোমার লাকান একটা বোগদাক দেখ্যা বুবু যে ক্যাংকা কর্যা আটক্যা গেলো হামি বুঝি না।' তারপর শক্ত করে চেপে চেপে বলে, 'মাঝির বেটা, বুবুক লিকা তোমার করাই লাগবি। না হলে বুবু গলাত ফাঁস দিবি। হামি বাপজানেক কয়া বুঝ দেমো। বাপজান হামার কথা শুনবি।' এই মেয়েটির প্রতি হুরমতুল্লার একটু বেশি দুর্বলতার কথা ফুলজানও তাকে নালিশ করে বলেছে। এই দুর্বলতা এখন ফুলজানেরই কাজে আসছে দেখে তমিজ হুরমতুল্লার এর প্রতি পক্ষপাতিত্ব অনুমোদন করে। নবিতন ফের বলে, 'আজ সকাল সকাল বাড়িতে যাও। আজ রাতে ভালো কাপড় পর্যা আসবা। বিয়া আজই হওয়া লাগবি।'

সারাটা দিন তমিজ ধানের আঁটি বয়ে বয়ে এই বাড়ির উঠানে গাদা করে রাখলো আর গোনাগুনতি চললো, আজ তার সঙ্গে সঙ্গে থাকলো নবিতন। ফুলজানের কোনো দেখাই পাওয়া গেলো না। নবিতনের দাঁতগুলো উঁচু, কিন্তু নাক বেশ চোখা আর তার গলায় ঘ্যাগের আভাস মাত্র নাই। কিন্তু ফুলজানকে না দেখে দেখে তমিজের কাজে ভুল হয়, গুনতে ভুল হয়, আঁটি সাজানো এলোমেলো হয়ে যায়। ফুলজানকে না হলে তার চলবে কী করে?

জুম্মাঘরে যেতে যেতে তমিজের রাত হয়ে গেলো। এশার নামাজ শেষ করে মুসল্লিরা বাড়ি ফিরছে। কালাম মাঝি তাকে দেখে শব্দ না করে কেবল দাঁত ফাঁক করে হাসে। তার হাসি মোলায়েম দেখাচ্ছে কি অন্ধকারে? না-কি তমিজকে সে অভয় দিচ্ছে বলে হাসিতে তার ছায়া পড়লো, তমিজ ঠিক বুঝতে পারে না। কুদ্দুস মৌলবি বলে, 'আসার কথা কলাম মগরেবের বাদে, আর তোর সময় হলো এখন? নামাজ পড়ার ভয় কি তোরগোরে এতোই? আখেরাতে কী লিয়া যাবু, ক তো বাপু।'

তমিজ কাচুমাচু হয়ে থাকলে কুদ্দুস মৌলবি আসল কথা ছাড়ে, 'তোর কাম হবি। আরে কালাম মিয়া হামার কথা ফালাবার পারে? কলো, তুই বিয়া কর‍্যা বৌ লিয়া বাড়িতে উঠবু। মণ্ডলের ভয় করিস না। তোর বাপের কথা কয়া কালাম মিয়া কান্দিলো। কয়, তার বেটা, হামার দায়িত্ব নাই? বিয়ার খরচও কিছু দিবার চাছে। চিন্তা করিস না। উপরে আল্লা, নিচে কালাম মিয়া'।

'তো আপনে চলেন।' কালাম মাঝির এরকম আশ্বাস যেন তমিজ আশাই করছিলো। তাই কোনো উচ্ছ্বাস দেখায় না। তার এখন দরকার মৌলবিকে, 'নিজগিরিরডাঙাত চলেন। লিকা আজই পড়ান লাগবি। মণ্ডলের জামাতের কোনো মুনসি লিকা পড়াবার রাজি হবি না। চলেন।'

'এখনি? ক্যাংকা কর‍্যা?' কুদ্দুস মৌলবির আজ দাওয়াত আছে আবিতনের বাপের বাড়িতে। 'আজ হয় না। কালাম মিয়া কলো, মেলাটা পার হোক। মেলার দিন তোক থাকা লাগবি কালাম মিয়ার সাথে। মাঝিরা হুজ্জত করলে তোক সামলান লাগবি। মেলাটা পার হোক।'

তা কালাম মাঝির পক্ষে থাকতে তমিজ তো একশোবার রাজি। কিন্তু 'হুরমতুল্লা বুড়াক তো হামি জবান দিয়া আসিছি। লিকা পড়ান লাগবি।'

'তোর শ্বশুর হবি, তাক তুই কোস বুড়া, তার নাম ধরিস? নাম তমিজ, কিন্তু কথাবার্তা বেতমিজি।'

আদব ও তমিজ এস্তেমাল করাব জন্যে কিংবা বিরক্ত হয়ে তমিজ কয়েক পলক চুপ করে থাকে। কুদ্দুস মৌলবি বলে, 'জবান দিলেই রাখা লাগবি, এমন কোনো কথা নাই। আল্লা সব বোঝে, বান্দার সুবিধা অসুবিধা তার নজর এড়ায় না।'

'না হুজুর। অপনাগোরে কথা আলাদা। নামাজ রোজা করেন, আল্লা আপনার অসুবিধা দেখবি। আমার নামাজ নাই, বন্দেগি নাই, আল্লা হামাক দেখবি কিসক? জবান দিছি, হামাক আজ বিয়া করাই লাগবি।'

কুদ্দুস মৌলবি তমিজের সমস্যাটা বোঝে। কিন্তু 'কালাম মিয়ার সাথে একটু বোঝা লাগে।'

'বোঝার দরকার কী হুজুর? আজ আপনে খালি লিকা পরায়া আসেন। বৌ তো হামি ঘরত লিয়া আসিচ্ছি না।'

'লিকা পড়াবার খরচপাতি আছে, জানিস তো?'

হুরমতুল্লার ঘরের মেঝেতে মাদুর পাতা হয়েছে, মাদুরের ওপর নবিতনের বোনা কাঁথা, সেখানে ফুল আছে, মাছের ছবিও আছে। আবার ছোটো একটা কাঁথা, তার ওপর বসলো তমিজ আর মৌলবি। হুরমতুল্লার ছোটো শালা এসেছিলো ভাগ্নীদের মেলায় নাইওর নিতে, ছেলেটা প্রথমে গম্ভীর হয়ে বসেছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই নবিতন আর ফালানির সঙ্গে সে বিয়ের আমোদে মেতে ওঠে। অতো রাতে হুরমতুল্লা তাকে দিয়ে গোলাবাড়ি হাট থেকে বাতাসা কিনে আনায়।

নবিতনের বোনা মিনারের আর চাঁদ তারা আঁকা ছবির ছোটো কাঁথায় বসে তমিজ অদ্ভুত বায়না ধরে, বড়ো বেটির নামে হুরমতুল্লা জমির ভাগ লিখে না দিলে সে বিয়ের আসর থেকে উঠে যাবে।

হবু জামায়ের আচরণে হুরমতুল্লা আহত হয়, উৎকণ্ঠিত হয় আরো, রাগও হয় তার। মাঝির ঘরে মেয়েকে দিচ্ছে বলে শরাফত এবারেই তার বর্গা কেড়ে নেবে। আর

মাঝির বেটাকে সে জমি লিখে দিচ্ছে শুনলে নিজগিরিরডাঙার চাষাপাড়ার লোকদের দিয়ে তার বাড়িঘর সব উচ্ছেদ করিয়ে ছাড়বে।

কুদ্দুস মৌলবিও বিরক্ত হয়, 'বৌ লিয়া তোক ভাগা লাগবি মাঝিপাড়াত তোর লিজের বাড়িত। এটিকার জমি তুই রাখবার পারবু?'

'হামার জমি ক্যাড়া লেওয়া অতো সোজা লয় হুজুর।' তমিজ জেদ করে, 'হামি জেলখাটা মানুষ, হামার সাথে লাগার ক্ষমতা মণ্ডলের বাপেরও হবি না।'

কুদ্দুস মৌলবির দেরি হয়ে যাচ্ছে। আশে পাশে কোনো বাড়ি নাই। ভবানীর মাঠ পার হলেই চাষীপাড়া। মণ্ডল কোনোমতে খবর পেয়ে যদি একটু ইশারা দেয় তো তমিজ তো তমিজ, মৌলবি নিজেও জান নিয়ে ফিরতে পারবে কি-না সন্দেহ। সে তাই একটা সমঝোতার চেষ্টা করে, 'হুরমতুল্লা পরামাণিকের বেটা নাই। তার জমিজমা যা আছে, পাবি কেটা? তার তিন বেটিই তো? হামরা আছি না? কালাম মাঝির জোর কি মণ্ডলের চায়া কম? তহসেন দারোগা তার বেটা লয়? মণ্ডল খালি খালি নাফ পাড়ে। তুই নিশ্চিন্ত থাক।'

নিশ্চিন্ত না হলেও তমিজ মেনে নেয়। তবে মেয়ের ভালোমন্দ, বিয়েশাদির ব্যাপারে মণ্ডলের মাথাব্যথা নিয়ে হুরমতুল্লা জানায়, 'বাপু, হামরা একই গুষ্টি, ছোটোজাতের কাছে বেটি দিলে খানদান লষ্ট হয়, তাই মণ্ডল ইংকা কোন্দ করে। আর কিছু লয়। ধরো শরাফত মণ্ডলের দাদার মামু আর হামার খালার মামুশ্বশুর, না, হামার মামুশ্বশুরের খালা আছিলো মামাতো ফুপাতো ভাইবোন, না, হামার মামুর—।' সম্পর্কটি খুঁজতে খুঁজতে সে হয়রান হয়ে পড়লে কুদ্দুস মৌলবি তাগাদা দেয়, 'লেও, হছে। এখন বিসমিল্লা করি'।

বাতাসা দেওয়ার পরেও লাউ দিয়ে রাঁধা শলুক দেওয়া শোল মাছ দিয়ে পেট ভরে ভাত খায় সবাই। মৌলবির সঙ্গে তমিজও বাড়িই ফিরে যেতো কিন্তু ফুলজান আর নবিতনের থাকার ঘরটি আজ নবিতন সাজিয়েছে বড়ো সুন্দর করে। অনেক রাত্রে তাকে একরকম ঠেলে ঢুকিয়ে দেয় ফালানি। তমিজ দেখে, ফুলজানের চোখে খুব পুরু করে কাজল লাগিয়ে দিচ্ছে নবিতন। ফুলজান আপন মনে তার নিজের ঘ্যাগে হাত বুলাচ্ছে। হাত দিয়ে চেপে ধরে ঘ্যাগটাকে সে যতোটা পারে সমান করার চেষ্টা করছে কি-না বলা মুশকিল। তমিজ ঘরে ঢুকতেই নবিতন খিলখিল করে হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করতে করতে সে আরো হাসে, 'ও দুলাভাই, আবার মাছ মনে কর‍্যা বুবুর মুখের মধ্যে বড়শি আটকায়া দিবেন না কলাম।'

৪৮

পোড়াদহ মেলার আগের দিন জোহরের নামাজের পর ফকিরের ঘাটে জাল নিয়ে গেলো আবিতনের বাপ, সঙ্গে ভিড়ে গেলো ভিকু পাগলা। ভিকু সম্পর্কে তার কেমন খালাতো ভাই হয়, আবার শালাও হয়। বাড়ি থেকে হঠাৎ করে তিন চার মাসের জন্যে উধাও হয়ে যাওয়ার অভ্যাসের ফলে, সবসময় পরনে ধুতি ও ময়লা তেলচিটচিটে রামপুরি টুপি মাথায় পরে থাকে বলে এবং প্রায়ই উর্দু বাত করার চেষ্টা করার কারণেও বটে, নামের সঙ্গে সে ঐ উপাধিটি অর্জন করেছে।

মাঘের শেষ বুধবার, কিন্তু শীত পড়েছে বড্ডো বেশি; পোড়াদহ মেলার সময় এমন হবেই। আবিতনের বাপ খালাতো ভাই-কাম-শালাকে দিয়ে হুঁকায় তামাক সাজায়, হুঁকায় লম্বা কয়েকটা টান দিয়ে এবং আল্লার নাম নিয়ে ও উত্তর দিকে পাকুড়তলায় মুনসির উদ্দেশ্য মাথা ঝুঁকে সালাম করে তৌড়া জালের একটা খেপ মারে আড়াআড়ি। বিলের এই জায়গাটায় একটা গর্ত আছে, সব সময়ই মাছ থাকে। দাদা পরদাদারা বলে গেছে, সেই কোন আমলে কোথায় ভুমিকম্প হলে যমুনা হঠাৎ করে ফুলে উঠলে তার গতরের উপচে-পড়া পানি ঢেলে দেয় বাঙালি নদীতে। বাঙালি উপচে পানি এলে ভাসিয়ে দেয় এই গিরিরডাঙা নিজগিরিরডাঙা গ্রাম। পাকুড়গাছ থেকে মুনসি তখন পা বাড়িয়ে কষে একটা লাথি মেরেছিলো ছোটো ডোবাটার ঠিক এই জায়গাতেই। তাইতেই তো ডোবা হয়ে গেলো মস্ত কাৎলাহার বিল। বাঙালি পেরিয়ে যমুনার পানি সেখানে ঢোকার জায়গা পেলে দুই গাঁয়ের মানুষ তাদের ভাঙার অনেকটা ফেরত পায়। সেই থেকে এখানটায় মাছের বরকত বেশি। পোড়াদহের মেলায় ফকিরের ঘাটের শিঙিমাগুরের খুব কদর।

আজও আবিতনের বাপের জাল ভরে মাছ উঠলো, তার বড়ো খলুইটা ভরে গেলে সে জাল তুলে দেয় ভিকু পাগলার হাতে। ভিকুও মাছ ভরা জাল টেনে তুলছে, এমন সময় কে চেপে ধরলো তার ডান হাতের কবজি। ভিকু ওই অবস্থাতেই বলে, 'আসসালামু আলায়কুম। কেয়া ভাই হাত পাকড়াতা কাহে? হাত ছাড়িয়ে।'

তার হাত চেপে ধরেছে আলি মামুদ, যমুনার মাঝিদের সর্দার গোছের মানুষ। ভিকুর সালামের জবাব না দিয়ে, উর্দু ভাষায় করা তার প্রশ্নের তোয়াক্কা না করে শান্ত গলায় হুকুম দেয়, 'জাল লিয়া বাড়িত যাও।'

ততোক্ষণে ফকিরের ঘাটে ও ঘাটের ওপারে জমতে শুরু করেছে যমুনার মাঝিরা। আলি মামুদ খামাখা গোলমাল করার লোক নয়, বরং অতো বড়ো কালো কুচকুচে শরীর থেকে বার করে মিষ্টি বুলি, 'বুড়ার বেটা', আবিতনের বাপের দিকে সে তাকায়, 'তোমরাও মাঝি, হামরাও মাঝি। মোসলমান মাঝি দ্যাশোত আর আছে কি-না সন্দ। হামরা নিজেরা নিজেরা খালি খালি হুজ্জত করি কিসক?' ভিকুর হাত ছেড়ে সে বলে, 'কালাম মিয়া সরকারের কাছ থ্যাকা ল্যাখাপড়া কর‍্যা ট্যাকা দিয়া বিল ইজারা লিছে। উগলান কাগজপত্র দেখা তাক খাজনা দিয়া হামরা আজ আসিছি বিলের মাছ ধরবার। আজকার দিন এই বিলের মাছ ধরমু হামরা যমুনার মাঝিরা। তুমি এক খলুই মাছ ধরিছো, এটি থুয়া তোমার জাল লিয়া বাড়িত যাও।' আবিতনের বাপের হতাশ মুখ দেখে সে আরেকটু বলে, 'হামাগোরে মাছ ধরা শেষ হলে তোমাক কিছু মাছ হামি লিজে থ্যাকা দিমু।'

রাগে ও দুঃখে হোক কিংবা পরে মাছ পাবার আশ্বাসেই হোক, আবিতনের বাপ জাল ও খলুই রেখে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়। কিন্তু তার খলুইটা হাতে নেয় ভিকু এবং আলি মামুদকে বলে, 'ইগলান ফালতু বাত কেয়া বলতা? তোম যমুনা আর গঙ্গা কাঁহেকো মাঝি না জেলে না নিকারি কেয়া হ্যায় তো হামারা বাল ছিঁড়েগা? গিরিরডাঙার মাঝিরা পোড়াদহ মেলামে মাছ বেচেগা নেহি?'

রীতিমতোন খাজনা দিয়ে একদিনের জন্যে জমা নিয়ে মাছ ধরতে আসা যমুনার বনেদি মাঝিসর্দারের পক্ষে এতোটা সহ্য করা সম্ভব নয়, শোভনও নয়। আলি মামুদ কারো গায়ে হাত তোলার মানুষ নয়। সে পেছনে আড়চোখে একবার তাকায়, অমনি তার বেঁটে খাটো এক সঙ্গীর হাতের প্রবল এক ধাক্কায় ভিকু পড়ে যায় একেবারে নিচে।

তার মুখ থেকে পেট পর্যন্ত ডুবে যায় পানিতে, তবে কোমর থেকে বাকিটা থাকে ডাঙার ওপরেই। উত্তর পাড়ার নুলা শামসুদ্দিন ভিকুর শরীরের প্রথম আদ্দেকটা তুলতে নেমে পড়ে পানিতে। তবে তার বাঁ হাতটা নুলো বলে শুধু ডান হাতে কিছু করতে পারে না। তবে ততোক্ষণ ভিকু তার শরীরের ডাঙার অংশটিও টেনে নিয়েছে পানিতে এবং একটুখানি সাঁতার দিয়ে পুরো শরীরটাই সে তুলে ফেলে ডাঙার ওপর, কিন্তু পানিতে তার টুপিটা ভেসে গেছে, তার ধুতির হালও এমন হয়েছে যে ওটা পরার উদ্দেশ্যই এখন ব্যর্থ। ধুতিটা কোনোমতে জড়িয়ে পরে ভিকু বারবার তার মাথায় হাত দিতে থাকে, সেটা কি টুপির শোকে, না চুলের পানি ঝেড়ে ফেলতে তা তারও জানা নাই।

আবিতনের বাপ হনহন করে ছোটে কালাম মাঝির বাড়ির দিকে। হাঁটে গজর আর গজর করে, তাদের গ্রামে এসে, তাদেরই বাপদাদাপরদাদার বিলে মাছ ধরে ভিন ঠেনের মানুষ, আবার তাদের মারধোর করে,—এ কেমন কথা? তাদের নেতা কালাম মাঝি কি এর একটা বিহিত করবে না?

কিন্তু কালাম মাঝির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো বুধা, সে জানায়, 'মামু গেছে তমিজের বাপের গোর জেয়ারত করবার।'

আবিতনের বাপের পিছে পিছে এসেছে ভিকু পাগলা। সে অবাক হয়, 'তমিজের বাপের গোর? উও তো কেয়া বলতা চোরাবালিমে—! ' মামা তার সেখানেই গেছে। বলতে বলতে বুধাও তাদের সাথ ধরে।

আবিতনের বাপ সেদিকে ছুটলে ভিকু পাগলাও যেতে যেতে একটা হাঁক ছাড়ে তমিজের বাড়ির সামনে এসে। কুলসুম ভেতর থেকে জানায়, কিছুক্ষণ আগে তমিজ গেছে পাকুড়তলায়। জাল নিয়েই গেছে।

চোরাবালির তিনদিকে ঘেরা খাটো দেওয়ালের এক কোণে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে জিয়ারতের দোয়া পড়ছে কুদ্দুস মৌলবি, তার পাশে মোনাজাতের হাত তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালাম মাঝি। তার দুই চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে তার দাড়িতে। দাড়ি এখনো তার তেমন বাড়ে নি। তবে দাড়ি হচ্ছে বেশ চাপ বেঁধে। মাথায় পরিষ্কার কিস্তি টুপি। কয়েক গজ দূরে ইঁটখোলার ইঁটের সারির পাশে হাঁটতে হাঁটতে একটা বেড় জাল ফেলার জুতসই জায়গা জরিপ করছে যমুনার আরেক সর্দার মাঝি, আলি মামুদের ভাই শাকের মামুদ। তার আশে পাশে বেশ কয়েকজন মাঝি। মস্ত বড়ো জালটা ধরে রয়েছে অন্তত তিনজন লোক।

বুধা সবাইকে ছাড়িয়ে চলে যায় আরেকটু উত্তরে, সেখানে মস্ত একটা তৌড়া জাল উড়িয়ে দিচ্ছে তমিজ। বিলের ঠাণ্ডা সর-পড়া পানিতে ছপাস আওয়াজ করে জালটা পড়তেই কালাম মাঝি হাত মোনাজাতে রেখেই এদিকে তাকায়। বুধা গিয়ে ধরে ফেলে তমিজের হাত, 'চাচা, তমিজ চাচা, আকজার দিনটা বাদ দে। মামু যমুনার মাঝিগোরে কাছ থ্যাকা মেলা ট্যাকা লিয়া আজকার জন্যে বিল জমা দিছে। তুই আজ আর মাছ ধরিস না চাচা। আজ থাক।'

'জাল ওঠাও। জাল ওঠাও।' শাকের মামুদের এই কড়া হুকুমে তমিজ ফিরেও তাকায় না। কিন্তু জিয়ারত ছেড়ে কিংবা জিয়ারত সেরে ছুটে আসে কালাম মাঝি। তমিজের পাশে দাঁড়িয়ে সে বলে, 'তুই পাগলা হলু? তোর বাপের মাজার জিয়ারত কর্যা তার দোয়া লিয়া আজ কাম শুরু করনু। তোর বাপের অছিলাত হামরা মাঝিরা বিল

ফেরত পানু। হামি বিল পত্তন নিলাম। আজ যমুনার মাঝিরা মাছ ধরবি, ওরা হামাক খাজনাও দিছে। তুই জাল ওঠা।'

বুধা তমিজের কানের কাছে মুখ নিয়ে সাবধান করে দেয়, 'যমুনার মাঝিরা সব মারকুটা মানুষ। আবার তহসেন ভাই কয়া রাখিছে আমতলির দারোগাক। খবর পালেই পুলিস আসবি মটোরেত চড়্যা। তুই ওঠ বাপু।'

কিন্তু ততোক্ষণ তমিজের হাতে শক্ত টান পড়েছে। জালে ঢুকছে মস্ত কোনো মাছ। বেশ বড়ো মাছ। তমিজ ফিসফিস করে বলে, 'বুধা, বাপজান বাঘাড় ধরিছিলো না? তুইও তো সাথে আছিলু? মনে হয় ওই বাঘাড়টা!'

বুধার গা শিরশির করে উঠলে সে চুপ করে। তমিজ বোঝে ডাঙায় দাঁড়িয়ে এই মাছ তোলা অসম্ভব। সরসর করে সে নেমে পড়ে ঠাণ্ডা পানিতে। ডাঙার তুলনায় পানি কম ঠাণ্ডা আর উরুতে গত রাত্রির ফুলজানের উরুর তাপ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তার মনোযোগ এখন জালের দড়ি টানার দিকে। বড়ো মাছের আভাস পেয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে পানিতে নেমে পড়েছে ভিকু পাগলা, নুলা শামসুদ্দিন আর শামসুদ্দিনের ভাগ্নে মংলু। সবাই মিলে তারা জাল টেনেও হাপসে হাপসে যাচ্ছে, মাগো! কী মাছ না জানি আজ ধরা পড়লো গো!

শাকের মামুদ এবার সরাসরি ফয়সাল্য করতে চায় কালাম মাঝির সঙ্গে, 'কালাম মিয়া, বিলের ব্যামাক ঘাটোত তোমাগোরে মাঝিপাড়ার মানুষ জাল লিয়া আসিছে। ইগলান কী? তুমি হামাগোরে পয়সা ঘুর্‌্যা দাও। মাছ ধরবার অ্যাসা এংকা হুজ্জত করবার পারমু না হামরা। পয়সা ঘুর্‌্যা দাও। হামরা যাই।' তবে ফিরে যাবার কোনো লক্ষণ তাদের নাই। বরং যমুনার মাঝিদের হাতে জাল ও পলো ছাড়াও যেসব অস্তর দেখা যাচ্ছে সেগুলো দিয়ে শুধু মাছই মারা যায় না। কালাম মাঝি সবই খেয়াল করে এবং চি ৎকার করে বলে, 'শালা হামাগোরে মাঝিপাড়ার মানুষ ইগলান কী করিচ্ছে? শালারা তো মরবি গো!' শাকের মামুদ বলে, 'না গো, পয়সা ঘুর্‌্যা দাও। আগে শরাফত মিয়াক খাজনা দিয়া হামরা বছর বছর মাছ ধরিছি, কেউ ক্যাচাল করে নাই। তোমাক খাজনা দিয়া অ্যাসা মুসিবতে পড়লাম।'

কালাম মাঝি ফের চেঁচায়, 'এ তমিজ, উঠ্যা আয়। তোরা শালারা ঠিক থাকিস মণ্ডলের কোবান খালে!'

ভিকু পাগলা ও মংলুর দুই ও দুই চার হাত, নুলা শামসুদ্দিনের এক হাত এবং তমিজের দুই হাত,—এই সাত হাত এবং তমিজের সর্ব অঙ্গের জোরে মাছটা তখন হাঁসফাঁস করছে, শালাকে বেরুতে দেওয়া হবে না। ভিকু বলে, 'বহুত বড়া রুই হোগা।' তমিজ আস্তে করে জানায়, 'না। বাঘাড়। কথা কয়ো না।' তার কথা কেঁপে কেঁপে ওঠে, বাপটা কি চোরাবালির ভেতর দিয়ে পানিতে ঢুকে মাছ ধরে দিলো নাকি?

কালাম মাঝির আর সহ্য হয় না, 'এই কুত্তার বাচ্চা। তোর বাপ মণ্ডলের কোবান খায়া ঠিক হছিলো। এখন কোবান দেওয়া লাগে তোক।' মনে হচ্ছে, তমিজের বাপের দোয়া পাবার পর তার প্রতি ভক্তি রাখার দরকার কালাম মাঝির ফুরিয়ে গেছে। এর পরেও তমিজ জাল নিয়ে ব্যস্ত থাকলে কালাম মাঝি ছাড়ে তার মোক্ষম অস্তর, 'এই শালা হারামজাদা। কাল তুই কুদ্দুস মৌলবিক ওয়াদা দিছিলু না? কাল শালা ঘেগি মাগীটাক লিকা করলু। এখনি মণ্ডলকে খবর দেই তো হুরমতুল্লাক ভিটাছাড়া করবি। ঐ মাগীক লিয়া তুই তখন উঠবু কুটি? হামার কাছে তোর ভিটাঘর বন্ধক আছে না? আজই ঘর

ছাড়া করমু তোক।' তারপর সে ডাকে কুদ্দুস মৌলবিকে। কুদ্দুস মৌলবি মিনমিন করে বলে, 'একটা মাছ তুল্যা তমিজ্জ বাড়িত যা।'

কালাম মাঝি কষে ধমক লাগায় মৌলবিকে, 'আরে মুনসির বেটা, চুপ করো। পয়সা খাও হামার, আর কথা কও উল্টাপাল্টা, না? যাও জুম্মাঘরত যাও। নামাজ পড়ান লাগবি না?

জুম্মাঘর থেকে তার পদচ্যুতির সম্ভাবনায় কুদ্দুস মৌলবি দমে যায়, যতোটা পারে চিৎকার করে সে বলে, 'তমিজ, তুই না কাল ওয়াদা করলু, কালাম মিয়া যা কয় তাই শুনবু। আজ আবার — ।'

তার কথা শেষ না হতেই একটা বর্শা এসে পড়ে মংলুর পিঠে, ঘাড়ের নিচে বর্শাটা লেগেই সেটার গতি শিথিল হয়ে এসেছিলো বলে বর্শা পড়ে যায় পানিতে। তমিজ আর ভিকু পাগলা এর পরেও জাল না ছাড়লে আরেকটি বর্শা বিঁধে গেল তমিজের কনুইতে। শিথিল হাতের ভেতর দিয়ে জালের দড়ি খুলে যায়। মুনসির পান্টিই কি বর্শা হয়ে বিঁধলো তার কনুইতে? তা মুনসি হোক আর যেই হোক তমিজ তাকে ছাড়ছে না। এখন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো পানিতেই কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটি ভয়ে কাঁপছে। রোগাপটকা, বয়স পঞ্চাশের কম নয়। দেখেই বোঝা যায়, এ শালার জাল নাই, নৌকা নাই; পরের মাছ-ধরা নৌকায় শালা জন খাটে। বর্শাটাও তেমন জোরে মারতে শেখে নি, এর কাছে বর্শা যা, পান্টিও তাই। তমিজ নিজের বাঁ হাতের কনুই থেকে বর্শা উপড়ে নিয়ে বড়ো একটা নিশ্বাস টেনে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো লোকটার মুখ বরাবর। লোকটা লাফ দিয়ে ওঠায় বর্শাটা বেঁধে তার গলার নিচে। সঙ্গে সঙ্গে সে পড়ে যায় বিলের পানিতেই, অনেকটা জায়গা জুড়ে পানি দেখতে দেখতে লাল হয়ে ওঠে এবং তমিজের জালের বড়ো মাছটাও জাল ছিঁড়ে বেরুবার সময় তার বহুকালের ল্যাজ, পেট, পিঠ ও মাথা ঝাঁকালে পানিতে ঢেউ ওঠে এবং রক্তাক্ত পানির ঝাপটায় মনে হয় বিলে বুঝি আগুন লেগেছে।

গলায় বর্শা বেঁধা মানুষটাকে ডাঙায় উঠিয়ে ফেলে যমুনার মাঝিরা। তাকে ঘিরে যমুনার মাঝিদের ভিড় দেখে শাকের মামুদ তাদের উঠিয়ে দেয়, 'এটি তামশা দেখবার আসিছো, না? যাও যাও বেড় জালটা খাটাও। শিমুলতলা এখনো খালিই পড়্যা আছে। যাও সোগলি যাও।'

এদিকে তমিজের বর্শায় আহত মানুষটা বেহুঁশ হয়ে রইলো, তাকে শোয়ানো হয়েছে চোরাবালির বেঁটে দেওয়াল ঘেঁষে। কালাম মাঝি লোক পাঠিয়েছে করিম ডাক্তারকে ডাকতে। কিন্তু আলি মামুদ বলে, "আগেই ডাক্তোর কিসক? পুলিস জখম দেখবি না? জখম না দেখলে মামলা শক্ত হয় ক্যাংকা কর্যা?'

'আরে আমতলির দারোগা তো হামার বেটার কথাত উঠবি, তার কথাত বসবি।' কালাম মাঝির এই আত্মবিশ্বাসে আলি মামুদ কিংবা শাকের মামুদ টলে না, 'দারোগা, তাঁই দারোগাই। দারোগা নিজের বাপেকও ছাড়ে নাকি?'

এদিকে তমিজের দিকে তেড়ে এসেছিলো যমুনার মাঝিদের মেলা ছোঁড়া । মংলু, ভিকু পাগলা, আবিতনের বাপের নেতৃত্বে মাঝিপাড়ার ছোঁড়ারা তাদের ঠেকায়, তবে তমিজের পিঠে বাঁশের একটা চোট লেগেছে বেশ ভালো ভাবে। কিন্তু যমুনার নেতৃস্থানীয় মাঝিরা এখন গোলমাল সহ্য করছে না, 'আগে মাছ ধরো। বেলা তো ডুব্যাই গেছে, বাতি জ্বালাও, মাছ ধরো'।

কালাম মাঝি তাদের আশ্বাস দেয়, 'তহসেন তো আর এটি আসবার পারে না। অর

হুকুম পায়া আমতলির দারোগা ফোর্স লিয়া খাড়া হয়া আছে গোলাবাড়ি হাটেত। এখনি আসিচ্ছে।'

'না। এখন থাক।' আলি মামুদ বাধা দেয়, 'হামাগোরে মাছ ধরা হোক। মাছ ধর‍্যা পোড়াদহ পাঠাই আগে। পুলিস আসলে শালারা আদ্দেক মাছ লিয়া যাবি।'

তমিজের ওপর কালাম মাঝি এতোটাই রেগে গেছে যে পারে তো এখনি গলায় পা দিয়ে তাকে শেষ করে ফেলে। কিন্তু তার জন্যে তার উদ্বেগও অন্তত চার আনা। একবার ইচ্ছা করে, কোমরে দড়ি বেঁধে তৌড়া জালের মতো তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় চোরাবালির ঠিক মাঝখানটায়। কুত্তার বাচ্চা বালুর মধ্যে মরুক দম বন্ধ হয়ে। আবার সঙ্গে সঙ্গে ভয় হয়, ছোঁড়াটাকে যদি পুলিস একবার ধরে তো জেলের ঘানি টানবে সারাটা জীবন। এদিকে মাঝিপাড়ার মানুষ সব জোট বাঁধতে শুরু করেছে উত্তর পাড়ায়। সবাই যদি এদিকে আসে তো শালার মাঝির জাত, কোনো বিশ্বাস নাই, কালাম মাঝির টিনের নতুন আটচালায় আগুন ধরিয়ে দেবে। কালাম এখন কী করে?

পাকুড়তলা থেকে উঠে তমিজ ভিকু পাগলা আর মংলুর পিঠে হাত দিয়ে রওয়ানা হয়েছিলো উত্তরপাড়ার দিকে। কালাম তাকে ধরে আড়ালে নেয়। ভিকু পাগলাকেও ডাকে। গলা নামিয়ে বলে, 'তমিজ, যে নেমকহারামিটা তুই করলু তোর ফাঁসি হলেও হামি আটকাবার পারমু না রে।'

'উগলান পরে দেখা যাবি।' মংলু বলে, 'দেখি আবিতনের বাপের ঘরত হামরা আগে বস্যা বুঝি।'

আবিতনের বাপের ঘরে তমিজ একবার গেলে শালারা জোট বেঁধে এসে হাজির হবে। কালাম বলে, 'তমিজ তুই ভাগ। পুলিস আসলে ইগলান বুঝাবুঝি কিছু শুনবি না।'

পুলিসের কথায় ভিকু পাগলা একটু ঘাবড়ায়, 'পুলিসকো হামরা সাচ কথা বলেঙে।'

এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে। তমিজকে একরকম জোর করেই বুধা আর কালাম মাঝি তোলে নিজের ঘরে। অন্যদের বলে, 'তোমরা উত্তরপাড়াত যাও।'

কিছুক্ষণ পর তমিজের শরীরে মাথায় ছাই রঙের একটা আলোয়ান জড়িয়ে বুধা তার পিঠে হাত ঠেকিয়ে গোলাবাড়ির পথ ধরে। ভিকু পাগলা তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে কালাম মাঝির বাড়ির বাইরের উঠানে। বুধা তার দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে।

ভোর হওয়ার আগেই আমতলির দারোগা চলে আসে দুইজন কনস্টেবল নিয়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যমুনার মাঝিরা নৌকা বোঝাই মাছ নিয়ে রওয়ানা হয় পোড়াদহ মাঠের দিকে। জখম মাঝিটা রয়ে গেলো কালামের ঘরে, আর পুলিসকে সামলাতে রইলো আলি মামুদ।

সেদিন পোড়াদহ মেলা। গ্রামের ঘরে ঘরে নাইওর। গ্রামের প্রত্যেকটি প্রাণী মেলায় যাবার জন্যে তৈরি হতে ঘুম থেকে উঠেছে ভোর হওয়ার অনেক আগে। সুতরাং কাউকে জাগিয়ে তোলার কষ্ট পুলিসকে আর করতে হয় নি। ফুল ইউনিফর্মে হাফপ্যান্টের তলায় মাঘের হাওয়া ঢোকায় নিম্নাঙ্গ তাদের শীতে কুঁকড়ে কুঁকড়ে যায়। সেটা পুষিয়ে নিতে উর্ধ্বাঙ্গের অন্তর্গত মুখে তারা অবিরাম গালাগালি করে। দারোগাকে ধরলে তিনজন পুলিসের তিন দ্বিগুণে ছয়টা পা চলতে থাকে সারা গ্রাম জুড়ে। পা পিছু দুজন করে মোট বারোজনকে তারা ধরে। তাদের কোমরে দড়ি বেঁধে সবাইকে বসিয়ে রাখে কালাম মাঝির বাড়ির বাইরে। তহসেন সকালে এসেছে সাদা পোশাকে, বৌ ছেলেমেয়ে রেখে সে চলে

যাবে বেলা সাড়ে দশটার মধ্যেই। বাপের কাছে সে বারবার আফসোস করে, 'এক নম্বর আসামীই তো ধরা পড়লো না। কী মুশকিল।' তমিজকে খুঁজতে পুলিস কোনো জায়গা আর বাকি রাখে না। এমন কি তহসেনের কথায় তার নিজের বাড়ির ঘরে ঘরেও তমিজকে খোঁজা হয় তন্ন তন্ন করে। তহসেন তার দিকে বারবার আড়চোখে তাকালে কালাম মাঝি মুখ কাচুমাচু করে বলে, 'এ শালা মণ্ডলের কাম। হামার সাথে দুষমুনি কর‍্যা মণ্ডলই বুঝি তমিজকে কোটে সরায়া দিলো। মণ্ডলবাড়ি একবার দেখবা নাকি?'

তহসেন বলে, 'পাগল হলেন নাকি?' শরাফত মণ্ডলের সঙ্গে বাপের বিবাদ করাটা তহসেন সায় দিতে পারে নি কখনোই। কাদেরের ক্ষমতা এখন মেলা। তার বড়োভায়ের ছেলেটা এবার ম্যাট্রিক দেবে, ছাত্র নাকি খুব ভালো। তার ছোটো বোনটা ভি এম গার্লর্স স্কুলে তহসেনের মেয়ের সঙ্গে পড়ে, সেটাও পরীক্ষায় ওপরদিকেই থাকে। আজিজ টাউনে বাড়ি কিনেছে হিন্দু পাড়ায়, কী সুন্দর বাড়ি। এইসব লোকের সঙ্গে তার বাপের গোলামাল। আর খাতির যতো সব ছোটলোকের সঙ্গে। গোমরা মুখ করে তহসেন বলে, 'আমি যাই। দুইটার দিকে ফোর্সের সঙ্গে যেতে হবে কাহালু, তেভাগার শয়তানগুলো আজ বিকালেময়েজ সরকারের বাড়ির গোলা লুট করতে পারে। যাই।' আমতলির দারোগার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সে বলে, 'গোলাবড়িটা একবার দেখতে পারেন। তবে একটা রাত পুরো পেয়েছে, বেটা কি আর বসে আছে?'

৪৯

এবার পোড়াদহের মেলায় কেষ্ট পালের মুখে থমথমে মেঘ, চোখে ঘোলাটে লাল অন্ধকার। মেলার আগের দিন মঙ্গলবার সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর কালো মুখে লাল চোখে সে চলে যায় বাড়ির দিকে এবং পরদিন মেলা না দেখে সারাটা দিন কাটায় বটতলায় ঠাকুরের বেদীর নিচে। তার প্রাণটা ধুকধুক করে : এভাবে হেলাফেলা করে আরাধনা হলে ঠাকুরের দৃষ্টি শুভ থাকে আর কতোদিন? এভাবে পূজা হলে মানুষের ভক্তিই বা টেকে কদ্দিন?

মুকুন্দ সাহা তো ভাগলো পূজার আগে আগে, আর নায়েববাবুর দর্শন অনেক কষ্টে যদিও বা মিললো, সন্ন্যাসী ঠাকুরকে নিয়ে কথাবার্তা সে যা বললো নেহায়েৎ বামুনের ঘরে জন্ম হওয়ায় তার মাথায় বজ্রাঘাত হলো না; ছোটোজাতের মানুষ তারা, তাই শুনেই তাদের যা পাপ হলো তার প্রাচিত্তির কোনো শাস্ত্রে আছে কি-না সন্দেহ।

তা নায়েববাবুর আর কী? পরিবার তো ইনডিয়ায় রেখেই এসেছে, নিজেও চলে যাবে দুই এক বছরের মধ্যেই। ইনডিয়া গিয়ে তারা বড়ো বড়ো দেবদেবীর পূজা করবে প্রাণ ভরে। সেখানে কাশী বৃন্দাবন মথুরা, সেখানে কালীঘাট নদীয়া। জাগ্রত দেবদেবীর সেখানে লেখাজোকা নাই। কিন্তু তাদের গ্রামের এই সন্ন্যাসী ঠাকুরকেও যদি অসন্তুষ্ট করে রাখে তো তাদের হালটা হবে কী? মোসলমানদের কি আর বিশ্বাস করা যায়? একটু

টাকা পয়সার মুখ দেখলে দুই পাতা পড়াশোনা করলে সন্ন্যাসী পূজায় এরা বাগড়া দিতে আসে। শরাফত মণ্ডল বলেছে, মেলায় তার আপত্তি নাই। কিন্তু পূজার জায়গায়, বটতলায় মোসলমানদের আসা যাওয়া চলবে না। সে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে মোসলমানদের চলতে হবে পাক্কা শরিয়ত মোতাবেক। মেলার দিনে গোলাবাড়ি থেকে সন্ন্যাসীর থান পর্যন্ত এতকালের ঘোড়দৌড়টা সে একেবারে অনুমোদন করে না। কালাম মাঝি অবশ্য তার ওপর টেক্কা দিতে বড়ো বড়ো ঘোড়া আনতে চেয়েছিলো সেরপুরের পশ্চিমে খোন্দকারটোলা থেকে। ঘোড়া নাকি এসেও গিয়েছিলো গোটা পাঁচেক। কিন্তু মেলায় ঘোড়াদৌড়ে সওয়ারি তো সব আসে মাঝিপাড়া থেকে। এবার মেলার দিন ভোরবেলা মাঝিপাড়ার আদ্দেকের কোমরে দড়ি পড়লো। ঘোড়াদৌড় শেষ পর্যন্ত হলোই না। পাকুড়তলার মুনসি কি এটা সহ্য করবে? ঘোড়ায় করে ছুটে এসেছিলো তো মুনসির দলের সর্দার, মজনু শাহ, তার বেশুমার ফকিরদের সঙ্গে ছিলো মুনসি। মানুষ সেই কথা ভুলে গেলে মুনসির অভিশাপ নেমে আসবে না?

পশ্চিমা সন্ন্যাসীও এবার এসেছে অনেক কম। মানতের গাঁজা ঠাকুরের থানের নিচে গড়াগড়ি যায়। কেষ্ট পাল পুরনো মানুষ, যতোটা পারে ধীরস্থির থাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষটা খুব দমে গিয়েছে : বাবুদের ছায়া না পেলে ঠাকুর আর তুষ্ট থাকবে কতোদিন?

মেলা ভেঙে গেলে অনেক রাত্রে বৈকুণ্ঠ গিরি এসে বসে বটতলায় ঠাকুরের বেদীর নিচে। এ বছরেও ভোরবেলা ভবানী ঠাকুরের দর্শন তার ভাগ্যে জুটলো না। গতকাল রাতে, মেলার আগের দিন, পূজার বটতলা যখন পশ্চিমা সন্ন্যাসীতে, পূজায় আরাধনায়, গাঁজায়, আরতিতে, কামারে কুমারে, জোলায় কলুতে মাঝিতে গমগম করছে, বৈকুণ্ঠ তখন ফিরছিলো হাটের দোকানে। পরদিন ভোর থেকে মেলা, গোলাবাড়ি হাটের দোকানদারদের বেশিরভাগই আজ রাত কাটাবে পোড়াদহ মাঠে। কেষ্ট পালের ছোটভাই বিষ্টু বলে, 'বৈকুণ্ঠ তুই হাটে যা। সাহার দোকান খালি না রাখাই ভালো। মানুষের লজর আছে ওই দোকানের উপরে।' ঠাকুরের প্রসাদ কিছু নিয়ে এসেছিলো, তারই খানিকটা খেয়ে বৈকুণ্ঠ শুয়ে পড়ে। এমন সময় ফিসফিসে গলায় 'বৈকুণ্ঠদা' শুনে দরজা খুলে দেখে তমিজ। সন্ধ্যার পরপরই সে মাঝিপাড়া থেকে পালিয়ে এসে লুকিয়ে ছিলো হাটের কাছেই মুচিপাড়ার পাশে এক ঝোপের ভেতর। রাত হলে গোলাবাড়ি হাটে এসে দেখে কেউ নাই।

তার বিবরণ শেষ করতে না দিয়ে বৈকুণ্ঠ বলে, 'শুনিছি। মেলার মাঠেত সবই তো শুনলাম। আয় ঘরত আয়।'

বাঁ হাতের কনুই তমিজের অসম্ভব ফুলে উঠেছে। পিঠের খোঁচাটা তেমন নয়। দিনমান না খেয়ে ছোঁড়াটা কাবু হয়ে গেছে। বৈকুণ্ঠ তাকে পূজার প্রসাদ দিলে সে গপ গপ করে খায়। কিন্তু একটুখানি খেয়েই নেতিয়ে পড়ে মুকুন্দ সাহার গদির ওপর। তারপর কোঁকাতে থাকলে তার গায়ে হাত দিয়ে বৈকুণ্ঠ দেখে তার গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। বৈকুণ্ঠ কী আর করে, টিউবওয়েল থেকে পানি এনে সারারাত ধরে তমিজের মাথায় জলপট্টি দেয়। ভোর হওয়ার অনেক আগেই মুকুন্দ সাহার দোকানের দরজায় আস্তে আস্তে আওয়াজ হলে বৈকুণ্ঠ ফিসফিস করে বলে, 'পুলিস।' তমিজ তার হাত ধরে থাকে। একটু পর বৈকুণ্ঠ বেরুবে ঠাকুরকে দেখার আশায়। এই সময় রাতভর বেজাতের

মানুষের সঙ্গে হাত ঘষাঘষি কি ঠিক হচ্ছে? কিন্তু উপায় কী? তমিজকে পুলিসে ধরলে ছোঁড়াটার ওপর কী জুলুমটা যে করবে!

ওদিকে দরজায় আস্তে আস্তে ধাক্কার সঙ্গে শোনা যায় 'এই বৈকুণ্ঠ। এই বৈকুণ্ঠ।'

দোকানের শেষ মাথায় মরিচের বস্তার আড়ালে তমিজকে তুলে নিয়ে বৈকুণ্ঠ তাকে শুইয়ে দেয় মেঝের ওপর। তারপর ফিরে দরজা খুলতেই গফুর কলু ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দিয়ে ফিসফিস করে বলে, 'তমিজেক বার কর্যা দে। পুলিস মাঝিপাড়ার দিকে যাচ্ছে। তমিজ এক লম্বর আসামী।'

'তমিজ কোটে?' বৈকুণ্ঠের এই কথায় গফুর রাগ করে, 'তমিজ তোর এটি ধরা পড়লে পুলিস তোক বস্তাই জবো করবি। কালামের বেটা খবর দিছে আমতলি থানাত। এই দোকানঘর থ্যাকা তোক সরাবার পারলে কালাম মাঝির আর কোনো কাঁটা থাকে না।' বলতে বলতে সে নিজেই চলে যায় দোকানঘরের শেষ প্রান্তে এবং মরিচের বস্তার ওপার থেকে তমিজকে ধরে দাঁড় করায়। 'তোর বরাত!' তার সৌভাগ্যের ব্যাখ্যাটা হলো এইরকম : কাদের কিছুক্ষণ আগে গফুরকে খবর দিয়েছে, তমিজ যেন মিছেমিছি পালাবার চেষ্টা না করে। তমিজকে পেলে গফুর নিজেই যেন তাকে নিয়ে চলে যায় টাউনে, টাউনে কাদেরের বাসায় রেখে আসে। মেলায় কাদেরের বন্ধুদের নিয়ে আসতে গফুরের এমনিতেই তো টাউনে যাবার কথা, ঐ সময় তমিজকে সে যেন সঙ্গে নেয়। 'চল, হামি তো সাইকেলেত যামু, তুই ভালো কর্যা আলোয়ান গাওত দিয়া নে। ভয় করিস না। পুলিস তো আসিচ্ছে পুব থ্যাকা, হামরা যামু টাউনের দিকে। চল।'

বৈকুণ্ঠের খালি আফসোস হয়, ছোঁড়াটাকে নিয়ে আগেই সে টাউনের দিকে ভাগলো না কেন? তমিজ তার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। গফুর কলুকে সে ভয় পাচ্ছে? গফুর কি তাকে নিয়ে কাদেরের টাউনের বাসায় যাবে, না পুলিসের হাতে তুলে দেবে? কাদেরের মতলবটাই বা কী? তমিজকে দিয়ে সে কি মাঝিপাড়ার মানুষকে খেপিয়ে তুলবে কালাম মাঝির বিরুদ্ধে? কালামকে তো সে সহ্যই করতে পারে না। বৈকুণ্ঠ এখন করে কী?

গফুর বিরক্ত হয়, 'এই শালা মাঝির জাত, ইগলানেক ভালো করবার গেলেও দোষ হয়। থাক শালা এটি থাক। হিন্দুই তোর লিজের মানুষ হলো? শালা হিন্দুটাকও তো মারবু রে।'

তমিজ বৈকুণ্ঠকে জড়িয়ে ধরলে সে আস্তে করে বলে, 'তমিজ, তুই যা, কাদের ভাইয়ের মেলা ক্ষমতা।'

তমিজ গফুরের সঙ্গে টলতে টলতে হাঁটে। দরজা পেরোবার সময় সে বৈকুণ্ঠের দিকে একবার তাকায় তার তপ্ত ও লাল দুই চোখ ভরে। বৈকুণ্ঠের মাথাটা দপ করে ওঠে : তমিজের বাপ যেন চেরাগ আলির দিকে তাকিয়ে কারো কোনো দুঃস্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনছে।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে গফুর ভেতরে তাকিয়ে দরজা ভালো করে বন্ধ করার ইশারা দেয়। তমিজ কিন্তু আর একবারো ফিরে তাকায় না।

দেখতে দেখতে রোদ উঠে গেলো। এবারও বৈকুণ্ঠের ঠাকুর দর্শন হলো না। এবার বরং ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হওয়ার দরকারটা ছিলো বেশি। বৈকুণ্ঠ যদি রাত থাকতেই তমিজকে নিয়ে মোষের দিঘির পাড়ে চলে যেতো! বৈকুণ্ঠ তো একরকম ধাক্কা দিয়েই তাকে বার করে দিলো। তমিজকে দেখে মনে হচ্ছিলো, এক পুলিসের হাত থেকে

বাঁচাতে তাকে যেন ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আরেক পুলিসের কবজায়। তমিজকে নিয়ে বৈকুণ্ঠ যদি মোষের দিঘির ওপর থেকে সন্ন্যাসী ঠাকুরের দর্শন একবার পায় তো ঠাকুরই তাকে বুকে টেনে নিতো। তমিজের বাপের বেটা কি রাগ করে গেলো তার ওপর? ঘর থেকে বেরিয়ে একবারও ফিরে তাকালো না কেন?

মেলার পর মানুষজন চলে গেছে। কিছু কিছু দোকানের ভেতর ঘুমিয়ে পড়েছে দোকানদাররা। আলো জ্বলে নটিপট্টিতে। আর এখানে সন্ন্যাসীর বেদি ঘেঁষে বটগাছের নিচে পশ্চিমা সন্ন্যাসী শুয়ে রয়েছে জনা ছয়েক। আর যারা এসেছিলো তারা কেটে পড়েছে। এই ছয়জন ঘুমিয়ে থাকে চারটে কম্বলের নিচে। সন্ন্যাসীরা নিজ নিজ নাভিমূল থেকে ব্রহ্মাকে টেনে হিঁচড়ে বার করে দিচ্ছে যার যার নাক দিয়ে। একেকজনের নাক ডাকার একেকরকম আওয়াজ বৈকুণ্ঠের কানে বড়ো এলোমোলো ঠেকছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে ওই গোলমেলে ধ্বনিতে একরকম বিন্যাস তৈরি হয়। ভবানী পাঠকের আশীর্বাদে ওই আওয়াজ থেকে নাক ডাকার শব্দ আড়ালে চলে যায়। অচেনা তাল ও লয়ের বাজনা শুনে বৈকুণ্ঠ বোঝে, এখনি শুরু হবে চেরাগ আলি ফকিরের গান। ঠাকুরের থানে মাথা রেখে সে জিগ্যেস করে, 'একেবারে নতুন কিসিমের গান বান্ধিছো ফকির?'

'মনুষ্যের কী সাধ্য এই সংগীত রচনা করে?'—এরকম কঠিন সমস্কৃত কথা চেরাগ আলির জিভে আসবে কী করে?—চমকে উঠে এবং খানিকটা ভয় পেয়েও বটে, বৈকুণ্ঠনাথ গিরি ধোঁয়া ও উৎকণ্ঠা, নেশা ও উদ্বেগ এবং ভয়ে ও উত্তেজনায় ভারী মুণ্ডু ওপরে তুলে দেখে, তার নয়নের সুমুখে জটাশির, বিভূতিমণ্ডিত ও উর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসীর বিশাল মূর্তি। সন্ন্যাসীর হাতের ত্রিশূলের তিনটে কাঁটা কুয়াশা ফুঁড়ে ঢুকে গেছে আকাশের খোপের ভেতর। কাঁটার আঁকশি তিনটেতেই আলো জ্বলে, তিনটেতেই মাছের নকশা জ্বলে জ্বল জ্বল করে। ত্রিশূল দিয়ে সন্ন্যাসী ঠাকুর বিজলি শিকার করবে নাকি? এই মাছের নকশা সন্ন্যাসী কি চেয়ে নিয়েছে মুনসির পাণ্টি থেকে? না-কি মুনসিই ত্রিশূল থেকে একটি এনে বসিয়ে দিয়েছে তার পাণ্টির মাথায়? মাছ কেন? বিজলির কি মাছের লালচ একটু বেশি যে তাকে ধরতে মাছের টোপ লাগাতে হয়? সন্ন্যাসীর মস্ত মাথা নিজের মাথায় নিয়ে বটগাছ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা পোড়াদহের মাঠ জুড়ে। বৈকুণ্ঠনাথ চোখ বুঁজলে তার কানে বেজে ওঠে :

সুখনিদ্রাপরিত্যাজে জাগো মৃগরাজতেজে
মীন জাগে তরু জাগে জাগো গিরিগণ।
তোমরা সুপ্ত শয্যাপরি গৃহে প্রবেশিল অরি
বান্ধিল শৃঙ্খলে তোমরা নিদ্রাতে মগন।
ভবানী হুঙ্কারে জাগো জাগো গিরিগণ॥

বৈকুণ্ঠের সারা শরীর কাঁপে থরথর করে, এই শাস্তর তো চেরাগ আলির নয়। এরকম শক্ত শক্ত কথা চেরাগ আলির পেটে যদি কোনোদিন থেকেও থাকে তো তার গলা পর্যন্ত আসতে না আসতে তা গলে গেছে, জিভে চড়ার বল তার হয় নি। চেরাগ আলির গলা ভারি, কিন্তু নদীর পানিতে, পানির বাতাসে আর বাতাসের হিমে ও তাপে সেই স্বরে ভাঙনের চিহ্ন, চিড় খাওয়ার দাগ। সেখানে বিজলির এরকম রাগী গর্জন নাই। এই গর্জন আসছে বটগাছের অনেক ওপর থেকে। বটগাছের নিচে দাঁড়ালে বৈকুণ্ঠ টের

পায়, সন্ন্যাসীর গান হুঙ্কার দিতে দিতে চলে যাচ্ছে উত্তর পশ্চিমে। এই গানের নিচে নিচে সে চলতে শুরু করে।

হাঁটার জন্যে দুই পা ফেলতে পায়ের নিচে পড়ে বটফল, হাঁটুতে আর কোমরে ঠেকে বটগাছের কচি চারা। একটা দুইটা তিনটা চারা। বটগাছের কচি চারা গায়ে লাগলে তার সর্বাঙ্গ শিরশির করে। ঐ পাতার ছোঁয়া কাটাতে এবং ঐ পাতাওয়ালা চারা থেকে বল পেতেও বটে, বৈকুণ্ঠ তার হাঁটুসমান একটা বটের চারা উপড়ে নেয় বেশ জোরে টান দিয়ে। না, এই অন্ধকার কুয়াশার রাতে খালি হাতে সে যাত্রা করে কীভাবে?

বটতলা থেকে পোড়াদহ মাঠ পেরিয়ে গান এখন উড়াল দিচ্ছে উত্তর পশ্চিমে। বাঙালি নদীর রোগা স্রোতের ওপর দিয়ে গান ওড়ে, বাঙালির স্রোতে তার ছায়া ফেলে, তার বিনিময়ে গান তার ডানায় মেখে নেয় কুলুকুলু বোল। কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে পাকুড়তলা থেকে গানের প্রতিধ্বনি ফিরে আসে, ফেরার সময় তার পাখায় লাগে পাকুড়গাছের ঝিরিঝিরি কথা আর বিলের ঢেউ আর বাঙালি নদীর স্রোতের ভিজে হাওয়া :

জাগো কাতারে কাতারে গিরিরডাঙা কাৎলাহারে
জোট বান্দো দেখো টেকে কয়টা দুষমন।
জোট বান্দো ভাঙো হাতের শিকল ঝন ঝন।
শিকল মিলায় রৌদ্রে শিশির যেমন॥

এই তো মুনসির গান, রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, হাওয়ায় হালকা হয়ে ঝরে পড়ছে চেরাগ আলির ভাঙাচোরা ভারি গলায়। কাৎলাহার বিলের রুই কাৎলা, পাবদা ট্যাংরা, শিঙি মাগুর খলসে পুঁটির আঁশটে গন্ধে, ভেড়ার আদলে জেগে-ওঠা গজারের ভেড়ার লোমের বোঁটকা গন্ধে ম ম করতে করতে চেরাগ আলির গলায় মুনসির গান বারবার ধাক্কা দিচ্ছে বটগাছের নিচে, সন্ন্যাসীর থানে। আর দেরি করা যায় না। তমিজটা কাদেরের হাতে ধরা দিতে গফূরের সঙ্গে রওনা হয়ে বৈকুণ্ঠের দিকে একবারো ফিরে তাকালো না। ছোঁড়াটা তার কাছে ঠাঁই চেয়েও না পেয়ে কী অভিমানটাই করে গেলো গো। বেটার কষ্টে চোরাবালির ভেতরে বাপটা তার না জানি কী ছটফট করে মরছে। তমিজের বাপের পাশে একবার বসা দরকার। চোরাবালির দিকে যাবার জন্যে বটের চারা হাতে লম্বা লম্বা কদম ফেলে চলে বৈকুণ্ঠ।

৫০

কামিজের ওপরে ওড়না, ওড়না ময়লা হলেও একটু খেয়াল করলে বোঝা যায় যে, মেয়েটির একটি স্তন নাই। বিহারে হিন্দুরা মেয়েটির অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে দুটো স্তনই আশ মিটিয়ে চাটা ও চোষার পর একটি কেটে ফেলেছে, খবরটা এই রিফিউজি ক্যাম্পে সবাই জানে এবং এর ফলে তার আত্মীয়স্বজনের রিলিফের হিস্যাটা একটু বেশি। কাদেরের হুকুমে কেরামত আলি একটা শাড়ি তার দিকে এগিয়ে ধরতেই সেটা চালান

হয়ে যায় অন্য একটি হাতে। ওড়নার ভেতর থেকে মেয়েটি চোখ মেলে তাকালে ঘোমটা একটু সরে যায়। তার নিশ্বাস নেওয়ার আওয়াজে কেরামতের কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে এবং ঐ নিশ্বাসের আওয়াজে বা নিজের কানের ঝাঁ ঝাঁ গোলমালে কেরামতের বাবরি চুল এলোমেলো হয়ে যায়। এও কি গন্ধ শুঁকে শুঁকে মানুষের ভেতরের কথাবার্তা সব জেনে ফেলবে নাকি? কিন্তু এর গায়ের রঙ তো রীতিমতো ফর্সা, এর নাক তো টিকালো। কুলসুমের মতো এর চোখ অতো বড়ো নয়, এর চোখে পটলচেরা ভাব।—তা হলে মিলটা কোথায়?

মেয়েটির কাটা স্তন এবং কুণ্ডুবাড়ির একতলা, দোতলা ও ছাদ জুড়ে উর্দু ও দেহাতি হিন্দিতে প্রকাশিত রিফিউজিদের ক্ষোভ, রাগ, বিলাপ ও অভিযোগ ভাষার দুর্বোধ্যতা মুছে ফেলে এবং কেরামতের বাবরি চুল ফুঁড়ে খোঁচাতে থাকে অবিরাম। খোঁচায় খোঁচায় একটি পদ্যের কুঁড়ি তার মাথার চাঁদিতে বেঁধে ছোটো একটি কাঁটার মতো, কিন্তু কুঁড়িটা ফোটে না। কুণ্ডুবাড়ির সব জায়গায় আবদুল কাদেরের নেতৃত্বে রিলিফের মাল দিতে দিতে কেরামতের মাথায় পদ্য ফোঁটার বদলে ফুটে ওঠে কুলসুমের মুখ। মুখটা গাঁথা হয়ে যায় বিহারি মেয়েটির ধড়ের ওপর। মাঝখান থেকে কুলসুমের বুকের একটা স্তন খসে পড়ে খাঁড়ার আঘাতে।

রিকুইজিশন করা যতীন রায়ের বাড়িতে রিফিউজি-ক্যাম্পের জন্যে বড়ো দুই টিন পাউডার দুধ নিয়ে একটি কাদেরের বাড়িতে রেখে এবং আরেকটি রিকশায় চাপিয়ে বাদুড়তলা যাবার সময় কুলসুমের কাটা স্তন কেরামতের চোখে ঝাপসা হতে থাকে। তাই রেলগেটের সামনে এসে নিজের নামটা শুনতে তার অনেকটা সময় লাগে। হঠাৎ চমকে উঠে ডানদিকে তাকিয়ে দেখে, রেল লাইনের ধারে চশমার ডালা থেকে ছোটো আয়না ধরে চোখের চশমা পছন্দ করছে কালাম মাঝি। তার সঙ্গেও রিফিউজিদের জন্যে রিলিফের প্যাকেট। কালাম মাঝি তার রিকশায় উঠে বসলে তার চশমাপরা মুখ জীবনে এই প্রথম দেখে কেরামত তাকে মিনিট তিনেকের মধ্যে দ্বিতীয়বার স্লামালেকুম বলে তাজিম করে। যতোটা সম্ভব বিনয় করে সে জিগ্যেস করে, 'সোমাচার ভালো?'

'আর ভালো!' ভালো না থাকার কারণ সে বয়ান করে একে একে—। মাঝিপাড়ার কয়েকটা চোরাডাকাতকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে বলে ইসমাইল অকারণে তার ওপর খাপ্পা হয়ে রয়েছে। আরে নিজের রক্ত পানি করা পয়সায় যে বিল ইজারা নিয়েছে, সে কি চোরডাকাতদের মাছ ধরার জুত করে দিতে? ইসমাইল এই রাগে তকে রিলিফের মাল পর্যন্ত দিলো না। তা তাতে তার বয়েই গেলো! বলতে গেলে এই কারণেই তার দাম বেড়েছে ডাক্তার শামসুদ্দিন খোন্দকার আর সাদেক উকিলের মতো জাঁদরেল নেতাদের কাছে। ডাক্তার তাকে দুধের টিন দিতে না পারলেও বেশ কিছু শাড়ি আর লুঙি জোগাড় করে দিয়েছে। তবে কি-না ইসমাইল হোসেন একজন এম এল এ এবং গিরিরডাঙা নিজগিরিরডাঙা গোলাবাড়ি এলাকায় এখনো তার পজিশন ভালো। শরাফত মণ্ডলের বেটা কাদের ইসমাইলের কান ভারি করে রেখেছে। মাঝিপাড়াটাও হাত করার তালে আছে কাদের। কালাম অনুমান করে, তমিজকে লুকিয়ে রেখেছে এই শালা কাদেরই। কালাম মিনতি করে, কেরামত কি ইসমাইল হোসেনকে তার হয়ে একটু বুঝিয়ে বলতে পারে না?

কিন্তু কুলসুমের একটি কাটা স্তন ও তার গায়ে ফর্সা ছাপ দেখে কেরামত বড়ো বিচলিত, শোলোকের কুঁড়িটা তার মাথায় ফোটে না। অন্যমনস্কভাবে সে জিগ্যেস করে,

'গোলাবাড়ির ওদিকে তো রিফিউজি যায় নাই, না?' এবং 'তমিজ এখনো ধরা পড়ে নাই?'

প্রশ্ন দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলেও কালাম মাঝি জবাব দেয় দুটোরই, 'এখানো যায় নাই, তবে যাতে কতোক্ষণ?' এবং 'শালা খুনের আসামী হয়া পলায়া বেড়ায়।'

কুলসুম একা একা নিরাপদে থাকে কী করে? কালাম মাঝির দারোগা বেটা কি তার ফোর্স নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে না তার ওপর? পুলিস কি তার স্তনে ছুরি বসিয়ে দিলো? তার কাটা স্তনের দুধ ও রক্ত লেগেই কি কুলসুমের কালো মুখ গোলাপি হয়ে গেলো?— কালাম মাঝিকে তো আর এসব প্রশ্ন করা সম্ভব নয়। কথাগুলো কেরামতের স্তনবিহীন বুকেই পড়ে থাকে এলোমেলোভাবে। কালাম মাঝি নিজে থেকেই বলে, 'বেটা তার চোরডাকাত জেলখাটা কয়েদি হলে কী হয়, তমিজের বাপ তো আছিলো ফেরেশতার লাকান মানুষ। হামরা একই বংশের মানুষ। তার বৌয়েক দেখাশোনা করা লাগে হামাকই। হামার ঘরত তাক থাকবার দিছি, দেখাশোনা করা লাগবি না?'

কুলসুমের এই দুর্দিনে তার দেখাশোনার ভার নিয়েছে, আহা মানুষটা খুব সওয়াবের কাম করছে গো। কেরামত গদগদ চোখে তাকায় কালামের নতুন চশমা-পরা চোখের দিকে। আবার কুলসুমের দেখাশোনার সুযোগ কালাম মাঝির ভাগ্যেই জুটে যাওয়ায় তার বুকটা একটুখানি চিনচিন করে ওঠে। তার হিংসাটুকু ছেঁকে পড়লে তার ভক্তিজর্জর দৃষ্টির প্রতিদান দেয় কালাম মাঝি তার কাব্যচর্চায় আগ্রহ দেখিয়ে, 'কেরামত আলি, তোমার দেখাই পাই না। এখন আর গান বান্দো না?'

'টাইম পাই না কালাম ভাই।' ব্যস্ত থাকার গৌরবে কেরামতের বিষণ্ণতা, উদ্বেগ ও চিনচিনে হিংসা কেটে যায়, কিংবা এইসব কাটাতেই সে ব্যস্ত হওয়ার উপায় খোঁজে, 'হামার টাইম কোটে? ইসমাইল সাহেব কয়, কেরামতের হাতে রিলিফের মাল দিলে নষ্ট হবি না। আবার সাদেক উকিল ওইদিন কলো, "কবি, এখন তোমাগোরে গান লেখার টাইম। পাকিস্তান হলো, এখনো যদি হিন্দু কবিদের কবিতাই পড়া লাগে তো ইসলামি স্টেট করার ফায়দাটা কী? ঢাকাত যাও, ইসলামি জোশের গান লিখ্যা মানুষের মন পরিষ্কার করো।" হামার ঢাকাত যাবার ফুরসৎ কৈ?' কিন্তু নতুন শোলোকের কুঁড়িটা ফোটাবার ফুরসৎ তো তাকে করে নিতেই হবে। আপন মনে সে বলে, 'অনেকদিন বাদে গান একটা বান্দিছি। রিফিউজি লিয়া গান।'

'চলো হামাগোরে ওটি চলো। একটা মজলিশ না হয় করি।' কালাম মাঝির প্রস্তাবে খুশি হলেও নিজের একটু দাম বাড়ায় কেরামত, 'মাঝিপাড়াত গান শোনার মানুষ কোটে?'

'মাঝিপাড়াত গান করবা কিসক? ওটি মানুষ কৈ?' মাঝিপাড়ার মানুষের কাব্যবোধে কালাম মাঝির আস্থা নাই, 'গান করবা তুমি গোলাবাড়ি হাটেত। মুকুন্দ সাহার দোকান তো হামি লিছি, সাহাক বায়না দিয়া রাখিছি। ঐ দোকানের সামনে মেলা জায়গা।'

নিজের বাঁধা শোলোক অনেক অনেক মানুষের সামনে গাইবার জন্যে কেরামত কাঙাল হয়ে ওঠে, নিজের দাম বাড়াবার ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিয়ে সে বলে ওঠে, 'আজই যাবেন? চলেন। রিলিফের এই টিনটা যতীনবাবুর বাড়িত দিয়াই হামি আসিছি। এক ঘড়িও লাগবি না।'

'দুধ তো গোলাবাড়িতও দরকার। ওটা না হয় লিয়াই চলো।'

দুধের বড়ো টিন হাত করে কেরামতকে সঙ্গে নেওয়ার ইচ্ছা কালাম মাঝির আরো

তীব্র হয়। মাঝিপাড়ায় সে বড়ো একা পড়ে গেছে। নিজের পরিবার পর্যন্ত মুখ গোমড়া করে থাকে তার সামনে। বৌয়ের চাচাতো বোনের ভাসুর আর খালাতো বোনের ছেলে বিলের ঘটনায় হাজত খাটছে। গোটা মাঝিপাড়ায় একটু আরাম পাওয়া যায় বরং কুলসুমের ঘরে গেলে। বিলডাকাতির কোনে কথাই সে তোলে না। মাঝিবংশের মেয়ে তো নয়, হাজার হলেও চেরাগ আলি ফকিরের নাতনি। তমিজের বাপ নাকি প্রায়ই তার কাছে আসে। এসব কথায় কালাম তেমন আমল দেয় না। কিন্তু কয়েকদিন হলো তার কথা সে খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে। তমিজের বাপের কথা বলতে বলতে কুলসুমের লম্বাটে মুখ কেমন জ্বলজ্বল করে। দূর সম্পর্কের এই চাচিকে কালাম মাঝি দেখে আসছে কতোদিন থেকে, তার বাঁশঝাড়ের ভেতরেই তো সে বড়ো হলো দাদার সাথে। তারপর মেয়েটির বিয়েও হলো তারই সম্পর্কের চাচার সঙ্গে। কিন্তু এই মুখে এরকম আলো তো কালাম আগে কখনো খেয়াল করে নি।

আবার ওই আলো দেখে তার কেমন ভয় ভয় করে, একলা ঐ ঘরে ঢুকে কখন কী করে ফেলে সে নিজেই বুঝতে পারে না। মাঝিপাড়ার মানুষের কাছে দিনদিন সে ছোটো হয়ে যাচ্ছে, কালাম মাঝির নিজের ওপর নিজের দখল যেন কমে যাচ্ছে। কেরামত আলিকে আজকাল সে আর কাছছাড়া করতে চায় না। তার বাড়িতে নতুন ওঠানো চারচালা খানকা ঘরে তার থাকার ব্যবস্থাও সে করে দিয়েছে। বাঁশঝাড়ের পেছনে চেরাগ আলির জন্যে যে ছাপরাটা তোলা হয়েছিলো, ঐ ভিটাটা এখনো খালিই রয়ে গেছে। কেরামতের জন্যে ওখানে একটা ঘর তুলে দেওয়া এমন কোনো ব্যাপারে নয়। কিন্তু এই কবি শালা মানুষটা বড়ো ছটফটে, কখন কেটে পড়বে, হয়তো কাদেরের এক ডাকেই কুত্তার মতো চলে যাবে কালামকে কিছু না বলেই। তবে থাক, খানকা ঘরেই থাক। যতোদিন থাকে, ততোদিনই লাভ। কালাম মাঝি এখন তার সঙ্গে গপ্পো করতে পারে, তাকে নিয়ে হাটে যায়, বাজারে ঘোরে। আবার লোকজনের সামনে তার ওপর একটু তম্বিও করতে পারে।

কুলসুমের জন্যে কেরামতের টানটা কালামের কিন্তু ভালেই লাগে। কুলসুমের সঙ্গে একা একা কথা বলতে তার যতোই ভালো লাগুক, ভয়ও করে। কেরামতটা থাকলে নিরাপদ।

কালাম মাঝির বাড়িতে সকালে পান্তা বা কড়কড়া ভাত, দুই সন্ধ্যা মাছ দিয়ে গরম ভাত খেয়ে এবং সময় অসময়ে কালাম মাঝির সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে কেরামতের সময় কাটে, কিন্তু মাথার পদ্যটা তার ফোটে না। কুলসুমের দেখা পেলে এ্যাদ্দিনে গান বাঁধা হয়ে যেতো। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কালাম মাঝি হুট করে 'তুমি একটু আগাও, হামি আসি' বলে কুলসুমের ঘরে ঢোকে, কেরামত ধীর পায়ে চলে কালামের খানকা ঘরে। আবার কেরামতের সঙ্গে কালাম কুলসুমের গপ্পোও করে। বলে, কেরামত কি সারাটা জীবন এমনি বাউণ্ডেলে হয়েই থাকবে? বিয়ে শাদি করবে না? কুলসুমটাও এই বয়সে রাঁড়ি হয়ে থাকবে আর কতোদিন? কালাম মাঝি সরাসরি না বললেও ইঙ্গিতটা কেরামত ঠিকই বোঝে। কিন্তু কালাম তাকে কুলসুমের ঘরে ঢুকতে দেয় না কেন?

এক মেঘলা ভোরে বাঁশঝাড়ে চেরাগ আলির শূন্য ভিটার দিকে মুখ করে পায়খানা করতে বসে কেরামত হঠাৎ খুব উতলা হয়ে ওঠে। কালাম মাঝি এখনো বাড়ির ভেতরে,

তার বেরুতে দেরি আছে। কেরামত ডোবার পানিতে ভালো করে হাত ধুয়ে চলে যায় তমিজের বাপের ঘরে।

ঘরের চৌকাঠে বসে সে কুলসুমকে নিবেদন করে, 'তুমি তো তোমার দাদার শোলোক শাস্তর সবই জানো। হামাক কলে হামি না হয় লিখ্যা লিবার পারি।'

'বইতো তোমাক দিলাম। তুমি বলে বেচ্যা দিছো কার কাছে? দাদা অ্যাসা বই উটকায়, পায় না।' সেই বই ফেরত পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই কেরামতের নাই। কুলসুম বোঝে না কেন, কেরামত নিজেই কতো কতো শোলোক বাঁধতে পারে, 'খোয়াবনামা'র তুলনায় সেগুলো কম কোনোদিকে? রীতিমতো ছাপা বই, লোকে পয়সা দিয়ে কেনে, পাইকাররা বাড়ি বয়ে এসে নিয়ে যায়।

এখন তার লেখা আসছে না। ওই ছেঁড়াখোঁড়া বইটাই যতো অনিষ্টের মূল। একবার হাতে পেয়ে সেখানে কী যে সে পেলো, তার ওপর কী যে আসর করলো, এখন বইটা হাতছাড়া হতেই কলম তার একেবারে শুকিয়ে গেলো। কুলসুম যদি একটু পাশে থাকে, ফকিরের গানগুলো যদি একটু শোনায় তো কেরামত ফের আগের মতো গান বাঁধতে পারে। মরিয়া হয়ে সে বলেই ফেলে, 'তোমাকে দেখলে হামার গান বান্দা হয়। হাজার হলেও তুমি ফকিরের লাতিন। একটা গান বান্দিছি, এখনো শেষ করবার পারি নাই। শুনবা?'

কাগজ নাই, কলম নাই, তবু তার পদ্যের বীজ মাথা ফেটে বেরোয় এই রকম আওয়াজে :

বাস্তভিটা হইতে বিতাড়িত মোহাজের।
পাকিস্তানেতে তারা হইয়াছে হাজের॥

কুলসুমের দিকে চোখ রেখেই সে পদ্য বলছিলো, কিন্তু তার চোখ দরজার বাইরে। চোখে তার তেজের বদলে একটুখানি হাসির কুচি। কেরামতের শোলোক তার কানে ঢুকেছে বলে মনে হয় না। দরজার বাইরে কুলসুম কাকে দেখে? কেরামত বাইরে চোখ মেললে কাউকেই তো দেখতে পায় না। কেরামতের দিকে তাকিয়ে কুলসুম হঠাৎ বলে, 'দুয়ার ছাড়ো, আসবার দাও।'

কৈ, কেউ তো নাই। অথচ কুলসুম কার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'তোমার বেটার বৌ তো পোয়াতি হছে গো। উদিনকা গেছিলাম্।'

সত্যি সত্যি কে যেন ঘরে ঢোকে, কেরামতের গা তার গতির বাতাসে কাঁপলে সে একটু সরে বসে। কিন্তু মানুষটাকে দেখা যায় না কেন? কুলসুম তার সঙ্গে কথা বলেই চলে, 'ঘেগি হলে কী হয়, বৌটা মানুষ ভালো। হামাকে বোয়াল মাছের সালুন দিয়া ভাত খিলালো।' ওপরে এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি থেকে একটা কাঁথা বার করে কুলসুম সামনে এগিয়ে ধরে, 'বৌ হামাক খ্যাতাখান দিলো। একটা কোণ অল্প একটু ছিঁড়া গেছে, তাও দুইটা শীত পাড়ি দেওয়া যাবি, লয়?' এগিয়ে দেওয়া কাঁথার একটা কোণ শূন্যে একটু ওপরে উঠলো, কেউ হাত দিয়ে ধরে ছেড়ে দিলো। কুলসুম বলে, 'বৌয়ের বোন খ্যাতা সেলাই করিছে। কী সোন্দর খ্যাতা গো, লকসা দেখিছো?' অদৃশ্য লোকটি দেখে, কেরামতও দেখে, সারা কাঁথা জুড়ে লাল নীল ও হলুদ সুতায় বরফি আঁকা, মাঝে মাঝে চাঁদ তারার ছবি। একেকটা চাঁদ পিছু তিনটে তারা।

কিন্তু তমিজের বাপের হাজিরা অনুমান করে, ঠিক করে বললে বলতে হয়, টের পেয়ে কেরামত শুকনা ঢোক গেলে। সবটা ঘরে বিলের কাদাপানির গন্ধ, পানির আঁশটে গন্ধ।

কেরামত আর কথা না বলে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে আসছে, দেখা হয়ে যায় কালাম মাঝির সঙ্গে। কালাম হঠাৎ এতো গম্ভীর হয়ে গেলো কেন? তমিজের বাপের ঘরে গিয়েছিলো শুনে স্থির চোখে সে তাকায় কেরামতের দিকে।

তবে বিকালবেলাতেই কালাম তাকে জানায়, 'কাল বুধবার না? হাটবার। কালই তোমার গান হবি।'

'কালই? গান তো পুরা বান্দা হয় নাই। শুক্কুরবার দিন হাটবার আছে না?'

'বালের গান বান্দো! আজ রাতের মধ্যেই গান বান্দা রাখবা।'

মুকুন্দ সাহার দোকানের বারান্দায় তক্তপোষ পাতা হলো। তক্তপোষ ঘর থেকে বার করে দিলো বৈকুণ্ঠ নিজেই। আড়তে ঢুকে কালাম চোখ দিয়ে জরিপ করে বলে, 'ক্যা রে, মরিচের বস্তা না উদিনকা দেখলাম আটটা। আজ ছয়টা কিসক? জিরার বস্তা খালি একটাই আছে? সব বেচ্যা দিছু?'

কালামের কথায় নয়, মুকুন্দ সাহাকে হিসাব দিতে হবে বলে বৈকুণ্ঠ মুখ কাঁচুমাচু করে। বাবুর আসতে দেরি হচ্ছে দেখে ও যে দাম পায় তাতেই মাল ছেড়ে দিচ্ছে। খরচাও করছে দেদার। সকালে চিড়া খায় আধসের রসগোল্লা দিয়ে, দুইবেলা ভাত খাচ্ছে বড়ো মাছ রান্না করে। তা ছাড়া সারাদিন তার মুখ চলছেই। হাটে কি আর খাবারের অভাব থাকে? সেদিন গোঁসাইবাড়ির মেলায় গিয়েছিলো, নটিপাড়ায় পয়সা ঢেলে এসেছে খুশিমতো।

কিন্তু কালাম তাকে শাসায় অন্য কারণে, 'সাহা বায়না লিছে, দোকান হামাক দিবি মালশুদ্ধা। তুই ব্যামাক মাল বেচলে লোকসান কার?'

বৈকুণ্ঠ অবশ্য খুব একটা কানে নেয় না, সে মহা ব্যস্ত কেরামতের জন্যে মঞ্চ সাজাতে। দুটো হ্যারিকেন জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে দিলো বারান্দার টিনের ছাদের সিলিঙে। নিজের দোকান থেকে কালাম একটা হাতলওয়ালা চেয়ার নিয়ে আসে বুধাকে দিয়ে। বৈকুণ্ঠ আরেকটা চেয়ার নিয়ে এলে কালাম মাঝি বলে, 'একটাই হবি। কবি বস্যা থ্যাকা গান করবি নাকি?' চেয়ারে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে কালাম হুকুম করে, 'উগলান পরিষ্কার কর।' বৈকুণ্ঠ বুঝতে না পারলে সে দেখিয়ে দেয় দরজায় ঝোলানো লক্ষীপূজার সোলার সরা আর দড়িতে বাঁধা আমপাতার দিকে। বৈকুণ্ঠ বলে, 'উগলান তো লক্ষীপূজার— ।'

'যা কই শোন। বুধা দরজা সাফ কর।' মামার হুকুমে বুধা দরজার সোলার সরা আর আমপাতা সরাতে গেলে হাঁ হাঁ করে ওঠে বৈকুণ্ঠ ' আরে করো কী? করো কী?'

'না, ধরেন, পূজার জিনিস, যি সি মানুষ ধরা হয় না।'

'হামরা হাত দিলে দরজা লষ্ট হয়? শালা হামারই ঘরের দরজা, হামার ভাইগ্না হাত দিবার পারবি না?'

'না, তা কই নাই। ধরেন পূজা বলে কথা। বেজাতের মানুষ হাত দিলে— ।' বলতে বলতে বৈকুণ্ঠ নিজেই ওসব সরিয়ে ফেলে। তখন কালাম মাঝি ফের হাঁক ছাড়ে, 'ক্যা রে বুধা, আগরবাতি কুটি?'

ছোটো দুটো চালের মালসায় আগরবাতি গুঁজে বুধা মালসা দুটো রাখে মঞ্চের সামনে। কালাম মাঝি দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়, 'নারায়ে তকবির।' তেমন জোরে সাড়া না পেয়ে সে ধমক দেয়, 'আল্লার নাম মুখোত লিতে আটকায়? জোরে কন।' এরপর সে কয়েকবার 'নারায়ে তকবির' ও 'পাকিস্তান' বলে চিৎকার করলে সন্তোষজনক জবাব পায়। 'বেরাদারানে ইসলাম' সম্বোধন করে কালাম মাঝি শুরু করে তার বক্তৃতা। মাসখানেক আগের একটা 'দৈনিক আজাদ' তার চশমা-পরা চোখের সামনে ধরে সে শুরু করে ইনডিয়ার মোসলমানদের ওপর হিন্দুদের জুলুম ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের বিবরণ। মনে মনে বানান করে ফের চেঁচিয়ে পড়তে তার কষ্ট হয় বলে কাগজটা হাতে রেখে নিজেই পেশ করে ভারতীয় মোসলমান নিধনের ভয়াবহ কাহিনী। বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস তার নাই; টাউনে রিফিউজি ক্যাম্পে ঘুরে ও এর ওর কাছে শুনে যেটুকু সে জানে তাই বলে যায় অগোছালো ভঙ্গিতে। ভাষা তার তেজোদীপ্ত না হলেও মোসলমান মেয়েদের স্তন কাটা, পাইকারি হারে তাদের ধর্ষণ, নির্বিচার হত্যাকাণ্ড, ভিটা থেকে তাদের উচ্ছেদ প্রভৃতি বিবরণে শ্রোতারা উৎসাহিত, এমন কি উত্তেজিত হতে থাকে। তারা বারবার ফিরে তাকায় পালপাড়ার শ্রোতাদের দিকে। আর এইসব শ্রোতাদের মাথা নিচু হতে হতে প্রায় মাটি স্পর্শ করে। কালাম মাঝি এবার ইশারা করে কেরামতকে, 'তোমার গান শুরু করো।'

কালাম মাঝির বেপরোয়া বর্ণনায় কেরামত একটু উসখুস করছিলো। এরপর তার নতুন গান কি আর জমবে? সে তাই স্মৃতি থেকে শুরু করে, 'যাহার হাতে নাঙল, ফলায় ফসল অন্ন নাই তার পাতে।'

কালাম মাঝি ধমকে বলে, 'ইগলান প্যাঁচাল বাদ দেও। মোহাজের লিয়া গান ধরো।'

বৈকুণ্ঠ গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে, বারান্দার নিচে থেকেই জিগ্যেস করে, 'লতুন গান বান্দিছো?'

কালাম মাঝির হুকুমে এক রাতেই নতুন গান লিখলেও এটা নিয়ে কেরামত খুঁতখুঁত করছিলো। এখন কী আর করা যায়? পকেট থেকে রুল টানা কাগজ বার করে সে পড়তে শুরু করে,

শোনো শোনো শোনো রে ভাই হিন্দু মোসলমান।
মোহাজেরের দুক্ষু কিছু করিব বয়ান॥
বাস্তুভিটা হইতে বিতাড়িত মোহাজের।
পাকিস্তানেতে তারা হইয়াছে হাজের॥
তাদের ঘর ছিলো বাড়ি ছিলো ছিলো পুষ্করিনী।
খোদার ফজলে তারা ছিলো নাকো ঋণী॥
আল্লা ও রসুলে তারা রেখেছে ইমান।
ইমান রাখিতে গিয়া দিলো শত জান॥

তাকে থামিয়ে দিতে, কিংবা তার গানে অনুপ্রাণিত হয়েও হতে পারে, কালাম জিভে চূচ চূচ করে,বলে, 'মোসলমান জান দিয়া লিজের ইমান ঠিক রাখে! কতো মানুষ যে মরিছে।' কোনো বাজনা ছাড়া পয়ারের একঘেয়ে ছন্দে বৈকুণ্ঠ মাথা দোলায়, কোথাও

তাল কেটে গেলে মাথা নাড়া টললেও গানে মনোযোগ তার **একটুও চিড়** খায় না। কেরামত ফের গান ধরে,

> কাফের হস্তে মায়েবোনে হারালো ইর্জত।
> সর্বোশ্রান্ত হইয়া হেথায় করিলো হিজরত॥
> হেথা হইতে যায় চলিয়া হিন্দু ভাইগণে।
> মাতৃভুমি ত্যাগে বড়ো দাগা পায় গো মনে॥
> স্বর্গদর্পে গড়িমসি এহি জন্মভূমি।
> পিতাপিতামহ রহে এহি মাটি চুমি॥
> তাহাদের মনোকষ্টে আল্লা হয় নারাজ।

কেরামত কোনো ভুল কথা বললো কি-না না জেনেও নিজের কথা বলার বেগ প্রবল হয়ে ওঠায় কালাম মাঝি তাকে থামিয়ে দেয়, 'রাখো।' তারপর সে তার বক্তৃতার উপসংহার টানে, ভাইসব, পাকিস্তান শুধু মোসলমানের নয়, হিন্দুরও দেশ। হিন্দু ভাইগণ যদি এই দেশকে আপন মনে না করে, এদেশের মালসম্পত্তি সামান যদি ঐপারে পাঠায় তবে পাকিস্তানের বুকেত ছুরি মারা হয়। হয় কি-না বলেন? হিন্দু হোক আর মোসলমান হোক, দেশের সয়সম্পত্তি নষ্ট করলে পাকিস্তানের পাক জমিনে তার জায়গা নাই।

কিন্তু শ্রোতারা তার কথায় তেমন কান না দিয়ে উঠে যেতে শুরু করলে এবং বিশেষ করে মাঝিপাড়ার লোকজন 'পানি আসবি গো, বাড়িত চলো।' বলে ডাকাডাকি শুরু করলে কালামকে থামতে হয়। বৈকুণ্ঠ শুধু কেরামতের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে, 'শ্যাষ করবা না?'

কালাম মাঝি তাকে মুখ ঝামটা দেয়, 'মোসলমান তোর ঘরত হাত দিলে ঘর নষ্ট হয়, মোসলমানের শোলোক শুনলে কান দুইখান তোর পচ্যা যাবি না?'

বৈকুণ্ঠ কৈফিয়ত দেয়, 'না, না কি যে কন! লক্ষ্মীপূজার সরা তো! বেজাতের মানুষ হাত দিলে—।'

'মোসলমানে বেজাত হলো? মালাউনের বাচ্চা তুই কোস কি রে?' কালাম মাঝি রাগে কাঁপে, 'ভাত খাস তুই পাকিস্তানের আর মোসলমানক তুই গাল পাড়িস জাত তুল্যা?'

পালপাড়ার বিষ্টু পাল তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে প্রচণ্ড ধমক ছাড়ে, বৈকুণ্ঠ, হুঁশিয়ার হয়া কথা কোস। না হলে তোর দাঁতের পাটি দুইটাই একো চড়ে ফালায়া দিমু কলাম।' তার হয়ে সে মাফ চায় কালাম মাঝির কাছে, 'ওটা একটা পাগলা চোদা, অর কথা হামরা কি ধরি?'

'তোমরা ধরবা কিসক? তোমার তো জাত তুল্যা কথা কয় না।' বিষ্টু পালকে প্রত্যাখ্যান করে দিয়ে কালাম মাঝি চোখ পাকায় বৈকুণ্ঠের দিকে, 'শালা মালাউনের বাচ্চা, হামার ঘরত থাকিস, আর হামারই জাত লিয়া মুখ খারাপ করিস? ওঠ, শালা, আজই তোক এই ঘরছাড়া করমু। ঐ দরজাত হামি কলমা লেখ্যা টাঙায়া দিমু। দেখি শালা তোর লক্ষ্মী হামার কি বাল ছেঁড়ে।'

কেষ্ট পালের ভাই বিষ্টু এবার পিছু হটে। আর কারো বিরোধিতা কিংবা সমর্থন না পেয়ে কালাম মাঝি ধরে এবার তার ভাগ্নেকে, 'ক্যা রে বুধা, ভাত খাস না? শালা

মালাউন জাত তুল্যা কথা কয় আর তুই চুপ কর‍্যা খাড়া হয়া মজা দেখিস! ওই শালাক কান ধর‍্যা বার কর‍্যা দে এই ঘর থ্যাকা।'

বৈকুণ্ঠ এবার ভয় পায়, 'বাবু তো খবর পাঠাছে, আর কয়টা দিন বাদে আসিচ্ছে।'

'তোর বাবুর গোয়া মারি। তোর জাতের গোয়া মারি হামি।' গতকাল সাহার ফিরে আসার খবর পাবার পর থেকে কালাম তার সঙ্গে সমকামে লিপ্ত হওয়ার সংকল্প ঘোষণা করে আসছে। কিন্তু এতোগুলো মোসলমান কেউ তার হয়ে কিছু বলছে না দেখে সে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে সামনে এগিয়ে আসে গফুর কলু।

'অতো গরম কিসের গো? মাঝির বেটার অতো গরম কিসের? কাদের ভাই কয়া গেছে, মুকুন্দ সাহার দোকানেত কিছু হলে, কি তার মানষের উপরে জুলুম হলে ফল ভালো হবি না। হুঁশিয়ার হয়া কথা কবা। বুঝিছো তো?' বলতে বলতে গফুর কলু কালামের একেবারে কাছাকাছি চলে এলে কালাম সরে দাঁড়ায়, 'শালা কলুর বেটা তফাত থাক, তফাত থাক।' কলুর স্পর্শ থেকে দূরে থাকতে সে নিজেই আরো পিছে হটে। 'শালা মাঝির বেটিক লিকা কর‍্যা মনে করিস, জাতোত উঠিছু, না? অতো সোজা লয়। শালা বুধবার দুপুর বেলা কলুর মুখ দেখিছি, তখুনি বুঝিছি, শনির লজর লাগলো।'

বুধবার শনির নজর লাগায় কালাম মাঝি হন হন করে রওয়ানা হয় বাড়ির দিকে। তার পাশাপাশি দূরের কথা, ঠিক পেছনে পেছনে হাঁটতেও বুধাকে দৌড়াতে হয় সারাটা পথ। তবে মামুর কথাগুলো সে শুনতে পায় সবই, 'মণ্ডল তো সাহার বাড়ি দখল করিছে, এখন দোকানখানও লেওয়ার তালে আছে। হামিও দেখমু।'

পরদিন সকালে কেরামতের সঙ্গে কালাম মাঝি নিজের দুঃখবেদনার কথা বলে। মাঝিদের উন্নতি হবে কী করে? এই যে শালা গফুর কলু, কিছুদিন আগেও মাঝিপাড়ার মানুষ ঘেন্না করে তার ছায়া মাড়াতো না। আর কাল সেই কলুর বাচ্চা তাকে বেইজ্জত করলো, মাঝিরা নাকি উত্তরপাড়ায় তাই নিয়ে খুব হাসাহাসি করেছে। মাঝিরাই যদি মাঝির দুষমনি করে তো এই জাতের ওঠার কোনো পথ আছে? মাঝির খাঁটি মুরুব্বি ছিলো এক তমিজের বাপ। নিজের জাতের জন্যে মানুষটা মণ্ডলের হাতে খড়মের বাড়ি খেয়েছে। তার ছেলেটা পর্যন্ত মাঝির সঙ্গে, নিজের বাপের সঙ্গে বেইমানি করলো। কুলসুমের ঘরে তমিজের বাপের রুহ নাকি রোজই একবার না একবার আসে, কথা কয়, কথা শোনেও। কুলসুমের কাছে বসে নিজের দুঃখবেদনার কথা বলার জন্যে কালাম মাঝির প্রাণটা আইঢাই করে।

৫১

বাড়ির সামনে কনকচাঁপা ও গোলঞ্চ, গেটের দুই পাশে কামিনী এবং পুকুরঘাটে জোড়াবকুলের গোড়ায় মাটি খুঁচিয়ে, মাটির সঙ্গে নানারকমের সার মিশিয়ে প্রতিদিন দুই বেলা পানি ঢেলে ফাল্গুনের মাঝামাঝি বিশ পঁচিশ বছরের গাছগুলোকে রঙবেরঙের ফুলে সাজিয়ে তোলায় তমিজ এখন ইসমাইল হোসেনের বাড়িতে খাতির পায়। ম্যাগনোলিয়ার

দুটো কলম নিয়ে আসা হয়েছিলো কলকাতা থেকে, চার বছরে সেটার বাড় বুঝতে ইয়াকুব বাড়ি এসে প্রত্যেক দিন স্কেল দিয়ে মাপতো। তমিজকে পেয়ে ইয়াকুব সেটার পেছনে এমনভাবে লেগেছে যে বর্ষার শুরুতে ফুল না ফুটিয়ে গাছ দুটোর আর রক্ষা নাই। শীতের মরশুমি ফুল ভালো করে ঝরে পড়ার আগেই ইয়াকুব সেগুলোকে ঝোপজঙ্গল আখ্যা দিয়ে সাফ করে ফেললো। এখন সেখানে গোল, চারকোণা ও তিনকোণা কেয়ারি কাটা শুরু হয়েছে। মাটি আচ্ছাসে কুপিয়ে গোবরের সঙ্গে মেশাবার জন্যে ইয়াকুব যে কতো কিসিমের সারই নিয়ে আসে তমিজ একশো এক বার শুনেও সেসবের সায়েবি নাম মনে রাখতে পারে না।

মনে রাখার চেষ্টাও করে কি-না সন্দেহ। এই খাটনিটা ধানজমির পেছনে খাটলে গিরিরডাঙা আর নিজগিরিরডাঙার চাষাদের চোখ জুড়িয়ে যেতো ফসলের ফলন দেখে। টাউনের ভদ্দরলোকদের মাথায় কী পোকা যে আছে তমিজ তার হদিস করতে পারে না। ধান, নয়, পাট নয়, পেঁয়াজ রসুন নয়, আলু নয়, আনাজ তরকারি নয়,—খালি ফুলের পেছনে এতো টাকা নষ্ট করার কোনো মানে হয়? মাটিতে সার মেশাতে মেশাতে তমিজের হাত আলগা হয়ে আসে : এবার হুরমতুল্লার ভিটার পেছনে পেঁয়াজ রসুন তোলার পর সে আউশ বোনার হাউশ করেছিলো। এখন ওই জমি তৈরির সময় চলে যাচ্ছে। জীবনে পেঁয়াজ রসুন ছাড়া হুরমতুল্লা ওই জমিতে আর কিছু আবাদ করে নি। চাষার ঘরের মানুষ বলে তাদের এতো রোয়াব, কিন্তু জমির রঙ দেখে এই তমিজই প্রথম বোঝে, ওখানে আউশের খন্দ ভালো হবে। বিয়ের রাতেই ফুলজানকে ওই জমিতে লাঙল দেওয়ার কথা সে বলেছিলো। ফুলজানের মনে থাকলেও কাজ হয়।

বিকালবেলা ইয়াকুব হোসেন বোঝায়, 'তোমার ঐ চাষাড়ে হাত দুটো একটু নরম করো। এই সার মেশাতে হয় মিহি করে।' তার হাতে চাষার লক্ষণ দেখায় তমিজ ইয়াকুবের দিকে তাকায় গদগদ হয়ে; কিন্তু তার সব ক্ষমতা কি ফুরিয়ে যাবে এই ফুল গাছের তোয়াজ করে করে?

ঘড়ি লাগানো কবজির নিচে লম্বা লম্বা ফর্সা আঙুল-জোড়ানো লালচে হাতে মিহি করে সার মেশাবার কৌশল শেখায় ইয়াকুব। বলে, 'নিবারণকে একদিন খবর দিলেই ও এসে তোমাকে দেখিয়ে দেবে।'

'ভাইজান, আরে আপনে মাটিত হাত দেন? তমিজ করে কী?' এই অনুযোগ শুনে ইয়াকুব পেছনে তাকালে দেখতে পায় আবদুল কাদেরকে। কিন্তু তার মনোযোগ অব্যাহত থাকে কেবল তমিজের দিকেই। তাকে নতুন কাটা কেয়ারির অসমান রেখা দেখিয়ে বলে, 'কোদাল কোপাবার আগে খুরপি দিয়ে লাইন কেটে নিতে বললাম না?'

আবদুর কাদের বলে, 'তমিজ, ইয়াকুব ভাই মিলিটারির অফিসার আছিলো রে, তার কামোত ফাঁকি দিবার পারবু না। এটি কয়দিন থাকলে কাম শিখবার পারবু, তখন গাঁওত যায়া আর নাঙল ঠেলা লাগবি না।'

ইয়াকুব আবদুল কাদেরের দিকে তাকিয়ে একটু হেসেই ঠোঁটজোড়া গুটিয়ে ফেলে। এদের সে বেশি পাত্তা দেয় না। বড়দার কাছে এসব লোক যখন তখন আসে বলেই বাড়ির বাগানটার হাল এই হয়েছে। তবে 'বড়দা তো ঢাকায়' ইয়াকুবের হাসি মুখে এই ঠাণ্ডা খবরে কাদেরের খুব একটা এসে যায় না। সে আজ দেখা করতে এসেছে এদের বাপের সঙ্গে, 'হেঁ হেঁ, জ্যাঠো, মানে আপনার পিতার সাথে একটু দেখা করার দরকার ছিলো। মানে—।'

'ও।' বলে ইয়াকুব ধীরেসুস্থে হেঁটে বারান্দায় উঠে বাড়ির ভেতরে চলে গেলে কাদের আরাম পায় : ইসমাইল ভায়ের এই ভাইটা এমনিতে ভালো, ব্যবহার বেশ ভালোই, কিন্তু গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে বেশিক্ষণ মিশতে পারে না। এখনি হৃষিকেশ মৈত্রের ছেলে অনিল কি আজিজ ডাক্তার আসুক, তাদের সঙ্গে ইয়াকুবের গলার হো হো হাসি শোনা যাবে একেবারে টাউনের মাঝখান থেকে। সে বাপু যাই হোক, এম টি হোসেনের সঙ্গে কথা না বলে কাদের আজ এখান থেকে নড়ছে না।

'ফুলজানের বাপের সাথে কথাবার্তা কছিলেন ভাইজান? জমি দেওয়ার ওয়াদা করিছিলো—।' তমিজ ব্যাকুল হয়ে হুরমতুল্লার জমি সম্বন্ধে জানতে চাইলে কাদের এই কয়েক মিনিটের মধ্যে তাকে দ্বিতীয়বার ধমক দেয়, 'আরো রাখ। যদ্দিন পারিস এটি থাক। এস পি সায়েবেক অনেক ধরাধরি কর‍্যা পুলিসেক আটকা রাখা হছে। এটি থ্যাকা বারালেই তোক থানার মধ্যে তুলবি। ও দিকে কালাম মাঝি আটো হছে, মাঝিপাড়ার মানুষ তাক আর দেখবারই পায় না। মুকুন্দ সাহার দোকান দখল করার তালে আছে, তার নিজের মানুষই তার সাথে কেউ নাই।'

এসব কথা তমিজের কানে ঢোকে কি-না সন্দেহ। সে বলে, 'আর কয়টা দিন গেলে আউশের জমিত নাঙল দেওয়ার সময় পার হয়া যাবি না?' তমিজের কথায় কাদের বিরক্ত হয়, আবার ছোঁড়াটার ওপর মায়াও হয়। ইসমাইল হোসেন এই ছেলেটা সম্বন্ধে একটু দুর্বল।—ভোটের আগে তমিজ জেলে না থাকলে তার মুক্তির জন্যে ওয়াদা করা যেতো কীভাবে? মাঝিপাড়ার ভোট সব তার বাকসে পড়েছে এই ছোঁড়াটার জন্যে। এবার তার পেছনে লেগেছে কালাম মাঝি। কালাম মাঝিটা যেভাবে বেড়ে উঠেছে, তাতে ইসমাইল হোসেনের আর কী এসে যায়, কিন্তু কাদেরকে একটু হুঁশিয়ার তো থাকতেই হয়। সামনে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ইলেকশন, সেখানে কালাম মাঝি ছাড়া কাদেরের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে আর কে? তমিজটাকে কাদের হাতে রাখলে কালাম মাঝি গ্রামে দূরের কথা নিজের আত্মীয় স্বজনের ভোট পর্যন্ত পাবে না। ইসমাইল ভায়ের হাতে পায়ে ধরে, এটা ওটা বুঝ দিয়ে কাদেরই তমিজকে নিয়ে এসেছে এখানে। এখন দেখা যাচ্ছে এই বাড়িতে তার খাতির বেশ ভালোই। ইয়াকুবের সঙ্গে সঙ্গে বাগান করে। বাড়িতে মূলতানি গাই আছে দুটো, তাদের যত্ন নেওয়ার ভারও পেয়েছে তমিজ। গোরু দুটোর জন্যে ইসমাইল হোসেনের মায়ের বড়ো দরদ। সেই দরদের সামান্য হিস্যা যদি তমিজের কপালে জোটে তো এই বাড়িতে তার কায়েমি আসন টলায় কে? অথচ দেখো, তমিজের বাপের বোকা বেটাটা মরার জন্যে বাড়ি যেতে পাগল হয়ে উঠেছে। কাদেরের রাগই হয়, 'বাড়িত গেলেই তোক জমি দিবি কেটা? তুই হুরমতুল্লার বেটিক বিয়া করলু, বাপজান সামনের খন্দ হুরমতুল্লাক করবার দেয় কি-না কওয়া যায় না। তখন হুরমতুল্লাক নিজের জমি আবাদ করা লাগবি না?'

কিন্তু তমিজটা একেবারে নাছোড়বান্দা, 'আপনেরা না কছিলেন জমির উপরে বর্গাদারের হক কায়েম করার আইন জারি হবি? ফুলজানের বাপেক আপনের বাপজান জমি থ্যাকা উঠায় ক্যাংকা কর‍্যা?'

আবদুর কাদের রাগ করলেও হেসে ফেলে, 'তোর বাপু এতো কথাও মনে থাকে? তোক এম এল এ করা লাগে।' কাদের হো হো করেই হাসে। হাসিটা তার এখনো ইসমাইল বা ইয়াকুব বা এদের বাপের মতো অতোটা উচ্চকণ্ঠ না হলেও বেশ দানা

বাঁধতে শুরু করেছে। সেই খানদানি হাসির অনুশীলন করতে করতেই জানায়, 'দুই বছর আগে এ্যাসেম্বলিতে জমিদারি উচ্ছেদের বিল উঠলে বর্গাদারদের সম্বন্ধে ঐ ধরণের একটা কথা ছিলো। ঐ বিল তো আবার উঠিছে, এই তো কয়দিন আগেই উঠলো। এবার বর্গদারের বথা বাদ দিছে।'

'বাদ দিছে?' তমিজের হাত থেকে মিহি করে সার মেশানো মাটি পড়ে যায় ঘাসের ওপর। এক আইন আবার দুইবার দুই রকম হয় কি করে? হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না,—ভদ্দরলোকদের এই বচন কি ভদ্দরলোকরাই খারিজ করে দিচ্ছে?

কাদের তাকে তাড়া দেয়, 'দেখ তো বাপু, বুড়া সায়েবকে খবর দে একটু।'

কথাটি তমিজের কানে ঢোকে না, সে জানতে চায়, 'তেভাগা হলেও কাম হয়। তেভাগা তো হচ্ছেই, না?'

'এ কথা সে কথা, দে বুড়ি আলাপাতা।' কাদের তমিজের একটি ব্যাপারেই লেগে থাকা নিয়ে হাসে, 'তোর খালি এক কথা। উগলান তো সব শ্যাষ হয় গেছে বাপু। নাচোলের দিকে এখানো মাথা গরম কিছু চ্যাংড়া— ।'

'লাটোর?' জায়গাটার নাম জানা থাকলেও এর অবস্থান সম্পর্কে তমিজের ধারণা অস্পষ্ট, কিন্তু সেটা সে স্বীকার করবে কেন? 'লবাবগঞ্জ তো? চিনি না? জয়পুরেত যখন ধান কাটিচ্ছিলাম তখনি তো ওটি জোতাদাররা সব দৌড়াচ্ছিলো পাছার কাপড় তুল্যা।'

'উগলান দিন শ্যাষ। এখন বাপু বাড়ির মধ্যে খবরটা দে। হামি বারান্দাত বসি।'

খিড়কির দরজা দিয়ে তমিজ বাড়ির ভেতরে গেলে কাদের বারান্দার চেয়ারে বসে বাড়ির লনটা দেখে। চোখ জুড়িয়ে যায়। খোলা গেটের ওপারে চওড়া কাঁচা রাস্তা। ঐ রাস্তা ধরে মিনিট দশেক হাঁটলেই নদী, খেয়া নৌকায় নদী পার হলেই জমজমাট টাউন। এদিকে একটা জমি কিনে বাড়ি করতে পারলে হতো। আবদুল আজিজ বাড়ি কিনলো। টাউনের আরেক প্রান্তে ঘিঞ্জি এলাকায়। চারদিকে হিন্দু বাড়ি। পার্টিশনের আগে ওখানে তো মোসলমানকে বাড়ি ভাড়াও দেওয়া হতো না, এখন দুই একটা মোসলমান বাড়ি কিনে কিংবা দখল করে ঢুকতে শুরু করেছে। তবে শরাফত মণ্ডল ঠিকই বলে, হিন্দু প্রতিবেশী থাকা ভালো। উঁচু জাতের শিক্ষিত হিন্দু পাড়ায় থাকলে বাড়ির ছেলেমেয়েরা বয়ে যায় না। আর পাকিস্তানে হিন্দুরা তো একটু ছোটো হয়েই থাকবে, ওদের দাপটটা সহ্য করতে হবে না। নতুন যারা আসবে, তাদের বেশির ভাগই লুটপাটের পার্টি, পাড়াটা নষ্ট করে দেবে।

এই শহরতলী এলাকায় এম টি হোসেন বেশ মাথা উঁচু করেই আছে। এ দিকেও সব বামুন কায়েত আর বৈদ্যের বসবাস; কিন্তু পাড়ার ক্লাবঘরটা এই বাড়িতেই। ক্লাবে আসে তো উঁচু জাতের হিন্দুই বেশি। কী সুন্দর হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে ইয়াকুব হোসেনের খাতির!

'আপনাক ঘরত বসবার কলো', তমিজের কথায় আবদুল কাদের হলঘরে ঢোকে। ইসমাইল হোসেন ঢাকায়, সুতরাং বাড়ির হলঘর খালি। এই ঘর কাদের কখনো এরকম খালি দেখে নি। দেওয়ালের শেলফ ভরা সারি সারি বই, ইংরেজি বাংলা বইতে শেলফগুলো ঠাসা। পাল্লা খোলা পেয়ে, একটা শেলফের সামনে দাঁদিয়ে কাদের বই নাড়াচাড়া করে। চামড়ায় বাঁধানো ইংরেজি ম্যাগাজিন, পাশে ইংরেজিতে এম টি হোসেনের নাম খোদাই সোনালি অক্ষরে। কাদেরও টাউনে বাড়ি করলে এরকম সাজানো বইয়ের আলমারি করবে।

'আরে কাদের নাকি? বসো বসো।' এম টি হোসেন ঢুকে প্রথমেই তার খোলা শেলফের পাল্লা বন্ধ করে, তালাচাবিও লাগায়। কাদের একটু ধাক্কা খেলেও বাঁধানো বই সাজানোটা ভালো করে দেখে নেয়।

এম টি হোসেন কাদেরের কাছে তাদের গ্রামের খবর জানতে চায়। তবে গিরিরডাঙা, নিজগিরিরডাঙা, গোলাবাড়ি এলাকার খবর তার মোটামুটি সবই জানা। আবদুর কাদেরের বাবা মুকুন্দ সাহার বাড়ি কিনেছে পানির দামে, কালাম মাঝি আছে তার দোকানটা দখল করার তালে, বুড়ার অজানা নাই কিছুই। তার আক্ষেপ, ইসমাইল হোসেন টাউনে কি ঢাকায় একটা বাড়িঘর কিছুই করলো না। বড়ো বড়ো বাড়ি ফেলে রেখে হিন্দুরা চলে যাচ্ছ। এই সময়, ঠিক আছে ন্যায্য দামেই, কিছু সম্পত্তি কেনো। টাকা কম পড়লে এম টি হোসেনই না হয় কিছু দেবে। পরে এই সুযোগ কি আর পাওয়া যাবে?—না, এসবের মধ্যে সে নাই। এতাই যদি সাধু হও তো চেলাচামুণ্ডারা যে লুটপাট করে তাদের তো বাধা দিতে পারো না। তা হলে এই সততার মানে কী?

ইসমাইল হোসেনের চেলাদের মধ্যে কাদের প্রথম চার পাঁচ জনের মধ্যেই পড়ে। বুড়া আবার তার বাপের দৃষ্টান্ত না দেখায় তাই তার আক্ষেপে কাদের পুরো সায় দেয়, 'ভাইজানের তো লিজের দিকে নজর নই। শামসুদ্দিন ডাক্তার, সাদেক উকিল, সামাদ খান, মফিজুল হক,—এরা তো সম্পত্তি করিছে দুই হাতে। তা ধরেন,—।'

এর মধ্যে পরোটা ও গোরুর গোশতের ভুনা এসে পড়লে কাদের বলতে গেলে একাই প্রায় সবটা সাবাড় করে। খাওয়ার তৃপ্তিতে ও নিজের আরজি পেশ করার প্রস্তুতিতে কাদের দুটো ঢেকুর তোলে। কী ব্যাপার—? কাদের জানায়, শিমুলতলার তালুকদার বাড়ি থেকে কাদেরের একটা সম্বন্ধ এসেছে। আজ পয়গাম নিয়ে যাবে তার বাবা শরাফত মণ্ডল। মেয়ে দেখা হবে, পাকা কথাও হবে। সঙ্গে লোকজন যাবে খুব কম। শরাফত মণ্ডল তো যাবেই। কাদেরের মা তো আবার দুইজন, বলে লজ্জায় মাথাটা নিচু করে একটু হেসে লজ্জাটা ফেরে কাটিয়ে উঠে সে জানায়, দুই মা যাবে, আবদুল আজিজ যাবে, আজিজের শালা সম্বন্ধী যাবে জনা চারেক, আজিজের শাশুড়িকেও নিতে হবে। আজিজের বড়ো সম্বন্ধীর বৌ যেতে পারে। কন্যা দর্শনার্থীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা শোনা থামিয়ে ইসমাইলের বাবা বলে, 'শিমুলতলার তালুকদারদের কার মেয়ে?'

'জি, ইসমাইল ভায়ের শ্বশুরের বংশই। মেয়ের বাপকে আপনে চেনেন। আজহার তালুকদার। পুরানা ঘর।'

'আর পুরানা ঘর! এখন টাকা হলে পুরানা ঘর বংশ সব কেনা যায়।'

মনটা একটু ছোটো হয়ে গেলেও কাদের হাত জোড় করে আরজি করে, এম টি হোসেন সাহেব তকলিফ করে তাদের সঙ্গে মেয়ের বাড়িতে যদি একটু তশরিফ নেয় তো কাদের একজন খানদানি, বিচক্ষণ ও বিবেচক মুরুব্বি পায়। তার বাবা শরাফত মণ্ডল নিজে এসে তাকে নিয়ে যাবে। সব মিলিয়ে ঘণ্টাখানেকের ব্যাপার।

এম টি হোসেন এক কথায় রাজি হলে আবদুল কাদের তাদের মজহাবের রেওয়াজের বাইরে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে কদমবুসি করে এবং তার স্বভাবের বাইরে তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। চোখের সঙ্গে সঙ্গে কানেও পানি জমে থাকতে পারে, কারণ এর পর ঐ সৌম্যদর্শন বৃদ্ধের কোনো কথাই সে শুনতে পায় নি।

বাড়ির গেটে কামিনী গাছের গোড়ায় তমিজকে বসে থাকতে দেখেও কাদেরের

আবেগ উথলে ওঠে, 'তমিজ, এটি আছিস, ভালো কর্যা থাক। ইসমাইল ভাইয়ের বাপ তো ফেরশতার লাকান মানুষ রে। এংকা মানুষ হয় না। হুঁশিয়ার হয়া থাকিস। দেখি। তোর নামে মামলাটা খারিজ করার চেষ্টা তো করিছি। ইসমাইল ভাই ঢাকা থ্যাকা আসুক। আর শোন। এটা রাখ।' পকেট থেকে আস্ত একটা আধুলি তমিজের হাতে দিতে গিয়েও ফিরিয়ে নেয়, 'না। এটা হামার কাছে থাক। পাকিস্তানের নয়া আধুলি।' হুকুমতে পাকিস্তান কিছুদিন আগে নতুন টাকা ছেড়েছে, আস্তে আস্তে পুরোনো টাকা তুলে নেওয়া হবে।

মুগ্ধ চোখে চকচকে আধুলিটা দেখে পকেট রেখে কাদের তমিজের হাতে তুলে দেয় দুটো সিকি, কি ভেবে ফের একটা দুআনিও গুঁজে দিলো।

লুঙির কোঁচড় থেকে তমিজ বার করে পাঁচ টাকার একটা আস্ত নোট; সেই নোট আর রেজকি গুনে কাদেরকে দিতে দিতে বলে, 'আগে আপনার কাছে রাখিছিলাম তিন আনা কম সাত টাকা, আবার এখন আপনে দিলেন দশ আনা, আবার হামি এখন দিচ্ছি আট ট্যাকা ছয় আনা,—কতো হলো? সাতে আটে পনেরো আর ওদিকে— ।'

হিসাবটা কাদের তাড়াতাড়ি করতে চায়, 'পনেরো টাকা এগারো আনা।'

'ক্যাংকা কর্যা?' তমিজ ফের প্রথম থেকে যোগ করে এবং যোগফল কাদেরের হিসাবের সঙ্গে মিলে গেলে নিশ্চিন্ত হয়, 'হুঁ, পনেরো ট্যাকা এগারো আনা। আপনে আর পাঁচ আনা পয়সা দিলে ষোলো ট্যাকা সই সই হয় ভাইজান!'

কাদের সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাঁচ আনা দিলে সেটাও কাদেরের কাছে রেখে তমিজ বলে, 'আর বেশি লাগবি না। কিছু জমলেই বাড়ির ভিটাটা কালাম মাঝির কাছ থ্যাকা খালাস করবার পারি। ফুলজানের বাপ জবান যখন দিছে, জমি তো তার দেওয়াই লাগবি। ঐ জমিত দুইটা খন্দ করবার পারি তো ভিটার পিছনের জমিটা আপনাগোরে কাছ থ্যাকা লিবার পারি, না? আপনে কলেই ওটা পাওয়া যাবি ভাইজান। হামার ঐ জমিত আমন হবি খুব ভালো, উঁচু জমি। কয়টা খন্দ করলেই— ।'

'যাই রে। তুই থাক।'। কাদের যাবার জন্যে পা বাড়ালে তমিজ ফের বলে, 'ঐ ট্যাকা থ্যাকা আপনে দুইটা ট্যাকা ফুলজানের হাতোত দিয়েন। আর টাউনের বাজার থ্যাকা হামার বেটির একটা পিরান লিবেন দশ আনার মধ্যে। তাহলে আর কতো থাকে?'

'তোর বেটি হছে নাকি?' এতো বড়ো একটা খবর কাদের জানতো না বলে তমিজ এতোটাই অবাক হয় যে, তার পেটের মধ্যে বুদবুদ-তোলা 'বেটিটাক চোখের দেখাও দেখবার পারলাম না। কী খায়, কী পরে'—কথাগুলো পেটের আরো ভেতরে ডুবে যায়, গলা পর্যন্ত আর আসে না। এর বদল বেরিয়ে আসে, 'বেটির পিরান দশ আনা আর ফুলজানের হাতোত দিলেন দুই ট্যাকা, না আরো আট আনা দেওয়া ভালো। কতো হলো? —'

কিন্তু কাদেরের বড়ো তাড়া। বাপ বোধহয় তার এসেই পড়েছে আজিজের বাড়িতে। তাকে নিয়ে দুপুরের পর পরই ফের আসতে হবে এখানে। তারপর মেয়ে দেখতে নামাজগড় যাওয়া। 'রূপমহল' থেকে শরাফত আংটি একটা কিনেছ। মিষ্টি নিতে হবে ভালো দেখে, পরিমাণেও বেশি হওয়া চাই—শিমুলতলার তালুকদারদের বাড়ি। মেয়ের গায়ের রঙ শ্যামলা শুনে কাদেরের মন উঠছিলো না, শ্যামলা বলা মানে কালোই। কিন্তু শরাফত মণ্ডল একেবারে পাগল হয়ে উঠলো : ঐ বাড়ির কালো কেন,

খোঁড়া কানা মেয়েও ঘরে নিয়ে এ.ল জেলার পুব এলাকার সবখানে তার ইজ্জত বাড়ে। আজহার মিয়া একটু দূরের হলেও তালুকদার বংশেরই তো। বিয়েতে, আকিকায়, ঈদে, বকরিদে, জানাজায় দাফনে সবাই মিলিত হয়। তালুকদারদের সাজানো গোছানো গোরস্তানেও এদের সমান হিস্যা। তা কাদের দেখলো, বাপকে আর এই নিয়ে চটিয়ে লাভ কী? নামাজগড়ে আজহার মিয়ার মাটির দোতলা বাড়িটা এই মেয়েই পাবে শুনে আপত্তি করার আর কোনো কারণই থাকলো না। আবার বিয়েটা হলে ইসমাইল হোসেনের সঙ্গে লতায় পাতায় একটা কুটুম্বিতাও হয়।

বাপজান বোধহয় টাউনে এসেই পড়লো। তমিজের হিসাবনিকাশ কাদেরের কানে ঢোকে না। তবে এম টি হোসেনের প্রতি টইটম্বুর ভক্তির খানিকটা সে খালাস করে তমিজের জন্যে উদ্বেগ জানিয়ে, 'তমিজ, একটা কথা কই। আজ বাপজান এই বাড়িত আসবি, আসরের নামাজ পড়বি এটি অ্যাসা। ইসমাইল ভায়ের বাপ দাওয়াত করলো, না আসলে বুড়া মানুষটা মন খারাপ করবি। বাপজান আসলে তুই আড়ালে থাকিস। তোক এটি দেখলে হামার সাথে সাটাসাটি করবি। বাপজানেক তো চিনিস।'

তমিজ তার হিসাব করেই চলে, 'ধরেন বেটির পিরান না হয় বারো আনা দিয়াই কিনলেন আর ফুলজানকে ট্যাকা দিলে আপনের কাছে জমা থাকে কতো? আর কয়টা ট্যাকা হলে ভিটার জমিটা খালাস করি। আর আপনে ভালো করা্যা বুঝায়া কন তো আপনার বাপজান— ।' হিসাব নিকাশের নিষ্পত্তি না করেই কাদের রওয়ানা হয় আজিজের বাড়ির দিকে।

৫২

বটতলার সন্ন্যাসীর থানে থির থাকা যাচ্ছে না; পোড়াদহের মাঠ ধসে পড়েছে বাঙালি নদীর স্রোতের টানে। এই রোগা নদীর জলে এতো ধার শানায় কে গো? মরা মানাস কি হঠাৎ করে জেগে উঠে উপচে পড়ছে বাঙালি নদীতে? বৈকুণ্ঠের ঠাকুরদার ঠাকুরদা, তারও বাপ, নাকি তার ঠাকুরদা এখানে এসেছিলো ভবানী পাঠকের সঙ্গে, মানাস নদী কি সেই তখনকার গতর, তখনকার তেজ ফিরে পেতে পাগল হয়ে উঠেছে? না-কি সেই সময়কার রোগা পটকা কোপাখাল যমুনা ভূমিকম্পের ধাক্কায় মস্ত যমুনা নদী হওয়ার দেমাকে আরো চওড়া হওয়ার স্পর্ধায় বাঙালি নদীর রোগা স্রোতকে খেয়ে ফেলতে চলে এসেছে পোড়াদহ মাঠ পর্যন্ত ? মাগী এখন লকলকে জিভটা তোর বাড়িয়ে দিয়েছিস তোর বাপ, বাপ কি রে শালী, তোর বাপের বাপ, তার ঠাকুর্দা সন্ন্যাসীর থানের দিকে। খানকিটার আস্পর্ধা দেখো। কিন্তু তাকে ঠেকায় বৈকুণ্ঠের সাধ্য কী? মাথার ওপর তার মশারি, সে দাঁড়িয়ে পড়ায় মশারির ছাদ ঠেকেছে তার মাথায় এবং হাত বুক পেট কোমর উরু ঢেকে সেটা ঝুলছে তার হাঁটু অব্দি। মুখেচোখে তার সব ঢাকা পড়ায় আশেপাশে সে কিছুই দেখতে পায় না; চোখজোড়া যতোটা পারে ধারালো করে চারদিকে এদিক ওদিক

ঘুরিয়েও নজরে পড়ে না একটি জনপ্রাণী। মাথার ওপর সন্ন্যাসীর বটবৃক্ষ, তার সঙ্গে জড়ানো পাকুড়গাছ। কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানের পাকুড়গাছ তা হলে উড়াল দিয়ে শেকড় ঢুকিয়ে দিয়েছে বটবৃক্ষের গায়ে গা ঠেকিয়ে? বটপাকুড়ের দম্পতির পাতায় পাতায় ভবানী পাঠকের মন্ত্রের ধ্বনি। মশারি পেরিয়ে সেই সমস্কৃত মন্ত্রের একটু খানি বোলও তো বৈকুণ্ঠের মাথায় ছুঁতে পারে না। চারদিকে কেউ নাই। মেলা কি তবে ভেঙে গেছে অনেক আগেই? না-কি নায়েববাবু মা দুর্গাকে পিতিষ্ঠা করবে বলে মেলা বন্ধ করার হুকুম জারি করে দিলো? না-কি শরাফত মণ্ডলের ভয়ে তার আত্মীয়স্বজন মেলায় আসতে সাহস পায় না?

একটা মানুষ নাই। কয়টা মানুষ একত্তর হলে মশারি ছিঁড়ে ফেলতে কতোক্ষণ লাগে? কয়টা মানুষ জোট বাঁধলে যমুনার ফণা আটকাতে কতোক্ষণ! কেউ নাই। বৈকুণ্ঠের পায়ের তলায় 'সন্ন্যাসীর মালিকানায় সাধারণ্যের ব্যবহারের নিমিত্ত' ৭ শতক জমি দেখতে দেখতে ছোটো হয়ে আসছে; ৭ শতকের একটু একটু চেটে নিচ্ছে জলের ঢেউ। জলের ঝাপটায় বৈকুণ্ঠের পায়ের পাতা ভেজে, দেখতে দেখতে পায়ের পাতা ডুবে যায়, জলের ঝাপটা ছড়িয়ে পড়ে হাঁটু পর্যন্ত। জালের শোঁ শোঁ শব্দে বৈকুণ্ঠ গিরির ঘুম ভেঙে যায়।

ঘরে ঘনঘোট অন্ধকার। টিনের ফুটো দিয়ে টপটপ করে পড়া জলে ভিজে গেছে তার হাঁটু পর্যন্ত। বাইরের আওয়াজটা কি যমুনার স্রোতের না আকাশের অবিরাম ধারার, তা ধরতেও তার কেটে যায় অনেকটা সময়। একটু আগে দেখা স্বপ্ন শিরশির করে বাজে টিনের ওপর অবিরাম বৃষ্টিপাতে এবং স্বপ্ন দেখার ভয় তার বাড়তে বাড়তে স্বপ্নটা পর্যন্ত খেয়ে ফেলতে শুরু করে। তখন তার ভয় হয় : এই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে স্বপ্নটা আবার ভুলে যাবে না তো? তা হলে চেরাগ আলি ফকিরের ঘরে স্বপ্নের মানে সে জানতে চাইবে কোন ভরসায়? স্বপ্নটার ভয়ে না কি স্বপ্ন ভুলে যাবার উৎকণ্ঠায় বৈকুণ্ঠের খুব পিপাসা পায়। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কুঁজো থেকে কাঁসার গেলাসে জল গড়িয়ে খেয়ে বিছানায় বসলে তার বুক ধুকধুক করে : মানষে এমন স্বপনও দেখে? এমন স্বপন দেখলে মানুষ কি বাঁচে? এই স্বপ্নের মানে কী? তখন বহুকালের ওপার থেকে শোনা যায় চেরাগ আলি ফকিরের গলা :

> ফকিরে খোয়াব দেখে কালনিদ্রাবশে।
> কাঁপে পানি ফাটে খাক ফোঁসায় আতশে॥
> দুনিয়ায় যাহাদের জনম মরণ।
> বুকে বল নাহি দেখে এমত স্বপন॥

হয়তো গেলাসভরা জল খেয়েই কাঁপন তার কমে। সৃষ্টির কোনো জীব যে-স্বপ্ন দেখার সাহস পায় না, সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখার গর্বে তার ভয় কিন্তু এতোটুকু ভোঁতা হয় না, বরং আরো চেপে চেপে আসে। একবার মনে হয় , এটা বোধহয় তার স্বপ্নের খোঁয়ারি। আরেকটা স্বপ্ন দেখলে খোঁয়ারি ভাঙে এই আশায় তক্তপোষ একটু সরিয়ে বৈকুণ্ঠ ফের শুয়ে পড়ে।

কিন্তু ঘুম তো আর আসে না। দরজায় চোখ পড়লে অন্ধকারেও বোঝা যায়, বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়েছে হাওয়ায়-কাঁপা কপাটের ফাঁক দিয়ে, জলের ছাঁটে ভিজে যাচ্ছে জিরার বস্তা। এমনিতে জিরা আর মরিচের অনেকগুলো বস্তা বৈকুণ্ঠ বেচে খেয়েছে, যা আছে

তাও নষ্ট হলে বাবু ফিরে এসে তাকে আর আস্ত রাখবে না। বাবু আসতে দেরি করে তাকে যে কী মুসিবতে ফেলেছে। কালাম মাঝি আজ বিকালে টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যেই ঘরে ঢুকেছিলো মাঝিপাড়ার কয়েকটা ছোঁড়াকে সঙ্গে নিয়ে। খুব শাসিয়ে গেলো, 'মালাউন শালা, ঘর ছাড়। তোর বাবু আসার আগেই ঘরের দখল লেমো।' তার সাটাসাটি শুনে গফুর কলু এলে কালাম মাঝি ঘর থেকে বেরোয়, গফুরকে বলতে বলতে যায়, 'শালা মণ্ডলে কতো খাবি রে? শালার প্যাট ফ্যাটা যাবি না?' বৈকুণ্ঠকে কড়া করে হুকুম দেয়, 'বস্তা যানি আর না কমে। কয়া থুলাম।'

সেই বস্তাগুলো ঠেলে সরাতে সরাতে বৈকুণ্ঠ শোনে, দরজার বাইরে কে যেন কপাট আচঁড়াচ্ছে। তুমুল বর্ষণ এই আঁচড়াবার আওয়াজটিকে ঝাপসা করে ফেললে তার মনে হয়, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে হাটের বেওয়ারিশ নেড়ি কুত্তাটা; এখানে জিরার বস্তার আড়ালে ওটাকে একটু ঠাঁই দেয় তো কার লোকসান? বাবু কি আর দেখতে আসছে নাকি? এদিকে পেচ্ছাবও চেপেছিলো বৈকুণ্ঠের। স্বপ্ন ও স্বপ্নের ভয়ে এতোক্ষণ টের পায় নি, এখন জিরার বস্তা সরাতে তলপেটে একটু ধাক্কা লাগায় জায়গাটা টনটন করে ওঠে। দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করবে এবং নেড়ি কুত্তাটাকেও ভেতরে টেনে নেবে বলে দরজার ছিটকিনি, হুড়কো এবং বাঁশের ডাঁশা খুলতেই হুহু বাতাসে তার গায়ে লাগে বৃষ্টির ঝাপ্টা। ধুতির কোঁচা খোলার আগেই ভিজে চপচপে দুই জোড়া হাত দুই দিক থেকে এসে তাকে জড়িয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেরে দেয় মেঝের ওপর।

বৈকুণ্ঠ গিরির স্বপ্ন ও স্বপ্নের ভয়ে ভারী মাথাটা পড়েছিলো মোটাসোটা একটা ইঁদুরের ওপর, আহত ইঁদুর ক্ষীণ গলায় মরণের ডাক ছেড়ে ছিটকে পড়ে একটু তফাতে।

'বাবা গো!' বলে বৈকুণ্ঠ চিৎকার করে উঠলে তার আর্তনাদ হারিয়ে যায় বাইরের প্রবল ঝড়ের ভেতরে। সন্ন্যাসীর ত্রিশূলের আঁকশি এড়িয়ে বাজ পড়লো বটপাকুড়ের জোড়া শরীরে, তার আওয়াজে ধরিত্রী কাঁপে। কিন্তু মুনসির পান্টিটাকে ছড় বানিয়ে চেরাগ আলি কি এই আওয়াজে নিজের জবান ফোটাতে পারে না? বৈকুণ্ঠ কোথাও কোনো সাড়া না পেয়ে শরীরের সব শক্তি বুকে নিয়ে প্রবল বেগে ঝাঁকি দিলে চারটে হাতের দুটো অন্তত একটু আলগা হয়। কিন্তু গা ঝাড়া দেওয়ার চেষ্টা করতেই হাত দুটো ফের ফিরে আসে তার গলায়, একটা হাত চেপে ধরে তার মুখ। একটি প্রাণী এর মধ্যে বসে পড়ে তার বুকের ওপর। প্রচণ্ড কষ্টে বৈকুণ্ঠ হাঁসফাঁস করে। কিন্তু হাঁসফাঁস করাটাও কঠিন হতে হতে কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ে পড়ে অসম্ভব। কষ্টের মোচন হয় তার গলার নিচে খুব ভারি ছুরির সবটাই একেবারে গেঁথে গেলে। তার মুখের ওপরকার হাত সরে যায়। বৈকুণ্ঠ তার চোখজোড়া মেলে যতোটা পারে খুলে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু কী যে হলো, গলায় ছুরি বসার পর এতো হাট করে খুলে রাখা চোখেও সে কিছু দেখতে পায় না। বুক থেকেও ভার নেমে গেলে শরীরটা বেশ হালকা ঠেকে। চোখ তার অকেজো হয়ে গেছে, বৈকুণ্ঠের নজর তাই চলে যায় একেবারে ভেতরের দিকে। সেই নজরে ধরা পড়ে আধময়লা লালপেড়ে শাড়ি পরা মাথাভরা কালো চুলে লাল সিঁথির আলো-জ্বালানো একটি মেয়েকে। বৌটি তাকে বকে, 'বাবা, দিনমান কোটে কোটে ঘুরিস, কোটে বেড়াস বাবা? কার ঘরত যাস, কী কী খাস, বাড়িতে অ্যাসাই ঢুকলু ঠাকুরঘরের মধ্যে?' বৈকুণ্ঠকে টেনে এনে যুবতি শাড়ির ময়লা আঁচলে তার মুখ মুছে দেয় আর বকেই চলে,

'খালি রোদের মধ্যে ঘোরে, খালি রোদের মধ্যে ঘোরে।' ময়লা আঁচলে তার মুখ মোছে, মুখ মোছে, তার ঘামে চটচটে মুখটা মোছে আর সেই মোছায় মোছায় বৈকুণ্ঠের মুখ ছোটো হয়ে আসে। মুখের সঙ্গে খাপ খাওয়াতেই কি-না কে জানে, ছোটো হতে থাকে তার বুক, পেট, হাত পা, হাতের আঙুল সব। লালপেড়ে শাড়ি পরা যুবতির কোলে শুয়ে এক দৃষ্টিতে বৈকুণ্ঠ দেখে তার কপালের লাল টুকটুকে গোল চাঁদ। ময়লা আঁচলের ছায়ায় চাঁদের আলো একটু ময়লা হয়, আবার নরমও হয়। সেই আলোয় বৈকুণ্ঠের চোখে নামে চোখভরা ঘুম। ঘুমের মধ্যেই শোনা যায় তাদের সন্ন্যাসীপাড়ার পশ্চিমে খোল করতালের বোল। এই বাজনার সঙ্গে ঠোঁট মেলায় ময়লা আঁচলে বুক ঢাকা মেয়েটি :

গিরিগণ নামে জলে যতনে লইল তুলে
যেন কৃষ্ণ দেহ কোলে শত রাই।
পাষাণে হিরদয় বান্ধো কান্দো গিরিগণে কান্দো
ভবানী পাঠক ভবে নাই॥

খোল করতালের আওয়াজ আর সেই সুরে মেয়েটির গুনগুন গলা মেলানো বৈকুণ্ঠের কানে আবছা হয়ে আসে। তার ঘুমে-ভারি চোখে মেয়েটির মুখে মেঘের ছায়া পড়ে মুখটা কালো আর লম্বাটে হতে থাকে। তার কপালের লাল গোল চাঁদ ঢাকা পড়ে মস্ত কোনো গাছের আড়ালে। কিন্তু এতেও গুনগুন করা তার থামে না,

চান্দ জাগে বাঁশঝাড়ে বিবিবেটা নিন্দ পাড়ে
ফকির উড়াল দিলো কোনঠে দিশা নাহি পাই
হায়রে ভবানী পাঠক ভবে নাই॥

মেঘলা ছায়া-পড়া মুখে সেই মেয়েটি গুনগুন করতে করতে থেমে হঠাৎ করে চোখ রাঙায় তার দিকে, 'হামার আম খাবার পারো, আর এটি পানি খালে তোমার জাত যায় কিসক?'—মেয়েটি কে গো? চেনা চেনা ঠেকে। তার দিকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলে, এ কে গো? বৈকুণ্ঠের চোখ ভরা জলে রক্ত মিশলে চোখের লাল পর্দার এপার থেকে তাকে দেখতে দেখতে আস্তে করে সে হাত দুটো বাড়িয়ে দেয় মেয়েটির দিকে। কিন্তু হাত তার এতোটুকু উঠলো না। মেয়েটিকে ঠাহর করতে বৈকুণ্ঠের বড্ডো দেরি হয়ে গেছে। তার হাট করে খোলা চোখে আরো রক্ত জমলে এবং রক্ত জমতে জমতে কালচে হয়ে গেলে সবই তার আড়াল হয়ে যায়।

সকালে বৃষ্টি থামে, আকাশে মেঘ সেঁটেই থাকে। পায়ের পাতা পানিতে ডুবিয়ে পা টেনে টেনে টিউবওয়েলের দিকে যেতে যেতে গফুর কলু মুকুন্দ সাহার দোকান খোলা দেখে ডাকে, 'ও বৈকুণ্ঠ, কি ঝড়টা হলো রে!' মুখ ধুয়ে বদনায় খাবার পানি নিয়ে ফেরার সময় সাহার দোকানের দরজা অমনি খোলা দেখতে পেয়ে সে ফের ডাকে, 'ক্যা রে বৈকুণ্ঠ।' সাড়া না পেয়েও সে চলে যাচ্ছিলো, কিন্তু খোলা দরজার ঠিক ওপাশেই মরিচ আর জিরার বস্তা এলোমেলোভাবে পড়ে থাকতে দেখে সে বারান্দায় উঠে ঘরে ঢোকে। বৈকুণ্ঠের বুক আর মুখ জুড়ে জমাটবাঁধা রক্ত, সে সটান পড়ে রয়েছে মরিচের বস্তা আর জিরার বস্তার এক ধারে। তার মাথা থেকে হাতখানেক তফাতে একটা থ্যাঁতলানো মোটা ইঁদুর।

৫৩

'বৈকুণ্ঠ, এই বৈকুণ্ঠ।'

রাতভর ঝড়ের মাতম, তার মধ্যে তমিজের বাপ নিজের ঘরে এসে ডাকে, 'বৈকুণ্ঠ। এই বৈকুণ্ঠ। এতো ডাকিচ্ছি, কানোত কথা ঢোকে না?'—তমিজের বাপের হাঁকডাকের মধ্যেই তমিজের শূন্য ঘরের চালে কাঁঠালগাছের মাথাটা ভেঙে পড়লো মড়মড় করে। এখন তো বোঝাই যাচ্ছে, নিজের এতো সাধের খাজা কাঁঠালের গাছটার মাথা মটকে দিয়ে তমিজের বাপ বৈকুণ্ঠের মরণের কথা জানান দিয়ে গিয়েছিলো। তা এই আলামত দেখাতে বুড়াটা কুলসুমের কাছে আসে কেন? মরার পরেও মানুষটার আক্কেল হলো না। পাকুড়তলার চোরাবালি থেকে মুকুন্দ সাহার দোকান কী অনেকটা ঘাটা?

বাইরে শ্রাবণের মেঘপালানো আকাশ রোদ ঝাড়ে চড় চড় করে, ঘরে তাপ ঢোকে সেদিনকার ঝড়ে নেতিয়েপড়া চাল ফুঁড়ে; দরজা বন্ধ রেখেও রোদের ঝাঁঝ সামলানো দায়। ভ্যাপসা গরমে কুলসুম না পারে বসতে, না পারে একটু শুয়ে থাকতে। এটার গন্ধ শোঁকে, ওটার গন্ধ শোঁকে। একটি গন্ধের অভাবে ঘরে তার খাঁ খাঁ করে : ঘরে চেরাগ আলির 'খোয়াবনামা' নাই। এই কেতাবের টানেই তো বৈকুণ্ঠ বারবার এসেছে তার ঘরে। 'ও ফকির, দেখো তো তোমার বইখান দেখো।' কী ব্যাপার?—'কাল অনেক রাতে, দশটা হবি, না গো, এগারোটা, না, বারোটার কম লয়। চোখেত হামার নিন্দ আসলো ঝ্যাপা। গাওখান চোকির উপরে ঠেকায়া কেবল চোখ মুঞ্জিছি তো দেখি— ।' বাঁশঝাড়ে ফকিরের ছাপরা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বাইরে থেকেই বৈকুণ্ঠ গতরাতে দেখা স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলতে শুরু করলে মাটিতে রেখা টানার কাঠি-ধরা উঠিয়ে চেরাগ আলি তাকে থামায়, 'রাখ বাপু। বোস। পরে শুনিচ্ছি।'

টাউন থেকে আসা এক অসহায় মানুষের জিনে-ধরা বৌয়ের কথা শুনতে চেরাগ আলি তখন ব্যস্ত। 'ডাক্তার কোবরাজ হাকিম বদ্যি ব্যামাক ব্যাঁটা খাওয়াছে, ফল হয় নাই। এখন আসিছে হামার কাছে। দেখি হামার মুনসি কী করবার পারে।'

টাউনের খদ্দের পাওয়ার দাপটে, ডাক্তার কবিরাজের ব্যর্থতার সুখে ও বৈকুণ্ঠকে দেখার খুশিতে দাদাজানের গলায় তখন ভাত উথলাবার শব্দ। সেই রোগী না-কি রোগীর স্বামী বিদায় হওয়ার আগেই বৈকুণ্ঠের স্বপ্নের আদ্দেক কাহিনী বয়ান শেষ। ফকির একটা একটা সওয়াল করে আর বৈকুণ্ঠ নিজের স্বপ্ন বাড়াবার সুযোগ নেয় ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা। বলতে বলতে সে ঘোরের মধ্যে পড়ে, মনে হয় স্বপ্নটা যেন সে তখনি দেখছে। মাটিতে ফকিরের কঞ্চির রেখা একটা একটা বাড়ে, সেই সাথে লম্বা হয় বৈকুণ্ঠের স্বপ্নটা। আসলে তার ছিলো ফকিরের শোলোক শোনার বাই। শোলোক শুনলে তার স্বপ্নের গল্পও পাল্টে যেতো। শোলোক শুনে-শুনেই কি-না কে জানে, চেরাগ আলিকেও সে ঠাঁই দিয়েছে তার স্বপ্নের মধ্যে। চেরাগ আলি নাকি পাকুড়গাছের মগডালে বসে মুনসির পান্টিখান নিতে আবদার করছে আর মুনসি রাগ করার বদলে মিটিমিটি হাসছে। যে পান্টি উঁচিয়ে মুনসি শাসন করে গোটা কাৎলাহার বিল, বিলের গজার মাছ যার ইশারায় পায় ভেড়ার সুরত, সেই জিনিসে হাত দিলে মুনসি সহ্য করবে?—ফকির কি তা জানে না? আসলে জেনেও সে খুশি।—কেন-না, বৈকুণ্ঠের স্বপ্নে মুনসির হাসি পড়েছে তার এই পাকা দাড়িওয়ালা মুখের ওপর।—এই খুশিতে সে মাতোয়ারা। আর সন্ন্যাসীর ঘরের এই ছোঁড়াটাই বা কেমন? দাঁত-পড়া, পাকা দাড়ি মানুষটাকে পর্যন্ত স্বপ্নে দেখে, অথচ কৈ, কোনো স্বপ্নে তো কুলসুমকে কখনো সে দেখতে পায় নি তো!

বৈকুণ্ঠের খোয়াব দেখার মুরোদ কুলসুমের জানা আছে। তার ছিলো জাতের ব্যারাম। এই বাড়িতে এসে আম খেয়েছে, মুড়ি খেয়েছে, গুড় পর্যন্ত খেয়েছে আঙুল চুষে চুষে। কিন্তু মুখে পানি তোলে নি কোনোদিন। জাতের ব্যারাম থাকলে খোয়াব আর কদ্দুর যাবে? দেখো না, কুলসুম তাকে চেরাগ আলির 'খোয়াবনামা'টা নিতে সাধলো। অতো বড়ো একটা সম্পত্তি, এর টানেই তো চেরাগ আলির কাছে সে আসতো, অথচ বইটা বৈকুণ্ঠ তাকে ফিরিয়ে দিলো। কেন, ওই বই নিতে তার অসুবিধাটা কী? 'খোয়াবনামা' থাকলে কি ঐ মাকুচোষা হারামখোর মুকুন্দ সাহার দোকানঘর এঁটো হয়ে যায়?—আসলে ভুলই হয়েছে। সেদিন জোর করেই ওই বই বৈকুণ্ঠের হাতের ভেতরে একেবারে গুঁজে দিলে ঠিক হতো। বৈকুণ্ঠের বিছানার সিথানে চেরাগ আলির বই থাকলে ডাকাতরা ঘরে ঢুকে তাকে কি এমনি করে জবাই করতে পারে?—ঝড়ের রাতে ঢুকে মানুষটাকে তারা জবাই করলো! জবাই করলো!—কুলসুমের চোখের পানি সরে যায়।

তমিজের বাপ এলেই মেঝেতে মেলা বালু ফেলে যায়, এই ঘরে তাই কুলসুমের চোখে বালি ঝির ঝির করে। কিন্তু এখন সব বালু গলে গলে যায় বৈকুণ্ঠের রক্তের ঝাপ্টায়। ঘর তার ভরে যায় রক্তের ধোঁয়ায়। কিছু দেখা যায় না। কুলসুম তখন হাতড়ে হাতড়ে গিয়ে ঘরের দরজা খোলে।

রোদে তার চোখের লাল লাল ঢেউ মুছে গেলে কুলসুম শোনে, 'কয়টা শিঙি মাছ আনিছিলাম, রাখো।' ফের দরজার আড়ালে গিয়ে কেরামত আলির হাত থেকে কলাগাছের বাকলের খলুইটা নিয়ে মেঝেতে রাখে। কেরামত আলি ফের বলে, 'ঘরত একলা থাকো। বেওয়া মেয়েছেলের কতো বিপদ হবার পারে।'

কিন্তু কাল থেকে কুলসুম রাত্রে তো আর এখানে থাকে না। কয়েকদিন থেকে কালাম মাঝিও এমনি করেই তাকে বলেছিলো, 'বিধবা মেয়েমানুষ, বয়সও কম, একলা থাকলে ভালো ঠেকে না, মানুষে নানা কথা কয়।' আর গতকাল দুপুরবেলা কালাম একবার কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথা বললো, তার পরপরই কালাম মাঝির বৌ আর বুধার বেটি একরকম জোর করেই নিয়ে গেলো তাকে, ঘর তো আর তার হাতছাড়া হচ্ছে না, দিনের বেলা না হয় এখানেই থাকবে। কিন্তু এই সোমত্ত মেয়েমানুষকে রাতে তারা একা থাকতে দিতে পারে না।

দুপুরে কালাম মাঝি কিন্তু খুব নরম হয়েই কথা বলেছে, 'তোমার সাথে হামার বিবাদ নাই। তুমি তমিজের বাপের বেওয়া, তার মাজারেত হামি প্রতি জুম্মার দিন মৌলবিক দিয়া জিয়ারত করাই। হামার সাথে দুষমনি করিছে তমিজ, এখনো করিচ্ছে। তা তমিজ তো তোমার বেটাও লয়। তোমাক দোষ দিমু কিসক?' কিন্তু একটা কথা।—কী?—'মানুষ কয়, তমিজ লিত্যি তোমার ঘরত আসে। ফেরারি আসামিক তুমি ঘরত আসবার দেও কোন সাহসে? থানা থ্যাকা পুলিস আসলে তখন হামি সামলামু ক্যাংকা কর‍্যা?'

কুলসুম অবাক হয়ে বলে, 'তমিজ? তমিজ তো আসে না।'

এই মেয়েকে অবিশ্বাস করা মুশকিল। কিন্তু মাঝিপাড়ার মানুষের কাণ্ডকারখানায় কালাম মাঝি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। টাউন থেকে কতো কষ্ট করে মোহাজেরদের বরাদ্দ রিলিফ নিয়ে এলো কালাম। রিলিফের কাপড় নিতে কারো কিছুমাত্র আপত্তি দেখা গেলো না। অথচ দুধের টিন যেমন এনেছিলো তেমনি পড়ে রইলো। বুধা নিজের কানে শুনেছে, 'ওই শালা আবিতনের বাপ,—যে-বুড়া শাড়ি নিলো, লুঙি নিলো,—খুব রাষ্ট্র করে বেড়াচ্ছে, কালাম মাঝির ওই টিনের দুধ খেলে মরণ সুনিশ্চিত। যে কি-না নিজের

আত্মীয়-স্বজনকে পুলিসের হাতে তুলে দিতে পারে, পুলিসের হাত থেকে ফস্কে যাওয়া মানুষগুলোর মুখে বিষ মেশানো দুধ তুলে দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব কী? তারপর ধরো, মাঝিপাড়ার চ্যাংড়াপ্যাংড়া যখন তখন বিলে জাল ফেলে। কালাম মাঝিকে দেখলেই জাল গুটিয়ে দৌড় দেয়, আবার আজকাল কেউ কেউ তাকে না দেখার ভান করে ধীরে সুস্থে মাছ ধরে। মানুষ মোতায়েন করে কালাম আর কতো সামলায়? আবার ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা তাকে দেখলেই একটু দূরে গিয়ে চিৎকার করে, 'আড় মাছে পাড় দেয়, বেলে মাছ এলে দেয়।' এই কথা তো কালাম মাঝি শুনে আসছে ছোটো থেকে; ঢেঁকিশালে মেয়েরা ধান ভানতে ভানতে কতো কী বলতে বলতে এই শোলোকটাও গায়। কিন্তু এখন বিশেষ করে তাকে দেখে এটা একটু বদলে বলার মানে কী? তমিজের বাপের বাঘাড় মাছ কি এখন ভর করেছে মাঝিপাড়ার চ্যাংড়াপ্যাংড়ার জিভের ওপর?

আর তাদের বাপচাচাদের শয়তানি আর সহ্য করা যায় না। হাটে তার দোকানে মাঝিপাড়ার মানুষ সওদাপাতি তো করেই না, বরং দোকানের সামনে দিয়ে যেতে যেতে বলে, 'ওই দোকানের মাল ব্যামাক ভেজাল দেওয়া।' তার নিজের বেটা টাউনের দারোগা, কিন্তু তাকে এসব কথা বললে গা করে না। তার কথা, কাদের মিয়াকে চটিয়ে সে কিছুই করতে পারবে না। এম এল এ আর মন্ত্রী মিনিস্টারের সঙ্গে তার দহরম মহরম, খুনের আসামীকে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষমতাও তার আছে। মুকুন্দ সাহার দোকান দখলের ব্যাপারেও তহসেন তাকে কিছুই সাহায্য করলো না। তবে হ্যাঁ, বলেছিলো, হিন্দু প্রপার্টি তো, একবার কোনোমতে ওদের খেদাতে পারলে দখল কায়েম রাখার বন্দোবস্ত সে করবে। তা সেটুকু অবশ্য করছে। বৈকুণ্ঠ খুন হবার পরদিন বিকালেই আমতলির পুলিস এসে দোকানে তালা ঝুলিয়ে গেলো, তার একদিন পর তহসেনের কথাতেই তালা খুলেও দিলো। দোকান থেকে গণেশের মূর্তি টুর্তি সরিয়ে সাফ সুতরো করে কালাম মিলাদ দিলো, তহসেন সেখানে ঠিকই ছিলো, আবার মিলাদের পর কাদেরের দোকানে গিয়ে গল্পও করলো কিছুক্ষণ। মাঝিপাড়ার মানুষ মিলাদে হাজির ছিলো খুব কম। তবে জিলাপি দেওয়ার সময় সব শালা ভিড় করে। কিন্তু জিলাপি খেতে খেতেই যা বলে গেছে বুধার কানে গেছে সবই; বুধা বলে, 'মামু, তমিজ ছাড়া ইগলান কথা শালাগোরে আর কেউ শিখায় নাই।' কেরামত আলিও একদিন, হয়তো মুখ ফস্কেই বলে ফেলে, অনেক রাতে সে কুলসুমের ঘরে মানুষের কথাবার্তা শুনেছে। কালাম মাঝি সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কোঁচকায়, 'তুমি রাত কর্যা ওই ঘরত যাও?'

'জে না। ওইদিক দিয়া আসিচ্ছিলাম, তো শুনি তমিজের বাপের ঘরত মানুষ কতাবার্তা কচ্ছে।'

'কেটা? কথা কচ্ছিলো কেটা? কী কথা হচ্ছিলো?'

সরল গদ্যে তমিজের একটা কাহিনী বাঁধতে কেরামত তৈরী ছিলো, কিন্তু কী বললে আবার কী দোষ হয় ভেবে সে চেপে যায়। শুধু জানায়, 'না। হামি আর খাড়া হলাম না।'

সেদিন দুপুরবেলা কুলসুমের কথা কালাম মাঝি অবিশ্বাস করে নি, তবে ফের জিগ্যেস করে, 'তুমি কল্যা তমিজ আসে না। তা হলে রাত কর্যা তুমি কথা কও কার সাথে? মেলা মানুষ শুনিছে, এটি কথাবার্তা হয়।'

কুলসুম সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, 'তমিজের বাপ আসে।'

কালাম মাঝি কুলসুমের এরকম নির্বিকার জবাবে চমকে উঠে আশেপাশে তাকায়। ঢোক গিলে বলে, 'মরা মানুষ আসবার পারে? ইগলান কী কও?'

'আসে। রাত কর্যা আসে।'

সেদিনই কালাম মাঝি সাব্যস্ত করে রাতে এই মেয়েটিকে এই ঘরে একলা থাকতে দেওয়া যায় না। বৌকে ডেকে বলে, 'মরা হোক আর জেতা হোক, রাতত বেওয়া মেয়েছেলের ঘরত মানুষ আসে, এটা তো ভালো কথা লয়। তুমি ওর এটি থাকার বন্দোবস্ত করো। কুফা ঘর রাখা যাবি না।'

কালাম মাঝির বৌ কুলসুমকে নিয়ে আসতে রাজি হয়, বরং একটু উৎসাহই দেখায় কিন্তু ওই ঘরের দখল নিতে তার আপত্তি আছে। এমনিতে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তারা একঘরে হয়ে পড়েছে, তমিজের বাপের ঘর কেড়ে নিলে মাঝিপাড়ার মানুষ খেপে যাবে, তমিজের বাপও চোরাবালির ভেতর থেকেই উৎপাত করতে পারে। কালাম মাঝি 'দেখা যাক, সেটা হামি বুঝমু।' বললেও তহসেনের সৎ মা বোঝে, স্বামী তার হুঁশিয়ারিটা অন্তত আপাতত মেনে নিয়েছে।

তবে যে যাই বলুক, কেরামতের কিন্তু মনে হয়, তমিজই রাত করে কুলসুমের ঘরে আসে। যে রাতে কুলসুমের ঘরে সে কথাবার্তা শুনেছিলো তার পরদিন সকালে কুলসুমের সারা মুখে ছিলো খুশি খুশি আলো। সে হলো কবিমানুষ, যুবতীর চেহারা দেখে তার চাহিদা আর তৃপ্তি যদি বুঝতে না পারে তো এতোকাল শোলোক বাঁধলো কি বাল ছিঁড়তে? তমিজের বাপের কাছে কুলসুম সারাটা জীবন কী পেয়েছে? এখন সুদে আসলে তাই পুষিয়ে নিচ্ছে বুড়া হাবড়ার জোয়ান ছেলের কাছ থেকে। তারপর, তাকে দেখে মাঝিপাড়ার ছোঁড়ারা তারই বাঁধা শোলোক বলে, 'মাঝি বিনা বিল আর জল বিনা মাছ/ নরস্পর্শ বিনা নারী পুষ্প বিনা গাছ।' নিজের বাঁধা এইসব শোলোক শুনলে তার ভয় করে, শালা তমিজ ছাড়া মাঝিদের এভাবে চেতাবে আর কে? কুদ্দুস মৌলবির মতো মানুষ পর্যন্ত কালাম মাঝির সামনেই একদিন বলে, 'আজ শিমুলতলার ঘাটেত মেলা কয়টা চ্যাংড়া একত্তর হছে। জাল লিয়া গেছে, সোগলি দেখি কেরামতের শোলোক কচ্ছে।' শুনে কেরামতের গলা শুকিয়ে আসে। কালাম মাঝিকে চটিয়ে সে এখানে থাকতে পারবে না, মাঝি পাড়ার বাস উঠে গেলে কুলসুমকে পাবার সম্ভাবনা তার একেবারেই শেষ হয়ে যাবে। কুদ্দুস মৌলবির দিকে না তাকিয়ে সে জবাবদিহি করে কালাম মাঝির কাছে, 'আরে উগলান শোলোক বাদ দিছি কোনদিন।'

কিন্তু মুশকিল এই কালাম মাঝিকে নিয়েই। কুলসুমের সঙ্গে তার নিকার কথা তো আর তোলেই না, বরং কেরামত প্রসঙ্গটি তুললেই কালাম এক্কেবারে খামোশ মেরে যায়। কুলসুমকে সম্পূর্ণ নিজের কাছে না পাওয়া পর্যন্ত কেরামত না পারে নতুন শোলোক বাঁধতে, না পারে তার পুরনো শোলোকগুলো সুর করে গাইতে। সুতরাং শিঙি মাছগুলো তার হাতে তুলে দিয়ে কেরামত না হয় নিজেই সরাসরি প্রস্তাব করবে। ঘরের চৌকাঠে বসে কেরামত খালি প্যাচাল পাড়ে, কুলসুম একা থাকলে লোকে নানা কথা বলবে আর তার নামে কোনো কুকথা কেরামত সহ্যই করতে পারে না। কুলসুম যদি তার সাথে নিকা বসে তো মানুষের মুখ বন্ধ করা যায়। কালাম মাঝিও তাদের এই বিয়ে সম্পূর্ণ অনুমোদন করে, এমন কি চোরাবালিতে গিয়ে কেরামত তমিজের বাপের দোয়াও নিয়ে এসেছে। কালাম মাঝি তাদের দুজনকে এই ঘরে থাকতেও দেবে, অন্তত কেরামত পরিবার নিয়ে বাস করলে কালাম এই ঘর থেকে তাদের উচ্ছেদ করবে না।

'ঘর কি কালাম মাঝির বাপের?' এতোক্ষণ পর মেয়েটির এই একটিমাত্র বাক্যে চমকে উঠলেও তার তেজে কেরামত মুগ্ধ হয়ে যায়। 'ঘর বন্দক দিয়া তমিজের বাপ টাকা হাওলাত করিছিলো কালাম মাঝির কাছ থ্যাকা। তমিজ আ্যাসা টাকা ঘুর‍্যা দিলেই তো মিট্যা যায়।' কুলসুমের জিভের ধার, ঠোঁটের জড়িয়েপড়া ও গুটিয়ে-নেওয়া এবং ভুরুর গেরো লাগানো ও গেরো খোলা দেখতে দেখতে কেরামতের মুগ্ধতা দানা বেঁধে তাকে

ঘোরের মধ্যে ফেলে; এক পলকের জন্যে হলেও তার ভুলো লাগে, সে কি জেগে আছে, না স্বপ্ন দেখছে? 'ঘরের চিন্তা হামি কোনোদিন করি নাই। রোজগার করবার পারলে খাওয়া পরার অভাব কী? কালাম মাঝি তো তার দোকানের খাতা লেখার কাম একটা দিয়াই রাখিছে, আবার মুকুন্দ সাহার দোকানটাও তো এখন তারই হলো, সেটার খাতা লেখার কামও হামকই করা লাগবি। রোজগার হামার কম হবি না।' তা ছাড়া টাউনের মানুষের মধ্যে তার গানের জনপ্রিয়তার বিষয়টিও সে মনে করিয়ে দেয় কুলসুমকে। কুলসুমকে বিয়ে করলে তার বাউন্ডালা জেবনটা সুস্থির হয়, 'হামি আবার গান বান্দিবার পারি।'

'দোকানের খাতার মধ্যেই তো গান বান্দা যায়, না?' কুলসুমের কাছে কেরামতের বাঁধা গান আর দোকানের খাতা লেখার মধ্যে কোনো ফারাক নাই ভেবে কেরামত একটু আহত হয়। কবির দুঃখটা একটু সামলে নিয়ে সে বলে, 'কালাম মাঝির এটি না পোষায় তো হামি তোমাক লিয়া টাউনেত বাসা লিমু। গানের বই লিখ্যা হামার যা রোজগার হবি, টাউনেত বাসা কর্যা থাকবার পারমু।'

টাউনে যেতে কুলসুমের আপত্তি নাই। কিন্তু সেখানে নাকি রাত্রেও আলো জ্বলে, সব জায়গায় লোকজন গিজগিজ করে, বেহায়া মেয়েরা রিকশায় করে টাউন ঘোরে।

'টাউনেত যাবা?'

একটু ভেবে কুলসুম বলে, 'তমিজের বাপ তো টাউনেত যাবি না। তাঁই তো টাউনের ঘাটাও চেনে না।'

কেরামত আলি বড়ো দমে যায়। তার সঙ্গে বিয়ের পরেও কুলসুমের এই মরা মানুষ দেখার ব্যারাম যদি না সারে?

এই নিয়ে সে হয়তো কুলসুমকে কিছু বলতো, কিন্তু এর মধ্যে চলে আসে বুধার মেয়ে, 'ও চাচী, ঢেকিত দুইটা পাড় দিয়া তুমি ঘরত আসিছো, হামি একলা এখন কী করি, কও তো?'

'চল।' বলে কেরামতের উপহার সিঙি মাছগুলো মাটির বড়ো মালসায় পানিতে জিইয়ে রেখে তার ওপর মাটির সরা চাপা দিয়ে দরজা আগলে রেখে চলে যায় কালাম মাঝির বাড়ি। আজ ভোর থেকে সেখানে ধান কোটার ধুম। বাড়ির জন্যে চাল তো লাগবেই, তহসেনের টাউনের বাসাবাড়ির জন্যে লাগবে এক মণ।

কালাম মাঝির বৌটা মানুষ ভালো, কুলসুমকে খুব একটা খাটায় না। কুলসুমের ঢেঁকির পাড় ভালো, আবার সারাদিন পাড় দিয়েও হাপসে যায় না। আবার এই অছিলায় ওই বাড়িতে থাকলে দুপুরের খাওয়াটা পাওয়া যায়, ভাতের সঙ্গে মাছও জোটে। তহসেনের সৎ মা তাকে একটু পছন্দই করে। কিংবা মাঝিপাড়ায় স্বামীর অপরাধের ভারটা একটু কমাতে চায় তাকে খুশি করে। আবার অন্য ব্যাপারও থাকতে পারে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা তাকে আড়ালে পেয়ে আস্তে করে বলে, 'কুলসুম, কেরামতের সাথে তুই লিকা বস। কেরামত মানুষ ভালো। তবু পুরুষমানষের মন, উলটাতে কতোক্ষণ?' কিন্তু মনে হয় অন্য কোনো পুরুষমানুষ তার উদ্বেগের কারণ। আজ সকালে বলছিলো, 'কুলসুম, হামার ঘরের বারান্দাত না শুয়া তুই বুধার ঘরের সাথে থাকিস। ওটি বিছনা পাতিস।' কুলসুম ঠিক বুঝতে পারে না। রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে সে তার বিছানার পাশে লম্বা একটি ছায়া দেখতে পেয়ে বরং খুশিই হয়েছিলো, তমিজের বাপ তবে এখানেও এসে হাজির হয়েছে। তহসেনের মাকে এই ঘটনা বলার কয়েক ঘণ্টা পর সে তার শোবার জায়গা বদলাতে বলে।

তমিজের বাপ আবার বুধার ঘরের বারান্দা ঠাহর করে যেতে পারবে তো?—কুলসুম একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে। তবে ঢেঁকিশালেই বিকালের দিকে হঠাৎ আস্তে করে গায়ে তার

ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে মাথাটা সাফ হয়ে যায়। দুপুরে বুধার মেয়ের সঙ্গে এখানে আসার পরই এক পশলা বৃষ্টি হলো। তারপর শুরু হলো গুমোট, ভ্যাপসা গরম আর কাটে না। ঢেঁকিশালে সবাই ঘামছে দরদর করে। ঘাম নাই খালি কুলসুমের শরীরে। তার গায়ে ফুরফুরে হাওয়া। এর মানে কী? এটা কি ফকিরের কাম? না। এই ভ্যাপসা গরমে হঠাৎ করে ঝিরঝিরে হাওয়া খেলাতে পারে এক মুনসি। কিন্তু তার হাওয়া আসে পাকুড়তলা থেকে, বিলের শিংমাগুর আর পাবদা ট্যাংরা আর খলশে পুঁটি আর রুই কাতলা সাঁতরানো পানির ওপর ভাসতে ভাসতে সেই হাওয়ায় জমে হালকা মিষ্টি আঁশটে গন্ধ। আর আজ এই ফুরফুরে হাওয়ায় মিশেল রয়েছে জর্দার হালকা গন্ধ। দুটো গন্ধ এক হয়ে যাচ্ছে বলে কুলসুম এগুলোকে আলাদা করে ঠাহর করতে পাচ্ছে না। ঢেঁকির পিছাড়ির ওপর তার পা ধীর হয়ে আসে, বুধার মেয়ে বলে, 'ও চাচী, কী হলো তোমার? মনুয়া তো হামার হাতের উপরে পড়িচ্ছিলো।' ঢেঁকির মুগুর হাতে পড়লে বুধার মেয়ের হাতটা ছেঁচে যাবে না? বুধার ছোট্ট মেয়েটা ছড়া কাটে, 'আড় মাছে পাড় দেয়, বেলে মাছে এলে দেয়।' শোলোক শুনতে শুনতে কুলসুমের মাথাটা ঘোরে, সেকি জর্দার গন্ধে, না বাঘাড়ের আঁশটে গন্ধে, না-কি শুধুই শিশুকণ্ঠের শোলোকের বোলে তা ধরতে না পেরে কুলসুম বলে, 'এখন থাক রে। একটু দম লেই।'

৫৪

ভোরবেলা বৃষ্টিতে সবাই কমবেশি ভেজে। রাতভর যে ঝড়টা গেলো, ভোরে রওয়ানা হওয়া যায় কি-না সন্দেহ ছিলো। স্টেশনে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের জিপ থেকে নামাবার সময় ছোটো বড়ো মেজো তিনটে সুটকেস, ট্রাংক, হোল্ডঅল ও খাবার বাস্কেট একটু একটু ভেজে। এমন কি যত্ন ও সতর্কতা সত্ত্বেও বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে কাদেরের হাতের পানির সোরাই টইটম্বুর হয়ে যায়। ট্রেন প্রায় আধ ঘণ্টা লেট। এর মধ্যে বৃষ্টি থেমে গেলো, তবে আকাশ মেঘলাই হয়ে রইলো।

ইসমাইল হোসেনের বেগম সাহেবা, তার এক ছেলে, দুই মেয়ে ও কাজের মেয়েটিকে ঢাকায় পৌঁছে দেওয়ার ভার পড়েছে কাদেরের ওপর, ঘাড় পেতে এই দায়িত্ব সে নিয়েছে নিজেই। এই সঙ্গে তার বিয়ের বাজারটাও সেরে নেবে। শাড়ি, গয়নাপাতি, কাপড়চোপড়, প্রসাধন ও সুটকেস কেনা হবে ইসমাইলের তত্ত্বাবধানে। শরাফত মণ্ডল সেদিন হোসেন মঞ্জিলে নিজে রিজিয়া বেগমকে অনুরোধ করে এসেছে, 'মা, আপনাগোরে বাড়ির মেয়ে ঘরে আনিচ্ছি, আপনার পছন্দমতো দেখ্যাশুন্যা যা ভালো মনে হয় তাই কিনবেন।'

এই সুযোগে আবদুল কাদের ঢাকায় পার করে দিচ্ছে তমিজকে। ইসমাইল হোসেনের ঢাকার বাড়িতে একবার পাচার করে দিতে পারলে পুলিসের সাধ্য কি তাকে ধরে? তদবির করে তার নামে মামলাটাও খারিজ করে নিয়ে ফের তাকে নিয়ে আসা যাবে গিরিরডাঙায়। তখন দেখা যাবে, কালাম মাঝি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভোট কীভাবে করে!

ইসমাইল হোসেনের ঢাকার বাড়িতে এরকম বিশ্বাসী চাকর একটা দরকার। রিজিয়া বেগম তাকে স্বামীর একটা পুরনো টুইলের শার্ট, প্রায় নতুন একটা লুঙি, এমন কি একটুখানি ছেঁড়া ছাই রঙের একটা শেরোয়ানি পর্যন্ত দান করে দিয়েছে অকাতরে। বৌ

ও বাচ্চার জন্যে যথাক্রমে শাড়ি, ব্লাউজ ও ফ্রক কিনে দিয়েছে, কাদের সেসব পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে নিজগিরিরডাঙায়। তমিজের ওপর রিজিয়া বেগম খুব খুশি। শাশুড়ি ও দেওরের মুখভারের তোয়াক্কা না করেই তাকে সে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তা তমিজও তাকে খেদমত করার চেষ্টা করে যতোখানি তার বুদ্ধিতে কুলায়। বৃষ্টি থেকে বাঁচাবার তাগিদে রিজিয়া বেগমের সবচেয়ে ছোটো সুটকেসটা সে তুলে নেয় কুলির মাথা থেকে এবং ওয়েটিংরুম পর্যন্ত সেটাকে বুক ও পেটের সঙ্গে আঁকড়ে রাখায় সে একবার হোঁচট খায় মাল ওজন করার যন্ত্রের সঙ্গে এবং দ্বিতীয়বার প্ল্যাটফর্মের এক ধারে স্তূপ করে রাখা চালের বস্তায়। বলতে কি, রিজিয়া বেগমকে খুশি করতেই 'হোসেন মঞ্জিল' থেকে রওয়ানা হবার আগে ছাই রঙের শেরোয়ানিটা সে একবার পরার উদ্যোগ নিয়েছিলো। কিন্তু সবাই 'এ কী? হাত ঢোকালে না' 'এই গরমে এটা পরো কেন?' 'এটা পরলে তোমাকে বড়দা ভেবে স্টেশন মাস্টার সালাম করে বসবে', 'এখন খোলো, খুলে তোমার ওই ব্যাগে রেখে দাও' প্রভৃতি মন্তব্য ও পরামর্শে সে ওটাকে ঢুকিয়ে রেখেছে ওর ছালার মধ্যে। ছালাটা কিছুতেই হাতছাড়া করছে না।

ফার্স্ট ক্লাস কামরায় কাদের মালপত্র গুছিয়ে রিজিয়া বেগম, ছেলেমেয়ে ও কাজের মেয়েটিকে তাদের যথাযথ আসনে বসিয়ে তমিজকে উঠিয়ে দেয় কয়েক কামরা পর প্রথম থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টে। নিজেদের কামরায় ফিরে যাবার সময় কাদের বারবার করে বললো, 'বোনারপাড়ায় গাড়ি থামলে ওই কামরাত আসিস। ভাবির কিছু দরকার লাগবার পারে। আর এর মধ্যে কোনো স্টেশনে ওঠানামা করিস না। মাঝখানে ছোটো ছোটো স্টেশন, নামলে উঠবার পারবু না।'

রেলে তমিজ মেলা যাতায়াত করেছে, এতো হুঁশিয়ার করার দরকার হয় না। তবে গাঁয়ের মাঝি কলু, চাষাভুষার আনাড়িপনায় ভদ্দরলোকেরা মজা পায়; তার রেলে অনেকবার চড়ার কথা তমিজ তাই চেপে যায়, বোনারপাড়া নেমে কী করতে হবে সে তা ভালো করেই জানে। ভবিসাহেবার তখন খেদমত করার একটা মওকা মিলবে। তার চায়ের দরকার হতে পারে, সোরাইয়ের পানি ফুরিয়ে যেতে পারে। পানের বাটা তো সঙ্গেই আছে, তবু দোকানের পান কয়েক খিলি না হয় এনে দেবে। ভাবিসাহেবা একটু হাসলে তমিজের এক সপ্তাহের খুশি থাকার খোরাক জুটে যায়। আর যদি বলে, 'তমিজটাকে বেশি বলতে হয় না, ইশারাতেই সব বুঝে ফেলে' তো সারাটা মাস সে খুশি।

এই কামরায় খুব ভিড় । দরজার সামনে মেঝেতে বসার একটা জায়গা তার হয়ে গেলো। চটের ব্যাগে হাত বুলিয়ে ভেতরের জিনিসপত্র সম্বন্ধে তমিজ তৃতীয় কি চতুর্থবার নিশ্চিন্ত হচ্ছে, এমন সময় পাশের লাইনে এসে দাঁড়ালো একটা লোকাল গাড়ি। ওই ট্রেনের একটা কামরায় উঠলো ট্রাংক ও সতরঞ্চি-জড়ানো বিছানা হাতে কয়েকজন পুলিস। কয়েকজন নয়; একগাড়ি পুলিস উঠলো সার বেঁধে। তমিজ তাড়াতাড়ি করে মুখ ঘোরালো তার কামরার ভেতরের দিকে। পুলিস যদি তাকে ফেরারি আসামি বলে সনাক্ত করে ফেলে! এই কামরায় কাদের নাই, ইসমাইল সাহেব নাই, তার বাবা নাই, ইয়াকুব সাহেব নাই। পুলিস যদি তাকে খপ করে ধরে তো তার বারো বছরের কয়েদ খাটা। বেশিও হতে পারে। এমন কি তার ফাঁসি পর্যন্ত হতে পারে। হঠাৎ তার মনে পড়ে ফুলজানের কথা । তার মেয়েটা কি বড়ো হলো? সে কি হাঁটতে পারে? না-কি হামাগুড়ি দেয়? মেয়েটাকে দেখার কপাল তার হবে কি? কুলসুম বোধহয় ফুলজান আর তার বেটিকে দেখতে যায়ই না। কিংবা গিয়ে হয়তো হুরমতুল্লার চটাং চটাং কথা শুনে এসেছে। মাঝির বেটি বলে হুরমতুল্লা নাতনিকে হেলা করে কি-না কে জানে? বৌবেটির জন্যে তমিজ এতোটাই উতলা হয় যে, পুলিসের ভয় পর্যন্ত তার চাপা পড়ে। কিছুক্ষণ

পর পুলিসদের আর দেখা যায় না, তারা মুখ সেঁধিয়েছে কামরার ভেতরে। তমিজের গাড়ির ভেতরে কে যেন বলে, 'ওদিকে খুব গোলমাল, কাল এক গাড়ি পুলিস গেলো, আজ আবার আরেক গাড়ি।'

'কিসের গোলমাল ভাই?' কে যেন জানতে চাইলে ভিড়ের ভেতর থেকেই জবাব আসে, 'আধিয়ার চাষারা হাঙামা করিচ্ছিলো, পুলিসও খুব সাটিচ্ছে। মদ্দামাগী বাছবিচার নাই, যাক পাচ্ছে তাকই ধরিচ্ছে।'

তমিজ জিগ্যেস করে, 'ঐ গাড়ি কুটি যাবি?'

'শান্তাহার।'

শান্তাহার! শান্তাহারের গাড়ি! শান্তাহারের গাড়ির ইনজিনের হুশহুশ ধ্বনি বলতে থাকে, 'শান্তাহার!' ওই গাড়ির ইনজিনের ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে লিখে দেয়, 'শান্তাহার!' অক্ষরজ্ঞান না থাকলেও তমিজ এই লেখাটাই জীবনে প্রথম পড়তে পারে। শান্তাহার যাওয়া মানে সেখান থেকে যাও জয়পুর, যাও আক্কেলপুর, যাও হিলি। দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ। আবার অন্য লাইন ধরে নাটোর কিংবা নবাবগঞ্জ। এতো পুলিস যাচ্ছে, মানে চাষারা দুই ভাগ ফসল তুলছে নিজেদের গোলায়, জোতদারদের গোয়ার কাপড় খুলে গেছে, শালারা দৌড় দিচ্ছে, লুকাচ্ছে পুলিসের গোয়ার মধ্যে। আবার এর মধ্যেই আমনের জন্যে একদিকে চলছে জমি তৈরি, পাট কেটে সেই জমিতে একটা দুইটা তিনটা লাঙল চাষ দেওয়া হলো, এখন বীজতলায় কলাপাতা রঙের ধানের চারা বিছানো। জমি তৈরি হলে সেখান থেকে চারা এনে ধান রোপার ধুম পড়ে যাবে। আহা, কাল সারা রাত বৃষ্টি হলো, জমি হয়ে আছে মাখনের মতো, লাঙল ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে ঢুকে যাচ্ছে দুনিয়ার অনেক ভেতরে, তমিজ সেখান থেকে পানি পর্যন্ত টেনে আনতে পারে। শান্তাহারের গাড়ির ধোঁয়ায় আসমানে এখন আবার লেখা হয় ধানজমির ছবি। কী জমি গো! ধানচারা রুইতে না রুইতে ধানের শীষ বড়ো হয়, ধানের শীষ দুধের ভারে নুয়ে পড়ে নিচের দিকে। মোটা মোটা গোছার ধান কাটতে নেমে গেছে কতো কতো মানুষ তার আর লেখাজোকা নাই। জোতদাররা এসেছে পুলিস নিয়ে। রেলগাড়ি ভরা পুলিস স্টেশনে স্টেশনে নেমে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। তারা সব কলেরার মতো নামে, গুটিবসন্তের মতো নামে। চাষারা তাদের তাড়া করছে কাস্তে নিয়ে, শালারা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবার আর পথ পাচ্ছে না।

'গাড়ি ছাড়ে না যে? কতো লেট করবে?' কে যেন জানতে চাইলে আর কেউ বলে, 'ঐটা আগে ছাড়বে। আগে আসে, পরে ছাড়ে।'

শান্তাহারের গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা বাজলো। তমিজ হঠাৎ দাঁড়িয়ে দরজার মানুষদের *ঠেলেঠুলে* নেমে পড়ে গাড়ি থেকে। পাশের লাইনে দাঁড়ানো শান্তাহারের গাড়ির একটা থার্ড ক্লাস কামরার খোঁজে সে দৌড় দেয়। গার্ড সাহেবের লম্বা হুইসিলে গাড়ির ইনজিনের বড়ো চাকাগুলো ঘুরতে শুরু করেছে। তমিজ উঠে পড়লো শান্তাহারের গাড়ির একটা কামরায়।

এই গাড়িতে ভিড় কম। বেঞ্চিতে জায়গা থাকলেও উদাম গায়ে গামছা-ঘাড়ে মানুষ অনেকেই বসে রয়েছে মেঝেতে। নিজেদের বাঁক আর ঝুড়ি আর কোদাল তারা ঠেলে রেখেছে বেঞ্চের তলায়। তমিজের সাফসুতরো জামা আর পরিষ্কার লুঙি আর পায়ে রবারের স্যান্ডেল দেখে অনেকে একটু সরে সরে বসে। বেঞ্চে বসতে তার চটের ব্যাগটার কথা মনে হলে তমিজ চমকে ওঠে। কিন্তু গাড়ি তখন গতি নিয়ে ফেলেছে। এতোগুলো জামাকাপড়! কাপড়চোপড়ের ভাঁজে ছিলো! পাঁচটা টাকা!

এখন তো আর ফেরার জো নাই! ফিরে কাজ নাই!

· ·

শরাফত মণ্ডল ছাতা বন্ধ করতে করতে কাদেরের দোকানে ঢুকতেই ফুল ইউনিফর্মে মোড়ানো তহসেনউদ্দিন চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায় এবং একটু উপুড় হয়ে মণ্ডলকে কদমবুসি করে। মণ্ডল হাসি হাসি মুখ করে বলে, 'থাক, থাক। বেঁচে থাকো।' কদমবুসি না করলেও আমতলির দারোগাও স্লামালেকুম বলে পাছাটা চেয়ার থেকে ইঞ্চি দুয়েক উঠিয়ে ফের ঠিকমতো বসে। হাটে এই সাতসকালে পুলিসের জিপগাড়ি দেখে মণ্ডল খানিকটা আঁচ করেছিলো। কিন্তু তমিজকে খুঁজতে টাউনের পুলিস আসে কোন আইনে?

গফুর মিষ্টির আয়োজন করেছিলো আগেই। খেতে খেতে ছানায় ভেজাল ও মিষ্টির মান নিয়ে নিয়মমাফিক আলোচনায় যোগ দিয়ে শরাফত সরাসরি জিগ্যেস করে, 'তোমরা তমিজের কোনো হদিস করাবার পারলা না?'

আমতলির দারোগার চোখেমুখে একটু অসন্তোষ, 'ধরা তো যায়ই। কিন্তু বড়ো মানুষরা যদি আসামিকে শেলটার দেয় তো—।'

'আরে, বলেন কী? আপনার কাজ আপনি করেন তো, আপনাকে বাধা দেবে কে?' কাদের প্রতিবাদ করে এবং আশ্বাসও দেয়, 'আমি তো আপনাদের এস পি সায়েবকে সেদিন মুখের ওপর বললাম। এইসব চোরডাকাত ছাড়া থাকলে নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষ শান্তিতে থাকে কী করে?'

গ্রিন সিগন্যাল থানাওয়ালারা পেয়েছে সপ্তাহ তিনেক আগে। এর মধ্যে একবার বাড়ি এসে তহসেন তমিজের ঘর ভালো করে দেখেও এসেছে। তবে সে গিয়েছিলো প্লেন ড্রেসে। আমতলির দারোগাকে খোলাখুলি বলেও দিয়েছে, আসামী তো তাদের জ্ঞাতিগুষ্টির মধ্যেই পড়ে, আবার মণ্ডলরা তাদের পেছনে লেগেই রয়েছে; অফিসিয়ালি তমিজের বাড়ি সার্চ করতে যাওয়াটা তার জন্যে নিরাপদ নয়। আমতলির দারোগা এখন যাচ্ছে নিজগিরিরডাঙায় তমিজের শ্বশুরবাড়ি সার্চ করতে। এলাকার সবচেয়ে বড়ো মুরুব্বির সঙ্গে একটু পরামর্শ করবে। তহসেন এসেছে পরিচয় করিয়ে দিতে। তাকে আবার এক্ষুনি ফিরে যেতে হবে।

তহসেন বলে, 'হুরমতুল্লা তো আপনার পুরোনো বর্গাদার। আপনি বললে তাকে ধরবে, আপনি না করলে এমনি গিয়ে খুঁজে আসুক।'

'হুরমতুল্লা মানুষ ভালো। সোজা মানুষ আর কী। তমিজের সাথে বেটিক নিকা দিয়া এখন মুসিবতে পড়িছে। আমি অনেক মানা করিছিলাম। মাঝির বেটার সাথে কুটুম্বিতা—।' তহসেনের সামনে প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যেতে সর্তক হয়ে মণ্ডল বলে, 'জেল-খাটা কয়েদির সাথে আত্মীয়তা কর‍্যা এখন নিজেই ভুগিচ্ছে। জমি তো মেলা দিছিলাম, বর্গা করিচ্ছিলো। এই বিয়াটা দেওয়ার পরে খালি মোষের দিঘির আশেপাশে কিছু জমি ছাড়া আর সব ফেরত লিছি। ভাবছিলাম সবই ক্যাড়া লেই। পরে দেখলাম, বুড়া মানুষ। আর তোমরা তমিজেক বান্দলে হুরমতুল্লা বেটিক ফির লিকা দিবি অন্য জায়গাত।'

তহসেন উৎসাহ পায়। তমিজকে ধরার জেদ তার দিনদিন আরো জোরে সোরে চেপে বসছে। সে নিশ্চিত, ওই ডাকাতটাই মাঝিপাড়ার মানুষদের খেপাচ্ছে। আর ওর সঙ্গে কুলসুমটার একটা যোগাযোগ আছেই। মেয়েটার এমন চমৎকার ফিগার, কালো মুখে অস্পষ্ট আলোর আভা, সারা জীবন কাটালো বোকাসোকা অথর্ব বুড়োর সঙ্গে। এখন সতীনের গোঁয়ার টাইপের কুচ্ছিত ছেলের গায়ের গরম খায়। তহসেন ক্রিমিনাল তো কম চরালো না। ব্রিটিশ আমলের আনডিভাইডেড বেঙ্গল থেকে শুরু করে কয়েকটা ডিস্ট্রিক্টে কতোগুলো থানায় চোরডাকাত ঠেঙিয়ে আসছে সে আজ আট বছরের ওপর। কুলসুমের

দিকে তাকিয়েই বোঝা যায়, ওই তাগড়া বডিতে মাগী পারে না হেন কাজ নাই। বডির চেয়েও ডেনজারাস হলো তার নিশ্বাস। এ পর্যন্ত দুইবার সে তার কাছাকাছি গেলো। কুলসুম একবার গন্ধ নিতে শুরু করলে তহসেনের গা শিরশির করে : মাগী বুঝি তহসেনের ব্রেন, হার্ট, ইনটেস্টাইনের ভেতরের সব কিছু কারেক্টলি আইডেনটিফাই করে ফেললো।

একটা প্রবলেম তার বাপকে নিয়ে। কালাম মাঝির বুদ্ধিশুদ্ধি তো কম নাই। এরকম একটা মানুষ,–কুলসুমের জন্যে তার এতো টান কিসের? তাকে কিছুতেই বিশ্বাস করানো যায় না যে, মাঝিপাড়াকে তমিজ খেপাচ্ছে কুলসুমকে দিয়েই। না। কুলসুমের কোনো দোষ মানুষটা দেখতেই চায় না। কেন? এটা কি কাৎলাহার বিলের সেই জিন না ভূতের সঙ্গে তমিজের বাপের কানেকশনের ভয়ে? কুলসুমের দাদা চেরাগ আলি সেই জিনের খাস বান্দা ছিলো বলেই কি বাপ তার কুলসুমকে ঘাঁটাতে এতে ভয় পায়?

বুদ্ধি পরামর্শ বরং দিতে পারে শরাফত মণ্ডল। হাজার হলেও জমিজমা নিয়েই থাকে, জমির মতোই ধীরস্থির। মাঝিদের মতো মাছের ছটফটানি এদের থাকে না। বড়ো গেরস্থ মানুষ, বুদ্ধি একেবারে পাকা।

'হরমতুল্লার বেটির কথা কবার পারি না।' শরাফত বলে, 'কিন্তু হুরমতুল্লা তমিজেক ঘরত থাকবার দিবি, বিশ্বাস করা কঠিন। তবে তোমার দেখার কথা তো ভালো কর্যাই দেখো।'

'না। দেখবেন তো ইনি।' তহসেন আমতলির দারোগাকে দেখিয়ে দেয়, 'এলাকাটা তো আমার জুরিসডিকশনে নয়। আমি এখন ফিরে যাচ্ছি টাউনে। তেভাগার কিছু নেতা ধরা পড়েছে, আজ কোর্টে ওঠানো হবে। তো, ইনি হাজার হলেও নতুন মানুষ, আবার বাড়িও এদিকে নয়, পাবনার মানুষ। তা সার্চের সময় এলাকার একজন গণ্যমান্য লোক থাকা দরকার।'

সেই গণ্যমান্য লোকটি হওয়ার ভয়ে শরাফত মণ্ডল কাতর হলে তহসেন তাকে বাঁচায়, 'আমার বাবাকে বলেছি। তো বাবা বোধহয় একবারে হুরমতুল্লার বাড়িতেই চলে যাবেন।'

জিপ নিয়ে তহসেন টাউনে চলে যাবার পরপরই আমতলির দারোগা দুইজন কনস্টেবল নিয়ে রওয়ানা হলো নিজগিরিরডাঙার দিকে।

ভাদ্রের ভ্যাপসা গরমে নিজগিরিরডাঙার রাস্তা, কাটা পাট ও পাকা আউশের জমি, এমন কি গাছপালা থেকেও আগুনের ভিজে ভিজে হলকা আসছে। জমিতে মানুষ আউশ কাটছিলো, কোনো কোনো জমি থেকে কাটা পাট নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো খালের দিকে, গরমে কেউ কেউ দম নিচ্ছিলো আমগাছের তলায়। পুলিস দেখে খুরপি, কাস্তে নিয়ে সব ছুটতে শুরু করে। এলোমেলোভাবে দৌড়াতে গিয়ে কেউ কেউ পড়ে যায় পুলিসের একেবারে সামনে।

হুরমতুল্লাহ বসেছিলো তার পুরোনো বর্গা করা জমির আলে কুলগাছের তলায়। পাটের ফলন এবার ভালো নয়, আষাঢ়ে বর্ষণ এবার একেবারেই কম। আল্লার গজব না পড়লে এরকম কখনো হয়? আর ঝড়! জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ—এই তিন মাসে যতোবার বৃষ্টি, ততোবার ঝড়। আজ ভাদ্রের প্রায় শেষ, বৃষ্টি কোথায়? একে গরম, তাতে খন্দের এই হাল দেখে হুরমতুল্লার মাথা ঘোরে, কিছুক্ষণ পাট কাটলেই বমি বমি লাগে। সেদিন ছাইহাটার করিম ডাক্তার সাইকেলে এদিক দিয়ে যাবার সময় এক দণ্ড দাঁড়িয়েছিলো, বলে গেলো লেবু আর চিনি দিয়ে সরবত খাবে দিনে অন্তত দুইবার। দুপুরবেলাটায় তার খুব খিদে পায়, তা পান্তার সানকিতে পানিই বেশি, ভাতের দানা মনে হয় গোণা যায়। তার তখন ইচ্ছা করে, খুব ঝাল সুঁটকির ভর্তা দিয়ে দুই সানকি ভাত খায় খুব তারিয়ে তারিয়ে। এখন সুপথ্য চিনি লেবুর সরবত বা কুপথ্য ঝাল সুঁটকির ভর্তা মাখা ভাত

কিছুই না জোটায় এবং আবাদ ভালো না হওয়ায় সে বেশ মনমরা। নবিতন ছুটতে ছুটতে এসে হাঁপায় আর বলে, 'বাপজান পুলিস। বাড়িত পুলিস লাগিছে।' মনমরা হুরমতুল্লা নতুন বাছুরের মতো তিড়িং করে উঠে দাঁড়ায় এবং সোজা তাকায় দক্ষিণপূর্বে, সেদিক মণ্ডলবাড়ি। ওই বাড়িটিকেই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা বিবেচনা করে ওদিকে পালাবার জন্যে সে পা বাড়ায়। নবিতন বলে, 'বাপজান, ঘরত চলো। ঘরত পুলিস।'

বাড়ির বাইরে বেঞ্চে বসে রয়েছে আমতলির দারোগা। ঘামে ভিজে গামছায় তাকে হাওয়া করত গেলে হুরমতুল্লা দারোগার ধমক খায়, 'রাখো তোমার জামাইকে বার করে দাও।'

একটু তফাতে কালাম মাঝিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হুরমতুল্লার চোখ মুখ কুঁচকে আসে। এতে তার পুলিসের ভয়টা একটু চাপা পড়ে। এখন তার কুটুম্বিতাকেই যদি কাজে লাগানো যায় এই ভরসায় সে কালাম মাঝিকে তোয়াজ করে, 'আপনাগোরে বৌ ভালোই আছে।' কালাম মাঝি বৈবাহিক সূত্রের আত্মীয়তাকে কিছুমাত্র আমল না দিয়ে বলে, 'ভালো তো থাকারই কথা। তোমার জামাই তোমার বেটিক তো ট্যাকাপয়সা, কাপড়চোপড় সবই দিয়া যায়। ক্যাংকা কর‍্যা দেয়?'

দারোগার ইশারায় একজন কনস্টেবল ইউনিয়ন বোর্ডের চৌকিদারকে নিয়ে চলে যায় বাড়ির পেছনের ভিটায়। ফুলজানের জেদেই এবার সেখানে প্রথম আউশের আবাদ করা হয়েছে। ধানগাছগুলো গরমে ঘামে এবং ধানখেতের তাপে কনেস্টবলের গায়ে ফোস্কা পড়ার জো হলে সে বুট পায়ে খচমচ করে তার মধ্যে হাঁটে।

নবিতন নিজেই এসে কালাম মাঝিকে কদমবুসি করে এবং বলে, 'আপনে বাড়ির মধ্যে চলেন।' কালাম মাঝি তার আরজি কবুল করে এবং দারোগার দিকে তাকালে সেও তাকে ভেতরে যাওয়ার জন্যে ইশারা করে। পেছনে যায় একজন কনস্টেবল।

পুলিসদের খেতে দেওয়ার মতো ঘরে কিছুই নাই। কনস্টেবল বাড়ির ভেতরে এদিক ওদিক আসামী খোঁজে আর নবিতন ও ফুলজান তাদের আপ্যায়নের জন্যে কী দেওয়া যায় তারই খোঁজে এখানে ওখানে হাতড়ায়। বাপের ঘরের মাচার নিচে হাঁড়িপাতিলে চিড়া মুড়ি খৈ কিছু থাকতে পারে মনে হলে ফুলজান হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকে মাচার তলায়। মাটির একটা হাঁড়ি ধরে টানতেই ফুলজান চিৎকার করে ওঠে। চিকন কালো একটা সাপ মাথা তুলে তার দিকে ফণা নাচায়। ঘরে লোকজন আসতে না আসতেই দুধভাত না পেয়েও কোনো উৎপাত না করেই সাপ চলে যায় উঠানের দিকে। কালাম মাঝি লাফ দিয়ে ওঠে উঠানের ভেতর এবং কনস্টেবল বলে, 'আরে এ যে গোখরা সাপ।' দারোগা চলে আসে উঠানে, সাপটা তখন রান্না ঘরের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে বাড়ির পেছনের ভিটায়। দারোগা তার ল্যাজ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় নি। তবে পদাধিকারবলে সে রায় দেয়, 'এই সাপের জোড়া আছে। সাপ তোমরা পোষো নাকি?' সাপের ভয় কাটাতে রাগ করে হুরমতুল্লার ওপর।

এরপর ওই ঘরে দূরের কথা, উঠানেও কেউ যায় না। বাইরে গাবতলায় বেঞ্চে বসে দারোগা বাড়ির লোকজনকে ডেকে জিগ্যাসাবাদ সারে। ফুলজানের মা কোনো জবাবই দিতে পারে না। মাঝখান থেকে মুখের ওপর ঘোমটা বেশি করে টানতে গিয়ে তার শাড়ি পাছার ওপর অনেকটা ফেঁসে যায়।

ফুলজানকে জিগ্যাসা করার সময় যেচে কথা বলে কালাম মাঝি। কালাম মাঝি বলে, 'তমিজ তোমার-কাছে ট্যাকাপয়সা দিয়া যায় কখন? তখন মাঝিপাড়ার মানুষ কেটা কেটা থাকে?'

'মাঝিপাড়ার মানুষেক এই বাড়িত আসবার দিবি কেটা?'

রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে গেলেও কালাম মাঝি সামান্য একটু ঝাঁঝ মিশিয়ে জিগ্যেস করে, 'ট্যাকা আর কাপড় দেয় কেটা?'

ফুলজান ফের ফুঁসে উঠতে মুখ তুলছিলো, তার আগেই হুরমতুল্লা তাকে আটকায়, 'কাদের মিয়া দুইবার ট্যাকা দিছিলো, পুরানা পিরানও দিছে। ধরেন শরাফত মণ্ডল তো হামাগোরে একই বংশের মানুষ। হামার বিটির বিপদ দেখ্যা—'

'বুড়া, তোমার মরণের আর বাকি কতো?' কালাম মাঝি হুরমতুল্লার বয়সের দিকে ইঙ্গিত করে, 'মিছাকথাগুলা কও কোন মুখে? তোমার আখেরাতের ভয় নাই? কাদের মিয়া ট্যাকা দিলো কুটি থ্যাকা?'

কালাম মাঝি ফেরারি তমিজের সঙ্গে মণ্ডলদের যোগাযোগের কথাটা দারোগার কাছে স্পষ্ট করতে চায়। তমিজকে দিয়ে মাঝিপাড়ায় ঝামেলা করতে চাইছে এই শালার মণ্ডলের গুষ্টি। কিন্তু দারোগা কাদেরের ব্যাপারে কোনো উৎসাহই দেখায় না। কাদেরের অনুমোদন ছাড়া এই বাড়িতে আজ তার আসাই সম্ভব হতো না। দারোগা ফুলজানকে দেখায় অন্যরকম ভয়, 'তমিজকে না পেলে তোমাদের এই বাড়ি ক্রোক করা হবে, তা জানো?'

ফুলজানের ঘ্যাগের ভেতর থেকে ফোঁস করে ওঠে একটু আগে দেখা গোখরো সাপ, 'এই বাড়ি কী অর বাপের?'

'ঠিক কথা।' দারোগা একমত হয়েও অন্য যুক্তি দেখায়, 'তোমার বাপের বাড়ি। কিন্তু তোমার বাপের বাড়ি তো পাবে তোমরা কয় বোন। তোমরা হিস্যা আছে না এখানে? তোমার সম্পত্তিতে তোমার স্বামীর হিস্যা থাকবে না?'

নিজের বিষয় সম্পত্তির মালিকানার বেদখল ঠেকাতে অস্থির হয়ে ওঠে হুরমতুল্লা, 'মাঝির বেটাক জামাই কর্যা হামার সব্বোনাশ হলো গো দারোগা সাহেব।'

ছেলের জুনিয়র সহকর্মীর সামনে কালাম মাঝি উসখুস করে। তাকে উদ্ধার করে ফুলজান, 'অর আবার বাড়ির হিস্যা কী? হামি অর ভাত খাই? হামার বিটি হছে, একটা খবর লিছে? উঁই হামার কিসের সোয়ামি। অর ভাত হামি খামো না।'

'তালাক দেবে?' দারোগার প্রশ্নের জবাব দেয় হুরমতুল্লা, 'হুঁ। আপনারা তমিজেক ধরেন চাই নাই ধরেন, উঁই জেলেত থাকুক চাই ঘাটাত ঘাটাত ঘুরুক, হামি হামার বিটির তালাক লিমুই। শরাফত মিয়ার সাথেও হামার কথা হছে, তাঁইও এই কথাই কছে।'

শরাফত মণ্ডলের এরকম প্রতিপত্তি কালামের জন্যে সুখের নয়। বিরক্ত হয়ে সে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। দারোগা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'এখানে লাভ হবে না। চলেন, তমিজের বাড়িতেই চলেন। তহসেন সাহেব প্রথমে তাই যেতে বলেছিলেন।'

কালাম মাঝি রাজি হয় না, 'আরে এখন ওখানে যায়া লাভ নাই। হামার বাড়ির সাথে অর ঘর, হামি জানি না?' দারোগা তবু যাবো যাবো করতে থাকলে কালাম বলে, তমিজ আসলেও অনেক রাতে আসবার পারে। যদি যান তো একদিন আঁতকা যাওয়া লাগবি অনেক রাত হলে।'

দুপুরবেলার প্রচণ্ড গরমে দারোগার কাছে কালামের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয়। তবে যাবার তারিখ এখনি সে বলতে পারে না।

ফুলজানের একেকবার মনে হয়, তমিজের ভাত সে খাবে না। যে ভাতার মাসের পর মাস পালিয়েই থাকে, তার জন্যে আবার অত্তো আহ্লাদ কিসের? ভাত না খেলে তার কী হয়? আজই তালাক পায় তো বাপজান কালই তার নিকা দিতে পারে। হুরমতুল্লা বলে, এবার খাঁটি চাষীর ঘরের ছেলেই জোগাড় করবে।

পুলিস চলে যাবার আগেই আরো ভ্যাপসা হতে লাগলো, গরম একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলো। তারপর হঠাৎ করে মেঘ করে বৃষ্টি নামলো ঝমঝম করে। বেশিক্ষণ নয়, সন্ধ্যার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৃষ্টি থেমে গেলো। আকাশে লেগে রইলো টুকরা টুকরা মেঘ।

কাদার মধ্যে বেটিকে কোলে করে ফুলজান বেরোলো ভিটার পেছনে আউশের জমিটা দেখতে। বৃষ্টিতে ভিজে ধানগাছগুলো যেন অনেকদিনের ব্যারাম থেকে সেরে উঠেছে। কিন্তু নষ্ট ফসল কি আর ভালো হয়? ধানের শীষে শীষে রুগ্ন ক্লান্তি, তবু পানির ফোঁটা মাথায় করে তারা যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে। আহা! এখনো যদি আউশের খন্দটা ভালো হয়। এই জমিতে প্রথম আউশের আবাদ মার খাওয়ায় হরমতুল্লা রাতদিন তমিজকে বাপমা তুলে গালাগালি করে। ফুলজানের জেদেই আউশ করা হলো, ফুলজানকে তো তমিজই প্রথম বলে, ওই জমিটা আউশের জন্যে ভালো। তা কে জানে, তমিজ থাকলে ওখানে ধান ভালোই হতো হয়তো। মাঝির ঘরের মানুষ হলে কী হয়, তার লাঙল জমিকে ঠিকই বশ করে ফেলতো। অনেকদিন আগে, সে কতো বছর তমিজও জানে না, এই গিরিরডাঙায় নাকি জঙ্গল কেটে জমি তৈরি করেছিলো তমিজেরই পরদাদার পরদাদা, না-কি তারও দাদা। মুনসি তা হলে তমিজের কী?

তাদের ভিটার পেছনে আউশের জমিরও পেছনে আলের ওপরে পায়ের আঙুলে ভর করে দাঁড়ালে বাঙালি নদীর রোগা স্রোতের ওপারে পাকুড়তলায় কিসের আলো দেখা যায়। ওখানে এখন বড়ো কোনো গাছ নাই, ছোটো ছোটো ঝোপের ওপর সারি সারি আলো জ্বলে আর নেভে। মানুষ ওগুলোকে মুনসির ফেলে-যাওয়া আলো বলে ভয় পায়, আবার খুশিও হয়। ফুলজান এ নিয়ে কখনো কিছু ভাবেও না। অতো রঙ্গ করার সময় কোথায় তার? তবে এখানে দাঁড়ালে খুব গরমের মধ্যেও গা জুড়িয়ে যায়। পাকুড়তলা থেকে কি হাওয়া আসে নাকি? কিন্তু পাকুড়গাছ কোথায়? তার বেটিও ওইদিকেই তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। আকাশে ফের মেঘ জমতে থাকলে ওপারটা আন্ধারে লেপে যায়। গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করলে ফুলজান তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরে বেটিকে বুকের মধ্যে সাপটে ধরে।

৫৬

ভাদ্রের নির্মেঘ দুপুরে রোদের তাপ লাগে চড়চড় করে, মাথা ঝিমঝিম করে। কিন্তু হলে কী হয়, কুলসুমের সারা শরীর ঘিরে ফুরফুরে হাওয়া চলে তার সঙ্গে সঙ্গে। মানে কুলসুম যেদিকে যায়, তার সারা শরীরের রোমকূপে আস্তে-আস্তে ঢেউ খেলায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া। গন্ধটা কেমন চেনা চেনা লাগে, কিন্তু কোত্থেকে আসছে তা আর ঠাহর করা যায় না। তাকে তাই হাঁটতে হয় অবিরাম বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস টেনে। হালকা হালকা জর্দার গন্ধ মিশে যায় কড়া তামাকের ধোঁয়ায়। তবে এগুলো সবই আসে কিন্তু বিলের আঁশটে-গন্ধ বাতাসে সওয়ার হয়ে।

হাতের বাসন মাটিতে রেখে দরজা খুলতে গেলে পেছনে পায়ের আওয়াজ পেয়ে কুলসুম চমকে উঠলো। এই চমকাবার মধ্যে তার শরীর ঘিরে পাক-দেওয়া গন্ধের উৎস খুঁজে পাবার আশাটিও ছিলো। কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে সে দেখলো, না, সেরকম কিছু নয়। ঘরে ঢুকে সে হুড়কো লাগিয়ে দিলো।

কুলসুমের দরজার বাইরে একটি মানুষকে দেখে চমকে উঠেছিলো কালাম মাঝিও। তার চমকাবার মধ্যে ছিলো আরেক ধরনের আশা, আশার চেয়েও বেশি বিস্ময় এবং সবচেয়ে বেশি ছিলো খুশি। তা হলে তহসেন আর আমতলির দারোগার সন্দেহই

ঠিক?–তমিজ শালা নিয়মিত দেখা করতে আসে কুলসুমের সঙ্গে। রাতে কালাম তার নিজের বাড়িতে কুলসুমের থাকার ব্যবস্থা করায় তমিজ আসতে শুরু করেছে দিনের বেলা? শালা দিনেদুপুরে খুনের ফেরারি আসামি এসে দিব্যি ঘুরে যায় কালাম মাঝির বাড়ির বগল দিয়ে! শালার এতো বড়ো আস্পর্ধা। তমিজটাকে হাতেনাতে ধরতে পারলে গাঁয়ে কালাম মাঝির দাপটটা ফের প্রতিষ্ঠা করা যায়। আর তহসেনের মনটাও ফেরানো যায়। তহসেন আজকাল বাড়িতে আসেই না, এই আজ জিপগাড়ি নিয়ে গোলাবাড়ি পর্যন্ত এসে ওখান থেকেই ফিরে গেলো টাউনে। গিরিরডাঙা পর্যন্ত জিপটা নিয়ে একবার ঘুরে গেলে মাঝিগুলো অন্তত কিছুদিন ঠাণ্ডা হয়ে থাকতো। কিন্তু তহসেনের সঙ্গে কথা বলাই কালাম মাঝির পক্ষে মুশকিল। হঠাৎ করে সে হয়ে উঠেছে তার সৎমায়ের ভক্তপুত্র। এই সৎমায়ের অত্যাচার থেকে তাকে বাঁচাতে কালাম চোখের পানি মুছতে মুছতে বালক ছেলেটিকে রেখে এসেছিলো তার প্রথম পক্ষের আত্মীয়ের বাড়ি। সেখানে না দিলে তহসেন কি আজ দারাগা হতে পারে? তাই সৎমায়ের ফুসলানি শুনে সে আজকাল বাপের চুলে-দাড়িতে কলপ মাখানো নিয়ে আকারে ইঙ্গিতে যা বলে, তাতে কালাম মাঝির একেকবার ইচ্ছা করে, সমস্ত সম্পত্তি তার লিখে দেবে দ্বিতীয় পক্ষের মেয়েদের নামে। সেই মেয়েগুলোও আবার মায়ের জন্যে পাগল। শালার ভাগ্নেবৌটাও মনে হয় মামীশাশুড়ির কুটনির কাম করে। নইলে কালাম মাঝি রাতে উঠে যতোবার বুধার ঘরের বারান্দায় যায়, দেখে বুধার বৌ দাঁড়িয়ে রয়েছে কুলসুমের বিছানা ঘেঁষে। *টাউন থেকে পুরো এক টাকা দিয়ে কালাম মাঝি কিনে এনেছে কন্দর্পসঞ্জীবনীর* একটা শিশি। কাল রাতে সেটা খুঁজে পাওয়া গেলো না। এসব তার বৌ আর বুধার বৌয়ের শয়তানি। এখন ছেলেটাকে খুশি করতে পারলে এদের আটো করা কালাম মাঝির কাছে ডালভাত। আল্লাই মওকা মিলিয়ে দিলো। তমিজটাকে ধরতে পারলে আমতলির দারোগা থেকে শুরু করে করে টাউনের ছোটো দারোগা তহসেন পর্যন্ত তার বশ থাকে।

শালা ঘাঘু ডাকাত, জেল-খাটা কয়েদি শালা দুপুরবেলা এখানে হাজির হয়েছে মাথায় বাবরি সাজিয়ে আর ময়লা সবুজ লুঙি আর নিমা পরে। কুলসুমের দরজার পৈঠায় দাঁড়িয়ে ছিলো বলে কেরামত একটুখানি লম্বা হয়ে যাওয়ায় এই ঝাঁঝা রোদে তাকে ছদ্মবেশী তমিজ বলে ঠাওরানো এমন কি ঘাঘু মানুষ কালাম মাঝির পক্ষেও খুব একটা দোষের ব্যাপার নয়। নিজের পায়ের নতুন পাম্পসুর শব্দ কালাম মাঝির সর্তকতার পরোয়া করে নি। লোকটা তাই পালিয়ে গেলো পলকের মধ্যে। কালাম মঝি বুঝলো, শালা পেছন দিয়ে ঢুকেছে কুলসুমের ঘরে। না-কি পেছনের ভাঙা কাঁঠালগাছে উত্তর দিয়ে উধাও হলো পাকুড়তলার দিকে।

দরজা ছেঁকে আসে কুলসুমের গলা, *'তুমি আসিছো কখন?* ওই বাড়িত মেলা কাম *লাগিছে গো। আসার ফুরসৎ পাই না।'* তমিজ ছাড়া আর কারো *সঙ্গে কুলসুম এমন কথা* বলতে পারে? কালাম মাঝি শুনতে শুনতে এতোটাই কাঁপে যে নিজের খুশি কি রাগ কি উত্তেজনার কোনোটাই সে ঠিকমতো ঠাহর করতে পারে না।

কুলসুম ঘরে ঢুকেই নিজের নিঃশ্বাসের বেগ তীব্র করে গন্ধের উৎস খুঁজছিলো মনোযোগ দিয়ে। নিঃশ্বাসের কয়েকটা টানেই সে বার করে ফেলে তমিজের বাপকে। এক মাথা বালু নিয়ে মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে তার মাচা ঘেঁষে। তাকে ওখানে রেখে উঠানের চুলা থেকে ছাই আর তমিজের চাল-ধসা ঘরের এক কোণ থেকে বঁটি আর মাটির মালসা এনে বসে তার নিজের ঘরে। তমিজের বাপ যদি মাচায় বসে এই আশায় এবং সে যদি দরজা খুলে বাইরে চলে যায় এই ভয়ে কুলসুম বঁটি পেতে বসেছিলো দরজায় পিঠ দিয়ে। মটকায় চাপা দেওয়া মাটির সরা তুলে নিতেই শিঙি মাছগুলো ভয়ে

কি খুশিতে ওইটুকু পানিতে নানারকম খেল দেখায়। তাদের কোলাহলে মটকা থেকে ছলকে ওঠে আঁশটে সুবাস। মটকার ওপর সরা না থাকায় ফোঁটা ফোঁটা পানির ঝাপটা লাগে। কুলসুমের চোখেমুখে ভারী আরাম!

কালাম মাঝি তার মাছ কোটা কিংবা তার লম্বাটে মুখে আঁশটে পানির ঝাপটা কিছুই দেখতে পায় না, কিন্তু তার কথা শুনতে পায় সবই। কুলসুম জবাব দেয় যেন কার কথার, 'না গো, ধান ভানার এখনি কী? তার বেটার টাউনের বাসাত চাউল পাঠান লাগবি? আবার তহসেনের মাও কয়, ছুঁড়ি, তুই এ্যানা সর্যা থাকিস। কও তো, হামাক সর্যা থাকা লাগবি কিসক? বুড়া হামার মাথা খায়া ফালাবি?'

কুলসুমের কথা তো সবই শোনা যায়, কিন্তু তমিজের গলা কোথায়?

কিন্তু কুলসুমের পরের কথাগুলো কালাম মাঝির মাথাটা এলামেলো করে দেয়, 'তমিজ কুটি গেছে কচ্ছো?—ভালো কর্যা কও। মর্যাও তোমার কথা আবোরের লাকান থ্যাকা গেলো?—খিয়ারেত গেছে? তোমার বেটার বাপু মাথা খারাপ। মনে নাই? তখন একেবারে চ্যাংড়া মানুষ, খালি দৌড়াচ্ছিলো খিয়ার মুখে। মনে নাই?'

কালাম মাঝির বুক টিপটিপ করে, ঘরের ভেতর কুলসুমের সঙ্গী কি তবে তমিজ নয়? তা হলে কে? কেরামত নয় তো? ওই শালা না খিয়ারে চাষাদের জোটের সাথে গান বাঁধতো। এখন আবার তমিজের খবর নিয়ে কুলসুমকে দেয় নাকি? কিন্তু হাটেবাজারে গলা ফাটিয়ে গান করা কেরামতের কথা এখানে শোনা যায় না কেন?

কুলসুমের পরের প্রসঙ্গটি নতুন, 'উদিনকা বুধাও কচ্ছিলো, তমিজ বলে কুটি গেছে চাষাগোরে সাথে জোট বান্দিবার। খালি হুজ্জত,খালি হুজ্জত। হুজ্জতের মধ্যে থাকবার না পালে তোমার বেটার প্যাটের ভাত হজম হয় না। তা তার বৌবেটি নাই? বৌবেটিক ভাত দেওয়া লাগে না? হামি না হয় ফকিরের বেটি, বানের সাথে ভ্যাসা আসিছি। বৌবেটি? বৌ ভাত না পালে দেখো, ঐ ঘেগি মাগী আবার কার সাথে লিকা বসে।'

কালাম মাঝির কান শিরশির করে। ঘরের মধ্যে লোকটি তবে কে? একবার ভাবে ফিরে যাই। সঙ্গে সঙ্গে সে বল সঞ্চয় করে, না তমিজের খবর জানতে হলে এক্ষুনি ঘরে ঢোকা দরকার। লোকটা যে-ই হোক তমিজের সঙ্গে তার সাঁট আছে। আবার কুলসুমের গলার মিহি আওয়াজ একটু মুশকিলেও ফেলে। মেয়েটির এই রিনিঝিনি বোল তার কানে ঢুকে গোটা শরীরে মোলায়েম মালিশ করে দিচ্ছে, দরজার কপাট থেকে কান সরিয়ে নেওয়া তার জন্যে বড়োই কঠিন।

কিন্তু আসামির হদিস করার কর্তব্যবোধ তাকে কুলসুমের কথার গুড়ে সেঁটে থাকতে দেয় কী করে?

নতুন পাম্পশুজোড়া আস্তে করে খুলে, হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে পেছন দিক দিয়ে তমিজের ভাঙা ঘর পেরিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো রোঁদে-ভাসা উঠানের ওপর। কুলসুমের ঘরের ঝাঁপ খোলা। পা দুটো টিপে টিপে ভেতরে ঢুকে ঘরে অনধিকার প্রবেশকারী আসামিকে কীভাবে এক ঝটকায় ফেলে তাকে জাপটে ধরবে কালাম মাঝি সেই ফন্দি আঁটে। সঙ্গে তার অস্ত্র নাই, জুতোজোড়া রেখে দিয়েছে উঠানের কোণে। ভরসা শুধু এই হাত দুটি।

ঘরের ভেতরটা আবছা অন্ধকার, কুলসুমের মুখে পড়েছে উঠানের রোদের আলো। মেয়েটা মাছ কোটে আর কথা কয় আর মাঝে মাঝে একটু ওপরে তাকিয়ে ঘরের অন্য বাসিন্দাটির কথা শোনে, ফের কথা বলে। সেই মানুষটির কী কথা শুনে কুলসুম ফের মাছ কাটায় মন দেয় আর বলে, 'থাকো। মাছ দিয়া ভাত খায়া যায়ো। কেরামত মিয়া কয়টা কানচ মাছ দিয়া গেছে।' ফের কী শুনে আফসোস করে, 'তুমি, তুমি মাছও খাবার পারো না? আহারে, কাৎলাহার বিলের সিথানত থাকো, মাছ মুখোত দিবার পারো না? তুমি খাও তো! পাকুড়গাছ বলে ক্যাটা ফালাছে, মুনসি আর দেখবি কুটি থ্যাকা? খাও, কেটা দেখিচ্ছে?'

কালাম মাঝির শরীর কাঁপে। লোকটি তবে কে? নিজের ভয় সারাতেই সে মনে করে আমতলির দারোগা আর তহসেনের কথা, নবাবগঞ্জ না নাচোল না ঠাকুরগাঁয়ে পুলিসের প্যাঁদানি খেয়ে তেভাগার লোকজন সব ছড়িয়ে পড়েছে এদিক ওদিক। তাদেরই কেউ কেউ হয়তো লুকিয়ে রয়েছে বিলের উত্তর সিথানে ঝোপে জঙ্গলে। কিন্তু সেখানে তো মণ্ডলের ইঁটখোলা। বড়ো গাছ আর কোথায়? তা হলে কি ইঁটখোলাতেই মিস্ত্রি সেজে লুকিয়ে রয়েছে তারা? এই আসামিকে ধরে আজই কালাম মাঝি যাবে শরাফত মণ্ডলের বাড়ি। তহসেন আসলে ঠিকই বলে, গাঁয়ে দাপট নিয়ে থাকতে হলে মণ্ডলের সঙ্গে বিবাদ না করে বরং খাতির রাখা ভালো। আসামিকে আরো ভালোভাবে সনাক্ত করার জন্যে কালাম মাঝি আরেকটু ধৈর্য ধরে। কিন্তু কুলসুমের মুখে 'ও! মরার পরে ভাত মাছ গোশতো কিছুই খাওয়া হয় না? খালে গোর আজাব বাড়ে? আজাব হবি আবার খাবার পারবা না? মরা মানুষে মাছ খালে কী দোষ হবি গো?' শুনে কালাম মাঝির গা এমনি ছমছম করে ওঠে যে মেঝেতে নিজের পড়ে-যাওয়া ঠেকাতে বেটার বুলি ধার করে তাকে চিৎকার করতে হয়, 'হ্যান্ডস আপ!' তার গলা-ফাটানো হুংকারে দিশাহারা কুলসুম মুখ তুলে সামনে দেখতে পায় কালাম মাঝিকে। তার জবান বন্ধ হয়ে যায়, ছাইমাখা মাছকাটা হাত উঠে আসে বঁটির ওপর থেকে। এমন কি, বয়সে অনেক বড়ো মানুষটাকে দেখে মাথার ওপর কাপড় তোলার কথাও তার খেয়াল থাকে না। আর কালাম মাঝির মুখে পুলিসের ইংরেজি কথা দুটির মানে জানে না বলে নির্দেশটি পালন করাও তার পক্ষে সম্ভব হয় না।

কুলসুমের শেষ কয়টি কথা শোনার পর একটি জ্যান্ত মানুষ দেখতে কালাম মাঝি অস্থির হয়ে উঠেছে, হয়তো এই কারণেই সে ছাড়ে তার দ্বিতীয় হুঙ্কার, 'মানুষ কুটি? কথা কচ্ছিলু কার সাথে? কুটি?'

ঘরের চারদিকে সে দেখে। মাচার ওপর জিনিসপত্র যেভাবে রাখা তাতে আস্ত একটা মানুষ সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারে না।—এই কাণ্ডজ্ঞানে সমৃদ্ধ কালাম কাঁপাকাঁপা হাতে মাচার ওপরটা কোনোমতে হাত বোলাতে বোলাতে ফের সত্যি সত্যি কেউ বসে থাকে ওখানে এই ভয়ে ধপাস করে বসে পড়ে মাটিতে এবং কুলসুমের নিশ্বাসের নিরাপদ দূরত্বে বসে হাতড়াতে থাকে মাচার নিচে। সেখানে রাজ্যের জিনিস। তুষের বস্তা, কালাম মাঝির বাড়ি থেকে হাতানো কাচের একটা প্লেট আর একটা বসবার টুল আরো সব হাবিজাবি। মাচার নিচে হামাগুড়ি দিয়েও কালাম মাঝি কোনো মানুষ দেখতে পায় না। মাচার তলা থেকে মাথা বার করে পাছা ঘষটে কুলসুমের আর একটু কাছে বসে মোলায়েম গলায় সে বলে, 'কুটি গেলো? কথা কচ্ছিলু তুই কার সাথে রে?'

কালাম মাঝির তৎপরতা ও কথাবার্তায় কুলসুমের টাসকা লাগাটা একটু কাটে, তার চোখে লোকটার চেহারা স্পষ্ট হয়। তার বড়ো বড়ো চোখের পানসে লাল আলোয় কালাম মাঝির স্বর আরেকটু নামে, 'আরে তোর কী? তুই তো আর ডাকাতির আসামি লোস। খালি ক, তোর ঘরত তুই কার সাথে কথা কচ্ছিলু। মানুষটা পলালো কোনদিক দিয়া?'

কুলসুমের হাতে শিঙি মাছের রক্ত শুকিয়ে চটচট করে। কালাম মাঝির আরেকবার 'তোর ঘরত কেটা রে?' প্রশ্নসূচক নির্দেশের জবাবে চোখ তুলে সে চোখের ইশারা করে মাচার পাশের জায়গাটিতে এবং শুকনা গলায় বিড়বিড় করে, 'তমিজের বাপ।'

কুলসুমের চোখের ইশারা কিংবা তার শুকনা খরখরে গলা অথবা দুটোতেই কালাম মাঝির শরীর কেঁপে কেঁপে ওঠে। এর সঙ্গে একটু আগে কুলসুমের মোলায়েম স্বরের কথা শুনে তার গায়ে মোলায়েম ছোঁয়ার কোনো মিল নাই। তমিজের বাপ কি সত্যি এসে পড়েছে নাকি? মানুষটা তো আচ্ছা নেমকহারাম গো! চোরাবালিতে প্রতি জুম্মার পর তার গোর জিয়ারত করাচ্ছে কালাম মাঝি, কুদ্দুস মৌলবিকে দিয়ে কোরান খতম করিয়ে তার

নামে বকশা করে দেওয়া হয়েছে কয়েকবার। এর পরেও সে শান্তি পায় না? দুনিয়ার টান তার যায় না? কুলসুমের উঁচু বুক আর লম্বাটে মুখ নিজের চোখ দুটো ভরে দেখার চেষ্টা তার ব্যর্থ হলে কালাম মাঝি বলে, 'কলেই হলো? মুনসিই বলে ভাগিছে পাকুড়গাছ লিয়া, তমিজের বাপ আসবি কার ঘাড়োত চড়্যা?'—নিজের ঠাট্টাবিদ্রূপে সে নিজেই ভয় পায় এবং এই ভয় কাটাতে ফের বলে, 'ওই যে বৈকুণ্ঠ, শালা মালাউনের বাচ্চা, ওটাও তার পাছ ধরিছে নাকি?'—এমনিতে শরিয়ত মোতাবেক দাফন না-হওয়া মুসলমানের বেচইন রুহ্, এর ওপর খুন-হওয়া হিন্দুর অতৃপ্ত প্রেতাত্মার কথা বলে কালাম এই ঘরে ছায়া ঘনিয়ে তোলে; সে আটকায় আরো প্যাঁচের মধ্যে : এই ঘরে সে কি বসে রয়েছে রুহ্ আর প্রেতাত্মার মধ্যে? মরার পরেও শালাদের জোট ভাঙে না? আর কুলসুম কি এদের বাঁদি? নাকি সে হলো এদের সর্দারনি?—না তাকে তারা দুনিয়ায় তাদের খলিফা নিযুক্ত করেছে? তাদের বাঁদি, সর্দারনি আর খলিফা যাই হোক, এইসব ভূত পেতের মধ্যে একমাত্র মানুষ হলো কুলসুম। কুলসুম ছাড়া কালাম মাঝিকে এখন ঠাঁই দেবে কে? আর কে আছে?—কালাম ঠিক বুঝতে পারে নি, কখন পাছা ঘষটে এসে পড়েছে কুলসুমের গায়ের কাছে, তার বঁটি ঘেঁষে।

কুলসুম হঠাৎ বলে ওঠে, 'আপনে এটি কাক উটকান? তমিজ তো গাঁও ছাড়িছে আর বছর। উঁই কি আর এই মুল্লুকেত আছে?'

এই সময় বাইরে ভ্যা ভ্যা করে ডেকে ওঠে একটা ছাগল, দুজন মানুষ কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছে ডোবার ওপারের রাস্তা দিয়ে। জীবিত জানোয়ার ও মানুষের আওয়াজে কালাম বল পায়, ওই আওয়াজের ভেলায় চড়ে বসতে তার জানটা আকুলিবিকুলি করে। কুলসুম বোধহয় ভয় পাচ্ছে তাকে, ব্যাকুল হয়ে মেয়েটা বারবার তাকাচ্ছে মাচার দিকে। ওদিকে ছাগল ও মানুষের গলার স্বর দূরে মিলিয়ে গেলে বিজলির ধমকে-ঝলসানো ঘনঘোট আন্ধারের মতো ঘরের নীরবতা বাড়ে একশোগুণ, কালামের ভয় বাড়ে তার চেয়েও বেশি, একশো হাজার গুণও হতে পারে। 'আল্লা গো, মা গো' বলে সে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করে কুলসুমকেই।

কালাম মাঝির ধাক্কায়, বরং বলা যায় তার ভারে কুলসুম মাটিতে গড়িয়ে পড়তে পড়তে হাত দিয়ে ঠেলে দেয় বঁটিটাকে। শিঙি মাছের রক্ত ও নাড়িভুঁড়িমাখা বঁটি পড়ে থাকে মাচার দ্বিতীয় খুঁটির গা ঘেঁষে। চিৎ হয়ে পড়ে গেলে দরজার বন্ধ কপাটে মাথা ঠেকে কুলসুমের, মাচার দিকে তাকিয়ে সে নালিশ করে, 'দেখো তো, মানুষটা হামার সাথে কী করিচ্ছে? খাড়া হয়া তুমি কী দেখো?' এবার কুলসুমকে জড়িয়ে না ধরে কালামের আর কোনো উপায়ই থাকে না। আলগা করে ধরেও তার ছমছমে ভাবটা কিন্তু একটু কাটে। এখন একে জাপটে ধরতে পালেই জ্যান্ত ও মরা মানুষের নজর থেকে, তাদের থাবা থেকে কালাম বাঁচে। কুলসুম অবিরাম কিল মারতে শুরু করে তার বুকে, পেটে, এমন কি চিবুকে পর্যন্ত। কুলসুমের হাতের ঘায়ে এতো জোর কি আর থাকতে পারে? মরিয়া হয়ে কালাম উপুড় হয়ে ধরে ফেলে কুলসুমের দুই বাহুমূল এবং চটকা মেরে উঠে বসে তার বুকের ও পেটের মাঝামাঝি। কুলসুম ফের নালিশ করে সামনের দিকে তাকিয়ে, 'তুমি খালি খাড়া হয়া থাকবা? দেখো না হামাক কী করিচ্ছে! এই মানুষটাক তুমি আটো করবার পারো না?'

কালাম মাঝি পেছনদিকে না তাকিয়েও শুকনা গলায় বলে, 'তমিজের বাপ, তোমার নামে হামি মিলাদ দিমু, তোমার নামে দোয়া পড়ায়া হাজার মানষেক খিলামু। তুমি মানষের মধ্যে আরো আসো না। তোমার রুহের মাগফেরাত চায়া গাঁয়ের ব্যামাক–' তমিজের বাপের প্রতি এই মিনতিতে কাজ হয় না। বরং কালাম মাঝির পিঠে পড়তে থাকে একটির পর একটি লাথি, মরা মানুষের পা ছাড়া এমন আবছা আবছা লাথি আর কে দিতে পারে?

ওদিকে কালাম মাঝিকে দেখেই কেরামত আলি তার বাবরি চুল, ময়লা বেনিয়ান ও সবুজ লুঙি নিয়ে বিজলির মতো ছিটকে গিয়েছিলো তমিজের বাপের ঘরের পেছনে ভাঙা কাঁঠালগাছের দক্ষিণে, সেখানে শরাফত মণ্ডলের বর্গাচাষা শমশের মরিচের জমি তৈরি করে। শমশের তখন জমিতে নাই, কেরামত দাঁড়িয়ে হাঁপায় । অস্থির হয়ে ভাঙা কাঁঠালগাছের পাশে এসে শুনতে পায় কালাম মাঝি আর কুলসুমের কথা, কালাম মাঝি মনে হয় কুলসুমের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে। এখন কেরামত করেটা কী? কালাম মাঝি হলো তার অন্নদাতা, কালামের বাড়িতেই সে থাকে। কুলসুমের সঙ্গে তার নিকা দেওয়ার ইংগিতও তো দিয়েছিলো কালামই। এখন অবশ্য সে কথা সে তোলেই না, বরং কুলসুমের সঙ্গে তাকে কথা বলতে দেখলে ভুরু কোঁচকায়। যতোই হোক, কালাম মাঝির ওপরেই তাকে চলতে হবে, তার রেজেক বলো রোজগার বলো সবই কালাম মাঝির হাতে। এই নিশ্চিত রোজগারটি না থাকলে তার গান লেখাও আর কখনো হবে না। গোলাবাড়ি হাটে মুকুন্দ সাহার দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একহাট মানুষের সামনে কেরামত যে গান করেছিলো, সেটা কালাম মাঝির তাগাদা ছাড়া কি হতো পারতো? এখন কুলসুমকে তার হাত থেকে বাঁচাতে যাওয়া মানে ওই মানুষটার সঙ্গে নেমকহারামি করা।—কেরামত কী করে?—ভাঙা কাঁঠালগাছের নিচে সে বসলো পেচ্ছাব করতে। বেগ ছিলো না, পেচ্ছাব তেমন হলোও না। এখন পেচ্ছাব করার পর তার আরো কোনো কিছুই করার নাই। তার পেচ্ছাবের ফেনার বুদবুদ সব মিশে যায় আর কেরামতের বাবরি চুলের নিচে লাগে কুলসুমের বড়ো বড়ো নিশ্বাসের ঝাপটা, গরম হাওয়ায় তার চুল ওড়ে। কেরামতকে কুলসুম দেখতে পাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু আড়ালে থাকলেও তার নিঃশ্বাসে কেরামতের এখানে এই কাঁঠালগাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা সে ঠিকই কিন্তু ঠাহর করতে পাচ্ছে। এক্ষুনি তার ঘরে ঢোকাটা খুব জরুরি। কুলসুমের একটা কাজে যদি সে আসে তো মেয়েটা তাকে কি আর ফিরিয়ে দিতে পারবে?

ভাঙাচোরা বাড়ির পেছন দিয়ে হুবহু কালাম মাঝির পথ ধরেই সে পৌঁছে গেলো কুলসুমের ঘরে। ঝাঁপতোলা ঘরের ভেতর ঢুকলে কেরামতের নজর আটকে যায় ঘাম চপচপ সাদা রঙের পাঞ্জাবিপরা পিঠের ওপর। কালাম মাঝি উপুড় হয়ে বসেছে কুলসুমের বুকের ওপর। সে কি তাকে চুমু খাবার চেষ্টা করছে? তার পিঠে পড়ছে কুলসুমের অবিরাম লাথি। ওই লাথি কি শালা মাঝির পিঠকে কাবু করতে পারে? না, মাঝির বেটা সুখই পাচ্ছে।

কুলসুম গলায় জোর খাটিয়ে বলে, 'খাড়া হয়া থাকো কিসক?' কিন্তু কালাম মাঝির ভারি ভারি হাত দুটোর নিচে চাপা পড়েছে কুলসুমের মুখ। কেরামত বুঝতে পারে, কুলসুম তো তাকেই ডাকছে, কালাম মাঝির হাত থেকে বাঁচাতে কুলসুম তারই সাহায্য চায়। কালাম মাঝি বলছে, 'কুলসুম, তুই হামাক মাফ কর। তুই হামার চাচি, হামি তোর নামে এই ঘর লেখ্যা দিমু, সম্পত্তি চাস তো আরো দিমু। তুই তমিজের বাপোক এটি থ্যাকা যাবার ক। হামি ভালো কর্যা দোয়াদরুদ পড়ায়া দিমু, তাক তুই যাবার ক।'

পাকুড়তলার ভয়ে তার শরীরের বল অনেকটা ক্ষয় হওয়ায় কিংবা তমিজের বাপকে এক্ষুনি চলে যেতে বলার জন্যে সুযোগ দিতেও হতে পারে, কুলসুমের মুখের ওপর চাপা দেওয়া হাত তার একটু শিথিল হয়ে গিয়েছিলো। সেই সুযোগ কুলসুমের কথা বেরিয়ে আসে তার খুব দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে, 'হামাক ম্যারা ফালালো গো। তুমি আবোরের লাকান ওটি খাড়া হয়া থাকো কিসক? তুমি, তুমি—।'

তাকে দেখতে পাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু কুলসুম ভরসা করছে তারই ওপর। তার 'তুমি তুমি' কেরামতকে খুশিতে, কষ্টে, গ্লানিতে, গৌরবে, উত্তেজনায়, উস্কানিতে, এমনকি বলা যায় না, হয়তো প্রেরণাতেও এমনি বলকাতে শুরু করে যে শরীরের সমস্ত বল দিয়ে

সে দুই হাতে ধাক্কা দেয় কালাম মাঝির পিঠে। তারপর ওই হাতজোড়া দিয়েই টেনে ধরে কালাম মাঝির গলা। তমিজের বাপ এবার কুলসুমের ডাকে সাড়া দিয়েছে কালামও তাই বুঝতে পেরে নিজের গলা থেকে বুক পর্যন্ত চেপে ধরে কুলসুমের মুখের ওপর। কুলসুমের নাকমুখ এমনভাবে চেপে ধরেছে যে তার পক্ষে কাউকে ডাকা দূরের কথা, নিশ্বাস নেওয়া পর্যন্ত অসম্ভব। কুলসুমের ডাক কেরামত আরেকবার, অন্তত আর একবার শুনতে চায়। সুতরাং উপুড় হয়ে কালাম মাঝির ঘাড়ের ওপর দিয়ে হাত ডিঙিয়ে তমিজের বাপের মাচার দ্বিতীয় খুঁটির পাশ থেকে টেনে নেয় শিঙি মাছের রক্তমাখা বঁটি। বঁটির ধাক্কায় মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে জ্যান্ত শিঙিওয়ালা পানিভরা মটকা। পানিতে ভিজে যায় কুলসুমের চুল। মাটিতে কিলবিল করে তিনটে শিঙি মাছ। কুলসুমের চুলে গড়ানো আঁশটে গন্ধের পানিকে একটি শিঙি ঠাওরায় কাৎলাহার বিলের অংশ বলে এবং বোকার মতো ঢুকে পড়ে সেই কেশরাশির ভেতর। সেটা কালাম মাঝির নজরে পড়লে তার বুক কাঁপে আরেক পশলা : এটা কি শিঙিমাছ? না-কি আজকেই হুরমতুল্লার ঘরে দেখা সেই গোখরোটা? কিংবা তার জোড়া? কাৎলাহার বিলের এপারে ওপারে সব জীবের মতো এটাও তো মুনসির শাসনেই থাকে। মুনসিই কি এটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে তমিজের বাপের খেদমতে। তারপর পুরো বিলে ডুবসাঁতার দিয়ে শালার সাপ এসে হাজির হয়েছে কালাম মাঝিকে কাটতে। তমিজের বাপ, বৈকুণ্ঠ, সেই কোন আমলের মুনসি, চেরাগ আলি ফকির, এদের সঙ্গে এসে জুটলো হুরমতুল্লার বাড়ির গোখরোটা। কাৎলাহারের সব মরা জীবের ভয়ে, তাদের সহকর্মী এই গোখরা সাপের ভয়ে কালাম মাঝি আরো জোরে চেপে ধরে কুলসুমের মুখ। সেখানে কোনো স্পন্দন নাই। মেয়েটা কি মরে গেলো নাকি? তা হলে? কুলসুমও যদি মরে তো এই ঘরভরা মড়াকে সে একা ঠেকাবে কী করে? আবার মাটি থেকে বঁটিটা চলে গেলো কার হাতে? তমিজের বাপের হাতে এখন হাতিয়ার, কালাম মাঝির এবার সব শেষ।

তবে পলকের ভেতর কালাম মাঝির কাণ্ডজ্ঞান ফিরে আসে, তার মনে পড়ে, লোহার কোনো কিছু কাৎলাহারের তেনাদের সাধ্যের বাইরে। তা হলে এই বঁটি তুলে নিয়েছে নির্ঘাৎ তমিজ। তমিজ না হলেও তার ওইসব জোট-বাঁধা চাষাদেরই কেউ হবে। সতর্ক হয়ে কালাম একটু ঘাড় সরিয়ে নিতেই বঁটির একটা কোপ পড়ে তার ডান হাতের কনুইতে। দ্বিতীয় কোপটি পড়ার আগেই সে ছিটকে সরে পড়ে অনেকটা বাঁয়ে। বঁটির এই কোপটি পড়ে কুলসুমের বাম স্তনের মাঝখানে। সেখান থেকে এবং কালামের কনুই থেকে রক্ত ঝরতে থাকে গলগল করে। দুজনের রক্ত গড়ায় মেঝেতে, বঁটিতে শিঙি মাছের শুকনা রক্ত এই দুজনের টাটকা রক্তে জেগে ওঠে লাল রঙে।

কুলসুমের গলা থেকে ঘর্ঘর শব্দ বেরুচ্ছিলো কালাম যখন তার মুখ ঠেসে ধরে তখন থেকেই। এখন তার স্তনের ওপর বঁটির ঘা পড়লে ফের আঁ আঁ করে কাৎরায়।

কালাম মাঝি ততোক্ষণে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কনুইতে তার জখম বেশ মারাত্মক। অন্য হাতে সেই হাত চেপে ধরে কেরামতের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথমে তাকে চিনতে পারে না। কেরামত তাকিয়েছিলো কুলসুমের মুখের দিকে। তার হাতে বঁটি তখনো ঝুলছে। কয়েক পলকের জন্যে তার চোখে কুলসুমের মুখে গোলাপি আভা দেখতে পায়, টাউনের রিফিউজি ক্যাম্পে দেখা ঐ রিফিউজি মেয়েটির কোন স্তনটি যেন কাটা ছিলো? বাকি স্তনটা কি কাটা পড়লো কেরামতের হাতে?

কেরামতকে কেরামত বলে চিনতে পেরে দারুণ অবাক হতে হতেও যন্ত্রণা, দুঃখ ও ভয়ের মাত্রাছাড়া চাপে কালাম মাঝি কোনো কথাই বলতে পারে না। তারপর সে অবশ্য খানিকটা সামলে নেয় এবং কুলসুমকে ডিঙিয়ে দরজার হুড়কো খুলে ছুটতে ছুটতে বলে 'খুন খুন!' কিন্তু গলায় তার জোর নাই।

কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামে ঝমঝম করে। খবর পেয়ে টমটম নিয়ে তহসেনউদ্দিন আসে টাউন থেকে। বাপকে নিয়ে সে চলে যায় টাউনে; হরেন ডাক্তার বলো আর করিম ডাক্তার বলো—এদের কারো ওপরেই তহসেনের ভরসা নাই। বুধাকে সে কড়া হুকুম দিয়ে যায়, আমতলি থেকে পুলিস না আসা পর্যন্ত লাশ যেখানে যেভাবে ছিলো তেমনি থাকবে। কেরামতকে আচ্ছা করে বেঁধে রাখা হলো কালাম মাঝির খানকা ঘরে।

মাঝিপাড়ার মানুষ অনেকদিন পর একেবারে ভেঙে পড়ে কালাম মাঝির বাড়িতে। তমিজের বাপের মতো মানুষ, যে কি-না ঘরসংসার তুচ্ছ করে চেরাগ আলির পাছে পাছে ঘুরলো সারাটা জেবন, তামাম এলাকার মুরুব্বি মুনসিকে এক নজর দেখতে গিয়ে তার আরস খুঁজে না পাওয়ার কষ্টে ঢুকে পড়লো চোরাবালির মধ্যে, এ্যাঁ, তারই বৌ এবং চেরাগ আলি ফকির, মুনসির খাস খলিফা, যে কি-না সারা জেবন খালি শোলোকে শোলোকে মুনসির শাস্তরই গেয়ে গেলো, তার সাক্ষাৎ নাতনিকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে গিয়ে জখম হয়েছে কালাম মাঝি। কালাম মাঝির দুঃখে লোকজন ভেঙে পড়ে। এমন কি, তার বিলডাকাতির মামলায় এখনো হাজতখাটা মাঝিদের আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত কালাম মাঝির ডান কনুইটা ডান হাতেই ঠিকমতো জোড়া লাগাবার জন্যে কুদ্দুস মৌলবির নেতৃত্বে আল্লার দরবারে কান্নাকাটি করে। চাষীপাড়ার মানুষ আসে, পালপাড়া থেকে আসে কেষ্ট পাল তার ভাই আর ভাইপোকে নিয়ে। শরাফত মণ্ডল আর কাদের একবার ঘুরে গিয়ে বাড়ি থেকে হ্যাজাক পাঠিয়ে দেয়।

আমতলি থেকে পুলিস আসতে আসতে পরদিন বেলা এগারোটা। তমিজের বাপের ঘর এবং ঘরের বাসিন্দা বৃষ্টির পানিতে ভিজে একসা। মাচার ওপর এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে তলার দিকে একটা শুকনা কাঁথা পাওয়া যায়। লাল নীল সবুজ ও হলুদ সুতাতে চারদিকে বরফি তোলা কাঁথার মাঝখানে অনেকগুলি চাঁদ এবং একেকটা চাঁদ পিছু তিনটে করে তারা। সেই কাঁথায় জড়িয়ে কুলসুমের লাশ ফের মোড়ানো হয় বাঁশের চাটাইতে। চাটাই জড়ানো লাশ বাঁশে ঝুলিয়ে কাঁধে তুলে নিয়েছে মাঝিপাড়ার দুজন তাগড়া জোয়ান। লাশের আগে পুলিস, পিছে পুলিস। পেছনের পুলিসের হাতে ধরা কেরামতের কোমরে দড়ি। তার হাতেও হ্যান্ডকাপ পরানো।

রাতভর মাঝিপাড়ার আবালবৃদ্ধের হাতে কিলচড়লাথি খেয়ে সে খুব দুর্বল। তার ঢুলঢুলু চোখে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে বাঁশের চাটাই থেকে বেরিয়ে-পড়া কুলসুমের পায়ের পাতা। সারারাত বৃষ্টিতে ভিজে পায়ের পাতাজোড়া ফ্যাকাশে, একটু ফোলা ফোলা। কাঁথার চাঁদতারা লুটিয়ে পড়েও সেখানে একটু আলো ফেলতে পারে না। কেরামতের মাথা এখন ভারী, তার মাথার ধারে কাছেও কোনো শোলোক নাই। কিন্তু কে বলতে পারে, জেল খাটতে খাটতে কিংবা ফাঁসির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আরো সব চোর ডাকাত আর জোট-বাঁধার-দায়ে-কয়েদখাটা উত্তরের চাষাদের সঙ্গে বসে কেরামত তার ওই শোলোকটায় আরো কথা জুড়বে না? শোলোকটা প্রথম থেকে বললে হয়তো শোনাবে এরকম :

> কদাপিও রূপ যদি দেখে থাকি কোথা।
> খোয়াবে ও মুখখানি নাহিক অন্যথা॥
> মুনসির আরস নাই পাকুড়ের তলে।
> বিধি মাঝি হাঁকে রূপ ভেসে যায় জলে॥

কয়েদখাটা কোনো চোর কি ডাকাত কি জোটবাঁধা চাষাদের কেউ হয়তো জানতে চাইবে, 'এই শোলোক তুমি কুটি পাঁছো গো?'

'হামার লিজের বান্দা শোলোক। শোলোক হামি লিজে বান্দি।'—কেরামত আলি কি তখন এই জবাব দিতে পারবে? পাকুড়গাছশূন্য পাকুড়তলা কি তার বুকে ছমছম করবে না?

তবে আজ কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে পাকুড়গাছশূন্য পাকুড়তলা দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় ছমছম করার মতো জায়গা কি ফুরসৎ ফুলজানের বুকে হয় না, সেখানে তার বেটির মুখ লাগানো।

সকালে ফুলজান সৎশাশুড়ির লাশ দেখতে মাঝিপাড়ায় যেতে চাইলে হুরমতুল্লা খুব না করছিলো : এইসব খুনখারাবির ব্যাপারে গেলেই ঝামেলা। পরে শরাফত মণ্ডল ও আবদুল কাদের পুলিসের দেখাশোনা করছে খবর পেয়ে তার সাহস হয় এবং একটু ভয়ে ভয়ে হলেও বেটিকে নিয়ে হাজির হয় কালাম মাঝির মানুষ গিজগিজ-করা বাড়িতে। ততোক্ষণে লাশ জড়ানো হয়ে গেছে বাঁশের চাটাইতে। শরাফতের বাড়ি থেকে ভাত ও মুরগির গোশতের তরকারি নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি কাজে হুরমতুল্লাহ হাত লাগায়। লাশ নিয়ে পুলিস রওয়ানা হলে সে মণ্ডলবাড়ি গিয়ে চারটে ভাতও খায়।

ফুলজান অনেক দূর থেকে লাশ ও কেরামতের পিছে পিছে গিয়েছিলো। তারপর বাঁদিকে ইঁটখোলা দিয়ে সে ধরে বাড়ির রাস্তা। বাঙালি নদীর রোগা স্রোতের ওপর বাঁশের সাঁকোটা কাল রাতের ঝড়ে ভেঙে গেছে। স্রোতে পানি বেড়েছে অনেকটা। এটা পেরোতে ফুলজানের কাপড় তুলতে হয় প্রায় উরুর ওপর। বাঙালি নদীর রোগা স্রোতে কেরামতের মার-খাওয়া মুখ ভেঙে ভেঙে যায়। এদিকে বুকের দুধ না পেয়ে কোলের বেটিকে কান্না থামাতে এবং ওদিকে কাল রাতে ফের বৃষ্টির পর ভিটার পেছনে আউশের জমিতে ধানশীষগুলো দেখার তাগিদে কদমে বাদাম না খাটিয়ে নিয়ে তার আর উপায় নাই।

৫৭

শান্তাহারের ট্রেন ছোটে। খিয়ারের মানুষ সবাই মাঠে নেমে গেছে। মেঘলা আকাশের নিচে বৃষ্টি-ভেজা মাটি আর কিছু না হোক ছানতেও সুখ। স্টেশনে স্টেশনে গাড়ি থামে, লোকাল ট্রেন, স্টেশন না পেলেও মাঝে মাঝে থেমে জিরিয়ে নেয়। লোক নামে, ওঠে। তমিজ নতুন যাত্রীদের হাতের দিকে দেখে, মাটির দাগ দেখলে তার হিংসা হয়।

শান্তাহারে গিজগিজ করে মানুষ। হিলির গাড়ি কোনটা কিংবা জয়পুর যাবে কোন গাড়িতে উঠে পাঁচজনকে জিগ্যেস করলে চারজনেই ছুটতে ছুটতে জবাব দেয়, 'জানি না।' আর একজন চুপচাপ এগিয়ে যায়। ওভারব্রিজের ওপারে দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন যেটা দাঁড়িয়ে ছিলো বেশ ভিড় টির দেখে তমিজ চেপে বসলো তারই একটা কামরায়। মেঝেতে কোনোমতে বসবার জায়গা পেয়ে তমিজ বেশ খুশি। কিন্তু গাড়ি আর ছাড়ে না। কী ব্যাপার?—কয়েকটা স্টেশন পরে পুলিসের সঙ্গে মারামারি করে চাষারা সব রেল লাইনের ওপর গাছ কেটে রেখেছে। আরো পুলিস গেছে; মানুষ সাফ করে, গাছ সরিয়ে ওখান থেকে সিগন্যাল দিলে জ্বলে উঠবে এখানকার সিগন্যাল। তবে না গাড়ি ছাড়বে। দেরি হোক, তমিজ উতলা হয় না। তবে খিদে পেলে ঢাকা মেলে ফেলে আসা ছালাটার কথা মনে হয়, পাঁচটা টাকা ছিলো। তবে ট্যাঁকে এখনো খুচরা খাচরা মিলিয়ে নয় সিকা মতো আছে, একটু

রয়ে সয়ে খেলে কোথাও কাজ না পাওয়া পর্যন্ত এতেই চলে যাবে। গাড়িতে কোদাল কাস্তে ঝুড়িওয়ালা মানুষ আরো আছে, এদের কোনো একটা দলের সঙ্গে নেমে পড়লেই চলে।

সন্ধ্যার পর গাড়ি একবার চলতে শুরু করে খুব স্পিড নেয়। বড়ো লাইনের বড়ো কামরা, গতির সঙ্গে তাল রেখে দোলে। বাংকের ওপরের প্যাসেঞ্জাররা অঘোরে ঘুমায়, কেউ কেউ ঘুমায় সিটে বসে। মেঝেতে কুঁকড়েমুকড়ে শুয়েও লোকজন ঘুমায় মহা সুখে। কেউ কেউ ঝিমায়। অনেকে হাই তোলে। গত রাত্রির ঝড়বৃষ্টি, জিনিসপত্রের দাম, কোথাও কোথাও বর্গাচাষাদের বাড়াবাড়ি, পুলিসের মারপিট, মন্ত্রীদের চুরিচামারি, ইনডিয়ার বদমায়েসি প্রভৃতি বিষয়ে মন্তব্য করতে গেলে হাই তোলার চাপে তাদের কথা বেরোয় বাঁকাচোরা হয়ে। ট্রেন ছোটে, ট্রেন ছোটে।

একেকটা স্টেশনে এক আধ মিনিটের জন্যে গাড়ি থামে আর তমিজের পাতলা স্বপ্ন ভেঙে যায়। কোদাল আর কাস্তেওয়ালা মানুষদের কথাবার্তা থেকে বোঝা যায়, হিলির দিকে মাঠে মজুরি এখন বেশি, আপখোরাকি বারো আনা চোদ্দ আনায় উঠেছে। ঝুঁকি আছে বলেই মজুরি বেড়েছে। কেউ কেউ মনে করে, জোতদারদের হয়ে জন খাটাটাই ভালো। আবার কারো কারো ইচ্ছা অন্যরকম, বর্গাচাষাদের সঙ্গে ভিড়ে গেলে জোতদারগুলার পাছায় ডাং মারা যায়। পুলিসকে অতো ভয় পাবার কী আছে গো? ঠোল্লাগুলো অনেক মানুষের জোট দেখলেই বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে পালায়।—এইসব লোক হাই তুলতে তুলতেও আস্তে কথা বলতে পারে না, একটুতেই তাদের গলা চড়ে। তাদের কেউ কেউ আবার ঝিমাতে শুরু করে এবং ঘুমিয়েও পড়ে। তমিজের খিদে পায় এবং পাতলা স্বপ্ন কেটে গেলে মনোযোগ দিয়ে সে সবার কথা শোনে। জোতদারদের ডাং না মারলে ওরা তেভাগা দেবে কেন? পুলিসের তাড়া খেয়ে কোথাও যদি টিকতে না পারে তখন না হয় কেটে পড়বে আর কোথাও। চাষা আবার নাই কোথায়?

এদিকে একটু চেষ্টা করলেই এখন বর্গাজমি পাওয়া যাবে। জোতদার নিজের গাঁয়ের মানুষকে বিশ্বাস করে না, পুব থেকে, দক্ষিণ থেকে আসা চাষাদের জমি দিয়ে ভাবে, এরা গোলমাল করবে না। বর্গাদার চাষা হলে অবস্থা ফেরাতে আর কতোদিন? তেভাগাটা হয়ে গেলে ধান বেচে যা থাকবে তার সঙ্গে কাদেরের কাছে জমা রাখা টাকাটা মেলালে তার ঘরভিটা খালাস হয়। তারপর ধরো কামারপাড়ার অনেকে তো যাবার তালে আছে, সেখানে কিছু জমি রাখা যায় সস্তায়, তারপর—। ঘুম আর রেলের দুলুনিতে তার হিসাব এলোমেলো হয়ে যায়। ঠাকুরগাঁ না নাটোর না নাচোল না-কি হিলির দিকেই চাষাদের মার দিলেও তাদের জোট এখনো ভাঙে নি। আর কোথাও না হোক ওদিকটায় তেভাগা হবেই। ধরো ওদিকে কোথাও যদি জমি বর্গা পায় তো গোরুবাছুর কিনতে আর কতোদিন? তারপর হুরমতুল্লার ভিটার পেছনে না গিয়ে তমিজ চলে যায় তার নিজের খালাসকরা ভিটার জমিতে। সেখানে তরিতরকারি করা যায়। আলু করো, বেগুন করো। বেগুনবাড়ির ওপর মাচা তুলে লাউ করো, ঝিঙা করো, সিম করো, শশা করো। ফুলজানকে লাগানো যায় ওখানে। আর তার বেটিটা ট্রেনের দুলুনিতে দুলুনিতে বড়ো হতে থাকে, তা হলে বেটিও থাকবে তার পাশে পাশে। পাঁচুন দিয়ে খেলতে খেলতেই বেটি বসে পড়বে তার পাশে। ছোট্টো ছোট্টো হাতে ঘাস আগাছা ওপড়াতে গিয়ে বেগুনচারার গোড়া কেটে ফেললেও তমিজ একটুও রাগ করবে না। ফুলজানের পেটের মেয়ে তো, দেখো, দেখো তোমরা, হামার হাঁটু সমান হতে না হতে বেটি হামার ক্যাংকা কর্যা জমি লিড়ায়। তা কুলসুম একটু রাগ করতে পারে। দাদী তো, কথা একটু শোনাবেই।—মাঝির ঘরের বেটি হয়া জাল চেনে না, একটা জালের নাম কবার পারে না। খালি জমিত জমিত ঘোরে।—কথা তমিজও কি আর কম জানে?

রাত্রি কেটে চলা ট্রেনের দোলায় তার ঠোঁটজোড়া একটুখানি ফাঁক হলে, সেটাকে হাসি বলেও চালানো যায়, হাসিটা টিকিয়ে রেখেই সে বলে, 'তুমিও তো বাপু মাঝির ঘরের বৌ। বাঘাড় মাঝি আছিলো তোমার দাদাশ্বশুর। জালের খবর তুমি কিছু রাখিছো?' ঘুম কিংবা তন্দ্রার মধ্যেই তার ঠোঁটের হাসি নিভে যায়, ঠোঁট না নড়িয়েই তমিজ নালিশ করে, 'তুমি খালি থাকিছো লিজের দাদাক লিয়া।' বলতে না বলতে গাড়ির ঝিকঝিক ঝিকঝিকে বাজে নতুন আওয়াজ। কে বাজায় গো?—কুলসুম ছাড়া আবার কে? তমিজের বেটিকে কোলে নিয়ে কুলসুম শোলোক বলছে, শোলোকের কথা বোঝা মুশকিল। শোলোকের টানে টানে গাড়িতে উঠে আসে তমিজের বাপ।—না তমিজের বাপ কোথায়? কুলসুমের লম্বাটে মুখেই বালি ঝুরঝুর করে। তা হলে তার মুখে দাড়িও গজাবে নাকি? কুলসুম এমন করে ঢুলছে কেন? তমিজের বাপ কি তার সব নিন্দ আর এলোমেলো খোয়াব সব সেঁধিয়ে দিয়ে গেছে তার দুই নম্বর বিবির চুলভরা মাথায়? আর কুলসুম আবার শোলোকে শোলোকে সেগুলো দিচ্ছে তমিজের বেটির কচি মাথার ভেতরে? না গো, ইগলান ভালো লয়। ঐ তো, শোলোকের আসর বেশ জমে উঠেছে। না হলে বৈকুণ্ঠ আসে কেন? কুলসুমের গলার ভেতর দিয়ে আসা তমিজের বাপের ঘুমঘুম কথা আর চেরাগ আলির শোলোক শুনতে শুনতে বৈকুণ্ঠ মাথা ঢুলিয়ে তাল দিচ্ছে। কিন্তু কুলসুমের শোলোকের কথা তো বোঝা যায় না।—'ও বৈকুণ্ঠদা, তুমি ইগলান হাবিজাবি কী শোনো গো?' ঢুলতে ঢুলতেই বৈকুণ্ঠ জবাব দেয়, 'তোর বাপেক পুস কর ছোঁড়া।' কিন্তু তার বাপ কোথায় ? তমিজ এদিক ওদিক তাকালে বৈকুণ্ঠ চোখের ইশারায় দেখিয়ে দেয় কুলসুমকে। তবে বাপ কি তার ঢুকে বসে আছে কুলসুমের গতরে? বাপকে খুঁজতে কুলসুমের গতর ছাড়া তার আর উপায় নাই, আর পথ নাই, কোনো বুদ্ধি নাই। তাইতো, একদিন রাতে, সেটা কবে গো?—বাপ মরার দিন, না-কি আরো পরে, বাপের শোকে একটা নুনের পোটলা হয়ে তমিজ শুয়েছিলো বাপের মাচায়। কেবল তখুনি, সেই একবারই বাপ তার কাছে এসেছিলো। কুলসুমের হাতের ভেতর দিয়ে, তার উঁচু বুকের ভেতর দিয়ে তার উরুতে ভর দিয়ে, তার কোমরে আসর করে বাপ এসে তাকে টেনে নিয়েছিলো নিজের কালোকিষ্টি গতরের মধ্যে। সেটা কবে যেন? বৈকুণ্ঠকে বাপের এই কারসাজির কথাটা বললে হয়। বাপজান তার কাছে আসে না কেন? বাপকে ধরতে হলে তাকে যেতে হবে কুলসুমের ভেতর দিয়ে, এটা কেমন কথা? বৈকুণ্ঠকে সে নালিশ দেবে, মরার পর বাপজান নিত্যি কুলসুমের কাছে আসে, তার সঙ্গে ফুসুরফাসুর করে। কিন্তু বেটাকে তো কোনোদিন উঁকি দিয়েও দেখে না। 'বৈকুণ্ঠদা, ওই ফকিরের বেটিক না ধর‍্যা কি বাজানেক ধরার কোনো বুদ্ধিই নাই?'—কিন্তু তার জবাব শোনার আগেই ট্রেনের ঝিকঝিক আওয়াজ জমাট বেঁধে ফেটে পড়ে বাজপড়ার শব্দে। পোড়াদহ মাঠে বটগাছের ঝাঁকড়া মাথায় আগুন ধরে গেলো নাকি? সন্ন্যাসীর থানে খালি ছাই আর ছাই। বৈকুণ্ঠ কি বসেছিলো ওখানেই? মানুষটা বড়ো গোঁয়ার। একেবারেই সাবধান থাকতে চায় না। এই কথা ভাবতে না ভাবতে বৈকুণ্ঠ বলে ওঠে, 'হামাক হুঁশিয়ার থাকা লাগবি কিসক রে? এই যে গিরিরডাঙা আর নিজগিরিরডাঙা, এই যে গোলাবাড়ি—ইগলান জায়গাত ওই সময় কোম্পানির পাছাত ডাং মারিছিলো কেটা? ক তো কেটা? ভবানী সন্ন্যাসীর সাথে আসিছিলো হামার ঠাকুরদার ঠাকুরদার বাপ, না-কি তার ঠাকুরদাই হবি— ।' কথা শেষ করার আগেই সে ঢলে পড়ে তমিজের বুকে। বৈকুণ্ঠের সারা শরীর পুড়ে অঙ্গার। ছাইয়ের ভেতর থেকে তবু কী করে সে বেরিয়ে এসেছে ওই পোড়া শরীর নিয়ে। তার শোলোকে-ভারী মাথার ওজনে তমিজের বুক টনটন করে। ঘুম ছুটে গেলে তমিজ তার পাশে শুয়ে-থাকা মানুষটির হাজা-ধর' পায়ের ভারি পাতা সরিয়ে দেয়

নিজের বুক থেকে। তখন ভোর হচ্ছে। গাড়ি থামলো হিলি স্টেশনে।

প্যাসেঞ্জাররা প্রায় সবাই নামে গাড়ি থেকে। পায়ে-হাজা মানুষটিকেও বেঞ্চের তলা থেকে কাস্তে কোদাল ঝুড়ি গুছিয়ে নিতে দেখে তমিজ জিগ্যেস করে, 'কামেত যাও? এটি কাম পাওয়া যাবি?'

তমিজের সাফসুতরো পিরান আর লুঙি দেখে লোকটি একটু দোনোমনো করে, 'দেখা যাক।' তবে তার সঙ্গীটি সাহস করে জিগ্যেস করে, 'তুমি কাম করবেন বাহে?' তমিজ 'হুঁ' বললেও তার ঝাড়া হাতপা দেখে তাদের সন্দেহ যায় না। তাকে কিছু না বলেই তারা নেমে গেলেও তমিজ কিন্তু তাদের পিছে পিছেই থাকে।

স্টেশনে ভিড়। আর একটা ট্রেন ঢুকলো। ধুতিপরা মানুষ, সিঁদুর মাথার মেয়েমানুষ অনেক। রেল লাইনের পাশাপাশি সবাই চলছে স্টেশনের ঘরের দিকে। টিনের ছাদ পার হয়ে চলে যাচ্ছে ওপারে। সেখানে রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি, গোরুর গাড়ি। রেল লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে তমিজ হঠাৎ আঁতকে ওঠে : আরে নায়েববাবু! এখানেও নায়েববাবু? তার নজরে পড়লে তমিজের সর্বনাশ, তাকে ঠিক তুলে দেবে পুলিসের হাতে। তাকে এড়াতে তমিজ একটু দাঁড়ালে তমিজ শোনে নায়েববাবুর আঙুল ধরা ছোটো ছেলেটির কথা, 'বাবা, কৈ, ইনডিয়া কৈ বাবা?' 'ওই তো স্টেশনের ওপারে। ওই যে রিকশা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।' লোকটির কথা শুনে তমিজের ভুল ভাঙে, না, এটা নায়েববাবু নয়। হঠাৎ পেছন থেকে দেখলে নায়েববাবু বলেই মনে হয়। নায়েববাবু নয় এটা নিশ্চিত হলে তমিজের কদমে হাওয়া খেলে। লোকটার আঙুলধরা ছেলেটি ঘ্যানঘ্যান করেই চলেছে, 'ইনডিয়া কৈ বাবা? ও বাবা।' লোকটির বাঁ পাশে সিঁথিতে সিঁদুর লাগানো বৌটা বলে, 'ওই তো বাবা, ওই যে।' মেয়েটির কান্নাবসা গলার কথা ছেলেটির বিশ্বাস হয় না, 'কৈ? সব তো একইরকম।' মায়ের চেয়ে বাপের ওপর তার আস্থা বেশি, ফের বলে, 'ও বাবা, ইনডিয়া কৈ?' লোকটি ছেলেকে আর পাত্তা না দিয়ে বৌকে বলে, 'ইয়ে টিয়ে সব বাকসে, ব্যাগে ভাগ করে রেখেছো তো? গ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে হবে, ওদিকে চাষারা খুব উৎপাত করছে।' নায়েববাবু তা হলে ইনডিয়ায় বিশেষ সুখে নাই। নায়েববাবু কিসিমের এই মানুষটার উদ্বিগ্ন মুখ ভালো করে দেখার লোভে তমিজ একটু পা চালিয়ে সামনে গিয়ে তার দিকে তাকায়।

লোকটি এবার কথা বলে তার পাশের সঙ্গীকে, 'এদিকে কিন্তু পুলিস প্রায় টাইট করে ফেলেছে। পাঁচবিবি জয়পুর একেবারে ক্লিন। পুলিসের বাড়ি না পড়লে কি আর বুলি কপচে কিছু কাজ হয়?' সঙ্গীটি বোধহয় ইনডিয়ার খবর জানে বেশি, সে জানায়, 'আমাদের ওদিকেও পুলিস মার দিতে শুরু করেছে। তবে এদিককার লিডাররাও তো সব ওপারে গেছে, তাই একটু টাইম নিচ্ছে, ঠিক হয়ে যাবে।'

পাকিস্তান ও ইনডিয়ার পুলিসের তৎপরতার কথা চলতে চলতেই কোমরে দড়িবাঁধা পনেরো-বিশজন মানুষের পাল নিয়ে পুলিস বাহিনী বীরদর্পে এগোয় একটা ট্রেনের দিকে। তমিজ দেখে মুহূর্তে গোটা প্লাটফর্ম আর রেল লাইনগুলো থিকথিক করছে পুলিসে। কোদাল কাস্তে ঝুড়ি হাতে লোকজন ছুটতে শুরু করে; তারা এদিকে ছোটে, ওদিকে ছোটে। ভদ্দরলোকদের গায়েও লাগে, এমন কি ভদ্দরলোকদের বৌঝিদের গায়েও ধাক্কা দিয়ে তারা ছোটে।

ওই হাজা পা মানুষটা আর তার সঙ্গীরা যে কে কোথায় দৌড় দিলো চোখে পড়ে না। তবে পুলিস অনেকগুলোকে ধরেছে, ওদের খুঁজতে যাওয়াটা নিরাপদ নয়। পুলিস কিন্তু তার পাশ দিয়ে গেলেও তাকে খেয়াল করে না। হতে পারে, রাতে তার কাপড় যতোই দুমড়েমুচড়ে যাক, ইসমাইল হোসেনের পুরনো জামাতেও ভদ্দরলোকের দাগ

খানিকটা হয়তো লেগেই রয়েছে। ওই জামার বুদ্ধিতেই তমিজ খামাখা দৌড়ায় না, দৌড়ালেই পুলিস সন্দেহ করবে।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে একটা মালগাড়ির পেছনে এসে তমিজ দেখে, এখানে মানুষজন খুব কম। মালগাড়ির ওয়াগনের নিচে বেশ কয়েকটা কোদাল কাস্তে আর ঝুড়ি পড়ে রয়েছে। কয়েকটা পাঁচুনও ঠেকানো রয়েছে ঝুড়ির সঙ্গে। নজর দিয়ে ভালো একটা কাস্তে আর একটা কোদাল পছন্দ হলে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। 'ঠোল্লাগুলো এখানে খুব পেটাচ্ছে, শালারা ঠাকুরগাঁয়ের দিকে পারে না, শোধ তোলে আমাদের এখানে এসে।'

রেলের নীল জামাপরা একটা কুলিকে দেখে তমিজ জিগ্যেস করে, 'ও ভাই, ঠাকুরগাঁয়ের গাড়ি আসবি কখন?'

'সেভুন আপ ইঁহা আয়েগা সওয়া চার বাজে। উও গাড়ি জায়েগা দিনাজপুর তক। দিনাজপুর সে ফিন ঠাকুরগাঁও কা গাড়ি মিল সকতা।'

ঘণ্টা তিনেক অপেক্ষার পর প্যাসেনজার ট্রেন একটা এলে একজনকে জিগ্যেস করে তমিজ উঠে পড়ে পেছন দিয়ে। একটু হুঁশিয়ার থাকা দরকার। তার সঙ্গে এখন কাস্তে আছে, কোদাল আছে। পাঁচুনও একটা নিলেই হতো।

ট্রেন চলে। ঠাকুরগাঁয়ের গাড়ির কী একটা নাম বললো কুলি, সেটা তো মনে নাই। কিন্তু গাড়ি যেখানকার হোক, তমিজকে যেতে তো হবেই। হিলির গ্রামে গ্রামে এখন পুলিস। থাকা চলবে না। এই গাড়ি ঠাকুরগাঁয়ে না গেলে হয়তো নাটোর যাবে। নাটোর নেমে সুবিধা করতে না পারলে সে উঠবে নবাবগঞ্জের গাড়িতে। নাচোল যাবে। ওখানে তেভাগা কায়েম হয় তো বর্গা সে একটা ঠিকই জোগাড় করে নেবে। ফসলের হিস্যা যা জুটবে তাতে প্রথমেই খালাস করে নেবে ভিটা আর ঘর। এ ভিটায় তরকারির চাষ হবে ভালো। ফুলজান খাটবে ওই জমিতে, কুলসুম পারবে না। কুলসুম তার বেটিকে শোলোক শোনাবে আর তার বেটি শোলোক শুনতে শুনতে বেগুন খেতে নিড়ানি নিড়ানি খেলবে। হুরমতুল্লার কাছ থেকে জমিটা নিয়ে সেখানে আউশের আবাদ করবে। দোপা জমি, আউশের এমন ফলন সে করবে যে আমনের খন্দকে ছাড়িয়ে যাবে। ট্রেন চলে।

৫৮

মাঝির বেটা হলে কী হয়, তমিজ কিন্তু হুরমতুল্লার ভিটার পেছনের জমির স্বভাবটা ঠিকই ধরেছিলো; প্রথমবার সেখানে আউশের আবাদ মারা পড়লো বটে, কিন্তু পরের বছর ফুলজানের জেদেই ফের আউশ বোনা হলো। আর খন্দও হলো, আল্লা রে আল্লা, রোপা আমনের জমিতেও মানুষ এতো ধান দেখে না। কিন্তু সেখান থেকে আদ্দেক জমি তো হুরমতুল্লাহ রাখতে পারলো না, বেচে বিয়ে দিলো তার পেয়ারের বেটি নবিতনকে। বুড়ার কথা : সব দোষ ফুলজানের। মাঝির বেটাকে নিকা করায় ভালো বংশের কোনো মানুষ কি তার বাপের সঙ্গে সম্বন্ধ করতে চাইবে? তাও হুরমতুল্লার শালা বলে ভাগ্নীটাকে বেটার বৌ করে ঘরে তুললো; শর্ত ছিলো একটাই : সোনামুখী হাটে তার মনিহারি দোকানটা সাজিয়ে দিতে হবে। জমি বেচা টাকাতে দোকান বড়ো করা যায় না। শালা তার মানুষ ভালো বলেই শুধু ওই জমি বেচার টাকা নিয়েই বেটার বৌ ঘরে তুললো, এখন চাপ দিচ্ছে বাকি টাকার জন্যে।

দেখা যাক, এবারের বর্গা করা আমন থেকে কিছু শোধ করা যায় কি-না। আজকাল এমন কি অঘ্রানের রোদেও হুরমতুল্লা অল্পেই কাবু হয়ে পড়ে; তার ঘন ঘন পিপাসা পায়, বদনা বদনা পানি খেয়েও বার বার পেচ্ছাব করা ছাড়া আর কোনো ফল হয় না। তাই রোদ পড়লে শরীরে যতোক্ষণ কুলায় হুরমতুল্লা পড়ে থাকে জমিতেই। ফুলজান থাকে কাছাকাছিই। পাঁচুন দিয়ে নিড়াবার ফাঁকে ফাঁকে একটু দম নিতে তাই হুরমতুল্লার বাধে বাধো ঠেকে। নিজের বেটি হলে কী হয়, নিড়ানির সময় বাপকে একটু জিরাতে দেখলেই ফুলজান ক্যাটক্যাট করে, 'মাঝির বেটা কয়া তাক হেলা করো, মাঝির বেটা তো একদণ্ড বস্যা থাকে নাই। তার হাত চলিছে বাতাসের আগে।'

'মাঝির বেটার সাথে লিকা বস্যা জাত ধর্ম খালু, সেই সোয়াগের মরদ আজ কয়টা বছর হয়া গেলো একটা খবর লেয় না। চার আনা পয়সাও তো পাঠায় না।' হুরমতুল্লার এই আক্ষেপে এক হাত তফাতের ধানগাছে কাঁপন লাগে, তাতেই তেজ ফিরে পেয়ে সে আরো হাত তিনেক জায়গা নিড়াতে পারে।

তমিজের পাত্তা নাই, সে কি আজকের কথা গো? কেষ্ট পালের মুখে কী না কী শুনে ফুলজান বাপকে কয়েকদিন খুব ধরলো, মণ্ডলবাড়ি গিয়ে সে তমিজের খবরটা ঠিকঠিক জেনে আসুক। হুরমতুল্লা বুড়ে হয়েছে বলে তো আর পাগল হয়ে যায়নি; শরাফত মণ্ডলের সামনে মাঝির বেটার খবর নিতে গিয়ে মানুষটাকে খামাখা খেপিয়ে দেবে নাকি? ফুলজানের আবদার রাখতে কি সে মণ্ডলের যেটুকু জমি বর্গা করছে তাও হারাবে নাকি? তার সংসার আছে না? তার আরো বেটি আছে না? বুড়া বাপের শরীরের দিকে ফুলজান ভুলেও কি একবার তাকায়? তার খাওয়া পরা জিরানের কথা কি ভাবে ? এই বাড়িতে তাকে দরদ যদি কেউ করে তো সে এক নবিতন। মেয়েটার বিয়ে দিলাম জষ্টি মাসে, ছয় মাসের ওপর হয়ে গেলো, বেটিটাকে একবার বাড়িতে আনতে পারলাম না। হুরমতুল্লা নিজের দুই বিঘা জমি বেচে শালার হাতে তুলে দিলো বেটিকে, মেয়ে তার সুখেই থাকবে। শালাও তো তার বোন বোনাই ভাগ্নীদের জন্যে অস্থির; পোড়াদহ মেলা লাগার তিন চার দিন আগে বোনকে নাইওর নিতে গোরুর গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে প্রতি বছর। আর এখন? বেয়াই হওয়ার পর তার চেহারাই পাল্টে গেলো। জমি বেচার টাকা তো নিলোই, তাতেও নাকি সোনামুখী হাটে তার বেটার দোকানের সাজগোছ সম্পূর্ণ হয় না। তা হুরমতুল্লার পয়সার অভাব? কেন? জমিটা বেচে দিলেই তো হয়। তার বেটা আছে নাকি? জমি কি সে রেখে দেবে ওই মাঝির বেটার ভোগের জন্যে? দোকান সাজাবার হাউস না মেটা পর্যন্ত জামাই তার শ্বশুরবাড়ি আসবে না, বৌকেও পাঠাবে না।

দোকানদার জামাই পেয়ে হুরমতুল্লা এখনো খুশিই। চাষাভুষা কামলাপাট নবিতনটার পছন্দ নয়। মেয়েটার ছিলো সেলাইয়ের সখ, চাষার ঘরের মেয়ের হাতের কাজ যে এত চিকন কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। শ্বশুর বাড়িতে সে কি সেলাইফোঁড়াই করার সুযোগ পায়? মেয়েটার মনটাও বড়ো কোমল গো। ফুলজানের মতো মাঠে মাঠে, জমিতে জমিতে ঘুরে সে একটা মদ্দামানুষ হয়ে ওঠে নি।—মেয়েমানুষ, তার মেয়েমানুষের মতো থাকাই ভালো, মেয়েমানুষ জমিতে কামলা খাটলে বুক পাষাণ হয়ে যায়।

আর নবিতন?—দুপুরে বাপ ঘরে ফিরলে সে তাকে আর জমিতে ফেরত পাঠাতে চায় নি, 'ক্যা বাজান, এই শরীল লিয়া তুমি এই গনগনা ওদের মধ্যে ফির গতর খাটাবার যাবা কিসক গো?'—সেই মেয়েকে হুরমতুল্লা আজ একবার চোখের দেখাটাও দেখতে পারে না। একেকবার ইচ্ছা হয়, দুত্তোরি, ভিটার পেছনের জমিটা না হয় বেচেই দিই। কিন্তু ঘরে তার মদ্দা কিসিমের খাণ্ডরনি বেটি আছে না একটা? সেটা তার ঘরের শনি, বংশের ইজ্জত মারা ঘেগি মাগী। ঘ্যাগভরা তার খালি হিংসা আর হিংসা।

হুরমতুল্লা আড়চোখে তাকায় দিঘির পুবের দিকে। দিঘির ঢালে, নিচে এক মনে নিড়ানি দিয়ে চলেছে ফুলজান। ফুলজানের বেটি পায়ে পায়ে উঠে গেছে দিঘির ঢালে, কাঁঠালগাছের নিচে। এমনিতে গাছের আন্ধার, তার ওপর ছুঁড়িটা হয়েছে কালো কুচকুচে। বাপ দাদার গায়ের পাকা রঙ। ছুঁড়ির বাড়ও বড্ডো বেশি, কে বলবে এখনো তিন বছরে পড়ে নি? হবে না কেন? ফুলজান তো সুযোগ পেলেই বেটির মুখে ভাত ঠাসে, কেউ খাক কি না খাক, বেটিকে তার ঠিকই গেলানো চাই। সাধে কি ছুঁড়িটার এরকম বাড়? যেভাবে বাড়ছে, এর বিয়ে দেওয়ার ভারও পড়বে হুরমতুল্লার ঘাড়েই। মাঝির পয়দা বেটিকে বিয়ে করবে কে? আবার রাতে বিছানা থেকে উঠে ঘুমের মধ্যেই দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে চায়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মাচার তলে ঢুকে খুটখাট করে, গুড়গুড় করে হাঁটে। দাদার ব্যারামটা পেয়েছে, বড়ো হতে হতে ব্যারাম আরো বাড়বে না? তখন?—নাতনির বিয়ে দেওয়ার দায়িত্বের গুরুভারে কিংবা নবিতনের শ্বশুরকে টাকা দেওয়ার ভাবনায় কিংবা দিনরাত পিপাসা পাওয়ার ব্যারামেও হতে পারে, হুরমতুল্লার মাথা নুয়ে নুয়ে পড়ে।

দিঘির পুবে পাঁচুন হাতে নিড়াতে নিড়াতে ফুলজান হুরমতুল্লাকে প্রায় সেজদা দেওয়ার মতো উপুড় হওয়া দেখে আঁচ করে, আবছা আলোয় বাপের চোখে সবই ঝাপসা ঠেকছে। বুড়া এখন ধানগাছ উপড়ে না ফেলে। কিন্তু বাপের সঙ্গে কথা বলতে মন চায় না তার। নবিতনের জন্যে তার সোয়াগ উথলাতে দেখে ফুলজানের একেকবার ইচ্ছা করে, বাড়িতে আগুন দিয়ে, জমির গোছা গোছা ধানগাছ সব উপড়ে ফেলে বেটিকে কোলে নিয়ে সে বেরিয়ে যায় যেদিকে দুই চোখ চায়। দোকানদার জামাইকে টাকা দেওয়ার জন্যে বুড়ার গোয়া চুলকায়। আর বড়ো জামাইটা যে তার কতোদিন থেকে ঘরছাড়া, কৈ, বুড়া তো তার তত্ত্বতালাস কিছুই করে না। পালপাড়ার কেষ্ট পাল একদিন এদিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলো, হুরমতুল্লার দুয়ারে হাঁক দিয়ে জানিয়ে গেলো, কোথায়, ঠাকুরগাঁও না নাচোল না কোথায় চাষারা উৎপাত করেছিলো জোতদারদের সঙ্গে, পুলিস গিয়ে মেলা মানুষকে গুলি করে সাফ করে দিয়েছে, জেলের মধ্যেও কিছু ভরেছে। তো তাদের মধ্যে নাকি এই এলাকার চাষাও আছে। কেষ্ট পাল এর বেশি কিছু বলতে পারে না। ফুলজান তাই বাপকে একটু যেতে বললো মণ্ডলবাড়িতে। 'বাপজান, ওই বাড়িত গেলে ব্যামাক খবরই পাওয়া যাবি।' ফুলজান বুড়াকে এমন কি তার বেটির জন্যে সরিয়ে রাখা চিড়া খাইয়ে দিলো এক পেট। বুড়া গেলোই না। তা গেলেই বা কী হতো? মণ্ডলবাড়ির পোষা গোলাম সে, গিয়ে মণ্ডলের হাগা গোয়াখান জিভ দিয়ে সাফ করে আসতো। তমিজের কথা সেখানে তোলার মতো মুরোদ কি এই বুড়ার হতো?

আবছা আলোয় আর আবছা আন্ধারে এখান থেকে হুরমতুল্লাকে দেখায় মোষের দিঘির দক্ষিণ পাড়ের শিমুলগাছ থেকে ছিটকে পড়া ব্যারামে বুড়া শকুনের মতো। দেখে ফুলজানের হাতও ভারি হয়ে আসে। তার হাতে পাঁচুন একটি আগাছায় শিকড়ে বারবার খোঁচায়, খোঁচানোর গতি বড়ো ধীর। মাটি ও আগাছার সঙ্গে ওই পাঁচুনের ঘষাঘষিতে শোনা যায় মণ্ডলবাড়ির কাদেরের কথা, 'উগলান খবর কি পুলিস সব কয়? কতো মানুষ মারে, জেলেত ভরে, উগলান হিসাব কি সব রাখা যায়?'

তমিজের খবর নিতে হুরমতুল্লা শরাফতের বাড়িতে না গেলে ফুলজান কী আর করে, নিজেই একদিন চলে গিয়েছিলো গিরিরডাঙায় মণ্ডলবাড়ি। কোলে তার বেটি আর কাপড়ের কোঁচড়ে লুকানো নবিতনের সেলাই-করা কাঁথা।—পালাপাড়ার কোন বৌ পুরনো কাপড় দিয়েছিলো, পরে আর নিতে আসে নি। মনে হয় ইনডিয়া চলে গেছে। আর যদি আসেও তো ফুলজান তাকে পাঠিয়ে দেবে নবিতনের শ্বশুরবাড়ি। দোকানদার ভাতার তার নতুন কাপড় কিনে দেবে, কাঁথা না হয় নবিতন আরেকটা সেলাই করবে।

কাদেরের বৌ কাঁথা পেয়ে মহা খুশি। তাদের শিমুলতলার কাঁথার এতো নাম, চটের ওপর উলের কাজ করা তার দাদীর মসজিদ আর চাঁদ তারা আঁকা জায়নামাজ এতোই সুন্দর যে, দেখলেই তার ওপর দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এই চাষার মেয়ে নানা রঙের সুতায় এমন করে সব পাখি, মাছ, হাতপাখা আর ফুল বুনে রেখেছে যে, একবার দেখলে আর চোখ ফেরানো যায় না।

আবদুল কাদের কিন্তু অতো খুশি নয়। কেষ্ট পালের কথা শুনে সে বলে, চাষাদের উৎপাত বন্ধ করতে পুলিসকে একটু গা ঝাড়া তো দিতেই হয়। উত্তরে আর পশ্চিমে কিছু মানুষ তো মারতেই হয়েছে, কিন্তু তাদের সবার নাম ধাম কি আর জানানো সম্ভব? তা এই নিয়ে এতো হৈ চৈ করার কী আছে? এখানে পুলিস একটা পাদ দিলেও ইনডিয়ায় মহা শোরগোল ওঠে। আমাদের শিশুরাষ্ট্রটিকে গলা টিপে মারার জন্যে ইনডিয়া কী না করছে! পালপাড়ায় তো আবার ইনডিয়ার কাগজ ছাড়া আর কিছু ঢোকে না। কেষ্ট পাল বুঝি এইসব কথা খুব রাষ্ট্র করে বেড়াচ্ছে?

'না ভাইজান।' কোনো শিশুকে গলা টিপে দম বন্ধ করে মারার সঙ্গে কেষ্ট পালকে জড়াবার সম্ভাবনায় ফুলজান ভয় পায়। খুনের দায় থেকে তাকে বাঁচাতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে ফুলজান, 'না ভাইজান, তাঁই খালি কয়া গেলো কোনটে বলে পুলিসের গুলিত মানুষ মরিছে। তার মধ্যে হামাগোরে এটিকার—'

'হবার পারে।' আবদুল কাদের আরো গম্ভীর হয়, 'ছোঁড়াটা এমনি খুব কামের আছিলো, কতো সুবিধা কর্যা দিছিলাম। কোটে যায়া কী করলো, আল্লাই জানে।' আবদুল কাদের এবার তাকে বিদায় দেওয়ার শোভন আয়োজন করে, বৌয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কাঁথা পছন্দ হয়েছে?'

কাদেরের বৌ ফুলজানের বেটির হাতে একটা কাঁচা টাকা ধরিয়ে দেয়। কাদের দশ টাকার একটা নোট তার দিকে এগিয়ে ধরে, 'আগে না তোক কিছু দিছিলাম। তমিজের টাকা।' কী ভেবে পাঁচ টাকার একটি নোট ফের এগিয়ে দেয়, 'রাখ।'

এতো টাকা পেয়ে ফুলজানের বুক কাঁপে। তমিজের খবর দিতে পারে না, কাদের তাকে এতো খাতির করে কেন?

ফুলজান ফিরেই আসছিলো। তাকে ইশারায় উঠানে ডেকে নেয় মণ্ডলের ছোটোবিবি। ফুলজানের বেটিকে একটা শবরিকলা দিলে টাকাটা পড়ে যায় তার মুঠ থেকে। ফুলজান সঙ্গে সঙ্গে সেটা তুলে আঁচলে বাঁধে। বারান্দা ঘেঁষে উঠানের এক পাশে মোড়ায় বসে ছোটোবিবি ফুলজানকে পিঁড়িতে বসার ইশারা করে। 'ক্যা রে ফুলজান, তোর শাউড়ির খুনের মামলার কী হলো রে? তোর আগের সোয়ামি ওই বাউদাটার সাথে তোর শাউড়ির বলে কী কী আছিলো? ছিক্কো ছিক্কো! তোর শ্বশুর বলে দলদলার মধ্যে খালি দাপায়। হামাগোরে ইঁটের ভাটাই রাখা গেলো না, ওই জায়গাত নাকি এখন খালি আগুন জ্বলে? মনে হয়, তমিজের বাপই ওটি ইগলান করে। তুই জানিস কিছু?'

ফুলজানকে এতো প্রশ্নের জবাব দিতে হয় না। তার আগেই 'তোমার খালি বেদাত কথা।' বারান্দায় জলচৌকিতে অজু করার বদনা হাতে নিয়ে বলে ওঠে শরাফত, 'কবরের মধ্যে আজাব হলে মরা মানুষ দাপাবি। এর মধ্যে আবার আগুন পাও কোটে? ইঁটের ভাটা তুল্যা দিছি কি ভূতের ভয়ে? উগলান কথা কও, তোমার নামাজ কবুল হবি?'

'তুমি বাপু মেয়ামানুষের কথার মধ্যে আসো কিসক?' ছোটোবিবির এক ধমকেই শরাফত সবটা মনোযোগ নিয়োগ করে আসরের নামাজের অজু করায়। মাস কয়েক আগে বড়োবিবি মরার পর ছোটোবিবির তিড়িংবিড়িং লাফানো বন্ধ হয়েছে, তার তেজ এখন সংহত। দুই বিবির ঠাণ্ডা ও গরম লড়াই থেকে রেহাই পাবার স্বস্তিতে শরাফত

এখন ছোটোবিবির এসব বকাঝকা অকাতরে হজম করে, বরং বহুকাল বাদে এক স্ত্রী সংসারের সুখ সে ভোগ করে তারিয়ে তারিয়ে।

শরাফত ঘরের ভেতরে 'আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর' জোরে জোরে বলে নামাজ শুরু করলে ছোটোবিবি প্রাণ খুলে কুলসুমের হত্যাকাণ্ড, কেরামতের সঙ্গে তার সম্পর্ক, পাকুড়তলা থেকে পাকুড়গাছের উধাও হওয়া, চোরাবালির ভেতরে শুয়ে কুলসুমের কেলেঙ্কারিতে ক্ষুব্ধ তমিজের বাপের দাপাদাপি, সন্ধ্যা হলেই সেখানে আগুন জ্বলে ওঠা এবং এসবের ফলে তাদের ইটখোলা উঠে যাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে নানাকরম প্রশ্ন করে এবং প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব দেয় সে নিজেই। ফুলজান উঠে দাঁড়ালে তার হাতে সের তিনেক চিঁড়ার একটা পুটলি দেয়, 'তোক দিয়া চিড়া কোটালাম। তোর চিড়া খুব ভালো হছিলো রে। তোর বেটিক খিলাস।' বলতে বলতে তার বাৎসল্য উথলে ওঠে, 'তমিজের নামে মিলাদ পড়াস রে। যা শুনি, ওদিককার খবর ভালো লয়।'

নতুন ধান উঠলে গত পৌষে চিড়া কোটার জন্যে মণখানেক পানিশাল ধান পাঠিয়ে দিয়েছিলো ছোটোবিবি। টাকাও দিয়েছিলো আগাম। মণ্ডলের ঢেঁকি তো সব ব্যস্ত থাকে চাল কোটায়। আর এখানে ধান ভানে সব মাঝিপাড়ার বৌঝিরা, চিড়া কোটার তারা জানে কী? ঢেঁকির পিছাড়িতে তাদের এলোমেলো পায়ের চাপে ঢেঁকির মুগুরটা গড়ের মধ্যে পড়ে ধাপ দুপ করে, ধানটা ভাজাও তাদের ঠিক হয় না। তাদের চিঁড়া হয় ফেটে যায়, না হয় চিটকা চিটকা হয়। মণ্ডল বাড়ির চিঁড়া তাই কোটা হয় সব হুরমতুল্লার বাড়িতে। তা ফুলজান নিজেই সের চারেক চিঁড়া সরিয়ে রেখেছিলো, ছোটোবিবি তো আর মেপে দেখে নি। বেটির জন্যে রাখা চিঁড়া খাইয়ে দিলো বাপকে। বাকিটা রেখে দিয়েছে তার মাচার নিচে হাঁড়ির ভেতর; গোখরা সাপ বেরুবার পর তার বাপ সেই মাচায় আর শোয় না, সেখানে থাকে এখন ফুলজান। একদিক থেকে ভালোই। ওর তলায় হাত দেওয়ার সাহস কারো নাই। এখন এই পুটলিটা যে কত্তো দিন ওখানে লুকিয়ে রাখতে হয় কে জানে? এই সের তিনেক চিঁড়া তমিজের চার বেলার নাশতা। আর খেতলালের গুড় হলে তিন বেলাতেই সাপটে দেবে। মাঝির বেটা মানুষটা এতোও খেতে পারে গো!—তমিজের নামে এরা মিলাদ পড়াতে বলে কেন?—এই মানুষ পুলিসের গুলিতে মরবে? অতোই সোজা? মণ্ডলবাড়ির সব মানুষ চাইলেই, কালাম মাঝি চাইলে, আমতলির দারোগা চাইলেই কি আর তমিজ মরে?—ফুলজানের গালে ঘ্যাগে গলায় বুকে তমিজের গরম নিশ্বাস এসে লাগে কতোদূর থেকে। একেকবার মনে হয়, কতো বা বচ্ছর পার হলো! আবার কখনো চমকে ওঠে, সারা গা তার গনগন করে তমিজের নিশ্বাসের শিখায়। শিখাতেই হয়তো ফুলজান চমকে উঠে তাকায় একটু দূরে। হুরমতুল্লা সেখানে বসে বসে ঝিমাচ্ছে।

'মগরেবের ওকতো গেলো। বস্যা ঢোপ পাড়ো?'

ফুলজানের শুকনা গলা শুনে আকাশের দিকে মুখ তুলে হুরমতুল্লা ফের সচল হয়ে ওঠে। আজ বুঝি পূর্ণিমা। তামাম ধানখেতের ওপর যেন চালের পিটুলি দিয়ে লেপে দেওয়া হয়েছে। আর চাঁদ থেকে দুধ পড়ছে, তাই সারাটা ধানখেত জুড়ে দুধের হালকা সুবাস। ফুলজানের বেটিটা এতোক্ষণ না খেয়ে আছে। দুধের গন্ধে তার নিশ্চয় খিদে পাচ্ছে। দুধ দিতে না পারুক, কাউনের চালের ভাত তো দুটি মুখে দিক। নিড়ানি দিতে দিতেই সে বলে, 'ঘরত যা। তোর বিটির খিদা নাগিছে না?'

বুড়ার খেয়াল শুধু তার বেটির খিদার দিকে, কার্তিক মাসে দুটো কাউনের চালের ভাতই তো খায়, বুড়ার তাও সহ্য হয় না। বাপকে ভালোমতোন একটা খোঁচা দিতে তাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না, জবাব দেয়, 'কাম থুয়া উঠি ক্যাংকা কর্যা? বেন থ্যাকা তো মেলা মানুষ যায় এবিন দিয়া। কাম আগায়া থুই। কাম তো হামার করাই লাগবি।'

তার মেয়ের খিদের কথা বলে হুরমতুল্লা আসলে খোঁচা দিয়ে ফেলেছে ফুলজানের পেটেই। ফুলজানের নিজেরই বেজায় খিদে পেয়েছে বলতে গেলে দুপুরে ভাত খাওয়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই। কাউনের চালের খসখসে ভাত হজম হয়ে পেট তার সেঁধিয়ে গেছে পিঠ বরাবর। বাড়ি ঢুকে খেতে তো হবে সেই কাউনের ভাতই, তাও এই বেলার খোরাকি আধপেটার বেশি নয়। খেসারির ডাল থাকলে ভাতটা নরম হয়, ঘরে খেসারি পর্যন্ত নাই। খেসারির ডাল ছাড়াই খসখসে কাউনের ভাতের ভাবনাতেও তার খিদে এতোটুকু কমে না। তখন সবটা মন দিতে হয় নিড়ানির দিকে। কিন্তু বেটির জুলুমে কামের দিকে মন দেওয়ার জো আছে তার? মেয়েটা তার কথা কয় কম, এই বয়সের ছেলেমেয়েদের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু স্বভাবটা বড়ো ছটফটে। কোথাও এক মুহূর্ত বসে থাকতে পারে না, সবসময় এদিক ওদিক করছেই। এই তো কিছুক্ষণ আগে বেশ খেলছিলো মায়ের পাশে বসে। আবার এখন মায়ের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে 'ও মা, খিদা নাগিছে, ভাত খামো।—কথাটা একবার বলেই মায়ের মাথায় হাতের চাপ দিয়ে তাগাদা দিতে লাগলো। তবে এখন ওকে ভাত দেওয়া চলবে না। এখন খেলে রাত না পোহাতেই বিছানায় শুয়েই বেটি ঠেলতে শুরু করবে ফুলজানকে। একবার মাত্র 'মা ভাত খামো' বলে সে অবিরাম ঠেলা দিতেই থাকলে ফুলজান কিছুতেই কথা না বললে কিংবা তার ঘুম না ভাঙলে মাচা থেকে উঠে বেটি তার ঢুকে পড়ে মাচার নিচে। তমিজকে খুঁজতে পুলিস এলে ওখানে গোখরা বেরিয়েছিলো। মাটির নিচে নাকি আরো সাপ থাকতে পারে। ফুলজানের ভয় করে। না, এখন বেটিকে কিছুতেই ভাত দেওয়া চলবে না।

ফুলজান তাই মাথা থেকে ঝামটা দিয়ে সরিয়ে দেয় মেয়ের ছোটো ছোটো হাত দুটো। তাতে ঝামেলা বরং বাড়ে। বেটি তার সোজা হাঁটা দেয় দিঘির ঢালের দিকে। মোষের দিঘির উঁচুপাড়ে লম্বা তালগাছের নিচে পুরনো উঁইঢিবিতে ওঠার ঝোঁকটা তার একটু বেশি। উঁইঢিবির সামনে হাত তিনেক জায়গা, হুরমতুল্লা মাঝে মাঝে মগরেবের নামাজ পড়ে ওখানে। নিচেই খাড়া পাড়, সেখান থেকে পা হড়কে গেলে গড়িয়ে পড়বে পুকুরের পানিতে। তখন? ফুলজান তাই নিড়ানি বন্ধ রেখে বেটিকে ধরতে ছোটে দিঘির ঢালের ওপর দিয়ে।

৫৯

হুরমতুল্লার মতিগতি ফুলজানের ভালো ঠেকে না। ভাগের ধান অনেকটা সে আছে বেচার তালে। মনে হয় মণ্ডলের গোলাতে সব ধান তুলে দিয়ে নগদানগদি টাকা নিয়ে বুড়া সোজা হাঁটা ধরবে সোনামুখির দিকে। নবিতনের শ্বশুরের হাতে দোকান সাজাবার টাকা মিটিয়ে দিয়ে পোড়াদহ মেলার সময় পেয়ারের বেটিকে নাইওর নিয়ে আসার অনুমতিটা আদায় করবে। ছোটো বোন ফালানিটা সেই কবে গেছে নবিতনের শ্বশুরবাড়ি, তাকে বাড়ি আনার ব্যাপারে বুড়া কিন্তু চুপচাপ। সেখানে নাকি সে মহা সুখে থাকে। তা তাদের এতো পয়সা, বৌয়ের বোনকেও রাখে দুধেভাতে, আর বৌয়ের বাপের কাছ থেকে বেটার দোকান সাজাবার খরচ রেয়াদ করে না। ইজ্জতের দামাদের দোকান সাজাবার ব্যবস্থা করলে কয়েকটা মাস যে গুষ্টিশুদ্ধ তাদের কাউনের চালের ভাত খেতে হবে, এমন কি

মাসখানেক আধপেটা কাটাতে হবে সেদিকে হুরমতুল্লার কি কোনো খেয়াল আছে?

তা বাপ চাইলো আর ফুলজান তাই হতে দিলো? আজ তো তার জমিতে আসার কথাই ছিলো না। কিন্তু সারাটা দিন বিছানায় কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে হুরমতুল্লা 'মেলা আসিচ্ছে, বেটিটাক ঘরত আনবার পারমু না' বলে বিলাপ করতে থাকলে ফুলজানের আর সহ্য হয় না। তাই এখন সে জমিতে এসেছে খন্দের পরিমাণ আন্দাজ করতে। তারপর দেখা যাবে বুড়া চুপচাপ ধান বেচে কী করে!

সন্ধ্যার ঠিক আগে ফুলজান এসে দেখে, মোষের দিঘির উঁচুপাড়ে তালগাছতলায় উঁইটিবিটা পেছনে রেখে নামাজ পড়ছে হুরমতুল্লা। সেজদা দিয়ে অনেকক্ষণ সে মাথা না তুললে ফুলজানের বুক ঢিপঢিপ করে : বাপজান তার বেহুঁশ হয়ে গেলো না তো? আজ দুপুর থেকে তো কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়েই ছিলো, পেয়ারের বেটির জন্যে বিলাপ করার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকবার পেচ্ছাব করতে ওঠা ছাড়া আসরের ওকত পর্যন্ত তো সে শুয়েই কাটিয়েছে। বাপজানের আবার এদিক ওদিক কিছু হলো না তো?—কিন্তু সেজদা থেকে উঠে হুরমতুল্লা ফের সেজদা দিলে বাপের শারীরিক সুস্থতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলে ফুলজানের গা জ্বলে : বুড়ার আবার নামাজ বন্দেগি কিসের? সেজদায় উপুড় হয়ে কি দোয়া পড়ে, না নবিতনের শ্বশুরের জন্যে টাকা জোগাড়ের ফন্দি আঁটে?

মোষের দিঘির উঁচুপাড়ে তালতলায় নামাজ পড়ে হুরমতুল্লা, আর জমির ধারে ধারে ঘোরে ফুলজান। পিছে পিছে হাঁটে তার বেটি। চারদিকে ধানজমি, পাকা আধপাকা আমনের খেত। প্রায় সব জমির ধানে পুরুষ্টু শীষ। দেখে দেখে চোখ ভরে যায়। তবে তাদের জমিতে খন্দের পরিমাণ আন্দাজ করতে হবে হুরমতুল্লার সঙ্গে, তার মুখ দিয়ে ধানের পরিমাণ কতো হতে পারে তা স্পষ্ট শুনে নিতে হবে। তবেই না বুড়া এদিক ওদিক করতে ভয় পাবে।

মেয়েকে কোলে তুলে আলের ওপর দিয়ে হেঁটে মোষের দিঘির ধারে গিয়ে দেখে, দিঘির পাড়ের ওপর হুরমতুল্লা নাই। নামাজ পড়ে সে এর মধ্যেই কোথায় গেলো? তার পাঁচুন পড়ে আছে দিঘির ঢালে পুবের জমির পাশে। তা হলে? বাপজান বোধহয় জিরাতে গেছে, কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসবে।

জমির পাশে বসে জিরাতে ইচ্ছা করে ফুলজানেরও। শরীরটা বড়ো অস্থির লাগে। একটু ঠাণ্ডা পড়েছে। গায়ে এন্ডির চাদরটা জড়ালে গরম লাগে, আবার খুলে ফেললে শীত শীত করে।

এর ওপর তার বেটির উৎপাত। মায়ের মাথায় ছোটো হাতের চাপ দিয়ে ভাত খাওয়ার লালচ জানাতে শুরু করেছে বেলা ডুবতেই। চোখ গরম করে ফুলজান তার দিকে তাকালে সে বলে, 'ভাত খামো।'

দুপুরে আজ ফুলজান কচুর শাক তুলেছে মেলা, কচুর শাকের ভেতর কাউন দিয়ে ঘাঁটি করেছে একটা। দুপুরে খেয়েছে, রাতের জন্যেও আছে। তা দুপুরে অনেকদিন পর কচুর শাকের নরম ঘাঁটি পেয়ে সবাই অনেক খেয়েছে, এতো তাড়াতাড়ি তো খিদে পাওয়ার কথা নয়। বেটির ওপর ফুলজানের রাগ হয়। সে আর একবার 'ভাত খামো' বলতেই ফুলজান তার পাছায় দুটো ও দুই গালে গোটা তিনেক চড় মারে। আরো চড় মারতে তার হাত উঠেছিলো, কিন্তু মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছোটে মোষের দিঘির উঁচু পাড়ের দিকে। এই বুঝি তালতলায় উঁইঢিবির দিকে চললো। ওখান থেকে ছুঁড়িটা বুঝি পড়েই গেলো পুকুরের পানিতে। ফুলজানও ছুটলো চড়াই ভেঙে। বেটির তার কয়দিন হলো ঝোঁক হয়েছে ওই উঁইঢিবির ওপর চড়ার। তাই কি কেউ পারে? ওর ওপর উঠতে গেলেই পা পিছলে পড়ে যাবে সামনের ছোটো জায়গাটায়, সেখান থেকে গড়িয়ে

একেবারে দিঘির পানিতে। ফুলজান তাকে ধরে ফেললো উঁইঢিবির নিচেই। এই একটুখানি সময় তাকে উৎকণ্ঠায় রাখার জন্যে তার রাগ উস্কে ওঠে এবং রাগটা ঝাড়ে বেটির পিঠে কষে কয়েকটা কিল মেরে। আরো মারার জন্যে হাত ওঠাচ্ছিলো, কিন্তু এবার তার হাত নেমে যায় বেটির নালিশ শুনে। কাঁদতে কাঁদতে নোনতা পানি জড়ানো গলায় 'মারে! মারে!' বলে সোজা উত্তরপশ্চিমে তাকিয়ে মেয়ে তার নালিশ করে কার কাছে?

কম-কথা-বলা বেটির তার নালিশ করার খাসলত তো একেবারেই নাই। তা হলে?

'দেখো, মা মারে।' শুনে বেটির নজর অনুসারে ফুলজান তাকায় সামনের দিকে। দিঘির ঠিক ওপারেই হুরমতুল্লার বর্গা করা ধানের জমি। তারপর বেশ কয়েক বিঘা ফাঁকা জমির পর বাঙালি নদীর রোগা স্রোত, দুই বছরে প্রায় বুঁজেই এসেছে। না, সেখানে তো কেউ নাই। তার একটু পশ্চিমে কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথান। সেখানে আসমান থেকে ঝোলে গোল চাঁদ। কাৎলাহারের উত্তর সিথানে কোনো বড়ো গাছের বাধা না পেয়ে চাঁদ নেমে এসেছে একটু নিচে।

চাঁদের আজ এ কী হাল হয়েছে গো? পরশু না পূর্ণিমা ছিলো? হ্যাঁ, পরশুই তো। না কি তার আগের দিন? এই কয়েকদিনে চাঁদের গতর একটু রোগা হয়েছে। তা পরশুও তো চাঁদের ঘন করে আওটানো দুধে সয়লাব হয়ে গিয়েছিলো মুল্লুকের আমন ধানের জমি। ওই দুধ চুমুক দিয়েই তো আমনের শীষে দুধ জমলো ঘন হয়ে। আর এই দুইদিনে চাঁদের এ কী ব্যারাম হলো গো? তার গায়ের রূপার বন্ন হয়ে গেছে কালচে লাল, গতর থেকে হলদেটে আভা মুছেই গেছে। চাঁদের সবটা গতরে কেমন কালচে লাল কালচে লাল দাগ। হায় আল্লা! চাঁদের এই হাল হলো কী করে গো? হরেন ডাক্তার, না হরেন ডাক্তার নয়, প্রশান্ত কম্পাউনডার হলে মনে হয় ধরতে পারতো। না কি ওই কম্পাউনডারই শয়তানি করে ফুলজানের বেটার গায়ের ছোঁয়া বাঁচাতে তার বিমারি মুখটাকে ছুঁড়ে দিলো এই কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের দিকে? না, তাই বা কী করে হয়? তার বেটার গালে কি এরকম শুকনা রক্তের ছোপ ছোপ দাগ ছিলো?

তা হলে কি মণ্ডলের ছোটোবিবির ভয়টাই ঠিক? গা ছমছম করলেও ওই ভয়টাই ভর করে ফুলজানের মাথায়। তমিজ যদি সত্যি সত্যি পুলিসের গুলি খায়, তবে সে নিজে বৌকে ছেড়ে অতো ওপরে চড়ে বসে কোন আক্কেলে? তবে মাঝির বেটার দেমাকটা তো বেশি–শ্বশুরবাড়িতে দিনমান কাম করবে, শ্বশুরের জমির লোভ তার ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা;–কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে বাস করতে তার গোয়া কামড়াবে। তাহলে তার থাকার জায়গা আর কোথায়? মাঝিপাড়ায় গিয়ে সে উঠতে পারবে? ওই অপয়া ঘর ভেঙে কালাম মাঝি ওখানে পাকা মসজিদের ভিত দিয়েছে। মাঝিপাড়াতেই আরেকটা মসজিদ করার একটু কথা নাকি উঠেছিলো। তা কুলসুমকে বাঁচাতে গিয়ে কালাম মাঝির ওই যে জখমটা হলো, এরপর সে প্রায় নুলো হয়ে পড়েছে। হাতে ব্যথা নিয়ে হেঁটে হেঁটে মসজিদে যেতে তার ভারী কষ্ট। তার কষ্ট দেখে মাঝিপাড়ার মানুষ মন খারাপ করে। আর ওই কুফা ঘরটা ভেঙে মসজিদ করলে বরং মাঝিদেরই ভালো হবে। কালাম মাঝি বাড়িটিও পাকা করার আয়োজন করছে। কিন্তু আল্লার ঘর পাকা না করে তার নিজের বাড়িতে সে ইঁট বসায় কী করে?

কিন্তু তমিজ ওখানে গিয়ে উঠতে তো আর পারে না। তাই কি সে গুলি-খাওয়া মুখে এসে ঢুকে পড়েছে গোলগাল চাঁদের গতরে? তাই কি চাঁদটাকে এমন ভূতুড়ে দেখায়?

তমিজের ভাবনায় ফুলজানের ভয় একটু কাটে। ওই ডাকাবুকো মানুষটা, জেতা হোক মরা হোক, থাকলে বুকে একটু বল পাওয়া যায়।

চাঁদের নিচে বড়ো গাছ একটাও নাই। পাকুড়গাছ তো গেছে অনেকদিন আগেই, আর

যেগুলো ছিলো সব পড়ে গেছে, বৈকুণ্ঠ মরলো, ওই ঝড়ের রাতে। এখন সেখানে খালি ঝোপ আর ছোটো ছোটো গাছড়া। উত্তর সিথান জুড়ে আর দেখা যায় আলো। মানুষ কয়, সন্ধ্যার পর পাকুড়তলায় এখন খালি আগুন জ্বলে। তবে এখন তো ফুলজানের ভয় খানিকটা কেটেছে, আলোর দিকে কিছুক্ষণ দেখেই বুঝতে পারে আসলে ওই ঝোপে আর গাছড়াগুলোতে জ্বলছে ঝাঁক ঝাঁক জোনাই পোকা। ঝোপের ওপরে, ছেড়ে-যাওয়া ইটখোলার পড়ে-থাকা নষ্ট ইঁটের সারিতে জোনাকি একবার জ্বলে, ফের নেভে। তারা নিভলে ফের জ্বলে ওঠে একটু নিচেকার জোনাকির ঝাঁক। ওপরের জোনাকি ফের আরো ওপরে উড়ে জ্বলে ওঠে দ্বিগুণ তেজে। মনে হয় এতো বড়ো জায়গা জুড়ে সমস্ত ঝোপঝাড় তারা নিজেদের আগুনের ডানায় ডানায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে অনেক ওপরে।

এখন ফুলজানের মনে হয় এখানে না থাকাই ভালো। কৃষ্ণপক্ষের এই রাত্রে মেয়েকে সামনে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে মোষের দিঘির অনেক উঁচু পাড়ে, আরো অনেক অনেক উঁচু একঠেঙে তালগাছের নিচে উঁইটিবির সামনে। এখান থেকে উত্তরে, একটু উত্তর পশ্চিমে এসব কী দেখা যায়! একবার মনে হয় এসব তার চেনা, আবার গা শিরশির করে : আসলে কি সে কিছু ধরতে পারে?—'ও বাপজান' বলে বুক ফাটিয়ে ডাকতে গেলে ফুলজান টের পায় তার সব আওয়াজ আটকে গেছে তার ঘ্যাগের মধ্যে, গলা পর্যন্ত স্বর আর আসে না। এখন তার বেটির কান্নাও থেমে গেছে, এখন ফোঁপানোটা শুধু সামলাতে পাচ্ছে না। নিয়মিত বিরতি দিয়ে তার ফোঁপানির আওয়াজেই ফুলজান এখনো দাঁড়িয়ে থাকার বল পাচ্ছে। বেটির ফোঁপানির শেষদিকের টানে ফুলজানের মনে পড়ে, তার বাপই একদিন বলেছিলো, বড়ো বড়ো গাছ সব না থাকায় ডালহারা, পাতাহারা, গাছহারা এবং বড়ো গাছের আন্ধার কোণাঘুপচিহারা সব জোনাকি এখন ছড়িয়ে পড়েছে ঘাসের ওপর, ঝোপেঝাড়ে আর ছোটো গাছড়ার নরম সরম ডালে।

কিন্তু ফুঁপিয়ে সব কান্না বার করে দিয়ে বেটি তার চুপ হয়ে গেলে সব একেবারে সুমসাম হয়ে যায়। ফুলজানের মনে হয়, বেটিও তার চুপ, এই সুযোগে জোনাকির ঝাঁকের আলো অতোদূর থেকে তার নাড়ি টিপেটিপে তার ভয়ডর সন্দেহ সব ঠিক সনাক্ত করে ফেলছে। তার ডান হাতের কবজিতে সুড়সড়ি লাগে।

ফুলজানের বেটি হঠাৎ করে বলে, 'হেঁসেল জ্বলে।' শুকনা অশ্রুর নুনের খারে তার গলা রুখা শোনায়, 'মা, হেঁসেল জ্বলিছে।'

ফুলজান তখন দেখতে পায় জোনাকির ঝাঁক পাখায় পাখায় আগুন নিয়ে গোটা পকুড়তলাটাকে একটু একটু করে তুলতে তুলতে নিয়ে যাচ্ছে ওই ভূতুড়ে চাঁদের দিকে। না-কি চাঁদটাই জোনাকির টানে নেমে এসেছে একটু নিচে? জোনাকির ঝাঁকের কাছাকাছি? জোনাকির তাপে তাপে, আঁচে আঁচে, এমন কি ধোঁয়ার ধোঁয়ায় চাঁদের গতর থেকে লালচে কালো ছোপ উঠে যাচ্ছে, সেখানে এখন খালি ঘন কালচে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ। জোনাকির হেঁসেলের তাপে কি ওটা অঙ্গার হয়ে যাবে না তো?

'মা, হেঁসেলেত ভাত চড়াছে।' আধো বোল মুছে পরিষ্কার জবানে ফুলজানের বেটি বলে, 'ভাত রান্দে।'

তাই তো, বেটি তার মিছে কথা কয় নি, চাঁদের নিচেই জোনাই পোকার জ্বালে জ্বালে চাঁদের ওপর সেদ্ধ হচ্ছে আউশের রাঙা চাল। পানসে লাল মাড় উপচে পড়তে না পড়তে আগুনের আলো হয়ে তাই গড়িয়ে পড়ছে কাৎলাহারের উত্তর সিথানে। দেখে আর ফুলজানের বেটি নিশ্বাস নেয় জোরে জোরে। বেটি কি ভাতের বাসনা পায় নাকি গো? আল্লা, তাই যেন পায়! জোনাকির শিখায় চাঁদের ওপর সেদ্ধ আউশের চালের ভাতের গন্ধে সে পেট ভরাক। ভালো করে পেটটা ভরলে ঘরে ফিরে তাকে আর ভাত

খেতে দিতে হয় না, আবার রাত না পোয়াতেই জেগে উঠে কিংবা ঘুমের মধ্যেই ভাতের জন্যে মাচার নিচে সে ঘুরঘুর করবে না। কচুপাতা দিয়ে ঘাঁটা কাউনের চালের ভাতটা থাকলে বরং কাল এক সন্ধ্যা চলে যাবে।

ও মা! কিছুক্ষণের মধ্যে ফুলজানের নাকমুখমাথাগলাঘ্যাগ সব ভরে ওঠে ভাতের গন্ধে। কেটা কয় মিছা কথা? আউশের চালের সেদ্ধ হবার ঘেরান চারদিক ম ম করে। আবার মনটা খুঁতখুঁতও করে, এই আউশের চালের ভাতের গন্ধ বুক ভরে নেওয়ায় কি পেট ভরে? খিদা কি তার দূর হবে? আর এই সুবাস একবার পাবার পর কচুর পাতার সঙ্গে কাউনের ঘাঁটি কি আর মুখে রুচবে? কিন্তু সেই গন্ধ শোঁকার আশ তো ফুলজানের মেটে না।

'ভাত খামো। ভাত রান্দিছে, মা ভাত খামো।'—এর মানে বেটির পেট তার খালিই রয়ে গেছে। কোনো ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়াই মেয়ের এই আবদার তার রুখা গলায় শোনায় দাবির মতো। খালি পেটে গলায় এতো তেজ ছুঁড়িটা পায় কোথায় গো? ফুলজানের জানটা কাঁপে। মানষে কয়, পাকুড়তলার চোরাবালির ভেতর তমিজের বাপ নাকি মাঝে মাঝে গা মোচড়ায়। ওই মানুষটাই এসব কারসাজি করছে না তো? বেটার ঘেগি বৌটাকে তার পছন্দ হোক চাই নাই হোক, নিজের বংশের একমাত্র নাতনিকে দেখার আশায়, ভাতের সুবাসে তার জিউটা ঠাণ্ডা করার জন্যে তমিজের বাপই হয়তো ঝাঁক ঝাঁক জোনাই পোকার বুকে ফুঁ দিয়ে হেঁসেল জ্বালিয়ে দিয়েছে। চোরাবালি থেকে নাতনিকে দেখতে দেখতে বেটার বৌকে নিশ্চয়ই সে দেখতে পায়। ফুলজান শরম পায় এবং তাড়াতাড়ি করে শাড়ির আঁচল তুলে দেয় মাথার ওপর, একটু বেশি করেই টানে। কী জানি, তাকে বেপর্দা দেখে শ্বশুর যদি ঘুমঘুম গলায় একটা শোলোক বলে তাকে শাসন করে! মুনসির শোলোক ফুলজান আগে অনেক শুনেছে। পোড়াদহ মেলায় মজনুর শোলোক, ভবানী সন্ন্যাসীর নামে কতো শোলোক শুনেছে। তা এসব তার মনে থাকে না, কোনোদিন নিজে নিজে আওড়ায় নি পর্যন্ত। তমিজ তাকে এতোসব কথা বলতো, কিন্তু শোলোক শোনায় নি কখনো। তার দুই চারটা শোলোক জানা থাকলে না হয় ফুলজান তাই জপতো মনে মনে, তমিজের বাপ হয়তো তাতে একটু ঠাণ্ডা হতো।

কিন্তু বেটি তার এরকম শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কেন? এই ছটফটে মেয়েটা এতোক্ষণ ধরে এরকম স্থির চোখে তাকায় কী করে? নিজের মেয়ে তার দেখতে দেখতে সেয়ানা হয়ে যাচ্ছে নাকি? সত্যি তার বেটি তো? বেটিকে ভয় পেয়ে, তার অচেনা হয়ে যাওয়া ঠেকাতে এবং তাকে খানিকটা বশ করতেও বটে, নিজের হাঁটুজোড়া মাটিতে রেখে ফুলজান দুই হাতে জড়িয়ে ধরে মেয়েকে। মেয়ের ছোটো ঘাড়ে সে ঠেকায় নিজের ঘ্যাগ এবং তার ছোটো মাথায় রাখে নিজের চিবুক। চিবুকে শিরশির করে ওঠে বিজবিজ আওয়াজ। তমিজের বাপ নিশ্চয়ই তার ওপর আসর করে নাতনির মাথার ভেতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে তার জানা অজানা মুনসির পাওনা-শোলোক।

ফুলজান আস্তে করে বলে, 'বাড়িত চল মা। ভাত খাবু না?'

ভাত খাবার কথাতেও মেয়ে সাড়া দেয় না। তার ছোটো ছোটো কালো কুচকুচে পা দুটো সে শক্ত করে চেপে রাখে মাটির ওপর। বেজায় গোঁয়ার ছুঁড়ি গো! হুরমতুল্লা যে বলে, মিছা কথা নয়, এই মাঝির বংশের মানুষ বড়ো একরোখা। মাছ ধরা হলো এদের কুলপেশা, মাছের মতোই ঝাঁক ধরে থাকে। নদীর স্রোতের সঙ্গে এদের খাতির, স্রোত যেদিকে চললো তো সবাই ছুটলো সেদিকেই। আবার স্রোতের সঙ্গে বিবাদ করতেও শালাদের বাধে না। কেমন?—না, স্রোতের উল্টাদিকে চলতেও এরা মাতে সমান তালে। উজানে তো উজানে, ভাটায় তো ভাটায়। বিলের ওপারে গিরিরডাঙার মাঝিরা একজোট

হয়েছে কি আজ থেকে? এরা ছিলো সব মুনসির সাগরেদ। তারই পেয়ারের মানুষ। কোন সেপায়ের গুলিতে সেই মুনসি মরে ভূত হয়েছে, সে কি আজকের কথা? তখন এই তমিজ তো তমিজ, তমিজের বাপ তো তমিজের বাপ, তার দাদা বাঘাড় মাঝিরও জন্ম হয় নি, বাঘাড় মাঝির দাদা না-কি তারও দাদার জন্ম হয়েছে কি হয় নি, হলেও সে তখন গিরিরডাঙায় নতুন মাটি-ফেলা ভিটায় কেবল হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে, তখন গোরা সেপায়ের বন্দুকের গুলিতে খুন হয়ে মুনসি তার গলার শেকল আর হাতের মাছের নকশা-আঁকা পান্টি নিয়ে উঠে পড়ে পাকুড়গাছের মাথায়। সে কি আজকের কথা? মাঝির গুষ্টির কুষ্টি জানতে বয়ে গেছে ফুলজানের! তবে লোকে বলে, সেই পাকুড়গাছ থেকে মুনসি নাকি বিল শাসন করছে সেই থেকে। রাতে তার পোষা গজারের ঝাঁক তারই হুকুমে ভেড়ার পাল হয়ে হাবুডুবু খেতে খেতে সাঁতার কেটে বেড়ায় তামাম বিলের ওপর। তা পাকুড়গাছ হারিয়ে গেলে মুনসির আরস এখন কোথায় উধাও হয়েছে কে জানে? মুনসির জায়গা কি এখন দখল করেছে তমিজের বাপ। তবে কি-না, মানুষটা নাকি একটু হাভাতে কিসিমের। তার যেমন খাওয়ার লালচ, গজার মাছগুলোকে কেটেকুটে জোনাকির হেঁসেলে চড়িয়ে দিয়েছে হয়তো ওই মানুষটাই। আর গুলি-খাওয়া গতরটা মেলে দিয়ে গোল চাঁদটা কি রান্নার সুবিধা করে দিলো? ফুলজান নিশ্চিত হয়, তার বেটি এখন গজার মাছের মাথা-মাখা-করে-রাঁধা ঝাল সালুনের সুবাস পাচ্ছে। নইলে শুধু ভাতের গন্ধে এতোক্ষণ হাঁ করে নিশ্বাস নেওয়ার ছুঁড়ি তো সে নয়।

এখন ভাতের গন্ধ আর মাছের গন্ধের কথা না হয় বোঝা গেলো, কিন্তু ফুলজানের বেটির মাথার ভেতরে বিজবিজ করে কী? তাহলে এর মাথার এই বিজবিজ আওয়াজ থেকে কথার কুশি বেরুবে, সেটাকে শোলোকে গেঁথে তুলবে কি এই সখিনাই? ভাত খাওয়া ছাড়া ছুঁড়ি আর বোঝে কী? এ কি আর শোলোক গাঁথতে পারবে? কে জানে! কী শোলোক গাঁথবে!

এখন মুনসি নাই, তার পাওনা-শোলকের কোনো টুকরাও কি আর সখিনার মাথায় গুণগুণ করতে পারবে? শোলাক গাঁথার ক্ষমতাও তো তমিজের বাপের ছিলো না।

এদিকে মোষের দিঘির ওপার থেকে, মনে হয় পাথারের ওপার দিয়ে শোনা যায় হুরমতুল্লার কাশিধসা গলার ডাক, 'ফুলজান, ও ফু উ উল জা আ ন।' ফুলজান একটু চমকে উঠলে তার নজর কাঁপে। দেখা যায়, বিলের ওপর ধীরে ধীরে ওড়ে মণ্ডলবাড়ির শিমুলগাছের বকের ঝাঁক। হেঁসেলের আগুনের ভয়ে তারা ওদিকে ঘেঁষে না। কিন্তু বিলের ওপর দিয়ে তারা আস্তে আস্তে উড়াল দিতে থাকে এপারের দিকে। একটু ঘুরে এই বুঝি তারা এসে পড়ে মোষের দিঘির ওপর। ভয়ে ফুলজান উঠে দাঁড়ায়, বেটির ঘাড় ধরে ঝাঁকায়, 'সখিনা, ও মা, চল। বাড়িত চল।'

বকের ঝাঁক হুরমতুল্লার ঝাপসা চোখেও আবছা ছায়া ফেললেও ফেলতে পারে। লালচে কালো কুয়াশা চুঁয়ে আসে তার ব্যাকুল ডাক, 'ও ফু উ উ লজা আ আ ন। ফুলজান।'

ফুলজান সাড়া দেবে কী করে? মেয়েকে নড়াতে পারে না। মোষের দিঘির উঁচু পাড়ে লম্বা তালগাছের তলায় পুরনো উঁইটিবির সামনে খটখটে শক্ত মাটিতে পাজোড়া জোরে চেপে রেখে ঘাড়ের রগ টানটান করে মাথা যতোটা পারে উঁচু করে চোখের নজর শানাতে শানাতে সখিনা তাকিয়ে থাকে কাৎলাহার বিলের উত্তর সিথানে জখম চাঁদের নিচে জ্বলতে-থাকা জোনাকির হেঁসেলের দিকে॥